আত্মচরিত

আত্মচরিত

রজনীকান্ত গুহ

(বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন
কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব
অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বহু-
ভাষাবিৎ ও বঙ্গভাষায় 'সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস
এণ্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা', 'মেগাস্থেনীস',
'সোক্রাটিস্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা)

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়
৪০এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

আমাদের পিতা শেষ রোগশয্যায় তাঁহার আত্মচরিত ছাপাইবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ঐ আত্মচরিত ছাপাইতে প্রথমে অনুরোধ করি। কিন্তু গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতে আরও বিলম্ব হওয়া উচিত নয় বিবেচনা করিয়া আমাদের পিস্তুতো ভাই শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়কে পিতার ইচ্ছার কথা জানাই। স্বর্গত স্নেহময় মাতুলের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে তিনি সাগ্রহে ঐ পুস্তক ছাপাইবার ভার গ্রহণ করেন।

এই আত্মচরিত লিখিত হয় পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—কয়েক বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিয়া। জীবনের শেষভাগের ঘটনাবলি তিনি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া যাইতে পারেন নাই। মৃত্যুর প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। এই গ্রন্থ-রচনাকালে তাঁহার বাম চক্ষু মাত্র ভরসা ছিল; বয়সও তখন সত্তরের উর্দ্ধে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় দুই তিন বৎসর লুপ্ত-প্রায় দৃষ্টিশক্তির জন্য পিতা লেখার কাজ করিতে পারিতেন না। বহু আশা ও ভরসা লইয়া ১৯৪৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী দ্বিতীয় চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও নষ্ট হইয়া যায়। তিন মাস পরে যেদিন ঐ নিদারুণ সত্য ডাক্তার তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন, সেইদিনই পিতা শয্যা গ্রহণ করিলেন। তার পর প্রায় দীর্ঘ নয় মাস রোগযন্ত্রণা ও মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়া ১৯৪৫ সনের ১৩ই ডিসেম্বর পার্কসার্কাসস্থ তাঁহার প্রিয় বাসভবনে পিতা দেহত্যাগ করেন।

৩৯, পার্কসার্কাস ও
১০, বালীগঞ্জ গার্ডেনস্
কলিকাতা
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯

সত্যব্রত গুহ
অমিতাভ গুহ
স্বর্ণকুমারী রায় চৌধুরী

সূচীপত্র

স্বর্গত রজনীকান্ত গুহ

জন্ম : ১৯শে অক্টোবর, ১৮৬৭ — মৃত্যু : ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫

প্রথম অধ্যায়

বংশ পরিচয়

আমাদের কুলপঞ্জিতে লিখিত আছে, "সর্ব্বাদৌ বিরাট্ গুহ।" তাঁহার বংশধর দশরথ গুহের রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি পুত্র ছিলেন। আমরা ভরত গুহের সন্ততি। তাঁহার অধস্তন একাদশ পুরুষ গোপীনাথ গুহ "চন্দ্রদ্বীপ হইতে আইসেন।" তাঁহার পুত্র হরিচরণের পাঁচ পুত্র, রামকানু, রামকৃষ্ণ, রামজীবন, রামদেব, রামনারায়ণ। রামকৃষ্ণ অপুত্রক ছিলেন; অবশিষ্ট চারি ভ্রাতাই জামুরিয়া গ্রামের গুহগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ। রামকানুর পৌত্র বলরাম; তাঁহার প্রথম পৌত্র রামমোহনের বংশ অধস্তন তৃতীয় পুরুষে, আমাদের জেঠতুতো ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পৌত্র গৌরমোহনের পুত্র রাজমোহন আমাদের জেঠামহাশয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দমোহন "বড় বাড়ীর বড় দাদা," নিঃসন্তান। দ্বিতীয় পুত্র গুরুনাথ গুহের তিন পুত্র বর্ত্তমান।

রামজীবনের প্রথম শাখা পরবর্ত্তী চতুর্থ পুরুষে বিলোপ পায়। দ্বিতীয় শাখার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ আমাদের খুড়তুতো ভ্রাতা রুদ্রনাথ গুহ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন; তাঁহার স্ত্রী পোষ্যপুত্র রাখিয়া বংশরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামদেবের বংশ তৃতীয় পুরুষে লুপ্ত হয়।

রামনারায়ণের পুত্র কালিকাপ্রসাদ; তাঁহার চারি পুত্র ছিলেন, জ্যেষ্ঠ দেবীপ্রসাদ; তাঁহার পুত্র দুর্গাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের তিন পুত্র; প্রথম গোবিন্দপ্রসাদ, বোধ হয় বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হন; দ্বিতীয় গোপালপ্রসাদ, তৃতীয় বৈদ্যনাথ। গোপাল প্রসাদের পুত্র রাধাপ্রসাদ (প্রকাশ নাম উমানাথ) আমাদের পিতা। বৈদ্যনাথের পুত্র আনন্দনাথ অল্প বয়সে লোকান্তরিত হন।

প্রবাদ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে ঘাটাইল গ্রামে বসতি করিতেন; কিন্তু ইহার কোনও নিদর্শন নাই। গুহগণ অন্যূন তিনশত বৎসর বর্ত্তমান বাস্তুভূমিতে বাস করিতেছেন।

জামুরিয়া

জামুরিয়া গ্রাম পশ্চিম ময়মনসিংহে টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যে পুখরিয়া পরগণার অন্তর্গত। নসিরাবাদ সহর (বর্ত্তমান নাম ময়মনসিংহ) হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত যে রাজপথ আছে, ঘাটাইল সেই পথের পার্শ্বে নসিরাবাদ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৩৯ মাইল দূরবর্ত্তী, টাঙ্গাইল হইতে প্রায় ঊনিশ মাইল উত্তরে। আমাদের গ্রাম ঘাটাইলের পশ্চিমে আন্দাজ দেড় মাইল দূরে অবস্থিত, সোজা পথে টাঙ্গাইল হইতে দূরত্ব পনর মাইল।

গ্রামখানি ছোট; আমাদের বাল্যকালে উহাতে ঊনচল্লিশ ঘর গৃহস্থ ছিল, এখন কিছু কম। ইহার পশ্চিমে ও উত্তরে টোক নামে ছোট নদী। নদীটি গ্রামের দক্ষিণার্দ্ধ স্পর্শ করিয়া অপরার্দ্ধ হইতে দূরে সরিয়া শস্যক্ষেত্রের ব্যবধান রাখিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। উহাতে স্রোত নাই, কাজেই

তলদেশ পঙ্কে পরিপূর্ণ। টোক গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালের নূতন জলে উচ্ছ্বসিত হইয়া গ্রামের পথ ঘাট মাঠ প্লাবিত করে, এবং সংবৎসর ধরিয়া নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলিকে প্রচুর মৎস্য জোগাইয়া থাকে।

নদীতীরের কয়েকটা হিজল গাছ ও দক্ষিণ দিকে তিনটী পলাশ বৃক্ষ ও একটী বট গ্রামটীর পরিচয় দিত। পূর্ব্বে ও দক্ষিণে শস্য ক্ষেত্র। গ্রামটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অনন্যসাধারণ কিছু নাই, কিন্তু ইহা তরুলতায় শ্যামল, নয়নের আরামদায়ক। প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে ধলাপড়া হইতে মধুপুর পর্য্যন্ত ১৩৷১৪ মাইল দীর্ঘ ও ৮৷৯ মাইল প্রশস্ত বন, প্রচলিত নাম মধুপুরের পাহাড়। তাহার অল্প দূরেই ঢাকার উত্তর হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভাওয়াল ও মধুপুরের নিবিড় অরণ্য। প্রথমটী আমাদের উচ্চ বৃক্ষ হইতে দেখা যায়, এবং গ্রামবাসীরা ইহা হইতে কাঠ, খড় প্রভৃতি গৃহের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ "বাইশ দেহার তালুকদার" নামে খ্যাত ছিলেন। বাইশখানি 'দেহা' অর্থাৎ গ্রাম তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। এখনও বোধ হয় আমাদের প্রধান সরিকের বাইশ গ্রামে প্রজা আছে। জামুরিয়া গ্রাম যে তাঁহারাই পত্তন করিয়াছিলেন, বসত-ভূমিগুলির অবস্থান হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইঁহারা ঠিক মধ্যস্থলে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড নিজেদের জন্য চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন। পশ্চিমে বাস্তুসংলগ্ন নদী; উত্তরে একটী খাল (প্রচলিত নাম দোয়াল); উহা পরিখার ন্যায় বসতভূমিকে উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় পরিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বদিকের পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণে আর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী এবং তাহার

পশ্চিমে, বাটীর মধ্যাংশের দক্ষিণে, তৃতীয় পুষ্করিণী। প্রথম ও দ্বিতীয়টীর তিন পার্শ্বে প্রজাদিগের বসতি। তৃতীয় পুষ্করিণীর দক্ষিণে বারোয়ারী কালীবাড়ী, পশ্চিমে, নদীর পার্শ্বে, বোধ হয় এক শতাব্দী পূর্ব্বে দত্তবংশীয় এক কুটুম্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেখানেই বাস করিতেছেন। গুহ বংশের দৌহিত্র দুই বসু পরিবারও এই গ্রামের অধিবাসী।

এই ভূমিখণ্ডের উত্তরে ও দক্ষিণে বর্ষার জলপ্রবাহের প্রশস্ত পথ, তৎপরে একটীর উত্তরে উত্তরপাড়া অপরটীর দক্ষিণে দক্ষিণ পাড়া। জল চলাচলের প্রণালী আরও আছে। খালের দক্ষিণে, বাসবাটীর পশ্চাদ্দিকে প্রজাপত্তনের জন্য কিয়ৎপরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিয়া সুরক্ষিত আয়ত ক্ষেত্রে গুহমহাশয়রা স্বীয় ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সমগ্র গ্রাম তাঁহাদের অধিকারে ছিল, নানা দশা-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও অধিকাংশ এখনও আছে।

কৌলিক বিগ্রহ পূজার জন্য ব্রাহ্মণ, নিত্য প্রয়োজনীয় পাঁচ ছয় ঘর ভুঁইমালী, নানা কার্য্যপটু বার চৌদ্দ ঘর মাঝি বা কৈবর্ত্ত, পূজা-পার্ব্বণ ও গৃহস্থালীতে কাজ করিবার জন্য দে, দত্ত, দাস প্রভৃতি উপাধিধারী নিম্ন সোপানের কায়স্থ—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সহায় সমস্তই তাঁহাদের হাতের কাছে ছিল। এই গ্রামে মুসলমান নাই। নিকটেই এমন কত গ্রাম আছে, যাহার অধিবাসী সমস্তই মুসলমান এবং বহু বহু গ্রামে হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশিরূপে বাস করিতেছে।

গোপীনাথ গুহ সঙ্গে "জড় খরিদা নফর" আনিয়াছিলেন। তাহাদিগের উপাধি ছিল সেন। নদীর একটী ঘাট আজিও "সেনদের ঘাট" নামে পরিচিত। "নফরের ভিটা" নামটীও ইহার প্রমাণ।

সেকালে এ দেশে দাসদাসীর ক্রয়বিক্রয় প্রচলিত ছিল; প্রমাণ স্বরূপ একখানি প্রাচীন পত্রের প্রতিলিপি দিতেছি।—

শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চাগে—

পত্রোত্তরে জানিবা
(স্বাক্ষর—)
(পড়া গেল না)

শ্রী বলরাম গুহ কহিলা

সন ১১৩৬ সনে তোমারদিগের তালুক ইহান জীম্মে ছীল—তিন জনের মালগুজারির অপ্রতুল জন্যে ইহান নিজের এক দাসী বিক্রী করিয়া তিন জনের মধ্যেই খরচ করিয়াছেন—তাহার হিসা তোমরা দেহ নাহি অতএব লিখি হিসা মতে টাকা (দিবা) পুনশ্চ নালিষ না হয়

(শিরোনামা)

শ্রীযুত কালিকাপ্রসাদ গুহ

শ্রীযুত জয়দেব গুহ

ইতি ২২ কার্ত্তিক

বলরাম গুহ হরিচরণ গুহের জেষ্ঠ পুত্র রামকানুর পৌত্র; কালিকা প্রসাদ রামকানুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণের পুত্র, বলরামের খুল্লতাত, আমাদিগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। জয়দেব রামকানুর চতুর্থ ভ্রাতা রামদেবের পৌত্র, বলরামের খুড়তুতো ভাই। গোপীনাথের পরবর্ত্তী কালে তালুক ও বসতভূমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং হরিচরণের দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হরিচরণের পৌত্র ভবানীদাস, কালিকাপ্রসাদ প্রভৃতির সময়ে এই বিভাগ ঘটিয়াছিল।

পত্রখানি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছিল। তখন সুজা উদ্দিন বাংলার নবাব ছিলেন।

শুনিয়াছি পুখরিয়া পরগণা প্রথমে নাটোরের জমিদারের অধিকারে ছিল, পরে পুঁটিয়ার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ময়মনসিংহ সহরে পুঁটিয়ার কাছারীবাড়ীর নাম পুখরিয়ার বাসা। পত্রখানি স্পষ্টই উপরিতন ভূম্যধিকারী তদধীন তালুকদারদিগকে লিখিতেছেন।

জামুরিয়ার তালুকদারেরা বহুকাল হইতে গভর্ণমেণ্টকে সদর খাজনা দিয়া আসিতেছেন। ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ পত্র পড়িলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময় হইতেই আমাদের শাখার পতনদশা আরম্ভ হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পরে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০ সনে), আমাদের প্রপিতামহ এবং তাঁহার দুই খুল্লতাত সমস্ত তালুক বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, তাঁহারা এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন যে, বিক্রেতাদিগের ভরণপোষণ ও দেবসেবার জন্য যেটুকু তালুক ও জমিজমা থাকিল, তাহা "লাখেরাজ জীবিকা" বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহার দেয় খাজানা ক্রেতা ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা গবর্ণমেণ্টকে দিবেন। এই সর্ত্ত তদবধি পালিত হইয়া আসিতেছে। আমাদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তির জন্য কোনরূপ কর দিতে হয় না।

উদ্ধৃত পত্র আর একটা বিষয়ের উপরে আলোকপাত করিতেছে। উহাতে বলরাম ১১৩৬ সালের একটা ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তিনি গোপীনাথ গুহ হইতে পঞ্চম পুরুষে। এক এক পুরুষে ত্রিশ বৎসর ধরিলে গোপীনাথ ঐ ঘটনার একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ৯৮৬ সালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে উত্তরাঞ্চলে আগমন করেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তাঁহার আগমনের কাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ, কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ।

হরিচরণ গুহের পুত্র বা পৌত্রগণ যখন পৃথগন্ন হইলেন, তখন বাস্তুভূমি বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হইল। আমাদের প্রপিতামহ দুর্গাপ্রসাদ গুহ ঠাকুরের ১২১৮ সালে লিখিত একখানি পত্র হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সে সময়ে গুহেরা পাঁচ সরিক ছিলেন। "অল্প স্থান, পাঁচজন সামাই হয় না; সে মতে মধ্যস্থেরা সকলে কহিলেন,······আপনারা তিনজন দেখিয়া স্থানান্তর বাড়ী কর। পশ্চিমবাড়ী কৃষ্ণদেব গুহেরা (রামদেব গুহের পৌত্র) জয়দেব সরকারের বাড়ীতে বাড়ী করিয়াছিলেন।···· আমার পিতামহ ঠাকুর (কালিকাপ্রসাদ গুহ) কহিলেন, 'আমি জ্ঞাতি ছাড়িয়া যাব না, আমি পুষ্করিণী ভরাট করিয়া বাড়ী করিব।' সরিকেরা কহিলেন, 'বিলক্ষণ।'" তদনুসারে, পূর্ব্বভাগে, যেখানে রন্ধনশালা ছিল সেই দিকে, পুকুরের কিয়দংশ ভরাট করিয়া তিনি বাস বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই জন্যই আমরা শৈশবে দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীতে মাটি খুঁড়িলে বিস্তর চাড়া বা খোলামকুচি বাহির হয়। আমাদের বাড়ী 'পূববাড়ী', তার পর "বড় বাড়ী" অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ শাখার বাড়ী, তাহার পশ্চিমে 'পশ্চিমবাড়ী'; তাহার পার্শ্বে, নদীতীরে যে শাখা বাস করিতেন, তাহা বিলুপ্ত হইবার পরে বসতভূমি পশ্চিম বাড়ীর সহিত মিলিত হয়; উহার পরিচায়ক নাম "সাবেক পশ্চিম বাড়ী", পশ্চিমবাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও বৃহৎ।

দুর্গাপ্রসাদ লিখিয়াছেন, যে বাঞ্ছারাম গুহেরা (রামজীবনের প্রপৌত্র) কৃষ্ণা শূদ্রের বাড়ীতে বাড়ী করিয়াছিলেন। সম্পত্তি বিভাগের পরে চারি সরিক পৈত্রিক বাস্তুভূমিতে বাস করিতেন।

একটি কিম্বদন্তী চলিত আছে যে, গুহগণ এককালে ডাকাতি করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের তিন বাড়ীতে তরবারি, ভোজালি,

শরকী প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। শুনিয়াছি—দেখিয়াছি কি না, স্মরণ নাই—কখন কখনও বসতবাটীর মাটীর নীচে মানুষের হাড় পাওয়া যাইত। ডাকাতির খ্যাতি বা অখ্যাতি যে একেবারে অলীক নয়, উপাখ্যান তাহা দেখাইয়া দিতেছে। আমাদের গ্রামের নিকটে উত্তর-পশ্চিম কোণে টোক নদীর একটা খাল আছে। জেঠা মহাশয়ের মুখে উহার উৎপত্তির যে ইতিহাস শুনিয়াছি, তাহা এই। একবার ভিন্ন স্থানের কতকগুলি লোক নৌকাতে দক্ষিণে যাইতেছিল। জামুরিয়া হইতে একটু দূরে থাকিতে তাহারা শুনিতে পাইল, ঐ গ্রামের মালিকেরা ডাকাইত, সুতরাং টোক দিয়া যাওয়া নিরাপদ হইবে না। নিকটেই ক্ষুদ্র জলধারা ছিল; তাহারা সেইটী বৈইঠা দ্বারা কাটিয়া প্রশস্ত করিতে করিতে নূতন জলপথে পলায়ন করিল। সেই দিন হইতে "বৈঠাকাটা খাল" নামটী চলিয়া আসিতেছে।

নবাবী আমলে বাংলার ভূস্বামীরা অনেকে ডাকাতি করিতেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ডাকাতি করুন বা নাই করুন, তাঁহারা যে বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁথি সংগ্রহের ও পুঁথি নকলের কাজে তাঁহাদের উৎসাহ ছিল। বংশপরম্পরা ক্রমে এই কাজ চলিত। বাল্যকালে আমাদের তিন বাড়ীতেই খুব প্রাচীন ও আধুনিক বহু পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। সে কথা পরে বলিব।

আমাদের সময় হইতে ছয় পুরুষ পূর্ব্বে পূববাড়ী, পশ্চিমবাড়ী ও সাবেক পশ্চিম বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের বিগ্রহ দারুময়, নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধারাণী; পশ্চিমবাড়ীর বিগ্রহও দারুময়, নাম কালাচাঁদ; তৃতীয় বাড়ীর বিগ্রহ ধাতব, নাম গোপীনাথ এবং পাষাণমূর্ত্তি গোবিন্দ রায়। জ্যেষ্ঠ পরিবারে নিজস্ব কোনও বিগ্রহ

নাই। সাবেক পশ্চিমবাড়ীর বংশধারা নিশ্চিহ্ন হইবার পর হইতে গোবিন্দ রায় ও গোপীনাথ অবশিষ্ট তিন বাড়ীতে বৎসরে চারিমাস করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পূজার জন্য এক ব্রাহ্মণ পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা বংশানুক্রমিক দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেন। ১৮৮২ সনে দাদা ও বড় বাড়ীর বড় দাদা, জেঠা মহাশয়ের সম্মতি লইয়া নিজ নিজ দেবোত্তর শস্যক্ষেত্রগুলি খাস দখলে আনয়ন করেন, বসতবাটী ঠাকুরদিগের অধিকারেই আছে। তদবধি বেতনভুক্ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার কাজ চলিতেছে।

জামুরিয়া, নন্দনগাতি, ঘাটাইল, কর্ণা, গলগণ্ডা এবং সাঙ্গালিয়া পাড়া-গৌরাঙ্গীর ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, রায় ও নিয়োগী প্রভৃতি কায়স্থদিগের মধ্যে একটা সামাজিক বন্ধন আছে; গ্রাম-গুলির সমষ্টিগত নাম "তরপ গৌরাঙ্গী"। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ড এবং দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা পার্ব্বণে অনুষ্ঠানকর্ত্তা মেলবদ্ধ ভদ্রলোকদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু শৈশব হইতেই দেখিতাম, 'তরপ গৌরাঙ্গী' প্রায়শঃই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িত; এক দল অপর দলকে নিমন্ত্রণ করিতেন না; তখন উৎসবানন্দ নিজ নিজ দলেই আবদ্ধ থাকিত। এই প্রকার দলাদলিতে বরাবর জেঠামহাশয় ও বাবা এক দিকে থাকিতেন, পশ্চিম বাড়ী বিরুদ্ধ দলে যোগ দিত। জ্ঞাতিদিগের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিরোধের উৎপত্তি নিশ্চয়ই কুরুপাণ্ডবের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

পিতামাতা

পিতা উমানাথ গুহ ১২২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কোষ্ঠীতে তাঁহার জন্মবৎসর ১২২৭ ছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার

বেশ স্মরণ আছে, তাঁহার লেখা একখানা পুঁথিতে দেখিয়াছিলাম, উহা নকল করিবার তারিখ ১২৩৫। উহার হস্তাক্ষর এত সুন্দর যে তাহা নয় বৎসরের বালকের বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এইজন্য জন্মতারিখটা অনিশ্চিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

বাল্যকালে অনেক বার শুনিয়াছি, আমাদের পূর্ব্বগামীরা কেহই দীর্ঘজীবী ছিলেন না, সকলেই ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পিতা যে পিতামহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কখনও কিছু বলিয়াছেন, এমত স্মরণ হইতেছে না। ইহাতে মনে হয় গোপালপ্রসাদ গুহ মহাশয়ও অকালে গতায়ু হইয়াছিলেন। পিতা তাঁহার খুল্লতাত বৈদ্যনাথের নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একাধিকবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, একদিন শাসন করিবার উদ্দেশ্যে কাকা তাঁহার হাতে কনুইয়ের নীচে বাঁশের চাঁচড় দিয়া এমন জোরে আঘাত করিয়াছিলেন যে তাহাতে একখণ্ড মাংস কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। "বৈদ্যনাথ গুহ" এই নামাঙ্কিত আম কাঠের ছয়খানা খুব বড় পীড়ি আমাদের বাড়ীতে ছিল। তাঁহার লিখিত বংশাবলী ও ঐ পীড়ি ছাড়া তাঁহার অন্য কোনও চিহ্ন আমরা দেখি নাই।

পিতামহীর একটীমাত্র স্মৃতিচিহ্ন আমরা দেখিয়াছি, সেটী তাঁহার নিজের রোপিত কাঁঠাল গাছে। ঠাকুরমার গাছের কাঁঠাল অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

বাবা ঠাকুরমার সহিত সংস্পৃষ্ট একটা ঘটনা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, উহা স্বপ্নসঞ্চরণের দৃষ্টান্ত, এজন্য বর্ণিত হইতেছে।

তিনি তখন বালক। একদিন রাত্রিতে ঠাকুরমার ডাক শুনিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলেন, উঠানে দাঁড়াইয়া মা বলিতে-

ছেন, "উমানাথ, এত বেলা হইল, এখনও উঠিলে না, ঠাকুর পূজার ফুল তুলিবে না?" বাবা অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ঘরের বাহিরে যাইয়া যেন দেখিলেন, বাস্তবিকই অনেক বেলা হইয়াছে। তিনি ঠাকুর ঘর হইতে ফুলের সাজি লইয়া ফুল তুলিতে চলিলেন। ঠাকুরমা ভাবিলেন, পুত্র বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাইতেছেন, তিনি তাঁহার সঙ্গে গেলেন। এদিকে বাবা ফুল বাগানের দিকে না যাইয়া গ্রামের বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং মাঠের পথ ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা তখন বাবার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেম, "উমানাথ, কোথায় যাইতেছ?" বাবার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, এবং চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তিনি দেখিলেন, গভীর অন্ধকার রাত্রি। তারপর জননীর সহিত গৃহে আসিয়া আবার নিদ্রিত হইলেন। গল্পটা বলিবার সময় বাবা গায়ের ঝাঁকুনিটা এমন বাস্তব করিয়া দেখাইতেন, যে তাহা আজও মনে অঙ্কিত হইয়া আছে।

সে কালের প্রচলিত শিক্ষা লাভ করিয়া পিতা নিজের চেষ্টায় যথার্থ জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তরপ গৌরাঙ্গীতে 'পণ্ডিত' বলিয়া প্রশংসিত হইতেন। ঘাটাইলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমাদের বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে কেহ ব্যবস্থার জন্য গেলে তিনি বলিতেন, "উমানাথ গুহ থাকিতে আমার নিকটে আসিয়াছ কেন? তাহার কাছে যাও।" পিতা কখনও টোলে পড়েন নাই; কিন্তু বহু সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, এবং সেগুলির অর্থও তিনি বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তাঁহার নখাগ্রে ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিদ্যানুরাগ স্মরণ করিলে গৌরব বোধ করি। তিনি কিশোর বয়সে রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, জগন্নাথ মাহাত্ম্য প্রভৃতি

পুঁথির আকারে নকল করিয়াছিলেন। তা ছাড়া নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি, দায়ভাগ, হিতোপদেশ প্রভৃতি পুস্তকের নব্য আকারে প্রতিলিপি করিয়া পরিপাটীরূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। হিতোপদেশ ও আরও দুই একখানির শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, 'ছাপার নকল।' হিতোপদেশ প্রকাশিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে; উহাতে গদ্যভাগের বঙ্গানুবাদ এবং শ্লোকগুলির মূল ও বঙ্গানুবাদ দুই-ই আছে। একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পিতা প্রথমে যে পুস্তকগুলির প্রতিলিপি করিয়াছিলেন, সেগুলির পত্রাঙ্ক পারসী কেতাবের মত ডান দিক হইতে বাম দিকে চলিয়া গিয়াছে; পরবর্ত্তী পুস্তকগুলিতে কোনও ব্যতিক্রম নাই।

তাঁহার আলাপে ভূয়োদর্শন ও লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। সদাসর্ব্বদা ব্যবহৃত অনেক শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি পার্সী জানিতেন কি না, বলিতে পারি না। জানুন বা না জানুন, তিনি যে প্রাচীন ধরণের একজন যথার্থ সুশিক্ষিত পুরুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাবা নিরলস, কর্ম্মপটু, সুনিপুণ গৃহস্থ ছিলেন। ঘর দুয়ারের অনেক কাজ—দরমা ও সুতলী তৈয়ারী করা, বেড়া বাঁধা ইত্যাদি তিনি নিজে করিতেন। তাঁহার নিজের গ্রামে বাড়ীতে বেগুন, মূলা, শিম, লঙ্কা, লাউ, কুমড়া, মিষ্ট কুমড়া, ঝিঙ্গা, কাকড়ল, ডাঙ্গা বৎসরের পর বৎসর যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। বাহিরের কাজ করিবার জন্য একটী বই চাকর থাকিত না, তাহাও সকল বৎসর নয়। বাড়ীতে কয়েকটা গাভী ছিল; সেগুলি দিনের বেলায় 'গোরা' ঘরে ও রাত্রিতে গোহাল ঘরে থাকিত। চাকর না থাকিলে তিনি নিজে ঘরদুটী পরিষ্কার করিতেন, নাদে খড় খৈল মাখিয়া গরুগুলিকে খাইতে দিতেন, সেগুলি

গোচারণে লইয়া যাইতেন। আমরা এক এক জন পাঁচ ছয় বৎসরে পঁহুছিলেই তাঁহাকে গোপালনের কর্ম্মে সাহায্য করিতাম। তাঁহার স্বাবলম্বনপ্রিয়তা এত প্রবল ছিল যে, যে লোকটী আমাদের গাই দোহাইত, সে এক দিন আসিতে কি একটা ওজর করিল শুনিয়া তিনি তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে স্বয়ং গরু দুহিতে অভ্যাস করিলেন। আমার জ্ঞানোদয়ের সময় অবধি তাঁহার চক্ষুর জ্যোতিঃ ম্লান হইতেছিল, শেষ দুই এক বৎসর তিনি প্রায় অন্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য আমি তাঁহাকে কখনও পুস্তক পড়িতে দেখি নাই; কিন্তু ইহাও দেখি নাই যে, বিশ্রামের প্রয়োজন ছাড়া অন্য সময়ে তিনি নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আছেন, কিংবা গল্পগুজব করিয়া বা তাসপাশা খেলিয়া কালহরণ করিতেছেন।

তাঁহার প্রতিজ্ঞার বল অসাধারণ ছিল। আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বে তিনি তামাক খাইতেন। একদিন সকালে হুঁকা পরিষ্কার করিবার শিকটা যথাস্থানে পাইলেন না। তখন রাগ করিয়া কাঁসার বৈঠকশুদ্ধ হুঁকা উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর তামাক খাইবেন না। হুঁকা চূরমার হইল, বৈঠক দুই টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আমরা তাহা সিন্দুকে দেখিয়াছি। তিনি জীবনে আর ধূমপান করেন নাই।

পিতার কয়েকটী বিশেষত্ব এখনও মনে আছে। কাহারও আমগাছ হইতে আম পড়িলে যে তাহা পায়, সেই লইয়া যায়, ইহাই দস্তুর; কিন্তু তিনি পাইলে তাহা গৃহস্বামীকে দিতেন। আমরা যখন কলাপাতায় লিখিতাম, তখন যে প্রতিবেশীর বাড়ীতে কলাবাগান আছে, সেখানে পাতা কাটিতে যাইতাম, তাহার অনুমতি লইবার প্রয়োজন বোধ করিতাম না। কিন্তু বাবা সঙ্গে গেলে সে প্রজা হইলেও তাহাকে জানাইয়া পাতা কাটিতেন। তিনি ষাঁড় বাছুর

বেচিয়া ফেলিতেন, কিন্তু মুসলমানের কাছে বেচিতেন না, কারণ তাহারা সেগুলি বিকলাঙ্গ করে। তিনি বড়শীতে মাছ ধরিতেন না, বড়শীর মাছ খাইতেন না; তাঁহার জীবদ্দশায় আমরাও বড়শীতে মাছ ধরি নাই বা বড়শীর মাছ খাই নাই।

পিতা সংযতেন্দ্রিয় নির্ম্মলচরিত্র পুরুষ ছিলেন। গ্রামে আমরা যে প্রকার দূষিত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের এই লক্ষণটী স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১২৫০ সনে পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি জামালপুরের সন্নিকট চন্দ্রা নিবাসী পূজণীয় সদানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের দুইটি কন্যা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, আতুড় ঘরেই শিশু ও প্রসূতি পরলোকে চলিয়া যান। বড় দিদির বয়স তখন দুই বৎসর (১২৫৯ সাল)। রায় মহাশয় রঙ্গপুরের অন্তর্গত চিলমারীতে নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন; বিবাহের পূর্ব্বে পিতা তাঁহার অধীনে দুই বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সেই সময়ের একটা ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সদানন্দ রায়ের এক নীচজাতীয়া রক্ষিতা ছিল। এক দিন বাবা আহার করিয়া আচমন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে তাহার বয়স্কা কন্যা, তাঁহাকে তামাসা করিবার যোগ্যপাত্র ভাবিয়া "তোমাকে ছুঁইয়া দেই" "তোমাকে ছুঁইয়া দেই" বলিয়া ছুঁইতে উদ্যত হইল। তিনি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, সে তাহা শুনিল না, তাঁহাকে ছুঁইল। তখন বাবা পা হইতে খড়ম লইয়া তাহাকে কয়েক ঘা লাগাইয়া দিলেন, এবং তখনই স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া রায় মহাশয়ের নিকটে নালিশ করিল। তিনি বলিলেন, "বেশ করিয়াছে; তুই মানুষ চিনিস না?"

১২৫৫ হইতে ১২৬১ সাল পর্য্যন্ত পিতা পতিলাদহ পরগণার ইসলামপুরে চাকুরী করেন। তাঁহার চাকুরীর কতকগুলি স্মৃতিচিহ্ন আমাদিগের ঘরে ছিল, কয়েকটী এখনও আছে ; কোন কোনটী তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিত। নীল ছাকিবার একটা মোটা, লম্বা ও চওড়া শতরঞ্চির মত শক্ত কাপড় আমাদের গ্রামে ক্রিয়াকলাপে সামিয়ানার কাজে ব্যবহৃত হইত। পিতার মৃত্যুর দুই এক বৎসর পরে কে তাহা চাহিয়া লইয়া গেল, আর ফেরৎ দিল না। একটা বড় রেশমের মশারি ছিল, সারা বৎসর সিন্দুকে বন্ধ থাকিত, এক দিন তাহা রৌদ্রে দিবার জন্য বাহির করা হইত। আমাদের আমলে তাহা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া লোপ পাইয়াছে। বাবা একখানা সুন্দরী কাঠের লাঠি ব্যবহার করিতেন; উহার কারুকার্য্য প্রশংসনীয়; দেখিতে বাঁশের লাঠির মত, বিপরীত দিকে চোখ তোলা (in relief), ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। শিরোভাগ রূপার দ্বারা মণ্ডিত ছিল, তাহা চোরে আত্মসাৎ করে। একখানি চৌদোল, গড়ন চমৎকার, ঝুলনযাত্রা, দোল প্রভৃতি উৎসবে গ্রামগ্রামান্তরে ব্যবহৃত হইত। পরিশেষে মকরকাঠ। ছবি দিতে পারিলে ইহার শিল্পকৌশলের আভাস দেওয়া যাইত। পাঁচ ছয় হাত লম্বা দুই খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ ; প্রত্যেকটীর উপরে সাত আটটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কাক খুদিয়া গঠন করা হইয়াছে, কাকগুলি দেখিতে খুব স্বাভাবিক। পশ্চাদ্দিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটার এক পা ভূমিতে, আর এক পা সম্মুখস্থ কাকের পুচ্ছে এবং ঠোঁট তাহার পিঠে। এই কাষ্ঠখণ্ড দুটী চতুষ্কোণ কাঠের থামের উপরে সূক্ষ্মকোণে যুক্ত ও স্থাপিত হইল, এবং তাহার নিম্নভাগে স্থূলকোণ রচনা করিয়া দুইটী মকর দুই দিকে মুখব্যাদান করিয়া রহিল। মকরদুটীতেও তক্ষকের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ

পাইতেছে। উপরের মকরকাঠ হইতে চৌদোল ঝুলাইয়া তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইত, দেবতা তাহাতে দোল খাইতেন।

পিতার পূর্ব্বে পিতামহ ও প্রপিতামহ ঠাকুরেরাও কয়েক বৎসর জমিদার সরকারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ গুহ ১২০১ ও ১২০২ সালে জাঙ্গারীয়নগরের জানবক্সী সাহেবের অধীন কুঠি রাজগঞ্জ কাছারীতে চাকুরী করেন। ১১৩।৶০ একশত তের টাকা ছয় আনার নিকাশী দাবীতে ১২০৩ সনে তাঁহার বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল; অভিযোগ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

গোপালপ্রসাদ গুহ ১২৩০ সনে পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের এক নীলকুঠিতে চাকুরী করিতেন।

আমাদের পিতা উন্নতকায়, বলিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। খুব বড় হাটের মধ্যেও গলা পর্য্যন্ত তাঁহার মাথা দেখা যাইত। এক দিন তিনি বাম হাতে টাকাপয়সার চামড়ার থলিয়া লইয়া হাটের ভিতর দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ একটা লোক থলিয়াতে থাবড়া মারিল, কিন্তু তাঁহার মুঠ হইতে উহা ছিনাইতে পারিল না; তিনিও তৎক্ষণাৎ একটু ঘুরিয়া ডান হাতে তার এক হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিলেন। চোর প্রাণপণ টানাটানি করিয়াও হাত ছাড়াইতে সমর্থ হইল না। ওদিকে “মার” “মার” করিয়া হাটের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। লোকটা তখন বাবার পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিতে লাগিল, তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

একবার ঝড়ে জেঠামহাশয়ের একটা বড় কাগজি লেবুর গাছ পড়িয়া গিয়াছিল। সেটীকে তুলিয়া সোজা করিয়া খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। একটা বাঁশ গাছের গুঁড়ির নীচে চালাইয়া

দিয়া বাবা এক দিকে এবং দুই জোয়ান পুরুষ অপর দিকে ধরিলেন। আমি নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম। দেখিলাম, বাবা একাকী তাঁহার দিকে গাছটা যতখানি উঠাইলেন, দুই জনে তাহা পারিল না। বাবা ইহাতে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার সাহসও যথেষ্ট ছিল। মায়ের নিকটে শুনিয়াছি, একদা গভীর রাত্রিতে বাঘ ডাকিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে জেঠা-মহাশয় শয়নগৃহ হইতে বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার গ্রামের বাহিরে মাঠে যাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাদের দুই জনের মধ্যে সহোদর ভ্রাতার মত সৌহার্দ্দ ছিল। বাবা তখনই নিজের ঘরের দরজা আটকাইবার মোটা ও লম্বা বাঁশের আড় লইয়া জেঠামহাশয়ের সঙ্গে চলিলেন, মা একাকিনী অর্গলবিহীন গৃহে রহিলেন।

পিতার কুলক্রমাগত ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল ; তিনি আজীবন যথাশক্তি উহা পালন করিয়া গিয়াছেন। রোগে শয্যাগত না হইলে তাঁহার নিয়মানুগত্যে চুলপরিমাণ ব্যতিক্রম ঘটিত না। তিনি বারমাস অতি প্রত্যূষে উঠিতেন। শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বে "ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী" ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করিতেন ; তৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে জপ আহ্নিক করিতে বসিতেন। তিনি যখন মালা জপ করিতেন, তখন তাঁহার মুখ এমন গম্ভীর ভাব ধারণ করিত যে, প্রয়োজন হইলেও আমি তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে সাহসী হইতাম না। জপ করিতে অনেক সময় লাগিত, তখন তিনি নীরব নিস্পন্দ থাকিতেন। তৎপরে কিছুকাল সংসারের কাজ করিয়া স্নান করিতেন, স্নানের সময়ে শঙ্করাচার্য্যরচিত "নমোনমঃ সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন তারিণি তরলতরঙ্গে"—এই স্তোত্রের আবৃত্তি

চলিত। তারপর পুনরায় পূজা আহ্নিক করিতেন। তিনি বাটীর বিগ্রহের পূজা শেষ হইবার পূর্ব্বে জলগ্রহণ করিতেন না। পূর্ব্বাহ্নের ধর্ম্মাকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া আহার করিতেন।

পাদোদক সম্পর্কে তাঁহার ও জেঠামহাশয়ের আচারনিষ্ঠার একটা উদাহরণ দিতেছি। একবার তাঁহারা দুইজন, বাড়ী হইতে দশ মাইল দূরে মধুপুরে এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে আহার সামগ্রী প্রস্তুত হইলে তাঁহারা ভৃত্যকে ব্রাহ্মণের পাদোদক আনিতে বলিলেন; কিন্তু সে অনেক খুঁজিয়াও সেই গ্রামে বা তাহার নিকটে কোনও ব্রাহ্মণ পাইল না। তখন তাঁহারা থালার ভাত ফেলিয়া দুপ্রহরের রৌদ্রে দশ মাইল হাঁটিয়া বাড়ী আসিলেন; আবার ভাত রান্না হইল, পাদোদক গ্রহণ করিয়া তবে তাঁহারা আহার করিলেন।

মধ্যাহ্নের আহারান্তে পিতা কয়েক দণ্ড বিশ্রাম করিতেন। সপ্তাহে একদিন হাটে যাইতেন; ফিরিতে অনেক রাত্রি হইত, সে দিন আর বিশ্রাম হইত না। অপরাহ্নে পুনরায় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। সায়ংকালে আবার জপ আহ্নিক করিয়া পুত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। পরিশেষে আহার করিয়া শয়ন করিতেন।

পূজারী ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে কুলদেবতা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধারাণী এবং (চারি মাস) গোপীনাথ ও গোবিন্দরায়কে শয্যা হইতে উঠাইয়া সিংহাসনে স্থাপন করিতেন; মধ্যাহ্নে তাঁহাদিগের পূজা হইত; সায়ংকালে বৈকালিক নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে শয়ন করাইতেন, তিনি আসিলেই বাবা "প্রাতঃপ্রণাম" বা "সায়ং প্রণাম" বলিয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। বিগ্রহের সিংহাসন,

পালঙ্ক, তোষক, মাথার বালিশ, পাশ বালিশ, লেপ, মশারি, সমস্তই পরিপাটী ছিল। দেবতারা গ্রীষ্মকালে মশারি এবং শীত ঋতুতে লেপ ব্যবহার করিতেন। সপ্তাহে একদিন পায়সের ভোগ হইত। মধ্যে মধ্যে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া দেবতাদিগকে হবিষ্য ঘরে আনিয়া পূজারী ভোজ্য উৎসর্গ করিতেন। চারি পাঁচ বৎসর পরে পরে ভাস্কর ঠাকুর বিগ্রহের সংস্কার ও নূতন অঙ্গরাগ করিতে আসিতেন। রুদ্ধদ্বার গৃহে কার্য্যটী সম্পন্ন হইত, সুতরাং আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার উৎসব। ইহার একটু সমারোহ ছিল। বংশীধারী কৃষ্ণচন্দ্র এবং রাধারাণীর মূর্ত্তি খুব সুন্দর বোধ হইত।

নিত্য বিগ্রহপূজা ছাড়া বাড়ীতে পদ্মাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্রীপঞ্চমী ও বাস্তুপূজা এই কয়টী পর্ব্ব ছিল। প্রথমটীতে ছাগ বলি হইত।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "পুত্র না থাকিলে তোমার পরকালে সদ্গতি হইবে না, অতএব তুমি পুনর্বায় দারপরিগ্রহ কর।" তাঁহার উপদেশে পিতা ৩৫ বৎসর বয়সে (১১৬০) বাসাইল গ্রাম নিবাসী রাজেন্দ্র নারায়ণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা ত্রিপুরা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। ইনিই আমাদের জননী। তাঁহার মাতা জামুরিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী নন্দনগাতির গুহ রায় বংশের দুহিতা ছিলেন। ইনি রুগ্না ছিলেন, সুতরাং সংসারের কাজে বেশী খাটিতে পারিতেন না; এজন্য ইঁহার জীবদ্দশাতেই বসু মহাশয় আবার বিবাহ করেন। মাতামহ প্রথম পক্ষে তিন কন্যা ও এক পুত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষে চারি কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রটী অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়।

আমাদের পিতামাতার বয়সের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহারা অনাবিল ও গভীর দাম্পত্য প্রেমে যুক্ত ছিলেন। মাতা শেষ দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পতির নানা গুণের প্রশংসা করিতেন। কিন্তু প্রশংসায় অন্ধতা ছিল না। তিনি একটী দোষের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—বলিতেন, "কর্ত্তার খুব রাগ ছিল।" মাতার এই স্পষ্টবাদিতার জন্যই তাঁহার মুখের সুখ্যাতি কখনও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় নাই। আমি পিতাকে আর কতটুকু জানিতে পারিয়াছি—আমার স্মৃতি চারি হইতে সাত, মোটে এই তিন বৎসরের ; পিতার সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহার অধিকাংশই মায়ের কাছে শুনিয়াছি। পিতা জননীর ত্রুটি দেখিলে নীরবে সহিয়া যাইতেন না, কিন্তু তিনি পীড়িতা হইলে ব্যস্ত হইয়া যথোচিত সেবাশুশ্রূষা করিতেন, নিজের হাতে পথ্য, স্নানের জন্য গরম জল, যখন যাহা প্রয়োজন, সমস্ত করিয়া দিতেন। আমি শৈশবে দেখিয়াছি, মাতার একটা ব্যারামে কিছুকাল ধরিয়া চিকিৎসা চলিতেছে। সে যুগে সকল পরিবারে নারীদিগের রোগে সমুচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইত, ইহা বলা যায় না।

মাতা আচারনিষ্ঠায় স্বামীর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, এবং পুত্রমুখ দেখিবার পূর্ব্বে, পিতা তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন। একখানি বৃহৎ নৌকা ভাড়া করা হইল ; উহা এত বড় ছিল যে বাবার মত দীর্ঘকায় পুরুষও উহার ছাপরের নীচে অনায়াসে দাঁড়াইতে পারিতেন। তাঁহার খুল্লতাত পশ্চিমবাড়ীর জগন্নাথ গুহ মহাশয়, এবং নিজ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু যাত্রী আরোহী হইলেন। মা ছয় মাসের জন্য আহার্য্য সামগ্রী এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদির যাবতীয় উপকরণ বাবাকে প্রস্তুত করিয়া

দিলেন। তীর্থযাত্রীরা বাড়ীর ঘাট হইতে যাত্রা করিয়া নদীর পর নদী বাহিয়া গঙ্গায় পড়িয়া বরাবর পশ্চিম মুখে চলিলেন। ঠাকুর-দাদা, বাবা প্রভৃতি ফতুয়া হইতে গরুর গাড়ীতে জিনিসপত্র চাপাইয়া পদব্রজে গয়া গেলেন, এবং সেখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া সেইরূপেই নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন। ফতুয়া হইতে কাশী এবং কাশী হইতে প্রয়াগ যাইয়া সময়োচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া যাত্রিগণ গঙ্গার অনুকূল স্রোতে গৃহের দিকে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের কালে ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। জগন্নাথ গুহ মহাশয় দুঃসাধ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন; পিতার অক্লান্ত শুশ্রূষায় কোনও ফল হইল না—তিনি চলিয়া গেলেন। তারপর ঐ দুরন্ত ব্যাধি বাবাকে ধরিল। বিদেশবিভূমে জনপূর্ণ নৌকাতে সংক্রামক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব—ভাবিলেই হৃৎকম্প হয়। একটী সহযাত্রী এই সময়ে বাবার খুব সেবা করিয়াছিল; ভগবানের কৃপায় অকথ্য রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন। ছয় মাস পরে নৌকা আবার গ্রামের ঘাটে লাগিল। বাবার চেহারা এমন বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে তিনি যখন বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

যে লোকটী সঙ্কট সময়ে বাবার বান্ধবের কাজ করিয়াছিল, সে পরে ভেক লইয়া উদয় বৈরাগী নামে কর্ণাগ্রামে বাস করিত। আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য আসিলে বাবা তাহাকে খুব সমাদর করিতেন।

বাবার তীর্থভ্রমণের সময় ১৮৫৪ কি ১৮৫৫ সন। ইহার চল্লিশ বৎসর পরে, আমি যখন রেলপথে আরামে কাশী যাইয়া একরাত্রি বাস করি, তখন পিতা কত দীর্ঘকালে কত ক্লেশ সহিয়া সেখানে

আসিয়াছিলেন, এবং গৃহে ফিরিবার সময়ে ভীষণ রোগে কয়েক দিন কেমন জীবনমরণের সন্ধিস্থলে কাটিয়া গিয়াছিল, নিরন্তর এই চিন্তাই আমার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল।

পিতা বৎসরের পর বৎসর আয়ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। তীর্থযাত্রার হিসাবটা আমি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বলিতে গেলে কিছুই মনে নাই।

পতিগৃহে আসিয়া মাতার উপরে একটী কঠিন কর্ত্তব্যের ভার পড়িল—সেটী সপত্নী কন্যাকে পালন করা। বড় দিদির বয়স তখন চারি পাঁচ বৎসর। পিতা মাকে বলিয়া রাখিলেন "মেয়ের প্রতি কোমল ব্যবহার করিবে; ইহাকে কখনও কটু কথা বলিও না।" মা আজীবন এই উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিয়া গিয়াছেন। বড় দিদির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ ঠিক সহোদর ভাই বোনের মতই ছিল। বার বৎসর বয়সে মৈশামুড়ার জগদ্বন্ধু ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; এবং দুই এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইনি বৈধব্যদশায় পতিত হন। ইঁহার কথা পরে বলিব।

১২৬৬ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৫৯) আমাদের অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন। পাড়াগাঁয়ে এখনও প্রসূতিকে প্রথম প্রসবের সময় যমের সহিত লড়াই করিতে হয়—আশী বৎসর পূর্ব্বে তো কথাই ছিল না। মাতা তিন দিন তিন রাত্রি অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন; দাইদিগের দোষে শিশুর একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল, এক গালে এমন ক্ষত হইল, যে তাহা দিয়া দুধ গড়াইয়া পড়িত। শুনিয়াছি, কৃষ্ণচন্দ্রের দুয়ারে কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে বাবার কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

১২৬৯ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬২) ছোট দিদি শ্রীযুক্তা

বিন্দুবাসিনী রায়, এবং ১২৭১ সনের কার্ত্তিক মাসে মধ্যম দাদা শ্রীযুক্ত হরিদাস গুহ মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

আমার জন্মদিন ১২৭৪ সালের ৩রা কার্ত্তিক (১৮৬৭, ১৯ এ অক্টোবর)।

১২৭৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ রমনীকান্ত গুহের জন্ম হয়।

জননীকে সন্তান শোক সহিতে হয় নাই। তাঁহার পাঁচ পুত্র কন্যা আজিও (১৯৩৮) বর্ত্তমান।

আমার জন্মের সময়ে পিতা জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়াই উঠিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" জেঠাইমা আতুড় ঘর হইতে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন, "আবার কি হবে, একটা মেয়ে হইয়াছে।" শুনিয়াই বাবা "দুর্গা", "দুর্গা" বলিয়া শুইয়া পড়িলেন। মা তখন বলিলেন, "হরিদাস যা', তাই হইয়াছে।" বাবা তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের আঙ্গিনায় যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কত বেলা হইয়াছে দেখিয়া তিথি নক্ষত্র নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তর পাড়ার মেয়েরা শিশুকে দেখিয়া বাড়ী যাইয়া বলিল, "গুহগো একটা পোলা হইয়াছে, তার নাকও নাই, চোকও নাই।"

শৈশবে মা একদিন বড় বাড়ীর ঢেঁকি ঘরে আমাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিলেন—"আমার চাঁদ, আমার চাঁদ"; জেঠাইমা বলিলেন, "হুঁঃ, অমাবস্যার চাঁদ।" বিদ্রূপটা মায়ের প্রাণে বড় লাগিল। তিনি কাঁদ কাঁদ মুখে বাড়ী আসিয়া বড় মাসীমাকে ব্যাপারটা জানাইলেন। মাসীমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন—তিনি শুনিয়াই বলিলেন, "বেশ তো বলিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ ক্ষয় হইতে

হইতে যায়; অমাবস্যার চাঁদ বাড়িতে বাড়িতে যায়। বেশ তো বলিয়াছে।” মা আশ্বস্ত হইলেন।

আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই, তখন ঠাকুরাণী দিদি (মাতামহী) পাটুলীগ্রামে ছোট মাসীমার বাড়ীতে ছিলেন। আমার জন্মের সংবাদ পাইয়া তিনি বলিলেন, “আমার দুঃখের রজনী শেষ হইল। ইহার নাম রজনীকান্ত রাখিলাম।” জন্মাবধি আমি এই নামেই পরিচিত। আমার রাশিনাম অন্নদাপ্রসাদ। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি ওলাওঠায় দেহত্যাগ করেন।

আমরা যে অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং শৈশবে ও বাল্যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যে জীবিত রহিয়াছি, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেন, বলিতেছি।

মা কতবার বলিতেন, “বাসী বিবাহের দিন মাথার টোপর খুলিয়া পাকঘরে ঢুকিয়াছিলাম, সারা জীবন পাকঘরেই আছি।” কথাটা খাঁটি সত্য। তাঁহার শাশুড়ী, জা, ননদ কেহ ছিলেন না; ঘরের ভিতরকার কাজে সাহায্য করিবার চাকর চাকরাণী কোনকালে দেখি নাই। ঘর লেপা, রসুই ঘরের ও ঠাকুর ঘরের সমস্ত বাসন মাজা, পূজার আয়োজন করা, দুই বেলা রান্না করা, তার উপরে ঢেঁকিঘরে চাল, চিড়া তৈয়ারী করা, খৈ মুড়ী ভাজা—এ সমস্ত তাঁহাকে একেলা করিতে হইত। বাবা কয়েক বৎসর বর্গা জমি আপনার হাতে রাখিয়া নিজের বলদ ও পাঁচ ছয় জন চাকরের দ্বারা চাষ করাইয়াছিলেন। তখন মার গুরুতর শ্রম আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। বড় মাসীমা অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; স্বামীকুল নির্ম্মূল হইলে তিনি এক একবার কিছুকাল আমাদের বাড়ীতে

থাকিতেন ; বড় দিদিও দুই এক বৎসর পর পর কয়েক মাস থাকিয়া যাইতেন ; আমার জন্মের সময়ে তিনি একাদিক্রমে দেড় বৎসর ছিলেন। তখন মা একটু বিশ্রাম পাইতেন।

এই প্রকার সংসার চক্রে পড়িয়া মা শিশুকে দেখিবার কতটুকু অবসর পাইতেন, বুঝাই যাইতেছে। শয়ন ঘরের বারাণ্ডার অর্দ্ধাংশ তিন দিকে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া একটা খোঁয়াড় তৈয়ারী হইত। শিশু প্রায় সারা দিন সেখানেই থাকিত। ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, গায়ে মলমূত্র কাদা মাখিয়া পড়িয়া আছে—হাতের কাজ শেষ হইলে তবে মা আসিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবেন, স্তন্য দিয়া শান্ত করিবেন। প্রথম পুত্রের শৈশবে ঠাকুরাণী দিদি আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, মা তাঁহার সাহায্য পাইতেন। আমার লালনপালনে তাঁহার সহায় ছিলেন পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট দিদি। মা অবসর না পাইলে তিনি আমাকে দুই পায়ের উপরে শোয়াইয়া ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইতেন।

ইহার উপরে ব্যারামস্যারাম লাগিয়াই ছিল। চারি বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার স্মৃতি জাগ্রৎ হয়—তখন হইতে যত রোগ ভোগ করিয়াছি বেশ মনে আছে। মার মুখে শুনিয়াছি, শিশুকালে আমি জ্বরে মর মর হইয়াছিলাম ; বাবা আমাকে কোলে লইয়া কাঁদিতেন, আর বলিতেন "ছেড়া বাঁচিল না।" আমার বোধোদয়ের পরে এক দিন অপরাহ্ণে জ্বরে শয্যা লইলাম। সে রাত্রি পূর্ণিমা ছিল, বোধ হয় চন্দ্রগ্রহণও ছিল। সন্ধ্যার পরে অজ্ঞান হইলাম। ভোর বেলা চেতনা ফিরিয়া আসিল। পিতা-মাতা সারারাত্রি নিকটে বসিয়াছিলেন। বাল্যকালেই আমার মাঝে মাঝে উৎকট মাথার বেদনায় দাঁত লাগিত।

গ্রামের স্বাস্থ্য

বর্ষার জল গ্রামের মধ্য দিয়া অবাধে মাঠে প্রবাহিত হইত এ জন্য বোধ হয় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল না; কিন্তু লোকে জ্বরে খুব ভুগিত। ওলাউঠা ক্বচিৎ দেখা দিত। ব্রাহ্মণবাড়ীতে এক জন ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার আরোগ্যকামনায় গৃহস্বামী দুর্গোৎসব মানস করিয়াছিলেন। সে উৎসব আমি দেখিয়াছি।

চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। শিক্ষাবঞ্চিত কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিত কবিরাজ ছিলেন রোগীর একমাত্র সম্বল। বাবা একবার তিন সপ্তাহকাল স্বল্পবিরাম জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার চিকিৎসা করেন, তিনি এক কবিরাজের ঔষধ বাটিতেন, পরে নিজেই কবিরাজী ব্যবসায়ে ব্রতী হন; ইহাতে তাঁহার সুযশঃও হইয়াছিল। পিতার চিকিৎসা করিয়া আরোগ্যান্তে তাঁহার নিকট হইতে ইঁনি দর্শনী ও ঔষধের মূল্য বাবদে সর্ব্বসাকল্যে একটী আধুলি পাইয়াছিলেন। তবে তখন টাকায় তিন মণ ধান বিক্রয় হইত।

গ্রামে স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল মুক্ত বায়ু, প্রতিকূল ছিল দূষিত জল, এবং গ্রামবাসীদিগের কদর্য্য অভ্যাস। আমাদের বাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বের পচা পুকুরে এক কোণ হইতে খালের বর্ষার জল আসিত, অপর কোণ দিয়া মাঠে বাহির হইয়া যাইত। উহাতে না পড়িত এমন জিনিষ ছিল না। কিন্তু উহার জলেই বাসন মাজা হইত, আচমনের কাজ চলিত। 'আগ পুষ্করণীতে' নরনারী, গরুবাছুর স্নান করিত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সেই জলই পান করিত, সেই জলেই রান্না করিত। তিন পুকুরের একটীর জলও পেয় ছিল না। ভদ্র-

লোকেরা পাতকুয়ার জল ব্যবহার করিতেন, এই যা মন্দের ভাল। নদীর জলও এখনকার হিসাবে পানের অযোগ্য ছিল; বর্ষাকালে আমরা ও অপর অনেকে তাহাতে স্নান করিতাম; অনেকে সে জল পানও করিত।

পল্লীজীবনের সুখদুঃখ

সেকালে বস্ত্রের বাহুল্য ছিল না। বাবা একবার শীতকালে তাঁহার নিজের এবং মধ্যম দাদা ও আমার জন্য দুইটা করিয়া মাকিণ-কাপড়ের জামা তৈয়ার করাইয়াছিলেন; তার পর পাঁচ ছয় বৎসর আমার গায়ে জামা উঠে নাই। গরম জামা, গরম কোট, আলোয়ান, এগুলি দূর ভবিষ্যতে নিহিত ছিল। বাল্যকালে ঘোর শীতের সময়ে একখানা কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত, তাহাতেই আমাদের চলিত।

আমরা বারমাস নিজের গোরুর দুধ পাইতাম। মা বলিতেন, আমার জন্মের পরে ঘরে দুধের ঢেউ খেলিত। তা'ছাড়া আমাদের বাড়ীতে প্রচুর আম, কাঁঠাল ও কলা হইত। সংবসর ধরিয়া জেলেরা মাছ জোগাইত, বর্ষাকালে বাবা নিজেও দোহাইর, ধিয়াইর তৈয়ার করিয়া যথেষ্ট মাছ ধরিতেন। সুতরাং আমাদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ছিল না। বিগ্রহের সাপ্তাহিক ভোগের পায়স একটা লোভনীয় সামগ্রী ছিল। আমরা প্রাতরাশের জন্য খৈ, চিড়া, মুড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাইতাম; নৈমিত্তিক উৎসবে মোয়া, মুড়কি, তক্তি, লাড়ু, পিঠা রসনার তৃপ্তি সাধন করিত।

আমাদের গ্রামে প্রতি শীত ঋতুতে মধুপুরের বন হইতে বাঘ আসিত। একদিন গভীর রাত্রিতে বাবা বাহিরে গিয়াছেন, তিনি

ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই পূর্ব্বদ্বারী ঘরের বারাণ্ডা হইতে বাঘে একটা কুকুর লইয়া গেল, আমি তখন জাগিয়াছিলাম। আর এক রাত্রি দুইটী বাঘ বড় বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় অনেকক্ষণ লড়াই বা খেলা করিয়া চলিয়া গেল; আমি বাবার কাছে মণ্ডপ-ঘরে ছিলাম, ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিলাম। আর একবার দিনের বেলায় বাঘ আসিয়া পশ্চিমবাড়ীর আদরের ছাগলটী মুখে করিয়া লইয়া গেল। তারপর একদিন ছোট ভাই ও আমি মার সহিত দক্ষিণ-দ্বারী ঘরের সিন্দুকের উপরে শুইয়াছিলাম; বাবা ও মধ্যমদাদা মণ্ডপ-ঘরে; নিশীথকালে উত্তর দিকের বেড়ার পেছনে বাঘ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অন্য দিন নিকটে বাঘের ডাক শুনিলে মা জাঁতি দিয়া সিন্দুকের গায়ে আঘাত করিয়া "দূর" "দূর" শব্দ করিতেন, সেদিন আমি সেটা কোথায় সরাইয়াছিলাম। মা অগত্যা হাতের কাছে যে তরবারী ঝুলিতেছিল, তাহা দ্বারা সিন্দুকে আওয়াজ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে আওয়াজ এবং তৎসঙ্গে মণ্ডপ-ঘর হইতে বাবার সবল কণ্ঠের চীৎকার বাঘ গ্রাহ্য করিল না। সে আমাদের ঘরে বাছুরের গন্ধ পাইয়াছে, কিছুতেই যায় না। আমি আতঙ্কে একেবারে আড়ষ্ট; বারংবার মনে হইতে লাগিল, বাঘ যদি দরজা দিয়া ঘরে ঢোকে, তবে কি উপায় হইবে। আমাদের পায়ের নীচে দুই তিন ঘণ্টা ডাকিয়া শেষ রাত্রিতে বাঘ চলিয়া গেল।

বাড়ীর জঙ্গলে কয়বার চিতা বাঘ মায়ের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। একদিন মা নদীর ঘাটে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে একটা নেকড়ে বাঘ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল; তিনি তাহার চোখে চোখে চাহিয়া রহিলেন, বাঘটা চলিয়া গেল।

আমাদের ঘরে একটা প্রকাণ্ড দারাজ সাপ দিনের বেলায় ইন্দুর

ধরিতে আসিত, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে চলিয়া যাইত। এটাকে দশ বার বৎসর দেখিয়াছি।

আমরা যখন ময়মনসিংহে পড়ি, তখন একদা গভীর রাত্রিতে দেখা গেল এক বড় কাল সাপ—কেউটে—শয়ন ঘরের মাচার নীচে বাছুরের নিকটে গর্ত্ত হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। মা, মধ্যম দাদারা তৎক্ষণাৎ বাছুর লইয়া অন্য ঘরে গেলেন। সাত দিন বিষধর সর্প সেই গর্ত্তেই ছিল। পরে গর্ত্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে চাকরেরা একটা মস্ত খোলস পাইল। আমাদের অঞ্চলে সাপের উপদ্রব ছিল, সর্পাঘাতে মৃত্যুও বিরল ছিল না।

পূজাপার্ব্বণ

বাল্যকালে যে সকল পূজাপার্ব্বণে প্রভূত আনন্দ পাইতাম, সেগুলির কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রাবণ মাসে রাত্রিতে পশ্চিম বাড়ীতে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ পাঠ ও গান করা হইত; পদ্মাপূজার পর দিন প্রাতঃকালে পাঠ সমাপ্ত করিবার রীতি ছিল। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন বৈকালে গ্রামস্থ বালকবৃদ্ধযুবকেরা পূজার বাড়ীগুলিতে জলযোগের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত্রিতেও ঐ ব্যবস্থা ছিল; তদুপলক্ষে আমরা সমকক্ষ অসমকক্ষ প্রতিবেশীর বাড়ীতে মোয়ামুড়কি ইত্যাদি তৃপ্তির সহিত আহার করিতাম। সকল বাড়ীতেই কিছু না কিছু খাইতে হইত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ছোট দিদি পিতৃগৃহে থাকিলে ব্রত পালন করিতেন; জেঠাইমা ঐ তিথিতে মধ্যাহ্নকালে তাঁহার ভ্রাতার সহিত আমাদিগকেও ভোজন করাইতেন। স্বগৃহে ও জ্ঞাতিদিগের বাড়ীতে বাস্তু পূজার পায়স একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল। পৌষ সংক্রান্তি

উপলক্ষে নানারূপ পিঠা প্রস্তুত হইত—অন্য সময়েও হইত। দোল-যাত্রার আবীর খেলায় আমরা মাতিয়া যাইতাম, যদিচ আমাদের তিন সরিক মিলিয়া মোটে একবার দোলের উৎসব করিয়াছিলেন; ঝুলনযাত্রাও পশ্চিমবাড়ীতে একবার দেখিয়াছি। ঠাকুরবাড়ী প্রতি বৎসর চড়ক পূজা হইত। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঐ পূজার পাণ্ডা ছিল, তাহাদের নাম ছিল "সন্ন্যাসী"। একমাস পূর্ব্ব হইতে তাহারা দারুমূর্ত্তি মাথায় লইয়া "দেবের দেব মহাদেব" ধ্বনি করিতে করিতে বাড়ী বাড়ী যাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত। সঙ্গে একটা ঢাক থাকিত। কোন কোন বাড়ীতে গায়ক ঢাকের তালে তালে

"এক কবিতা মধুর কথা শুন সর্ব্বজন,
যেরূপেতে শ্যামের সঙ্গে রাই করেছে মান"

ইত্যাদি কবিতা গাহিত। মধ্যাহ্নে সন্ন্যাসীরা এক বাড়ীতে অতিথি হইত, এবং আহার ও বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আবার ঘুরিত। রাত্রিতে তাহারাই একজন দেবতার পূজা করিত—ইহাতে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল না। ভদ্রলোকেরা সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিতেন না, কিন্তু আমি দুই একবার তাহাদের সঙ্গে ছিলাম।

চড়কপূজার পূর্ব্বরাত্রিতে 'হাজরা' নামে একটা ব্যাপার ছিল; উহাতে সাহসী পূজারীরা ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া শ্মশান হইতে কত কি লইয়া আসিয়া নৃত্য করিত। আমরা ভয়বিহ্বল চিত্তে দেখিতাম।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে ভাই ফোঁটার মত একটা মাঙ্গলিক কার্য্যে ভগিনীরা ভাইদিগের হাতের পিঠে তিন বার ছাতু দিতেন, তিন বার ভাইদিগকে তাহা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে হইত। তারপর ভ্রাতারা ছাতু, দৈ, কলা, গুড় ইত্যাদি ভোজন করিতেন।

চড়কপূজার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ হরগৌরীর পূজা করিতেন—অর্দ্ধাঙ্গ হর, অর্দ্ধাঙ্গ গৌরী। সুবৃহৎ চড়কগাছ সম্বৎসর পুকুরে থাকিত, পূজার পূর্ব্বদিন তাহা তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া রূপার চক্ষু দ্বারা সজ্জিত করা হইত। সংক্রান্তির দিন গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে কবুতর বলি দিয়া সন্ন্যাসীরা উহা পুঁতিয়া দিত। দুপুর বেলা হইতে বাজার বসিত। বৈকালে চারি জন সন্ন্যাসী মোটা মোটা দড়িতে বসিয়া চড়কগাছে ঘুরপাক খাইত। বড়শীতে পিঠ ফুঁড়িয়া ঘুরিবার প্রথা সরকার বাহাদুর আইন করিয়া বন্ধ করিয়াছিলেন; বড়শীগুলি দারুদেবতার সঙ্গে বাঁধা থাকিত। চড়কে আমরা দুই চারি পয়সা পরবী পাইতাম, এবং তাহা দিয়া আম কাটিবার ছুরি কিনিতাম।

নন্দনগাতির রামজয় রায় মহাশয়দিগের গোষ্ঠযাত্রা একটা দেখিবার মত উৎসব ছিল। যাত্রার পূর্ব্ব দিন ঘাটাইল হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চ দারুময় কানাই-বলাই ঢাকের বাদ্য সহকারে রায়-বাটীতে আনীত হইতেন। পরদিন যথারীতি পূজা হইয়া গেলে দুই জন ব্রাহ্মণ কানাই-বলাই মাথায় বাঁধিয়া গোষ্ঠে যাইতেন; বহুতর ঢাকের বাদ্যে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইত; পশ্চাতে গ্রামের সমুদয় রাখাল নিজ নিজ গরু লইয়া যাইত। উৎসবের অপেক্ষায় দুইখানি ক্ষেতে ধান পাকিয়া থাকিত। ব্রাহ্মণেরা কানাই-বলাই লইয়া দৌড়িয়া একবার ক্ষেত দুখানির এপার হইতে ওপার যাইতেন, আবার ওপার হইতে এপার আসিতেন। সঙ্গে সঙ্গে রাখালেরা গোরুগুলি ছাড়িয়া দিত, তাহারা অবাধে ধান খাইত—গৃহস্বামী এক কণা ধান ঘরে লইয়া যাইতেন না। তারপর বিগ্রহ সন্নিকটে কালীবাড়ীর পার্শ্বে এক গৃহে স্থাপিত হইত; তখন লোকে মানস করিয়া এত চিনি বাতাসা প্রভৃতি উৎসর্গ করিত যে, কলাপাতার ঠোঙ্গাগুলি স্তূপীকৃত

হইয়া উঠিত। সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মেলা বসিত, এবং সায়ংকালে যাত্রার দল অভিনয় ও গান করিত। গোষ্ঠযাত্রায় বিপুল জনসমাগম হইত।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর মহোৎসব। আমাদের বাড়ীতে একবার পূজা হইয়াছিল—সে আমার জন্মের পূর্ব্বে। পশ্চিমবাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইত। আশ্বিন মাস আসিলেই আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। যে দিন কুমার আসিয়া কাঠামের জীর্ণ সংস্কার করিয়া খড় দিয়া প্রতিমার জরা অর্থাৎ কঙ্কাল রচনা করিত, সেই দিন হইতে মূর্ত্তিগুলির ক্রমবিকাশ—একমেটে, দোমেটে ও রং করা, চক্ষুদান, বস্ত্রাভরণে সাজসজ্জা—সমুদায় একাগ্রচিত্তে দেখিতাম। প্রতিমার পূর্ণতা সাধন করিতে করিতে পঞ্চমী ষষ্ঠী আসিয়া পড়িত।

জ্ঞাতির বাড়ীর পূজা আমাদের কাছে নিজের বাড়ীর পূজার মতই ছিল। বিল্বমঙ্গল বা বোধন হইতে বিজয়া পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় দিন মহা আনন্দে কাটিয়া যাইত। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ থাকিত, কোন কোন দিন তরপের অন্যান্য গ্রামেও নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতাম। ছাগবলি, মহিষবলি, এবং সায়ংকালের আরতি এগুলি দেখিবার উৎসাহ খুব ছিল, রাত্রিতে আঙ্গিনায় বসিয়া প্রসাদ খাইবার লোভও সংবরণ করিতে পারিতাম না।

নবমীর দিন বৈকালে একটা কুৎসিত আচার পালিত হইত, উহা আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। ইতর শ্রেণীর কতকগুলি লোক পূজার প্রাঙ্গণে জড় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিত; গানের ভাষা ও ভাব এমন জঘন্য যে, তাহা স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এই আচারে তাহারা মনিবের অন্তঃপুরিকাদিগকেও রেহাই দিত না।

বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের ব্যাপারে ঐ শ্রেণীর লোকেরাই প্রধান

কর্ম্মকর্ত্তা ছিল। তাহারাই প্রতিমা বহন করিয়া নৌকায় উঠাইত, আড়ঙ্গে লইয়া যাইত, নদীতে বিসর্জ্জন দিত। নন্দনগাতির উত্তর প্রান্তে টোকনদীর তীরে আড়ং বসিত, আমাদের প্রতিমা সেখানে যাইয়া ঐ গ্রামের প্রতিমার সহিত মিলিত হইত। রাত্রি কয়েক দণ্ড পর্য্যন্ত উভয়ের নৌকা পূর্ব্ব-পশ্চিমে চলাচল করিত, দুই তীরে সহস্র পুরুষনারী, হিন্দুমুসলমান প্রতিমা দেখিত। আমি প্রতিমার নৌকায় থাকিতাম; যে বার নৌকার বাইচ হইত, সে বার বাইচের নৌকায় যাইতাম। বাইচে প্রতিযোগিতা ছিল না। আমাদের গ্রামের নিকট দিয়া অন্য গ্রামের বাইচের নৌকা যাইতে ভয় পাইত। একখানি বড় পান্‌সী নৌকা এই উপলক্ষে ব্যবহৃত হইত; এ জন্য কতকগুলি ছোট বৈঠা (দাঁড়) মজুদ ছিল। নৌকার পশ্চাদ্ভাগে একটা সাময়িক চৌদোলের মধ্যে দর্শকেরা বসিতেন; দাঁড়ীরা সম্মুখের ভাগে বসিয়া গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে পেছনের গলুইর দিকে নৌকা চালাইত। প্রধান গায়েন প্রথমেই মঙ্গলাচরণের গান ধরিত—

গঙ্গাজী দরশনে পাতক পলায়।
প্রথমে আছিল গঙ্গা, আছিল কৈলাসে
ভগীরথে আন্‌ল গঙ্গা জীব নিস্তারিতে রে।

বাইচের নৌকাও আড়ঙ্গে যাইয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া প্রতিমার নৌকার সহিত ঘাটে ফিরিয়া আসিত। বিসর্জ্জনের পরে কালাচাঁদের আঙ্গিনায় ভদ্রইতর বালকবৃদ্ধ সকলে সম্মিলিত হইত। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরে কোলাকুলি এবং যথাযোগ্য নমস্কার প্রণাম অভিবাদন চলিত; এই বিদায়োৎসবে জাতিবিচার ছিল না, ধনীদরিদ্র প্রজাভূম্য-ধিকারীর ভেদ ছিল না। তৎপরে আমরা বাড়ী বাড়ী যাইয়া পূজনীয়া

নারীদিগকে প্রণাম করিতাম। এইরূপে দুর্গোৎসব শেষ হইত। ইহার পরে কিছু দিন আমার মনটা বড় বিষণ্ণ থাকিত।

পূজা উপলক্ষে সকলে নূতন কাপড় পাইত, এবং বাবা সংবৎসরের প্রয়োজন মত নারিকেল ও অধিক পরিমাণে কয়েক রকমের গুড় কিনিয়া রাখিতেন। বাখরগঞ্জ জেলা হইতে শরৎকালে নারিকেলের নৌকা আসিত।

বিজয়ার পরে লক্ষ্মীপূজা এবং তারপরে কালীপূজা বা দীপান্বিতা। অমাবস্যার সন্ধ্যায় প্রতিগৃহে ভিত্তি ঘিরিয়া প্রদীপ দেওয়া হইত, আমরা আঙ্গিনায় কলাগাছ পুঁতিয়া আলোক দ্বারা সাজাইতাম। প্রাচীনেরা ছোট ভেলায় কতকগুলি প্রদীপ রাখিয়া মন্ত্র পড়িয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতেন। পশ্চিম বাড়ী কালীপূজা হইত; প্রসাদের লোভে আমি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতাম।

শীতকালে বারোয়ারী কালীপূজা হইত। গ্রামবাসীদিগের মাথটে অর্থাৎ চাঁদাতে ব্যয় চলিত। দলাদলি না থাকিলে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ সকলেই চাঁদা দিত। আমি দুই একবার বাবার সহিত ঐ পূজায় উপস্থিত ছিলাম।

বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা নৈমিত্তিক ক্রিয়া ছিল। একটু বড় হইলে আমি পূজার পাঁচালী পড়িতাম।

গ্রামে বৎসরে কয়েক বার সঙ্কীর্ত্তন ও হরির লুট হইত। কীর্ত্তনের প্রথম গানটী ছিল গৌরনিতাইর আবাহন। শেষ গান—

হরির লুট পড়েছে আনন্দের আর সীমা নাই;
চাঁদবদনে হরি বল ভাই।

* * *

কত খাজা মণ্ডা গুড়-বাতাসা আনন্দেতে লুইটা খাই।

সঙ্কীর্ত্তনে অধিকাংশ দিন আগাগোড়া যোগ দিতাম; না দিলে ঐ গান আরম্ভ হইতেই ছুটিয়া যাইতাম।

শ্রীপঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে আমরা উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে প্রতিমাবিহীন পূজাতে অঞ্জলি দিতাম। সেদিন মধ্যাহ্নে অন্নাহার নিষিদ্ধ ছিল। নূতন গুড়, খাজা, কদমা, বাতাসা, দৈ, খৈ প্রভৃতি উদরের তৃপ্তিসাধন করিত।

আমাদের ও অন্যান্য ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে বৎসরে একাধিকবার সত্যনারায়ণের পূজা হইত, উহাতে নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীরা উপস্থিত থাকিতেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ উহার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। আমি বাল্যকালে কয়েকবার পাঁচালী পাঠ করিয়াছি। আমাদের গৃহে পিতা ও অগ্রজ উভয়ের প্রতিলিপিই ছিল। এই পূজার প্রধান লোভনীয় বস্তু ছিল চাউলের গুঁড়া, দুধ, গুড় ও কলার মিশ্রণে এক সুমিষ্ট ঘন প্রসাদ নামক বস্তু।

পৌষ মাসে ভদ্রগৃহে বাস্তুপূজা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান ছিল। পুরোহিত ঠাকুর বাহিরে তিনটী পাটখড়ি পাশাপাশি মাটীতে পুঁতিয়া তাহাতে তিনটী শণফুলের মালা ঝুলাইয়া দিতেন। তৎপরে পায়স পাক করিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকায় ক্ষুদ্র গর্ত্তে প্রদান করিতেন। পূজার কিছু বুঝিতাম না, দর্শকের প্রাপ্য পায়সটুকু পরম উপাদেয় বোধ হইত।

জেঠাইমা ও অপর কোন কোন গৃহিণী কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া কার্ত্তিক পূজা করিতেন।

আমাদের পূজারী ঠাকুরবাড়ীর বহিরঙ্গনে একটি বড় শেওড়া গাছ ছিল। ঐ বৃক্ষে বুড়া ঠাকুরাণীর পূজা হইত।

ধীবরশ্রেণীর লোকেরা ত্রিনাথের পূজা করিত। এটী বোধহয় বৌদ্ধযুগের একটী দেবতার রূপান্তর মাত্র।

আমাদের বাড়ীর সম্মুখে, বড় পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে একটী ও পুর্ব্বোত্তর কোণে আর একটী বৈরাগীর আখড়া ছিল। দুটীতেই অনেক রকম ফল ও ফুলের গাছ ছিল। প্রথমটীতে পঞ্চবটীর তলে এক বৈরাগীর সমাধিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিত। উহাতে "কাঁঠালীচাঁপা" নামে এক প্রকার ফুল দেখিয়াছিলাম, তাহা আর কোথাও দেখি নাই। কাঁচা অবস্থায় ঐ ফুল সবুজ বর্ণ ও গন্ধহীন থাকিত, কিন্তু পাকিলে সোনালী রং ধারণ করিয়া সুগন্ধে নাসিকা আমোদিত করিত। এই আখড়াটী পাপের দুর্গ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৈরাগী ও বৈষ্ণবী অজানা দেশ হইতে আসিয়া ইচ্ছামত মিলিত হইত, আবার যখন খুসী এক ছাড়িয়া অন্যকে ধরিত। ক্বচিৎ দুই একটী শুদ্ধাচারিণী বৈষ্ণবী দেখা যাইত। দ্বিতীয় আখড়াতে বরাবর একই বৈরাগী বৈষ্ণবী যুগল দেখিয়াছি, তাহারা বিবাহিত দম্পতীর ন্যায় আজীবন পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল; ইহাদিগকে কেহ কোন দিন কলহ করিতে দেখে নাই। এই বৈরাগীর শিষ্য ছিল।

"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি"—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পিতামাতা আমাকে লালন করিলেন। মা বড় কোমলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহাকে কোন দিন পুত্রকন্যার গায়ে হাত তুলিতে দেখি নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন তাঁহাকে একদিন "পেতা" "পেতা" অর্থাৎ বারংবার বিরক্ত করিতেছিলাম, এজন্য একখানা ক্ষুদ্র কাঠের চেলা দিয়া আমাকে মারিয়াছিলেন। সে ঘটনাটী আমার শৈশবেও স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। পিতা

আদর করিতেন, শাসনও করিতেন। স্মৃতিস্ফুরণের পরে দুই রকম অভিজ্ঞতাই যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া রাখিতেছি।

একবার দুর্গোৎসবের মধ্যে পশ্চিম বাড়ীর দাদা আমার চেয়ে বড় দুইটী মালীর ছেলের সহিত আমার লড়াই লাগাইয়া দিলেন। আমি হারিয়া গিয়া গায়ে কাপড়ে কাদা মাখিয়া বাড়ী গেলাম। বাবা আমার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?", এবং ব্যাপারটা শুনিয়া তখনই আমাকে কোলে লইয়া তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে 'রুদ্রনাথ' বলিয়া ডাক দিয়া পূজার আঙ্গিনায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পশ্চিম বাড়ীর দাদা ডাক শুনিয়াই অন্তঃপুরে দক্ষিণদ্বারী ঘরে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন, তাঁহাকে আর কিছু বলিতে হইল না।

আর একদিন মধ্যম দাদার সহিত মারামারি করিতে করিতে একটু বেশী মার খাইলাম। বাবা বাড়ী ছিলেন না; আসিয়া আমার নিগ্রহের কথা শুনিয়া আমাকে কোলে করিয়া গাছপালা দেখাইয়া শান্ত করিলেন।

পাঁচ বৎসর হইতে তাড়না সুরু হইল। অন্যায় করিলে বাবা সবুর করিতেন না, তখনই সাজা দিতেন। লেখাপড়ায় শৈথিল্য করিলে কিংবা দ্রুত শিখিতে না পারিলে প্রহার করিতেন। দুই ভাই যুক্তি করিয়া আড়ায় উঠিয়া দেবতার প্রাপ্য গুড় চুরি করিয়া খাইলাম, কাটারীর মুখ ভাঙ্গিল, দুই জনের মধ্যে যে দোষী, সে দোষ স্বীকার করিল না—এ জাতীয় অপরাধের মার্জ্জনা ছিল না; ফলে দুই জনই বেশ মার খাইলাম। দণ্ড দিবার সময় পিতার ন্যায়-বোধের পরিচয় পাওয়া যাইত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ লাঙ্গলজোড়ায় রাখিয়া আসিয়াছিলাম। বাবা

মধ্যম দাদা ও আমাকে তাহা আনিতে পাঠাইলেন। আমরা বই লইয়া ফিরিবার পথে একটা আমগাছের নীচে বিশ্রাম করিতে বসিলাম। চৈত্র কি বৈশাখের অপরাহ্ণ হঠাৎ ঝড় আসিল, আমরা বাড়ী পানে ছুটিলাম; কিছু দূর যাইয়া মনে পড়িল, বই ফেলিয়া আসিয়াছি। দুই ভাই দৌড়িয়া গাছতলায় গেলাম; দেখি কয়েকটী মুসলমান বালকবালিকা আম কুড়াইতে আসিয়াছে; এক জনের হাতে বইখানার নীচের অৰ্দ্ধখণ্ড পাইলাম, উপরের অৰ্দ্ধাংশ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাড়ী আসিয়া পুস্তকের ভগ্নাবশেষ বাবার হাতে দিলাম। তিনি দুই জনকে বারাণ্ডার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বাঁশের খাবাসী দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। মধ্যম দাদাই প্রধানতঃ দায়ী, এই প্রহারের মাত্রা তাঁহার ভাগেই বেশী পড়িল। হঠাৎ বাবা বলিলেন, আচ্ছা, "বইএর যে উপরের অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়াছে, সেজন্য হরিদাস দোষী; কিন্তু উহার আগের পেছনের সবগুলি পাতা আছে তো? প্রসন্ন, পাতাগুলি গুণিয়া দেখ।" বড় বাড়ীর প্রসন্ন দাদা নিকটে দাঁড়াইয়া আমাদের সাজা দেখিতেছিলেন, তিনি তখনই মহোৎসাহে বাড়ী হইতে তাঁহার দ্বিতীয় ভাগ আনিয়া দুইখানি মিলাইয়া বলিলেন, "এতগুলি পাতা নাই।" এই পাতা ছিঁড়িবার অপরাধ আমার, সুতরাং আমাকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

বাবা আমাদিগকে নিজের হাতে মারিতেন না; শাসন করিবার কালে খাবাসী (বৰ্ত্তমান কালের বেত) ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার শাসনে সন্তানগণের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি কাগজী লেবুর বীজ পুঁতিয়াছিলেন। অঙ্কুর বাহির হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র উল্লাসে তাহা উপড়াইয়া আনিয়া বাবাকে দেখাইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রের গালে এক চড় বসাইয়া দিলেন।

তিনি বালিকা কন্যার রন্ধন নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেন, কিন্তু কিছু অন্যায় করিলে দণ্ড দিতেন, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি।

চারি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমি কিছুদিন বাবার সহিত বাহিরের ঘরে শুইতাম, আবার কয়েক দিন মার কাছে থাকিতাম। বাবার নিকটে থাকিলে তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া আমাকে ও মধ্যম-দাদাকে পূজার ফুল তুলিবার জন্য উঠাইয়া দিয়া মাঠে চলিয়া যাইতেন। ভোরের বেলায় নানা প্রকার ফুলের সংস্পর্শ চিত্তস্ফূর্ত্তির সহায়, সন্দেহ নাই। রক্তজবা, দুধজবা, পাটকেলে জবা, শেফালিকা, টগর, কুন্দ, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, পদ্মকরবী, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, চাঁপা, বকুল, রঙ্গন, কলকে, অতসী, অপরাজিতা, সন্ধ্যামালতী, শণফুল, পলাশ ফুল, দোপাটী, কামিনী, নিজের ও অন্যের বাড়ীতে কত প্রকার ফুলের সহিত শৈশবেই আমাদের পরিচয় হইয়াছিল।

আমরা পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম; আমাদের হৃদয়ের যোগ ছিল মাতার সহিত।

এখন আমার শিক্ষাধ্যায় বর্ণিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যারম্ভ—বাঙ্গালা শিক্ষা

পাঁচ বৎসর বয়সে একদিন প্রাতঃকালে স্নানের পরে আমার হাতে খড়ি হইল। এক ব্রাহ্মণ যুবক একখানা পাথরের থালার নীচের পিঠে খড়িমাটি দিয়া ৭ (আঞ্জি), ক খ গ ঘ ঙ লিখিয়া দিলেন, আমি তাহাতে হাত বুলাইলাম; তাহাই হইল হাতেখড়ি।

তারপরে প্রতিদিন সকালে বিকালে আঙ্গিনায় এক জন চাড়া দিয়া মাটিতে ক, খ, অ, আ লিখিয়া দিতেন, আমি তাহাতে হাত বুলাইতাম। এইরূপে কয়েক দিনে বর্ণপরিচয় হইল; তখন কলা-পাতায় বানান ও ফলা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। য-ফলা, র-ফলা হইতে, স্ক, স্থ পর্য্যন্ত ফলা শিক্ষা করিয়া নাম লিখিবার শ্রেণীতে উঠিলাম। পরিচিত নামগুলি লিখিতে শিখিবার পরে যে সকল মুসলমান বর্গাদার উঠানে ধান মাড়াইতে আসিত, জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নাম লিখিতাম; যথা শ্রী গরি সেখ, শ্রী বাথ্‌রা সেখ, শ্রী গছু সেখ ইত্যাদি।

কলাপাতে লেখার কাজটা বাবার তত্ত্বাবধানে চলিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সন্ধ্যার পরে নানা সংস্কৃত শ্লোক, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের নাম, এবং কড়াকিয়া, নামতা ইত্যাদি শিখাইতেন। কিছু দিন পরে একখানা ধারাপাত

পাইলাম। যে শ্লোকটা বাবা সর্ব্বপ্রথম মুখস্থ করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে—

সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধা জয়া পশুপতি-পতিঃ॥

ইহা আমি আজ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। গণেশের প্রণাম, কৃষ্ণের প্রণাম প্রভৃতি সুপরিচিত। আমরা একটা হিন্দী শ্লোকও শিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝি নাই, এবং এখন কিছুই মনে নাই।

কলাপাতা ছাড়িয়া কাগজ ধরিলাম। আমরা নিজেরা কালী তৈয়ার করিতাম এবং কঞ্চির বা খাগের (খাগড়ার) কলমে লিখিতাম। কঞ্চির কলম কখনও কখনও মারামারিতে অস্ত্রের কাজ করিত। কাগজে লিখিবার মুখ্য বিষয় ছিল 'সেবক' পাঠ ও 'আজ্ঞাকারী' পাঠ, অর্থাৎ পত্রলিখিবার পদ্ধতিটা আরম্ভ। এইরূপ—সেবক শ্রী—— দণ্ডবৎ প্রণামা (ঃ) বহব (ঃ) নিবেদনঞ্চাদৌ (পাঠান্তর, নিবেদনঞ্চাগে) আজ্ঞাকারী শ্রী——; বিনয়-পূর্ব্বক নিবেদন, অথবা বিনয়পূর্ব্বক ভণে'। অতঃপর 'নলকালী', অথবা ভূমি মাপিবার শিক্ষা। এটা জরিপের কাজ। ইহার ঊর্দ্ধে সর্ব্বোচ্চ সোপান 'চিঠাপৈঠা'; আমি সে সোপানে উঠিবার পূর্ব্বেই স্কুলে প্রবেশ করি।

আমাদের বিদ্যাভ্যাসের স্থান ছিল মণ্ডপঘরের বারাণ্ডা; সেখানে আমার ছোট দিদি এবং দুই তিনটী জ্ঞাতি ভগিনীও কিছু দিন শিক্ষা লাভ করিতেন। বাবা ও জেঠামহাশয়ের তাহাতে অনুমোদন

গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের পাঠ

(১) সূতি বঙ্গবিদ্যালয়

আমাদের গ্রামের নিকটে কোনও স্কুল ছিল না। এ জন্য আমার ছয় বৎসর বয়সে, শীতের প্রারম্ভে, বাবা আমাকে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে লাঙ্গলজোড়া গ্রামে আমার এক জেঠতুত ভগিনীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন; সঙ্গে আমাদের মালিনী গিয়াছিল। পথে পশ্চাতে পড়িয়া আমি খুব কাঁদিয়াছিলাম এবং সারাদিন আমার মুখখানা গম্ভীর ছিল। লাঙ্গলজোড়া আমাদের বাসবাটী হইতে তিন চার মাইল উত্তরে; উহার দেড় কি দুই মাইল উত্তরে সূতিগ্রামে একটা মধ্যছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় ছিল; উহাতে আমার দিদির তিন পুত্র ও এক ভাসুরপুত্র পড়িতেন। পর দিন হইতে তাহাদিগের সঙ্গে ঐ স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম প্রথম মায়ের জন্য এত কষ্ট হইত, যে আমি এক সপ্তাহ পরেই আকুল হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, একমাসে শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয় ভাগ এবং তাহার পরের মাসে তৃতীয় ভাগ পড়া হইল। ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে একখানা বোধোদয় লইয়া লাঙ্গলজোড়ায় গিয়াছিলাম, কিন্তু কি জন্য স্মরণ নাই, দুই এক দিন পরেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম, এবং বাবা আমাকে আর পাঠাইলেন না। আমি বইখানা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে লাগিলাম। আমি উহা উচ্চৈঃ-স্বরে পাঠ করিতাম, বাবা কাজকর্ম্মের মধ্যেই নাসিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি শব্দের অর্থ বলিয়া দিতেন, সবগুলি বলিতেন না। বর্ষাকাল হইতে আমি ও মধ্যম দাদা জ্বরে ভুগিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের খুল্লতাতভ্রাতার বাড়ীতে এক কবিরাজ ছিলেন; আমরা প্রতিদিন

প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইতে যাইতাম; তখন তিনি আমার পড়া লইতেন। তিনি শুধু শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিতেন, অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন না। ভুল করিলে তিনি স্বয়ং সাজা না দিয়া আমাকে নিজের কাণ নিজে মলিতে বলিতেন; আমি সেটা খুব সুবিধার বিষয়ই মনে করিতাম। সেইখানে বসিয়াই সুযোগ পাইলে আমি কৃত্তিবাসের মুদ্রিত রামায়ণ পড়িতাম। সাত আট বৎসর বয়সে আমি উহা শেষ করি।

১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে একদিন প্রাতঃকালে পিতার জ্বর হইল। তিনি বাহিরের ঘরে লেপ গায়ে দিয়া শুইয়াছিলেন, আমি ও মধ্যম দাদা এই সুযোগে খেলায় মাতিয়া ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমরা ঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে এমন দুই একটা কথা বলিলেন, যাহা আজিও ভুলিতে পারি নাই। এই তাঁহার শেষ বাণী শুনিলাম। দুই এক দিন পরে অবস্থা খারাপ বুঝিয়া মা, মাসীমা তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে দক্ষিণদ্বারী ঘরে লইয়া গেলেন। আমাদিগকে সে ঘরে যাইতে দেওয়া হয় নাই; আমরা ভাই বোনেরা রাত্রিতে পাক ঘরে থাকিতাম। তারপর শুনিলাম, বাবা স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। ক্রমশঃ পিতার বাক্‌রোধ হইল। কবিরাজ মদন ঘোষের চিকিৎসায় কোনও ফল হইল না। সপ্তাহকাল পরে এক দিন প্র্যাতূষে মা ও মাসীমার ক্রন্দনের রোল শুনিয়া আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলাম, দেখিলাম পিতাকে উঠানে আনা হইয়াছে, কবিরাজ আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "নাড়ী ভাল আছে, কেন বাহির করিয়াছেন?" তখন মুমূর্ষুকে বারাণ্ডায় শোয়াইয়া রাখা হইল; কিন্তু এক মুহূর্ত্ত

পরেই কয়েক জন তাঁহাকে আবার বাহিরে আনিয়া অন্তিম শয্যায় স্থাপন করিলেন ; তখন চরম শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। জেঠামহাশয় ছুটিয়া আসিয়া মাথার কাছে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে দেব দেবীর নাম শুনাইতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ আমাদের কাল গোরুর লাঙ্গুল পরলোক যাত্রীর হাতে রাখিয়া বৈতরিণী পারের মন্ত্র পড়িলেন। চুয়ান্ন বৎসর তিন মাস অতিক্রম করিয়া পিতা ভবধাম ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে অগ্রজ টাঙ্গাইলে ছিলেন; তাঁহাকে আনিবার জন্য নৌকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পিতৃবিয়োগের দুই দিন পরে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। মধ্যম দাদা মুখাগ্নি করিলেন। শ্মশানযাত্রার সময়ে আমার জ্বর আসিল, জেঠামহাশয় আমাকে যাইতে দিলেন না।

পিতা "অঋণী অপ্রবাসী" ইহলোক হইতে দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। আমরা পরে দশ পাঁচ টাকার কয়েকখানা তামাদি তমঃশুক পাইয়াছিলাম। তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য অতিরিক্ত গোয়াল ঘর বিক্রয় ও পঞ্চাশ টাকা ধার করিতে হইল।

আমার বয়স তখন সাত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতার আগ্রহ এত অধিক ছিল যে, তিনি দাদা, মধ্যম দাদা ও আমি, তিন জনকেই বিভিন্ন সময়ে পাঠের উদ্দেশ্যে তিন আত্মীয়ের গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদরের বয়স ছিল তিন বৎসরের কম ; তাহার জন্য ভাবিবার অবসর তাঁহার হয় নাই।

গৃহে পাঠ

পিতৃহীন হইবার ফলে আমাদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ উপস্থিত হইল না বটে, কিন্তু আমার পাঠ বন্ধ হইল। বিশেষতঃ এই সময়ে আমি

জ্বর প্লীহায় খুব ভুগিতে আরম্ভ করিলাম; বিনা চিকিৎসায়ই নিরাময় হইলাম, কিন্তু তাহাতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। তবে শিক্ষার একটা উপায় আমার হাতের কাছে ছিল। আমি সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যে বাড়ীর অনেকগুলি পুঁথি ও পুস্তক পাঠ করি। কাশীরাম দাসের মহাভারতের বন প্রভৃতি কয়েকটী পর্ব্ব পড়িয়াছিলাম মুদ্রিত পুস্তকে, দ্রোণ, কর্ণ ইত্যাদি খুব প্রাচীন পুঁথিতে; উহা ১১২৭ হইতে ১১৩১ সালে লিখিত হইয়াছিল। যাত্রা গান আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, আমি কাব্য পুরাণের বহু আখ্যান যাত্রা ও পালা-গান হইতেই শিখিয়াছিলাম।

মাঘ মাসে (১২৮২ সাল) ছোট দিদির বিবাহ হইল। বর্ষাকালে মা নৌকাতে আমাদিগকে লইয়া বাসাইল মাতামহের বাড়ীতে গমন করিলেন। সেখান হইতে আমরা ঠাকুরদাদার সহিত মৈশামুড়া বড় দিদিকে আনিতে গেলাম। তাঁহাকে লইয়া ফিরিবার সময়ে আমাদিগকে খুব বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ছাওয়ালী গ্রামের নিকটে প্রবল বায়ুতে নদীতে ভয়ানক তরঙ্গ উঠিতেছিল; নৌকাখানি ছোট, চালক মোটে এক জন, সে আমাদিগকে হাঁটিয়া তরঙ্গসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিবার পরে নৌকায় উঠিতে বলিল। আমরা তাহাই করিলাম। অকস্মাৎ ঝটিকা বাতাস আসিয়া নৌকা নদীর অপর পারে লইয়া গেল। মাঝি লগি দ্বারা নৌকা চালাইতে-ছিল, বাত্যার মধ্যে লগি ছাড়িয়া দাঁড় ধরিতে পারিল না, পারিলে তাহা দ্বারা হালের কাজ করিয়া নৌকা সোজা রাখিতে পারিত। নিরুপায় হইয়া সে ঠাকুরদাদাকে দাঁড় ধরিতে বলিল, তিনি প্রাণপণে তাহার নির্দ্দেশমত দাঁড় ধরিয়া রহিলেন, তবু ঝড়ে নৌকা দুইবার কাত হইল, এবং তাহাতে ঝলকে ঝলকে জল উঠিল। আমরা

সকাতরে ইষ্টদেবতার নাম করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে ঝড় থামিল, আমরা নিরাপদ হইলাম।

মাতামহের বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া কাওয়ালজানীতে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিমাতুলের গৃহে একরাত্রি যাপন করিয়া আমরা জামুরিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বড়দিদি মৈশামুড়ার ঘাটে নৌকা লাগিতেই মার সহিত কাঁদিতে সুরু করিয়াছিলেন। বাড়ীতে পা দিয়াই তিনি যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিন দিন তিন রাত্রি তাহার বিরাম হইল না; তারপর একেবারে উন্মাদ হইলেন। বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই; মা ও মাসীমার পক্ষে তাঁহাকে শান্ত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল; তিনি তাঁহাদিগকে মার ধর করিতে আরম্ভ করিলেন। অগত্যা তাঁহারা চন্দ্রাগ্রামে মাতুলদিগকে সংবাদ দিলেন, এক মামা আসিয়া বড়দিদিকে লইয়া গেলেন। খবর পাইয়া তাঁহার শ্বশুরও তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন।

আরোগ্যলাভের পরে বড়দিদি কখনও মাতুলালয়ে, কখনও পিতৃগৃহে বাস করিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার মাথা খারাপ হইত, প্রথম বারের অবস্থা আর দেখা যায় নাই। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর ইনি আমাদের গৃহেই যাপন করেন। বড়দিদি জন্ম-দুঃখিনী ছিলেন।

(২) ঘাটাইল বঙ্গবিদ্যালয়

দেড়বৎসর পরে, বোধ হয় ১৮৭৬ সনের বসন্তকালে, আমাদের বাটী হইতে দেড় মাইল ব্যবধানে ঘাটাইল গ্রামে একটী স্কুল স্থাপিত হইল। উহার একটু ইতিহাস আছে। ঐ গ্রামের প্রসিদ্ধ তালুকদার কালী রায়ের অন্তঃপুরস্থ দক্ষিণদ্বারী চৌচালা ঘরে একদা একটা শকুন

বসিল। ইহাতে গৃহখানি অপবিত্র সুতরাং বাসের অযোগ্য হইল বিবেচনা করিয়া তিনি উহা স্বীয় বাটীসংলগ্ন হাটে কালীবাড়ীর সম্মুখে স্থানান্তরিত করিলেন এবং উহার যথাযোগ্য ব্যবহারের মানসে একটা স্কুল খুলিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার জন্য বৃহৎ দুইখানি নৌকা নির্ম্মিত হইতেছিল অব্যবহার্য্য তক্তাগুলির দ্বারা বেঞ্চ তৈয়ারী হইল। আমরা দুই ভাই কয়েক দিন পরেই ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।

এই স্কুলের প্রথম শিক্ষক ছিলেন একজন মুসলমান; তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর ব্যবহারও তেমনি মধুর ছিল। নামটা ঠিক স্মরণ নাই, তমিজউদ্দিন, কি এইরূপ কিছু হইবে। সিরাজগঞ্জের নিকট একটী গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই শিক্ষকের স্মৃতি আজও আমার চিত্তপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। ইনি আমাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন, ইঁহার গৃহে গেলে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেন, এবং বন্ধুদিগকে বলিতেন, "এই ছেলেটী একটা মানুষের মত মানুষ হইবে।" আমার অপেক্ষা বড় ছেলেরা পড়া বলিতে না পারিলে তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া সেই পড়া পড়িতে আদেশ করিতেন। ইনি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অন্যত্র চলিয়া যান।

তারপর যিনি শিক্ষক হইয়া আসিলেন তাঁহার নাম ছিল, (যদি স্মৃতি আমাকে বঞ্চনা না করিয়া থাকে) গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী। ইনি শাসনপটু সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন। নূতন হুজুগে স্কুলে হিন্দু মুসলমান বহু ছাত্র জুটিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেল; মুসলমান দুই একটীর অধিক রহিল না। প্রথমে বেতন কেহ দিত মাসে দুই পয়সা, কেহ এক আনা; আমরা দিতাম দুই আনা। এখন হইতে দুই পয়সা উঠিয়া গেল; বেতন সমভাবে দুই আনা, অসমর্থপক্ষে এক আনা, নির্দ্ধারিত হইল। আমি কিছু কাল ধরিয়া

বোধোদয়, পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ, পদ্যমঞ্জরীক, পদ্যপুণ্ডরীক কবিতাবলী ভূগোলসূত্র প্রভৃতি পড়িতেছিলাম, কিন্তু কোন্ শ্রেণীতে পড়িতেছি, তাহা জানিতাম না। নূতন শিক্ষক ধীরে ধীরে বিদ্যালয়টীকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে লইয়া আসিলেন, এবং সাময়িক পরীক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। এক দিন ইঁহার নিকটে সাহিত্য ও ব্যাকরণের পরীক্ষা দিলাম; পরীক্ষা শেষ হইতেই পণ্ডিত মহাশয় আমাকে আচ্ছা করিয়া কয়েক ঘা বেত লাগাইলেন। আমি তো হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বেত খাইয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলাম। আমার সম্মুখে আর একটী ছাত্রও এইরূপ সাজা পাইল। পরে দেখিলাম, আমাদের শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রটী ৬০ এর মধ্যে ৪৮ পাইয়াছে; আমি পাইয়াছি ৩৪; অপর দণ্ডিত বালকটী পাইয়াছে, ২৭। তখন বেত্র-বেদনার নিদান বুঝিলাম। আর এক দিন সকাল বেলায় আমরা কয়েকজন বিদ্যালয়গৃহের সম্মুখে খোলা হাটের মাঠে মহোল্লাসে খেলা করিতেছি, আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সহসা দেখিতে পাইলাম, গঙ্গাধরবাবু বেত্রহস্তে আমাদিগের দিকে আসিতেছেন তিনি স্কুলের সন্নিকটে রায়বাটীতেই থাকিতেন অমনি সকলে যে যে-দিকে পারিল ছুট। ১৮৭৭ সনের বার্ষিক পরীক্ষার পূর্ব্বে ইনি বিজ্ঞাপন দিলেন, যাহারা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইবে, তাহারা "ডবল প্রমোশন" পাইবে। (যত দূর স্মরণ আছে, এই দুটী শব্দ বিজ্ঞাপনেই ছিল।) তখন স্থির হইল, আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। পরীক্ষান্তে, ১৮৭৮ সনের জানুয়ারী মাসে, আমি চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম, এবং উৎসাহের সহিত নূতন পাঠ্যপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ঘাটাইল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীই সর্ব্বোচ্চশ্রেণী হইল।

বর্ষাকালে পথঘাট দুর্গম হইত; তখন আমরা দুই ভাই এবং

গ্রামের আরও কয়েক জন ঘাটাইলে আমাদের এক জ্ঞাতি সম্পর্কিত পিসীমার বাড়ীতে তিন মাস বাস করিতাম। তিনি নিঃসন্তান বিধবা ছিলেন, এবং তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পিসীমা আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন, একাদশীর দিনও ব্যতিক্রম হইত না। একবার কি একটা ব্রতোপলক্ষে ইনি ক্রমাগত তিন দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াও আমাদিগকে রাঁধিয়া আহার করাইয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু ক্ষীণ হইয়াছিল, এই যা' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইঁহার আদরযত্নের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা দুই বর্ষকাল ইঁহার গৃহে যাপন করি। প্রথমবার পূজার ছুটীর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিসীমা আমাদিগকে নানা প্রকার পিঠা করিয়া খাওয়াইলেন। পর বৎসর ছুটী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমি ও মধ্যম দাদা বাড়ী চলিয়া যাই। একদিন তিনি লোকমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা যেন অমুক দিন তাঁহার গৃহে পিঠা খাইতে যাই। আমরা জলকাদা ভাঙ্গিয়া যাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে চাহিলাম না, কাজেই যাওয়া হইল না। শারদীয় অবকাশের পরে এক দিন আমরা দুইজনে স্কুল ছুটী হইলে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উঠানের এক কোণে বসিয়া রহিলাম। বরাবর পিসীমা আমাদিগকে পাইলেই কিছু না কিছু খাইতে দিতেন; সে দিন তিনি আমাদের সম্মুখেই বাহির হইলেন না, কথা বলা দূরে থাক। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অপ্রস্তুত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলাম। তৎপর দিন দুই ভাই আবার গেলাম। সে দিনও তিনি কথা বলিলেন না, দেখাও দিলেন না। আমরাও নাছোড়বান্দা; তৃতীয় দিন আবার তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

সেদিন তাঁহার মন নরম হইল এবং আমাদিগকে অশিষ্টতার জন্য খুব ভর্ৎসনা করিয়া জলপান খাইতে দিলেন।

নয় বৎসর বয়সে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িবার কালে আমি সময়ে সময়ে পাঠে বড়ই অবহেলা করিতাম। কত দিন আহার করিয়া স্কুলে যাইবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়াছি, কিন্তু পথে খেলার সাথীদিগের সহিত গল্পগুজব করিয়া যথাকালে ফিরিয়া আসিয়াছি; মা, মাসীমা আমার কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরে একবার ক্রমাগত মাসাধিক কাল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিলাম। কথা হইল, আমি পিংনা এক আত্মীয়ের গৃহে থাকিয়া সেখানকার স্কুলে পড়িব। তাহা হইয়া উঠিল না। তখন আমার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা হইল। স্কুলে যাইতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; দণ্ডের ভয়ও যাইবার ইচ্ছার বিরোধী হইল। পরিশেষে জেঠামহাশয়ের শরণ লইলাম। দুই এক দিন পরে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন; জেঠামহাশয় তাঁহাকে আমার কথা বলিয়া দিলেন; আমি সহজেই নিষ্কৃতি পাইলাম।

আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ তখন সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের ছাত্র। আমার পড়াশুনার প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি জানিতেন, বাড়ীর বাহির না হইলে আমার শিক্ষালাভ হইবে না। তিনি সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ের একটী ঘটনা আমার জীবনে ভগবৎকৃপার আশ্চর্য্য নিদর্শন; এজন্য উহা বিবৃত করিতেছি। কোন ভদ্রলোক কালী রায় মহাশয়ের বন্ধুত্বের আকর্ষণে স্বগ্রাম ছাড়িয়া ঘাটাইলে রায়বাটীর পার্শ্বে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। আসামের অন্তর্গত নওগাঁ তাঁহার কর্ম্মস্থান ছিল; তিনি ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছিলেন, বাঞ্ছিত বেতনে সরকারী চাকুরী

করিতেন। ১৮৭৭ সনের বর্ষাকালে ইনি কয়েক মাসের ছুটী লইয়া পরিবার পরিজন সহিত নবনির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে আসিলেন। বিদায় ফুরাইবার প্রাক্কালে ভদ্রলোকটী একাকী কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং স্ত্রী ও বন্ধুদিগকে বলিয়া রাখিলেন যে, একটী বুদ্ধিমান্ বালক পাইলে তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। বালিকাটী তাঁহার প্রথম সন্তান, বয়স চার কি পাঁচ বৎসর। ইঁহাদের সহিত আমার ভগিনীপতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এজন্য ছোট দিদি নিমন্ত্রিত হইয়া এই পরিবারে দুই এক মাস বাস করিতেন। আমি স্কুল হইতে মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে যাইতাম; কেন জানি না, নির্ব্বাচনটা আমার উপরেই পড়িল। দাদা শুনিয়া অনুমোদন করিলেন। তারপর ১৮৭৮ সনের গ্রীষ্মকালে তাঁহারা ফিরিয়া যাইবেন এই প্রকার স্থির হইল। আমাদের গ্রামের পাঁচ ছয় মাইল পশ্চিমে এক বন্দর হইতে নৌকাতে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া বরাবর সুদূর নওগাঁ যাইতে হইবে। যাত্রার দিন নির্দ্ধারিত হইলে মহিলাটী সংবাদ দিলেন যে, আমি যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত থাকি। তদনুসারে আমি ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণে আহারান্তে মা, মাসীমা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া একান্ত বিষণ্ণ চিত্তে আসামযাত্রীদিগের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যখন চলিলাম, তখন মা একটা কথাও বলেন নাই। কিন্তু আমাকে এই বয়সে অত দূরদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে, এই কথা শুনিয়া আমাদের বৃদ্ধ পূজকঠাকুরের গৃহিণী জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া মাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন—বলিলেন "তুমি কি করিতেছ? তুমি কি ভাবিয়াছ ও পুত্র আবার আসিবে? ও গেল, ওকে আর দেখিতে পাইবে

না।” এই প্রকার হৃদয়ভেদী তিরস্কার শুনিয়া মা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, অগত্যা, বাড়ীর কর্ত্রী মাসীমা চাকর পাঠাইয়া আমাকে ফিরাইয়া আনিলেন। এইবার যে দুইটী যুবক ইঁহাদের সহিত নওগাঁ গিয়াছিল, তাহারা সেইখানেই অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

টাঙ্গাইল গ্রেহাম স্কুল

গ্রীষ্মের অবকাশে বাড়ী আসিয়া দাদা ব্যাপারটা অবগত হইলেন। সেই সময়ে আমাদের খুড়তুতো ভগিনী পশ্চিম বাড়ীর স্বর্ণদিদি পিত্রালয়ে আসিলেন। বাঘিল গ্রামনিবাসী নিত্যহরি মিত্র মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল; তিনি টাঙ্গাইলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার ছিলেন। দাদা স্বর্ণদিদিকে অনুরোধ করিলেন, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি যেন আমাকে তাঁহার সহিত লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের গৃহে রাখিয়া পড়াশুনা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। তিনি সম্মত হইলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৮৭৮ সনে রথযাত্রার দুই এক দিন পরে আমি দিদির সহিত নৌকায় টাঙ্গাইল যাইয়া তাঁহাদিগের বাসায় বাস করিতে লাগিলাম এবং গ্রেহাম স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।

টাঙ্গাইলের অন্যতম প্রসিদ্ধ মোক্তার করুণাকান্ত চৌধুরী মহাশয় আমাদিগের মেশোমহাশয় ছিলেন। দাদা, এবং মধ্যম দাদা, উভয়েই বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের বাটীতে থাকিয়া অল্লাধিক কাল বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। মাসীমার নিকটে না থাকিয়া জ্ঞাতি ভগিনীর গৃহে আছি বলিয়া তাঁহারা সকলেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এবং সে কথা আমাকে স্পষ্ট করিয়াই জানিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমি মিত্রমহাশয়ের গৃহে আহার এবং মাসীমার বাড়ীতে শয়ন করিতাম,

পাঠাভ্যাসও অধিকাংশ সময় সেখানেই করিতে হইত। এক বাড়ীর আরাম এবং অপর বাড়ীর আদরের মধ্যে আমার দিনগুলি সুখেই কাটিয়া যাইত। তখন আমার বয়স দশ বৎসর।

গ্রেহাম স্কুলের মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্যইংরেজী, এই তুইটী বিভাগ ছিল—চলিত নাম ছিল ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর। ইংরেজী বিভাগে তিন জন মাষ্টার এবং বাঙ্গলা বিভাগে তুইজন পণ্ডিত ও একজন মৌলবী ছিলেন, হেড্‌মাষ্টার ছিলেন নন্দগোপাল ঘটক মহাশয়, হেড্‌ পণ্ডিত শ্যামাচরণ কুশারি মহাশয়। বিদ্যালয়টী বৃহৎ, সুপরিচালিত ও সুফলপ্রদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আমি মহকুমার স্কুলে প্রবেশ করিয়া বেশ গৌরব বোধ করিয়াছিলাম, করিবার কারণও ছিল, যদিচ সে সময়ে এই অজ্ঞ বালক তাহা প্রায় কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এখন হইতে আমার জীবনে একটা মঙ্গলপ্রসূ পরিবর্ত্তন ঘটিল, অধ্যয়নে মনোযোগ আসিল, কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিল। ১৮৭৮ সনের জুন মাসে গ্রেহাম স্কুলে আসিলাম; তদবধি ১৮৯৩ সনে এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত আমার পাঠের ধারা সমভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

ঘাটাইল স্কুল হইতে গ্রেহাম স্কুলে আসিয়া প্রথম কিছুদিন বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম; তুইটীই মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়, কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক একেবারে স্বতন্ত্র। গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, সমস্তই নূতন; অধিকন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস। এক-দিন ঐ পুস্তকের অনেক পাতা পাঠ ছিল; যাঁহার বই পড়িয়া পড়া শিখিব, তিনি রাত্রিতে উহা দিলেন না। সকালে যেটুকু সময় পাইলাম, তাহাতে প্রাণপণ করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা মুখস্থ করিলাম, কিন্তু আরও কতকগুলি বাকি রহিল। আমি নূতন ছাত্র সুতরাং

ক্লাশে প্রায় সকলের নীচে বসিয়াছিলাম। আমার মুখস্থ অংশের প্রশ্নগুলি উপরের ছাত্রদিগের মধ্যেই নিঃশেষ হইল, কাজেই অপঠিত পৃষ্ঠার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। তখন দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় আমাকে পঞ্চম শ্রেণীতে নামাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে কাণ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন; অনেক কাকুতি মিনতি করিবার পরে আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন। এই দুর্দ্দৈবের কয়েক দিন পরে হেড্-পণ্ডিত কুশারি মহাশয় আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। ইংরেজী বিভাগের ছাত্রেরা দুই ঘণ্টা ইংরেজী পড়িত, আমাদের তখন অবসর থাকিত। তিনি আমার উত্তরগুলিতে সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট একটু সুখ্যাতি করিলেন; ইহাতে বিশ্বাস মহাশয় ইঙ্গিতে বলিলেন, যে তিনি সে দিন আমাকে কাণে ধরিয়া নামাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই আমার পাঠে একটু উন্নতি হইয়াছে।

কয়েক দিন পরে আমি ছাত্রগণের সাপ্তাহিক সভায় একটা ছোট কবিতা পাঠ করিলাম। পাঠান্তে করতালির অভিনন্দন নূতন অভিজ্ঞতার সূচনা করিল। কবিতাটীর দুই ছত্র আজিও মনে আছে—

"আলস্য করিয়া কভু থেকনা বসিয়া।
যে কর্ম্ম আছে হে তাহা করহ যাইয়া॥"

মোটের উপরে পাঠে মনোযোগ থাকিলেও আমি চতুর্থ শ্রেণীতে অনেক সহাধ্যায়ীর পশ্চাতে পড়িয়া ছিলাম।

শারদীয় অবকাশের পরে দুই চার দিন মেশোমহাশয়ের বাসায় থাকিয়া টীকা দিবার জন্য বাড়ী চলিয়া গেলাম। সে সময়ে আমাদের গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছিল, ক্রমশঃ উহা গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। আমরা দেশীয় টীকা লইলাম, এবং তদানুষঙ্গিক জ্বরে ও

বসন্তে প্রায় দুই সপ্তাহ খুব ভুগিয়া উঠিলাম। ইতোমধ্যে পশ্চিম বাড়ীর দাদা দুঃসাধ্য বসন্তে ২৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি মাতার একমাত্র পুত্র এবং স্বয়ং নিঃসন্তান ছিলেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া স্বর্ণদিদি জননীকে দেখিতে আসিলেন, এবং কয়েক দিন পরে স্বগৃহে যাইয়াই বসন্তরোগে পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমি অশৌচান্তে নূতন বৎসরে টাঙ্গাইল যাইয়া মেশো-মহাশয়ের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলাম, এবং বার্ষিক পরীক্ষা দিতে না পারিয়াও তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম।

এখন হইতে আমাকে নিয়মিতরূপে সংসারের কাজে কিছু কিছু সময় দিতে হইত; খেলাধূলাতেও আমার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল; তা' ছাড়া আমি পাঠের ঠিক প্রণালীটীও তখন পর্য্যন্ত ধরিতে পারি নাই; সুতরাং অধ্যয়নে ঔদাস্য না থাকিলেও আমি এই শ্রেণীতে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারি নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদিন দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়—তৃতীয় শ্রেণীতে শুধু তিনিই পড়াইতেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " 'আমরা' কোন পদ?" তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "ক্রিয়াপদ," শুনিয়াই তিনি কাণ ধরিয়া গালে এক চড় দিলেন। ১৮৭৯ সনে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ইন্টারমিডিয়েট, অর্থাৎ উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা দিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা পূর্ব্ব বৎসর এই পরীক্ষা দেয় নাই, এবার আমাদিগের সহযাত্রী হইল। সাহিত্যে আমার দুইটী উত্তর চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সন্ধিবিচ্ছেদের প্রশ্নে একটা শব্দ ছিল 'স্বাধীন'। আমি সূত্রগুলি আওড়াইয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিলাম, 'সু + আধীন'। 'যুগপৎ'শব্দের অর্থ হইল 'প্রলয়।' পাটীগণিতের দশটী প্রশ্নের মধ্যে নয়টীর সমাধানই ভুল হইয়াছিল। গণিতে

আমার এই দৌর্ব্বল্য পূর্ব্বাপর আমার ঈপ্সিত ফললাভের পরিপন্থী হইয়াছে। আমাদের শ্রেণীর মাত্র একটী ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, আমার নাম দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইল।

১৮৮০ সনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া এমন এক ব্যক্তির শিক্ষাধীন হইলাম, যাঁহাকে আমি তদবধি আদর্শস্থানীয় শিক্ষকরূপে ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছি। ইনি স্বর্গীয় শ্যামাচরণ কুশারি। ইঁহার নিবাস ছিল বিক্রমপুরে। নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রথমে টাঙ্গাইলে একটা মনিহারী দোকান খুলিয়াছিলেন, বাজারে আগুন লাগিয়া তাহা পুড়িয়া গেলে গ্রেহাম স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কুশারি মহাশয় নির্ম্মল-চরিত্র, মৃদুভাষী অমায়িক, ছাত্রবৎসল ও সুনিপুণ শিক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল, কিন্তু আমাদিগকে তাহা জানিতে দেন নাই। আমাকে তিনি কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহা পরে বলিব। দুই বৎসর ইঁহার নিকটে পড়িয়াছিলাম; সেই সময়ে প্রাঞ্জল শিক্ষা-প্রণালী ও প্রীতিমধুর ব্যবহার দ্বারা ইনি আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির গোড়া পত্তন করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রধান পণ্ডিত মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াই প্রতিদিনের পাঠে পারদর্শিতা অনুসারে নম্বর দিতে আরম্ভ করিলেন; মাসান্তে সেগুলি যোগ করিয়া ছাত্রগণের গুণানুরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। আমি দুই তিন মাস চতুর্থ স্থানের উপরে উঠিতে পারি নাই। ঠিক সেই সময়ে সন্তোষের পাঁচ আনির জমিদার দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী টাঙ্গাইলে নিজের নামে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। গ্রেহাম স্কুল হইতে অনেক ছাত্র ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই স্কুলে চলিয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ গ্রেহাম স্কুলকেও

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। আমি ইতোমধ্যে দুই এক দিনের জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া ক্লাসে ঢুকিতেই পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইংরেজী পড়িবে, না বাঙ্গলা বিভাগেই থাকিবে?" আমি নিমেষমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিলাম, "আমি বাঙ্গলাই পড়িব।" জীবনদেবতাই আমাকে এই প্রেরণা দিলেন, কারণ আমি যদি তখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ ছাড়িয়া দিতাম, তবে আমার উচ্চ শিক্ষালাভের পথে অর্গল পড়িত।

যে তিনটী ছাত্র আমার উপরে ছিল, তাহারা ইংরেজী পড়িতে গেল—এই তিনটীর একটীও এন্ট্রান্স পাস করিতে পারে নাই—সুতরাং অতঃপর আমি 'নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে,' এই প্রবাদের অন্যতম দৃষ্টান্ত হইয়া পড়িলাম। মাইনর স্কুলের ছাত্রেরা আমাদিগের সহপাঠী থাকিল না, এজন্য ছাত্রবৃত্তি-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতেই ছাত্রসংখ্যা খুব কমিয়া গেল। এ বৎসর বার্ষিক পরীক্ষা হইল না। সুতরাং পূজার ছুটীর পরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে দশবারটী বালক ছিল, সকলেই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইল।

১৮৮১ সনের প্রথমাবধি কুশারি মহাশয় আমাদিগকে যে প্রকার যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ইনি সমস্ত শীতকাল স্কুল ছুটী হইবার পরে প্রায় সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে পড়াইতেন। তদুপরি নিয়মিতরূপে সাপ্তাহিক পরীক্ষা চলিল। ফাল্গুন মাসে এক শনিবার ছুটী ছিল। শুক্রবার পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'সোমবারে একটা পরীক্ষা লইব, কিন্তু বিষয় বলিব না।" আমি ভাবিলাম, বেশ, পরীক্ষার জন্য পড়িতে হইবে না, তবে এক দিনের জন্য বাড়ী যাই। শনিবার যাইয়া রবিবার বাড়ী থাকিয়া পর দিন সূর্য্যোদয়ের পরে যাত্রা করিয়া পনর মাইল

হাঁটিয়া ঠিক বারটার সময় বাসায় পঁহুছিলাম ; তখনই অস্নাত আহার করিয়াই স্কুলে যাইয়া দেখি, সঙ্গীরা উত্তর লিখিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় আমাকে দেখিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী গিয়াছিলে বুঝি ?" আমি 'হাঁ' বলিয়া প্রশ্নগুলি পড়িয়াই লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পরীক্ষার বিষয় ছিল পূর্ব্ব বৎসরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সাহিত্যের প্রশ্নপত্র। এবারও আমার স্থান বিচ্যুতি হইল না।

কয়েক মাস পরে তিন দিন পর পর পরীক্ষা হইতে লাগিল, রবিবারের পালাও বাদ যাইত না। আমিও অধিকতর মনোনিবেশ-সহকারে পড়িতে থাকিলাম ; এবং আমার পড়িবার উৎসাহও বাড়িয়া চলিল। আমি চারিখানা পাটীগণিত হইতে অল্পবিস্তার অঙ্ক কষিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, এই খাঁটি জ্ঞানব্রত পুরুষের অকৃত্রিম স্নেহ ও ঐকান্তিক পরিচালনা নিষ্ফল হয় নাই।

ভাদ্র মাসে বাচনিক পরীক্ষা হইল। আমি উদ্ভিদ্ বিচারে দ্বিতীয় এবং আর সমস্ত বিষয়ে ও মোটের উপরে প্রথম হইলাম। ইংরেজী স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক গণিতে একপত্রের এবং তৃতীয় শিক্ষক ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। প্রথমটীতে ৫০ মধ্যে ৪৮ পাইলাম। দ্বিতীয়টীতে পরীক্ষক মহাশয় কেন যে আমাকে ৫০ মধ্যে ৪৯ দিলেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। যে ছাত্রটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল, তাহার অপেক্ষা আমি ১৭০ নম্বর অধিক পাইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় নম্বরের বহিখানি মনোযোগ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ বৃত্তি পাইবে।" প্রতি বৎসর তিনি এতদনুরূপ মত প্রকাশ করিতেন।

৪ঠা আশ্বিন (১২৮৮ সাল, ১৮৮১) ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। চৌধুরী ভবনে বিস্তর লোকের বসতি ছিল ; আমার আশঙ্কা হইল, এত ভিড়ের মধ্যে পরীক্ষার কয়দিন হয় তো ঠিক

সময়ে আহার হইয়া উঠিবে না। এজন্য যখন করটিয়া স্কুল হইতে মধ্যম দাদা ও অন্যান্য পরীক্ষার্থীরা আসিয়া তথাকার জমিদারের বাসায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন, তখন আমিও সেখানে যাইয়া জুটিলাম। আমার অসুবিধার কথা কি করিয়া কুশারি মহাশয়ের কাণে গেল। পরীক্ষা আরম্ভ হইবার দিন প্রাতঃকালে তিনি আমার সন্ধানে আসিয়া আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'তুমি আমার বাসায় চল, আমি তোমাকে রাঁধিয়া দিব।' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আমার কোনও অসুবিধা হইবে না, বেশ বন্দোবস্ত হইয়াছে।' শুনিয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে পরীক্ষা দিলাম। সাহিত্য মন্দ হইল না, ইতিহাস ভালই হইল। গণিতে এবার ভয়ের কারণ রহিল না। ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল আমার অনুকূল ছিল। জ্যামিতি আশাপ্রদ কিন্তু শোচনীয় হইল পরিমিতি—এই বিষয়টী ও উদ্ভিদ্ বিচার আমাকে উচ্চ স্থান লাভে বঞ্চিত করিল।

পরীক্ষা হইয়া গেলে টাঙ্গাইল ত্যাগ করিলাম। এখানে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময়টা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। বাড়ী হইতে অর্থসাহায্য বলিতে গেলে কিছুই পাইতাম না। বিদ্যালয়ের বেতন ছিল মাসে চারি আনা; কুশারি মহাশয়ের সাহায্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাহা হইতেও রেহাই পাইলাম। মাসীমা বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রকাশ্যে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না; সঙ্গোপনে ধুতি বা জামা বা চাদর দিয়া বস্ত্রের একান্ত অভাব দূর করিতেন। পনর বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে চটী কিংবা জুতা ক্রয় করিবার পয়সা জুটে নাই। প্রাতঃকালে ক্ষুধায় কাতর হইলে আধ পয়সার মুড়ি কিনিবারও

সঙ্গতি ছিল না, মুড়িওয়ালী দয়া করিয়া আমাকে পোয়া পয়সার মুড়ি দিত—যদিও আধ পয়সার নীচে বিক্রয় করার দস্তুর ছিল না। আমার বংশধরগণের নিকটে এগুলি উপন্যাসের মত শুনাইবে, এই জন্যই কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখিলাম।

দাদা দুই বৎসর পূর্ব্বে সন্তোষ হইতে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং পরীক্ষার প্রাক্কালে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিতমহাশয় যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃত্তি পাইলে কোন স্কুলে পড়িব, তখন আমি জেলা স্কুলের নাম করিলাম। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গ্রেহাম স্কুলের নাম লিখিয়া দিলেন। তাহা হইলেও আমি যখন গুরুজনের নিকট বিদায় লইলাম, তখন জানিতাম, এইবার নূতন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।

পরীক্ষা হইয়া গেলে কিছু কাল অন্তরে একটা অহৈতুক আনন্দ অনুভব করিলাম। বাড়ীতে পরিপূর্ণ অবসর; বান্ধবপত্রিকার উপাদেয় প্রবন্ধগুলি খুব সহায় হইল। ময়মনসিংহ যাইতে হইবে—কিন্তু বৃত্তি পাইব কি না, কোথায় থাকিব, কিরূপে ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে, সমস্তই অপরিজ্ঞাত। এক মাস যাইতে না যাইতে পরম পিতা অজানা পথে লইয়া গিয়া নিরুপায়ের উপায় করিয়া দিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ইংরেজী শিক্ষা

বড় বাড়ীর বড় দাদা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গুহ মুক্তাগাছায় এক জমিদার সরকারে চাকুরী করিতেন। কার্ত্তিক মাসে তিনি তাঁহার পত্নীকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। বধূঠাকুরাণী আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড় ছিলেন, তিনি এই প্রথম প্রবাসে যাইতেছেন, একাকী সেখানে কিরূপে থাকিবেন? জেঠা মহাশয় একটু ভাবনায় পড়িলেন। তখন আমি সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। আমাকে ময়মনসিংহে যাইয়া অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকিবার একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে, সুতরাং মুক্তাগাছা গেলে গন্তব্যস্থানের নিকটেই যাওয়া হইবে; উভয়ের ব্যবধান মোটে দশ মাইল। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি বধূঠাকুরাণীর সহিত মুক্তাগাছায় যাইয়া উপনীত হইলাম।

কয়েক দিন পরে দাদার সহিত দেখা করিতে গেলাম, তখন স্কুল, কাছারী বন্ধ। প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে ব্রাহ্মদোকানে লইয়া গেলেন; সেটী তৎকালে মেধাবী ছাত্রগণের মিলনস্থান ছিল। আমার পায়ে জুতা নাই, দীনহীন মলিন বেশ, দূরে সসঙ্কোচে নীরব বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই কার্য্যাধ্যক্ষ সুপরিচিত ব্রাহ্ম শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আমার উপরে পড়িল। তিনি পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন, এবং নানা কথা

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি আমাকে ও আমার আত্মীয় আর একটী বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রকে রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া আহার করিয়া সে রাত্রি ঐ আত্মীয়ের ছাত্রাবাসে যাপন করিলাম। শরৎ বাবু সেই দিন হইতে বরাবর আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তুই তিন দিন দাদার নিকটে থাকিয়া মুক্তাগাছা ফিরিয়া গেলাম। এ যাত্রায় সাহিত্যের নম্বর জানিলাম, এবং বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলাম, আমি ইতিহাসে ময়মনসিংহ জেলাতে প্রথম হইয়াছি। ইহার অধিক কিছু হইয়া উঠিল না।

বড় দাদা আমাকে বাল্যাবধি প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার রাত্রিকালে কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত; এজন্য যতক্ষণ তিনি না আসিতেন, আমাকে তাঁহার ঘরে থাকিতে হইত; তিনি আসিয়া উঠাইয়া দিলে নিজের ঘরে যাইয়া শুইতাম। আমার শীত বস্ত্র ছিল না; তিনি একখানা দোলাই কিনিয়া দিলেন। একরাত্রি ঘুমের ঘোরে খাট হইতে নীচে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া তাহা ছাই হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে তিনি নিজে হইতে জুতা কিনিবার টাকা দিলেন; আমি বিশ মাইল হাঁটিয়া ময়মনসিংহ হইতে তাহা ক্রয় করিয়া আনিলাম। এই প্রথম আমার পায়ে জুতা উঠিল। আরও কয়েক দিন পরে দিবা দ্বিপ্রহরে জমিদার বাড়ীতে ঢাকাপ্রকাশ দেখিয়া বাড়ী আসিয়াই সংবাদ দিলেন, মধ্যমদাদা ও আমি তুইজনেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। নিশীথ কালে তিনি কাগজখানা সঙ্গে আনিলেন; আমি তখন নিদ্রায় অভিভূত; তাঁহার পার্শ্বেই রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোরে উঠিয়াই ঢাকাপ্রকাশ খুলিয়া দেখি, ময়মনসিংহের মধ্যে আমি চতুর্থ হইয়াছি, মধ্যম দাদা পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং আমরা তুই

জনেই বৃত্তি পাইব। দুই এক দিন পরে অগ্রজের নিকট হইতেও সুসংবাদ লইয়া পত্র আসিল।

এখন পড়িবার একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা না করিলেই নয়। দাদা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, শারদীয় অবকাশের পরে একজন প্রসিদ্ধ উকীল গ্রাম হইতে সহরে ফিরিয়া আসিলেই তাঁহার গৃহে আমাকে স্থান দিতে অনুরোধ করিবেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইত কি না, জানি না; কিন্তু সে চেষ্টার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গুহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে বলিলেন, যে তিনি আমার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। আমার দুর্ভাবনা দূর হইল। যথাসময়ে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও কয়েকটা টাকা দিয়া একখানি পত্রসহ জমিদারের মোক্তার দীননাথ সাধ্য মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি ইহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব।" আমি ২রা জানুয়ারী (১৮৮২) ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। তখন আমার বয়স চৌদ্দ পার হইয়াছে। বড় দাদার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, ব্যয়বাহুল্যও যথেষ্ট ছিল, এই হেতু আমি দুই এক মাসের অধিক তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করি নাই। কিন্তু তিনি যে আমাকে নব শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, এই ঋণ আমি চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া আসিতেছি।

সেকালে শিক্ষার ব্যবস্থা

এইস্থলে ময়মনসিংহ জেলায় তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। তখন মধ্যবঙ্গবিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই ছিল। দশ পনর মাইল ব্যবধানে এক এক স্থানে এক

একটা স্কুল ছিল, তাহাতে নিকটবর্ত্তী বালকেরা শিক্ষা লাভ করিত বটে, কিন্তু জেলার অধিকাংশ শিক্ষার্থী সে সুযোগে বঞ্চিত থাকিত। বালিকাবিদ্যালয় দুই একটীর বেশী ছিল না। ময়মনসিংহ সহরে আলেকজাণ্ডার বালিকাবিদ্যালয় প্রথমে উচ্চপ্রাইমারী ও পরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিত। বালিকাদিগের জন্য ইংরাজী শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

মধ্যইংরাজী স্কুলের সংখ্যা কম ছিল; টাঙ্গাইলের এলাকার মধ্যে তিন চারিটীর অধিক নাম মনে পড়িতেছে না। এণ্ট্রান্স স্কুলগুলির নাম এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলে গণনা করা যায়। এদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখ্যাত ছিল জেলা স্কুল ও জাহ্নবী স্কুল। সহরে নসিরাবাদ এণ্ট্রান্স স্কুল নামে দ্বিতীয় একটী উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। ১৮৮২ সনে তাহা উঠিয়া যায়, এবং বৎসরান্তে পুনর্জ্জীবিত হইয়া ১৮৮৪ সনে বিলুপ্ত হয়। সুসঙ্গ দুর্গাপুরে দুই চারি বৎসর একটা এণ্ট্রান্স স্কুল চলিয়াছিল, ১৮৮২ সনে তাহা জীবিত ছিল কি না, বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণার উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়গুলি ইহার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রেহাম স্কুলের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহার বর্ত্তমান নাম বিন্দুবাসিনী স্কুল। দ্বারকানাথ স্কুল হইতে একটী ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ইহাই উহার জীবনীশক্তির প্রথম ও শেষ স্পন্দন। ১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসন স্থাপিত হয়; কয়েক বৎসর পরে সিটী স্কুল বলিয়া ইহা নূতন নাম ধারণ করে। এখন (১৯৩৮) ময়মনসিংহ জেলায় উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় নব্বইটী।

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল

সপ্তম শ্রেণী

১৮৮২ সনে নূতন আশা ও উৎসাহ লইয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু এই বৎসরটা অভাব, অসুবিধা এবং ক্লেশও যথেষ্ট বহন করিতে হইল। সাধ্যমহাশয়ের বাসায় আহার করিতাম, কিন্তু সেখানে থাকিবার স্থান ছিল না, এজন্য ছাত্রনিবাসে পড়িতে ও রাত্রি যাপন করিতে হইত। ফাল্গুন মাসে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হইলাম। কিন্তু ইহাতে ব্যয় একটু বাড়িল, সম্বল মাসিক চারিটাকা, কাজেই কিছু কিছু ঋণ হইতে লাগিল। পূজার ছুটীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রনিবাস উঠিয়া গেল। ছুটীর পরে ফিরিয়া আসিয়া আমরা গুরুতর অসুবিধায় পড়িলাম ; দুই এক দিন এবাসায় ওবাসায় কাটাইয়া ছাত্রনিবাসের এক শূন্যঘরে থাকিবার ও দূরে গাঙ্গাটিয়ার বাসায় আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। শীতের রাত্রিতে হাঁটাহাঁটিটা খুব মনোরম বোধ হইত না, তদুপরি এখানে অন্ন পাইতে রজনী গভীর হইয়া যাইত। ইত্যবসরে ছাত্রাবাসের এক পুরাতন ভৃত্য ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটা হোটেল খুলিল। আমরা তখন তাহার মূল্যদায়ী অতিথি হইলাম। কিন্তু শয়নগৃহ হইতে ভোজনালয়ের দূরত্ব অনেকখানি বাড়িয়া গেল। ও দিকে পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, অগত্যা সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করিলাম। তিনি বৎসরের পর বৎসর উচ্চশ্রেণীর দুই একটী উৎকৃষ্ট অথচ গরিব ছাত্রকে নিজের গৃহে রাখিতেন ; দাদা তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইঁহার ভবনে থাকিয়া সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ঢাকায় গিয়াছিলেন। গুপ্ত মহাশয় এবার আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। বার্ষিক পরীক্ষা যে দিন শেষ

হইল, সে দিন দ্বিতীয় পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় আমাকে জানাইলেন, যে রত্নমণি বাবু আমাকে তাঁহার গৃহে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুমতি লইয়া পর দিন প্রাতঃকালে সেখানে চলিয়া গেলাম। এত দিনে অকূলে কূল পাইলাম।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়, সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষকগণের সহিত সম্বন্ধ—তিন দিকের ঘাতপ্রতিঘাতে সম্বন্ধটা গড়িয়া উঠিতেছিল। আমরা তিন জন শিক্ষকের নিকটে পড়িতাম ; সপ্তম শিক্ষক ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল পড়াইতেন ; প্রধান পণ্ডিত ঈশান চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বাঙ্গলা লইতেন, অষ্টম শিক্ষকের বিষয়টা স্মরণ হইতেছে না। আমি বঙ্গবিদ্যালয়ে থাকিতে যৎসামান্য ইংরেজী পড়িয়াছিলাম, এবং তাহারই জোরে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। সুতরাং যাহারা গোড়া হইতে ইংরাজী স্কুলে পড়িতেছিল, প্রথম প্রথম তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতাম না। অঙ্ক, বাঙ্গলা ও ভূগোল আয়ত্ত ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর দৈন্য দূর হইতে লাগিল ; এবং সপ্তম শিক্ষকের দৃষ্টিও আমার প্রতি দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর আকৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহার ফল আমার পক্ষে সর্ব্বথা সুখকর হইল না।

প্রথমতঃ এই সময়ে আমি দৌরাত্ম্য ও অশিষ্টতায় সহপাঠীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলাম। শিক্ষক মহাশয়ও দোষত্রুটি পাইলেই তৎপরতার সহিত দণ্ড দিতেন। ভূমিতে দাঁড়ান, বেঞ্চের উপর দাঁড়ান, হাঁটুর উপরে অবস্থান—এ সব অহরহ লাগিয়াই ছিল। ইঁহার দণ্ডবিধির একটু নূতনত্ব ছিল—তাহা আর কোথাও দেখি নাই। এক দিন কি অপরাধে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার আদেশ পাইলাম।

সে দিন বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরেই হাফ্ স্কুল গতিকে ছুটী হইয়া গেল। আমি তো আহ্লাদে আটখানা হইয়া বাড়ী গেলাম—আঃ, কি সহজেই পরিত্রাণ পাইলাম। পর দিন ক্লাসে আসিয়া বসিয়াই আমার বিপরীত দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কাল আমি যাহাদিগকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু বসিতে বলি নাই, তাহারা আবার দাঁড়াক।" এই অপ্রত্যাশিত আজ্ঞা পাইয়া আমি নিঃশব্দে বেঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। একেই বলে অনন্ত নরকের পূর্ব্বাভাস।

আর এক কারণে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে তিক্ততা দেখা দিত। আমি ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তাও বিশেষ কিছু জানিতাম না। কিন্তু সে যুগে অধিকাংশ বুদ্ধিমান্ ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন; দাদা নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতেন, এবং ছাত্রনিবাসের অনেকেই শাখাসমাজ ও সঙ্গতের সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আমিও নববর্ষের উৎসবে গেলাম, এবং আস্তে আস্তে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। ছাত্রগণ যাঁহাদিগের প্রভাবে নূতন ধর্ম্মের আচরণে ব্রতী হইতেছিলেন, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। পক্ষান্তরে সপ্তম শিক্ষক মহাশয়ের যোগ ছিল বিধানবাদী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত। উভয় দলের আদিম বিরোধ হইতে যে অপ্রীতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার তীব্রতা আমিও কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিয়া-ছিলাম। আমি যে তাঁহাদের মন্দিরে না যাইয়া অপর সমাজের উপাসনালয়ে যাই, তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না—তুই একবার আকারে ইঙ্গিতে এবং অবশেষে স্পষ্ট কথায় ইহা তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন। এক দিন আমার নির্ব্বুদ্ধিতা এই অসন্তোষে ইন্ধন জোগাইল। ক্লাসে কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ ?" উত্তর। "না।" আমি বলিলাম "আমরা বেদ মানি।" শিক্ষক—"তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্ম নও।" আমি অমনি বলিয়া ফেলিলাম, "আপনারাই ব্রাহ্ম নহেন।" শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় ক্ষণকাল গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তখনই পার্শ্বের কক্ষ হইতে অষ্টম শিক্ষক আসিলেন—তিনিও নববিধানী ছিলেন। তাঁহাকে সপ্তম শিক্ষক বলিলেন, "শুনিয়াছেন, রজনী বলে, আমি ব্রাহ্ম নই।" তিনি খুব রাগিয়া গেলেন, এবং পরামর্শ দিলেন, "চারি টাকা জরিমানা করুন।" পরিশেষে সপ্তম শিক্ষক আমাকে বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া বেড়ার গায়ে যতবার ইচ্ছা লিখিয়া রাখ, আপনি ব্রাহ্ম নহেন, আপনি ব্রাহ্ম নহেন'—আমি কিছুই বলিব না। কিন্তু তুমি তোমার শিক্ষককে অপমান করিয়াছ।" এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই, অতএব ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। ইঁহারা দুইজনেই আমাকে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিতেন।

মাসের পর মাস এই প্রকার দণ্ডিত হইবার ফলে আমি নিজেকে বড়ই লাঞ্ছিত জ্ঞান করিতাম, এবং মনে মনে দিন গণিতাম, কবে বার্ষিক পরীক্ষা হইবে, এবং ডবল প্রমোশন পাইয়া পঞ্চম শ্রেণীতে যাইয়া ইঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। বার্ষিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল না। পূজার ছুটীর পরে ইনি আর আসিলেন না, প্রচার ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

সপ্তম শিক্ষক মহাশয় এক জন বিশ্বাসী ব্যাকুলপ্রাণ ভক্ত সাধক ছিলেন; প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নানান্তে দীর্ঘকাল সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেন। উত্তরকালে ইনি জ্ঞানভক্তিসমন্বিত একনিষ্ঠ

সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই, যে ইনি আমাকে স্নেহ করিতেন, এবং যথার্থই আমার মঙ্গলকামী ছিলেন। ইঁহার উপদেশেই মিথ্যা কথা বলা ছাড়িয়া দিবার সংকল্প জাগিয়াছিল। ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষাপদ্ধতির একটা দিক্ দেখাইবার উদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

আষাঢ় মাসে শাখা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আগমন করেন। প্রথম দর্শনেই আমার প্রতি তাঁহার প্রীতির উদ্রেক হইল; তিনি আমাকে দুই খানি পুস্তিকা দিলেন; আমার মত কয়েকটী বালককে বাসভবনে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিলেন, এবং অবশেষে দাদাকে বলিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার সহিত লইয়া যাইতে চাহেন। দাদা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সদ্গুরু আমাকে তাঁহার চিহ্নিত বর্ত্ম হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইতে দিলেন না।

বর্ষান্তে বার্ষিক পরীক্ষা হইল। স্বয়ং হেড্মাষ্টার মহাশয় ইংরাজীতে মৌখিক পরীক্ষা লইলেন। আমি ইংরাজী, বাংলা, গণিত প্রভৃতি সকল বিষয়ে এবং মোটের উপরে প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। সমগ্র নম্বরের মধ্যে আমি শতকরা প্রায় ৯০ পাইয়াছিলাম। ইহাও উল্লেখযোগ্য, যে আমার ইংরেজী অপেক্ষা বাঙ্গলাতে দুই এক নম্বর কম ছিল।

এই সুফলের পুরস্কার হইল পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নয়ন এবং হেড্মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে আশ্রয়লাভ।

জেলা স্কুলে দাঙ্গা

১২৮৯ সালের ২৩এ ভাদ্র (সেপ্টেম্বর ১৮৮২) ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে একটা দাঙ্গা হইল। সেই সময়ে স্কুলের পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে ক্যালোনাস (T. T. Kallonas) নামক এক আর্ম্মাণী জমিদারের কুঠী ছিল। রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের সহিত বন্ধুত্ব-নিবন্ধন তাহার প্রতাপ দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ তারিখে স্কুল বসিবার পূর্ব্বে একটা সামান্য কারণে তাঁহার সহিসদিগের সহিত কয়েকটী ছাত্রের বিবাদ আরম্ভ হয়, এবং কথায় কথায় বিবাদ বাড়িয়া যায়; ক্রমশঃ ছাত্রেরা যেমন স্কুলে আসিতে লাগিল, তেমনি উভয় পক্ষে কলহকারীর সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। হঠাৎ প্রায় ত্রিশ জন লাঠিয়াল আসিয়া স্কুলের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল এবং যাহাকে পাইল তাহাকেই আক্রমণ করিল। দুই একটী বলবান্ যুবক ছাত্রও প্রতিশোধ লইতে পশ্চাৎপদ হইল না। শেষে প্রতিপক্ষ নিজেদের ভূমিতে যাইয়া ইটপাটকেল ছুড়িয়া লড়াই করিতে লগিল, ছাত্রেরাও তদনুরূপ অস্ত্র লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল—আমিও সহযোগিতা করিতে ভয় পাই নাই। তার পর যথারীতি পুলিস আসিল, উভয় পক্ষে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইল, আসামীরা সনাক্ত হইবার পরে জামিন দিয়া খালাস পাইল, কিছুকাল ধরিয়া মোকদ্দমা চলিল।

এই ব্যাপারে ময়মনসিংহে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। তখনও সেখানে টেলিগ্রাফের তার আগমন করে নাই, রেলপথ ত নয়ই। এক দিন ছাত্রদিগের পক্ষে নির্দ্ধারিত হইল, কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার আনিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক ভদ্রলোককে ত্রিশ

জন বাহক দিয়া পাল্কীতে ঢাকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তথা হইতে তিনি ষ্টীমারে গোয়ালন্দ যাইয়া রেলগাড়ীতে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। পর দিন পরামর্শ হইল, ব্যারিষ্টার না হইলেও চলিবে, অমনি অপর এক জন ঢাকায় ছুটিলেন, সেখান হইতে কলিকাতায় তার করিয়া প্রথম কথাবার্ত্তা রহিত করিবেন। আমাকে একটী ছাত্র-আসামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। বিচারে দুইটী ছাত্র খালাস পাইল, এবং ছয়জনের পঞ্চাশ টাকা ও দ্বারবানের দশ টাকা জরিমানা হইল। অপর পক্ষে একজন তিন মাসের ও অবশিষ্ট ছয়জন দুই মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

পঞ্চম শ্রেণী

পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিয়া আমি যাঁহাদিগকে শিক্ষকরূপে পাইলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজনের কথা বিশেষ করিয়া বলিব। পরম শ্রদ্ধাস্পদ জগদানন্দ সেন মহাশয় ইংরেজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। এই দুই বিষয়ে ইঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ও সুনিপুণ শিক্ষক অধিক দেখি নাই। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না; প্রাচীন প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার ইংরেজী ভাষার উপরে অনন্যসুলভ অধিকার ছিল।

একবার এক বিদায় সভায় ইনি ইংরেজীতে অনর্গল মনোহর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা শুনিয়া বিস্ময়পুলকে পূর্ণ হইয়াছিলাম। ইঁহার শিক্ষাদানপ্রণালী প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ছিল; শিক্ষার্থীরা ইঁহার সান্নিধ্যে শ্রান্তি বোধ করিত না, বরং অনুভব করিত, শিক্ষনীয় বিষয়ে তাহারা একজন পারগামীর সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে।

সেন মহাশয় স্বল্পভাষী ও গম্ভীর-প্রকৃতি মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে রুক্ষতা ছিল না। তিনি নিতান্ত উত্ত্যক্ত না হইলে ছাত্রদিগকে শাসন করিতেন না। আমাকে তিনি সমধিক স্নেহ করিতেন, আমিও কদাপি পাঠে অবহেলা করিয়া বা আচরণের ত্রুটি দ্বারা তাঁহার বিরক্তিভাজন হই নাই। ইনি পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীতে আমাদিগকে বেইনের ছোট ব্যাকরণ আদ্যোপান্ত পড়াইয়াছিলেন, সেই অধ্যাপনার অনুপম নৈপুণ্যে আমাদিগের ইংরেজী ব্যাকরণের জ্ঞান শৈশবাবস্থায় খাঁটি ও দৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে তাঁহার চরিতকথা লিখিত হইবে।

পঞ্চম শ্রেণীর দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ১৮৮৩ সনের বর্ষাকালে আমার উদ্যোগে একটী Reading club বা পাঠসমিতি স্থাপিত হয়। সভ্যগণ কেহ এক আনা, কেহ দুই আনা, কেহ কেহ চারি আনা চাঁদা দিতেন; তদ্দ্বারা কয়েকখানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা লওয়া হইত। হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহার নিজের পত্রিকাগুলি আমাদিগকে পড়িতে দিতেন। আমি উহার সম্পাদক ছিলাম। সমিতিটী তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টী বর্ণনা করিতে যাইয়া সঙ্কোচ বোধ করিতেছি; কেন না, উহা পাঠ করিতে করিতে পাঠকগণের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইবে। কিন্তু আমার অন্তরে উহা স্থায়ী দাগ রাখিয়া গিয়াছে, সুতরাং কিছু বলিতে হইতেছে। আমরা কয়েক জন পঞ্চম শ্রেণীতে যাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইলাম। কিয়ৎকাল পরেই ইহাদিগের মধ্যে এক জনের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হইল। ইনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ এবং স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী হইতে শেষ

পর্য্যন্ত আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ক্রমশঃ এই সুদর্শন বালকটীর দিকে আমার প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ইনিও প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কয়েক দিন যেন একটা ভাবাবেশের মধ্য দিয়া আমার দিন যাইতে লাগিল। তখন ছাত্রে ছাত্রে এইপ্রকার সম্বন্ধের নাম ছিল বন্ধুতা, এবং কে কাহার বন্ধু, কোন্ দুর্ভাগ্য বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিয়া বাঞ্ছিতের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছে, এবম্প্রকার আলোচনা সর্ব্বদাই শুনা যাইত। সুতরাং আমার নবভাবোদ্গমে অলৌকিক কিছুই ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না, সময়ে সময়ে প্রণয়ে কীট ঢুকিত, তরুণ প্রেমে কালিমা দেখা দিত। সহসা জাগিয়া দেখিলাম, একটা ষড়যন্ত্রের জাল আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। প্রিয় বালকটী আমার সহিত কথা বন্ধ করিলেন, ছাত্রেরা দুই দলে বিভক্ত হইল, একটী সহপাঠী বিশ্বাসঘাতক হইয়া আমাকে নদী-তীরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া এক বয়স্ক গুণ্ডা ছাত্র দ্বারা অপমানিত করিল, কেহ কেহ সর্ব্বৈব মিথ্যা অপরাধ রচনা করিয়া হেড্মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে যাইয়া আমাকে ধিক্কৃত করিয়া তুলিল। একটী যুবকের কথা না বলিয়া পারিতেছি না। সারদারঞ্জন সেন ও আমি এক শ্রেণীতে পড়িতাম ও এক বাটীতে বাস করিতাম। সে রত্নমণি বাবুর খুড়তুতো ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার গৃহে তাহার মর্য্যাদা ছিল। সে বিরোধী দলে যোগ দিল। এক দিন রাত্রিতে একত্র আহার করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সারদা আসিয়া অনর্থক আমাকে অভদ্র ভাষায় গালাগালি করিল। সে আমার অপেক্ষা বয়সে বড় ও বলিষ্ঠ ছিল কাজেই আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার কিছু কাল পরে আমার প্রতি তাহার মনোভাব আশ্চর্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। একদিন আমি জ্বর

লইয়া স্কুল হইতে আসিয়া একাকী বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে-ছিলাম। ক্রমে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এমন সময়ে কে এক জন আসিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, আমি চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিতেও পারিলাম না। একটু পরেই সংবাদ পাইয়া সারদা আসিল, গরম জল করিয়া নুণের সঙ্গে খাওয়াইয়া বমি করাইল, এবং বমি ও মলমূত্র নিজের হাতে পরিষ্কার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। যে কয় দিন পীড়িত ছিলাম, তাহার অক্লান্ত সেবা পাইলাম, এবং তদবধি প্রায় তিন বৎসর তাহাকে অনুরক্ত বন্ধুরূপে পাইয়া তাহার সাহচর্য্যে গুপ্তগৃহে বাস করিলাম। সারদা আমাকে এমন ভালবাসিত, যে তাহার পত্নীর প্রত্যেক পত্র আমাকে দেখাইত, সাংসারিক সুখদুঃখের কথা বলিত, জীবন সংগ্রামে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। বহু বৎসর হইল সে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে প্রতিপক্ষের সংখ্যা কমিয়া গেল, কিন্তু দুই চারিজনের বিদ্বেষ প্রশমিত হইল না। পড়াশুনায় ইহাদিগের মন ছিল না, কিন্তু কলহবিবাদে ইহারা খুব উৎসাহ দেখাইত। এই দলের নেতা কয়েক মাস পরে খেলিতে খেলিতে ঝগড়া করিয়া এক সঙ্গীর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। যে দিন আমাদের রিডিং ক্লাব স্থাপিত হইল, সে দিন বৈকালে ঐ দুর্দ্দান্ত যুবক অন্য স্কুল হইতে একটি বলবান্ ষণ্ডা ছাত্র ডাকিয়া আনিয়া তৃতীয় সহচর লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে আমার অপেক্ষায় রহিল। আমি একটু ঘুরিয়া আমার সমপাঠী ও সহবাসী একটী ছাত্রের সহিত বাসা হইতে অল্প দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম বিপরীত দিক্ হইতে তিনটী ছাত্র আসিতেছে। আমাদিগের মনে সন্দেহের লেশমাত্র উদিত হয় নাই—দুইজনে নিরুদ্বেগে কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর

হইতেছি, অকস্মাৎ ষণ্ডাটী দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়াই বুকের দ্বারা আমাকে এক বিষম ধাক্কা মারিল, আমি পড়িতে পড়িতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেলাম, এবং তাহার অতর্কিত ব্যবহারে তাহাকে কি বলিতে চাহিলাম, সে তৎক্ষণাৎ ছুতা ধরিয়া আমাকে টানিয়া নর্দ্দামায় জলকাদার মধ্যে ফেলিল; দলপতি যেন কিছুই জানে না, এই প্রকার ভাণ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিল, তৃতীয় ব্যক্তি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা চলিয়া গেল, আক্রমণকারী যাঁহার সাহায্যে স্কুলে পড়িত, তাঁহার নিকটে যাইয়া আমার এই অপমানের কথা বলিলাম। পরদিন হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে সুবিচার প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত দিলাম। তিনি কিছুই করিলেন না। প্রায় এক মাস পরে মুরুব্বীর আদেশে গুণ্ডা ছাত্র আমার কাছে মুখে ক্ষমা চাহিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে সরলতার পরিচয় পাইলাম না।

এই ঘটনার পরে উৎপীড়নের নিবৃত্তি হইল, কিন্তু রত্নমণি বাবুর সদাশয়তার জন্য আমি অন্য প্রকারে সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় পড়িলাম। শারদীয় অবকাশের পরে জানুয়ারী মাসে (১৮৮৪) বাড়ী হইতে আসিয়া দেখি ঐ দুর্দ্দান্ত ছাত্রটী অত্যন্ত গরিব ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের অধিবাসী বলিয়া তাঁহার গৃহেই স্থান পাইয়াছে। যদি সারদার ন্যায় ইহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইত, তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু লোকটী হিংস্র স্বভাব ছিল, অধিকন্তু দেহে অসুরের বল ধারণ করিত —জানি না কেন, সে আমাকে দেখিতে পারিত না; গায়ের জোরে যখন তখন আমাকে শাসাইত; একদিন হাড়ুডুডু খেলার মধ্যে ইচ্ছা করিয়া আমাকে এমন আঘাত করিল, আমি এক মাসকাল কোমরের বেদনায় কষ্ট পাইলাম। আমি পারতপক্ষে ইহার সংস্রবে

থাকিতাম না, তথাপি সব সময়ে অপ্রীতিকর ব্যাপার এড়াইতে পারিতাম না। ফলতঃ যে দেড় বৎসর এই ব্যক্তির সহিত এক আশ্রয়ে বাস করিয়াছি, সে সময়টা স্মরণ করিতে আজিও ক্লেশ বোধ হয়। এ লোকটী কনেষ্টবলের কাজ লইয়া চলিয়া যাইবার পরে আমি নিশ্চিন্ত হই।

কঠিন পীড়া

পূজার ছুটীতে বাড়ী গেলাম। বিজয়ার পরে বড় দাদা আনন্দমোহন গুহ মহাশয় জমিদারের কাজে নৌকাতে নাগরপুর যাইতেছেন জানিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গী হইলাম। আমরা নাগরপুর, কেদারপুর, গয়হাটা প্রভৃতি গ্রাম ঘুরিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলাম। তখন নাগরপুর অঞ্চলে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং তাহাতে বিস্তর লোক প্রাণ হারাইতেছিল। কয়েক দিন পরে, কালীপূজার দিন ভোর হইতে শরীরটা খারাপ বোধ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেজন্য একটুকুও সতর্ক হইলাম না। সকালে মুড়ি কলা ও পান্তাভাত, ঘণ্টা দুই পরে কতকগুলি বড় সবরীকলা এবং মধ্যাহ্নে ভাত তরকারীর সঙ্গে প্রচুর অম্বল উদরসাৎ করিলাম। অপরাহ্নে চলিতে ফিরিতে কষ্ট বোধ করিয়া জ্বরে শয্যা লইলাম। দিনের পর দিন জ্বর না ছাড়িতেই জ্বর হইতে লাগিল। গ্রামের দশ পনর মাইলের মধ্যে ডাক্তার বা কবিরাজ নাই। বিনা চিকিৎসায় নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করি, তাহাতে ফলোদয় কিছুই হইতেছে না। সে কালে জ্বররোগীকে দুধ খাইতে দেওয়া হইত না, সকালে ও সন্ধ্যায় মোটে দুইবার সাগু বা মুসূরী ডালের জল পাইতাম; ছোট দিদি পথ্য দিতেন, মা রাত্রিতে

নিজের কাছে রাখিতেন। দুই দিন আপনার ইচ্ছামত খাইলাম ; মা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর, ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ দিনে ভাত খাইতে চাহিলাম—জ্বর আছেই, তাপমানযন্ত্র তখনও চক্ষুগোচর হয় নাই। মা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে ডাকিলেন আমি গেলাম না। অন্তর্যামী আমার লোভকে সংযত করিয়া রাখিলেন। ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ; ধরিয়া না তুলিলে উঠিয়া বসিতে পরি না ; পথ্যের বাটী মুখে ধরিতে হয়। প্রাচীন সংস্কার রোগীকে খাটে শুইতে নিষেধ করে। কার্ত্তিকের হিম ; ঘরের মেঝেতে বিছানা; দর্ম্মার বেড়ায় সহস্র রন্ধ্র, উপরে নীচে শীতল বায়ুর অবারিত গতি। একদিন গভীর নিশিতে মা হঠাৎ দেখিলেন, আমার হাত ঠাণ্ডা; ব্যস্ত হইয়া নাকে হাত দিয়া দেখিলেন, নাকও ঠাণ্ডা। তখন এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, যে তাঁহার আর্ত্তনাদে দূর ও নিকট হইতে বহু নরনারী ছুটিয়া আসিলেন। বড় দাদা নাড়ী দেখিতে জানিতেন না ; কিন্তু মাকে আশ্বাস দিবার জন্য নাড়ী টিপিয়াই বলিলেন, "রজনী বেশ আছে, অনর্থক কাঁদিবেন না।" বস্তুতঃ আমার জ্ঞান পরিষ্কার ছিল। জ্বর যখন তিন সপ্তাহ পার হইতে চলিল তখন আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন ধীরে ধীরে বাহ্য জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ ছিন্ন হইতেছে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ হয় নাই। বাইশ দিন পরে প্রায় দশ মাইল দূর হইতে এক ব্রাহ্মণ কবিরাজ আসিলেন। ইঁহার খুব সুনাম ছিল। ইনি অধিক ঔষধ দিলেন না, কিন্তু যাহা দিলেন, তাহা ফলপ্রদ হইল ; তিনি অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, এই রোগী যদি ভাত খাইতেন, তবে ইঁহাকে আর রাখা যাইত না। চারি দিন পরে আবার আসিয়া কবিরাজ মহাশয় এক সপ্তাহের ঔষধ এবং

ছাব্বিশ দিন পরে জ্বরের বিরাম না হইলেও ভাত খাইবার ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার চিকিৎসা এই পর্য্যন্ত। প্রথম দুই দিন ভাত খাইবার পরে আমার প্রবল জ্বর হইল, ২৯ দিন হইতে একেবারে ছাড়িয়া গেল।

ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরও কবিরাজ ছিলেন। জ্বরমুক্ত হইবার কয়েক দিন পরে তিনি কর্ম্মস্থানে যাইবার পথে আমাকে দেখিয়া এক সপ্তাহের ঔষধ দিয়া গেলেন। এবার ঔষধ সেবন এইখানেই শেষ হইল।

ঠিক ষোল বৎসর বয়সে আমি এই সঙ্কটপূর্ণ পীড়ায় পড়িয়াছিলাম। এমন অনাচার করিয়া ও তিন সপ্তাহ চিকিৎসায় বঞ্চিত থাকিয়া যে বাঁচিয়া উঠিলাম—ইহা ভাবিলে আজও বিস্ময় বোধ করি। রক্ষাকর্ত্তা রক্ষা করিলেন, এ কথা ছাড়া আর কি বলিবার আছে।

তিন মাস পরে ময়মনসিংহ যাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম (১৮৮৪)।

চতুর্থ শ্রেণী

কলিকাতায় মহাপ্রদর্শনী দর্শন

এই বৎসরের দুইটী ঘটনা উল্লেখ করিব। প্রথমটী কলিকাতায় আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী দর্শন। আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম যে রাজধানীতে The Great International Exhibition হইতেছে। প্রথম দুই মাস আমাদের উহা দেখিবার তেমন উৎসাহ হয় নাই; কিন্তু মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। মধ্যম দাদা, আমি এবং চতুর্থ শ্রেণীর আরও তিনটী ছাত্র যাত্রা করিবার পরামর্শ করিলাম—ইহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে কলিকাতা

দেখে নাই। যাত্রীদের একজন আমার ন্যায় রত্নমণি বাবুর গৃহে বাস করিত, আমরা তাঁহার অনুমতি লইলাম। তারপর অর্থের ভাবনা। সকলেই গরিব, সুতরাং স্থির হইল, ময়মনসিংহ হইতে সরলরেখায় গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে, ইহাতে ব্যয় যথাসম্ভব কম পড়িবে—তখনও ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। আমরা পদব্রজে রওনা হইয়া গভীর রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে পঁহুছিলাম। এক দিন সেখানে বিশ্রাম করিলাম; মা ধার করিয়া দুই ভাইকে দশটী টাকা দিলেন। তৎপর দিন আমরা সিলিমপুর লক্ষ্য করিয়া বাহির হইলাম; অপরাহ্নে টাঙ্গাইল যাইয়া মাসীমার গৃহে আহার করিয়াই আবার যাত্রা করিলাম। সিলিমপুর টাঙ্গাইল হইতে দশ এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে; ঐস্থান হইতে একখানা ছোট ষ্টীমার একদিন পর এক দিন গোয়ালন্দ যাইত ও সেইরূপ গোয়ালন্দ হইতে ফিরিয়া আসিত। আমরা রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় তথায় উপস্থিত হইলাম—ভরসা ছিল, তথায় করটিয়ার জমিদারের কাছারী বাড়ীতে আশ্রয় পাইব। যাইয়া দেখি, উহা শূন্য পড়িয়া আছে। সেখানে সপ্তাহে এক দিন হাট বসে, কিন্তু হোটেল বা মুদিদোকান একটীও নাই। অপরিচিত স্থান, অন্ধকার রাত্রি, তখনও বেশ একটু শীত, আমরা যাই কোথায়? ইতস্ততঃ ঘুরিয়া একটা মাঠ পার হইয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া আশ্রয় পাইবার আশায় ডাকাডাকি করিয়া কোনও ফল পাইলাম না, তখন অগত্যা সেই হাটেই ফিরিয়া আসিলাম। আমরা কোথায় রাত্রি যাপন করিব, এই ভাবিয়া যখন উৎকণ্ঠায় আকুল, তখন অদূরে একখানা ঘরে আলো দেখিতে পাইলাম; তাহার মধ্যে টুন্ টুন্ শব্দ শুনা যাইতেছে। দরজা বন্ধ ছিল, আমি বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিলাম,

দুই তিনটী লোক কর্ম্মকারের কাজ করিতেছে। তাহাদিগকে দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলাম, তাহারা তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজেদের বিপদের কথা জানাইলাম, তাহারা নিরাপত্তিতে আমাদিগকে স্থান দিতে সম্মত হইল। আমরা গদ্দিতে পাটীর উপরে বসিলাম। তাহারা মুসলমান। অল্পকাল পরে একজন বলিল, 'আপনাদের আহারের আয়োজন করিয়া দিতেছি, আপনারা পাক করুন।" আমি বলিলাম, "আমরা জাতি মানি না, আপনাদের হাতেই খাইব।" একথা শুনিয়া লোকটী একটু বিরক্ত হইল, বোধ হয় ভাবিল, আমি পরিহাস করিতেছি। তখন আমি বুঝাইয়া বলিলাম, আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, সত্য সত্যই জাতি মানি না, মুসলমানের ভাত খাইতে আমাদের আপত্তি নাই।" তখন তাহারা রান্না করিতে গেল, আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রিতে তাহারা আমাদিগকে জাগাইয়া রান্নাঘরে সানকীতে ভাত ও মুগের ডাল পরিবেশন করিল, আমরা পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। তাহারা দুই তিনটা নূতন পাশবালিশ দিল, আমরা আরামে সুনিদ্রায় রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন বেলা নয়টার সময় ষ্টীমার ছাড়িল। আমরা জনপ্রতি এক টাকা দিয়া এঞ্জিনের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিবার অধিকার পাইলাম, এবং অপরাহ্নে গোয়ালন্দ পঁহুছিলাম। ষ্টীমারে সে দিন আর কোন যাত্রী ছিল না। সিলিমপুর-গোয়ালন্দ পথে ষ্টীমারে যাত্রী বহন করিবার ব্যবস্থা আমাদের জন্যই বিহিত হইয়াছিল, কেন না, এক বৎসর যাইতে না যাইতেই উহা উঠিয়া যায়। আমরা প্রদর্শনী উপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হইয়াও এক ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট পাইলাম, এবং রাত্রিতে গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে দাদার

ছাত্রাবাসে যাইয়া উপনীত হইলাম। তাঁহাকে পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

অবিলম্বে আহার করিয়া মেসের কয়েকটী ছাত্রের সহিত প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। যাদুঘরে ও তৎসহ সম্মুখের ময়দানে বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া আন্তর্জাতিক মহাসম্মিলনী বসিয়াছিল। আমরা কলিকাতায় নবাগত, তদুপরি এই বিপুল সমারোহ, যাহা দেখি তাহাই আমাদিগের নিকট বিস্ময়কর। সায়ংকালে বাসভবনে আসিয়া আহারান্তে আমরা আবার ঐ সঙ্গীদিগের সহিত গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখিতে চলিলাম। সার্কাসও পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই; যাহা দেখিলাম তাহা খুবই চমৎকার বোধ হইল—দুই একটী আশ্চর্য্য ক্রীড়া আজও ভুলিতে পারি নাই। রাত্রি প্রায় বারটার সময় সার্কাস ভাঙ্গিল; অমনি সঙ্গীরা দৌড়াইয়া যাইয়া ট্রাম গাড়ীতে উঠিলেন—উহা দর্শকদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; এই গাড়ীর পরে আর গাড়ী নাই। মধ্যম দাদা পশ্চাতে ছিলেন, আমি তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইলাম, ফলে আমরা দুইজন পড়িয়া রহিলাম, আর সকলে চলিয়া গেলেন। আমরা তখন এক খানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়োয়ানকে বলিলাম, "পটলডাঙ্গায় চল";—শুনিয়াছিলাম, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট যে অঞ্চলে, তাহার নাম পটলডাঙ্গা। সে আমাদিগকে কলেজ ষ্ট্রীটে—বোধ হয় এখন যেখানে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট তাহার সন্নিকটে কোন স্থানে, তখন হ্যারিসন রোড হয় নাই—আনিয়া বলিল, "এই পটল-ডাঙ্গা, আপনারা নামুন।" আমরা গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কোথায় কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন এক নিদ্রিত দোকানদারকে ডাকাডাকি করিয়া জাগাইয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম, "কোন দিকে যাইব"। সে বলিল, "উত্তর দিকে।" আমরা উত্তর দিকে চলিলাম, পশ্চাৎ হইতে এক ভদ্রলোক আমাদিগকে ডাকিয়া ফিরাইলেন, বলিলেন, আপনারা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে যাইবেন? আসুন আমি দেখাইয়া দিতেছি।" তিনি আমাদিগকে বিপরীত দিকে লইয়া চলিলেন। মনে মনে ভ্রম হইতে লাগিল, এত রাত্রিতে দুষ্ট লোকের চক্রান্তে না জানি কি বিপদেই পড়ি! ভদ্রলোকটী কয়েকটা গলি ধরিয়া এক রাস্তার মোড়ে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এই সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ঐ দেখুন দেয়ালের গায়ে নাম লেখা আছে।" তিনি চলিয়া গেলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ ষ্ট্রীটে ঢুকিলাম; কিন্তু দুর্দ্দৈবের উপর দুর্দ্দৈব, কিছুতেই বাড়ী খুঁজিয়া পাইতেছি না। এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা গলদঘর্ম্ম হইয়া গেলাম, বাড়ীটা এক সরু গলির মধ্যে, তাহা মনে ছিল না, বাহির হইতে উহার চেহারাটাও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই, কাজেই এক একটা বাড়ী দেখিয়া বিভ্রান্ত হইতে লাগিলাম। অবশেষে দৈবাৎ এক গলিতে প্রবেশ করিয়া একটু অগ্রসর হইয়াই দেখি সম্মুখে ৫০ নম্বরের বাড়ী। আমাদিগকে সঙ্গীদিগের সহিত না দেখিয়া দাদা ও অন্যান্য সকলে দারুণ ভাবনায় পড়িয়া থানায় সংবাদ দিবার পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে আমরা দুই ভাই কলিকাতা নগরীতে প্রথম দিনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলাম।

তৎপরে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, ইডেন গার্ডেন, হাইকোর্ট, জাহাজ ঘাঠ প্রভৃতি দেখিয়া তৃতীয় দিন রাত্রের গাড়ীতে আমরা কলিকাতা ছাড়িলাম; গোয়ালন্দ হইতে পূর্ব্বের বন্দোবস্তে ষ্টীমারে সিলিমপুর যাইয়া টাঙ্গাইল হইয়া বাড়ী পঁহুছিলাম, এবং সেখানে দুই

তিন দিন থাকিয়া ময়মনসিংহে ফিরিয়া গেলাম। আমরা যে পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলাম, তাহাতে খুব অল্পব্যয়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

আমি কলিকাতায় একটীমাত্র জিনিষ ক্রয় করিয়াছিলাম, সেটী Principia Latina, Part I। ইহার পূর্ব্বকথা এই। এক দিন আমাদের গণিতের শিক্ষক বলিলেন, "তুমি গিল্‌ক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিও; সে জন্য লাটিন শিক্ষা কর।" গিল্‌ক্রাইষ্ট পরীক্ষা যে কি, কিছুই জানিতাম না, কিন্তু কথাটা মনে রহিল।

একটী ভদ্রলোক সপ্তম শ্রেণীতে আমাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি কি করিয়াছিলেন, স্মরণ নাই; তবে কলিকাতায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়াছিলেন, আমার নিবেদন শুনিয়া আমার নিকটে একটা টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত টাকাটা কুড়াইয়া লইলাম, এবং তদবধি তাঁহার সাহায্যের প্রত্যাশা ত্যাগ করিলাম। লাটিন পুস্তকখানি দ্বারা এই অবজ্ঞা-প্রণোদিত দানের সদ্ব্যবহার করা গেল।

নূতন পুস্তক পাইয়া উৎসাহের সহিত লাটিন শিখিতে আরম্ভ করিলাম। First Declension, (প্রথম শ্রেণীর শব্দ রূপ) mensa mensae মুখস্থ করিয়া দুইটী অনুশীলন উত্তীর্ণ হইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। তারপরে Second Declension এ যাইয়া একেবারে চক্ষুস্থির—কথাটার অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। লাটিন শিক্ষা চারি বৎসরের জন্য বন্ধ রহিল।

এখন দ্বিতীয় ঘটনার কথা বলিতেছি। এত দিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স, এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে

হইতেছিল। ১৮৮৪ সনে নিয়ম হইল, এই তিনটী পরীক্ষা মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে হইবে, সুতরাং ঐ বৎসরের পরীক্ষার্থীরা তিন মাস সময় অধিক পাইল ; সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর জীবনকালও তিন মাস বাড়িয়া পনর মাস হইল। এজন্য গ্রীষ্মের ছুটীর পরে প্রবীণ শিক্ষক মহাশয় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বলিলেন, যে তাহাদিগের একটা পরীক্ষা লওয়া হইবে, এবং যাহারা তাহাতে প্রশংসনীয় যোগ্যতা দেখাইবে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইবে। এই আশ্বাস পাইয়া আমরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কয়েক দিন পরে আমার মনে হইল, যে বৎসরের মধ্যমভাগে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলে পরিণামে ফল ভাল হইবে না। আমি সেইজন্য স্থির করিলাম, পরীক্ষা দিব না। অচিরে চতুর্থ শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পরীক্ষা দিবে তো ?" আমি বলিলাম, "না।" আমার উত্তর শুনিয়া ক্লাসের সমস্ত ছাত্র তখনই পরীক্ষা দিবার সংকল্প ত্যাগ করিল; পরীক্ষা আর হইল না। জীবনের সন্ধিস্থলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা সুবুদ্ধি দিয়া আমাকে আসন্ন দুর্গতি হইতে রক্ষা করিলেন।

অগ্নিকাণ্ড

১২৯১ সালের চৈত্র মাসে (১৮৮৫) ময়মনসিংহ সহরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইল। একদিন অপরাহ্নে স্কুল হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, পশ্চিম দিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে। অমনি আমার মনে হইল আজ যদি আগুন লাগে, তবে আর রক্ষা থাকিবে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় যাইয়া বিছানায় সবে বসিয়াছি, এমন সময়ে রাস্তা হইতে এক সহাধ্যায়ী ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র এস, আগুন লাগিয়াছে।" আমরা দৌড়িয়া আগুনের দিকে

যাইতে না যাইতে উহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দুর্গাবাড়ীর নিকটে এক বাড়ীতে আগুন লাগে, দেখিতে না দেখিতে আগুন ছোট বাজার, বড় বাজার, চকবাজার ছাইয়া ফেলিল। তখন সহরে টিনের ঘর ছিল না; পাকা বাড়ীর সংখ্যাও খুব অল্প ছিল; অধিকাংশ বসতবাটী ও দোকানপাটের ছিল খড়ের চালা ও দর্ম্মার বেড়া। ঘর দুয়ার জিনিসপত্র বাঁচাইবার জন্য বহু লোক জড় হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছুই করিতে পারিল না। আমরা একটা ঘরের বেড়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছি, চক্ষুর পলকে অগ্নিশিখা বায়ুভরে দূরত্ব উল্লঙ্ঘন করিয়া ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল, সাহায্যকারীরা তখন আগুনের জালে পড়িয়া দগ্ধ হইবার ভয়ে অন্য দিকে চলিয়া গেল। একে চৈত্রের উত্তাপ, তদুপরি প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ—এই দুই সহায় পাইয়া অগ্নি যাত্রার স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে শত শত গৃহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে যাইয়া পরিশেষে নিবৃত্ত হইল।

এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিস্তর দালান কোঠা বিনষ্ট হইল, পশুপক্ষী মরিল, আট দশ জন মানুষ প্রাণ হারাইল। আমরা সে রাত্রি হাসপাতালে ছিলাম, সেখানে মৃতদেহ দেখিয়াছি, আমাদের সম্মুখে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে লোক প্রাণত্যাগ করিল, তাহাও দেখিয়াছি। এক হতভাগ্য ছোট বাজারে তাহার প্রভু ধনী ব্যবসায়ীর পাকা বাড়ীর প্রাচীর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াই মরিয়াছিল; কেহ বা প্রাণ বাঁচাইবার আশায় রাজপথে সেতুর নীচে আশ্রয় লইয়া সেখানেই মৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কোনও সবজজের পরিবারবর্গ কিছুতেই দ্বিতল বাটী হইতে লোকের সম্মুখে বাহির হইয়া আত্মরক্ষা করিবেন না, এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক অনেক করিয়া বুঝাইয়া অগত্যা জোর

করিয়া তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যান। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মহম্মদ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার বাটীতে প্রবেশের পথ নাই, তিন দিকে আগুন লাগিয়াছে, তখন পশ্চাদ্দিকের পুষ্করিণী সাঁতার দিয়া পার হইয়া স্ত্রীকন্যাদিগকে রক্ষা করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারদিগকে এক রাজনৈতিক সন্ন্যাসী নদীর অপর পার হইতে আসিয়া নৌকায় তুলিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। মোক্তার পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্যস্ত হইয়া আসিতে আসিতে বাড়ীর একটু দূর হইতে দেখিলেন, তাহার আশে পাশে আগুন জ্বলিতেছে, অমনি তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা মহাপ্রলয় হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দগ্ধাবশিষ্ট সহর দেখিয়া বোধ হইল, যেন শত শত তোপের গোলা-বৃষ্টিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সে দিন কয়েকটী রাজকর্ম্মচারীর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে ময়মনসিংহনগর আর একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বড় বাজারে অনেকগুলি জুতার দোকান ছিল, দোকান ঘরগুলি ইষ্টকের, কিন্তু বারাণ্ডায় খড়ের চাল। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বারাণ্ডাগুলিতে আগুন ধরিল, এবং সেই আগুনে চৌকাঠ কপাট কড়িবর্গা পুড়িতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যবসায়ী এলাহী বক্স জুতার সঙ্গে বারুদের কারবারও করিতেন; দোকানের পশ্চাদ্ভাগে, রাজপথের পার্শ্বে এক কুঠরীতে প্রচুর পরিমাণে বারুদ মজুদ ছিল। আগুন জুতার দোকান দগ্ধ করিতে করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু মানুষের সাধ্য নাই যে, দোকানের মধ্যে প্রবেশ করে। সায়ংকালে নগরময় মহা আতঙ্কের

সঞ্চার হইল—যদি একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই বারুদের স্তূপের উপর যাইয়া পড়ে, তবে সহর উড়িয়া যাইবে। তখন কয়েকটী ইয়ুরোপীয় ও বাঙ্গালী পুলিশ কর্ম্মচারী লোকজন সহিত পশ্চাদ্দিক হইতে সমস্ত বারুদ সরাইয়া ফেলিলেন, নগরবাসী নিরাপদ হইল।

কলিকাতা গেজেটে গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে লিখিত হইয়াছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ সওয়া লক্ষ টাকা। জনসাধারণের অনুমান ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা শুনিয়াছিলাম, এলাহী বক্স ও অটল পাল—এই দুইজনের প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

এই ব্যাপারের পরে নিজেদের বাড়ীতে আগুন লাগিল। রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় যে বাটীতে বাস করিতেন, তাহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য। তিনি স্বীয় বিপুলায়তন প্রাসাদ পরিকল্পনা করিয়া ঐ বাটী ও ভূমি খাসদখল করিলেন। ঐ ভূমিতেই উকীল কালীনাথ সেন মহাশয়ের বসতবাটী ছিল; তিনি অদূরে জমি কিনিয়া একটী ছোট ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে উঠিয়া গেলেন, রত্নমণি বাবুও তাঁহার ভিতর বাড়ীতে একখানি খড়ের ঘরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, আমরা দুই তিনটী ছাত্র কালীনাথ বাবুর বৈঠকখানায় বা লোন আফিসে স্থান পাইলাম। ঐ বাড়ীর উত্তরে লোন আফিস। তৃতীয় শিক্ষক মহিমচন্দ্র বসু মহাশয়ের ও দক্ষিণে দ্বিতীয় শিক্ষক কালীকুমার গুহ মহাশয়ের বসতবাটী ছিল। এই সময়ে মহিম বাবু পরিদর্শকের পদ পাইয়া টাঙ্গাইল চলিয়া যাইবেন, এই প্রকার স্থির হইল; এবং রত্নমণি বাবু তাঁহার বাটী ক্রয় করিবেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে নিশ্চিত কথাবার্ত্তা হইয়া রহিল। বৈশাখ মাসে একদিন বৈকালে এক বন্ধুর গৃহে বসিয়া আলাপ করিতেছি, এমন সময়ে

কয়েকটী ছোট ছেলে "আগুন," "আগুন" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। বাহির হইয়া দেখি, আমাদিগের বাসার দিকেই আগুন লাগিয়াছে। তখন আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। নিকটে যাইয়া দেখিলাম তৃতীয় শিক্ষকের বাটী হইতে আগুন আসিয়া আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে; তাহাতে রত্নমণি বাবু এবং কালীনাথ বাবুর খড়ের ঘরগুলি পুড়িয়া ছাই হইল, পাকাবাড়ীটী অনেক কষ্টে বাঁচিয়া গেল। তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় বলিতে গেলে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন; তাঁহার একখানি ঘরও রহিল না, জিনিসপত্রও প্রায় সমস্তই গেল। এই বিপদের মধ্যে রাত্রিতে এক মিঠাইর ফিরিওয়ালা আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিল।

এপ্রিল মাসে (১৮৮৫) বার্ষিক পরীক্ষা হইল, আমি ইংরেজী, গণিত ও সংস্কৃত-বাঙ্গালায় প্রথম ও ইতিহাস-ভূগোলে দ্বিতীয় হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। শ্রুতলিপিতে পূর্ণ নম্বর পাইয়াছিলাম। চতুর্থ শ্রেণীটী খুব বড় ছিল, এবং নসিরাবাদ এণ্ট্রান্স স্কুল উঠিয়া যাওয়াতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছাত্র আসিয়া প্রতিযোগিতা একটু কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল। বন্ধু মহিমচন্দ্র রায় দ্বিতীয় হইয়াছিলেন।

পরীক্ষার ফল দেখিয়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাকে ও মহিমকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন। আমি দাদার মত চাহিয়া ইংরেজীতে একখানা পত্র লিখিলাম। তিনি তদুত্তরে স্পষ্ট কথায় অমত জানাইলেন, এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে লিখিলেন "No less than twelve mistakes disfigure the letter now before me"—সে letterও একখান post card. এই বার আর একটা বিপদ কাটিয়া গেল, আমরা হরষিত অন্তরে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম।

এই সময়ের দুইটী ঘটনা বর্ণনা করা আবশ্যক; কেনা না, সামাজিক ইতিহাসে ও দুটীর মূল্য আছে।

আমাদের সহাধ্যায়ী এক যুবক নগরের উপকণ্ঠে কোন সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রূপে বাস করিতেন। কালক্রমে তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও যুবক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ছাত্রটী আমার বন্ধু, একথা আমাকে বলিয়াছিলেন; ইহার অধিক আমি কিছু জানিতাম না। দুই বৎসর পরে তিনি ঐ গৃহ হইতে চলিয়া আইসেন। চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার সপ্তাহ তিন পূর্ব্বে মহিলাটীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যুবক তাঁহাকে গোপনে আট মাইল দূরবর্ত্তী নিজ ভবনে লইয়া যান; অভিপ্রায় ছিল, তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু দুইজনেরই অভিভাবক এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী হইলেন, এবং যুবতীর মাতা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। যুবক প্রণয়িনীর মিলনাশায় বঞ্চিত হইয়া পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পরীক্ষার পাঠে মনোনিবেশ করিয়া ক্রমশঃ সুস্থ হইলেন। ইনি যে বিধবা বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাতে বহু লোক ইঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইল, এবং এ ব্যক্তির নিন্দা ও গঞ্জনার অবধি রহিল না।

গ্রীষ্মের ছুটীতে আর একটী ঘটনা ঘটিল। বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণ তনয় ময়মনসিংহে সরকারী চাকুরী করিতেন। এক দিন তিনি কাছারীতে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ও পত্নীর মধ্যে ঝগড়া হইল। সায়ংকালে বাড়ী আসিয়া তিনি স্ত্রীর মুখে বিবাদের কাহিনী শুনিলেন। নিশীথ কালে যখন পাড়ার সকলে নিদ্রায় অচেতন, সেই সময়ে পুত্র মাতার ঘরে যাইয়া তাঁহাকে মারিতে মারিতে ভূমিতে ফেলিয়া বুকের উপরে চাপিয়া বৃদ্ধার জিভ টানিয়া ধরিয়া

চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গিন্নী শীগ্‌গির বঁটি আন, যে জিভ দিয়া এ তোমাকে গালাগালি করিয়াছে, সেই জিভ কাটিয়া ফেলিব।" মাতার আর্ত্তনাদে জাগিয়া উঠিয়া প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল।

সুপ্রসিদ্ধ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ তখন ময়মনসিংহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এই অমানুষিক নৃশংস ব্যবহারের সংবাদ শুনিয়া লোকটীকে সমাজচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গাবাড়ীতে এক সভা আহ্বান করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না; মাতৃ-পীড়ক ব্রাহ্মণ যুবকের সামাজিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিল।

আমি এই দুইটী ঘটনার বিবরণ সঞ্জীবনী পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়, এবং সম্পাদক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।

সঞ্জীবনী পড়িয়া দাদা আমাকে একটা অজ্ঞাত সংবাদ দেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে যুবক স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের প্রেম পঙ্কিল হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটীর পরবর্ত্তী জীবন শোচনীয়।

তৃতীয় শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িবার কালে দুইটী ঘটনার মধ্য দিয়া আমার জীবনগতি চিরদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেগুলি একটু বিস্তৃতরূপে বলা আবশ্যক; তৎপূর্ব্বে সময়ানুসারে কয়েকটী বিষয় বিবৃত করিতেছি।

মহিম বাবু স্থানান্তরে চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি. এ. তৃতীয় শিক্ষক হইয়া আসিলেন। জেলা স্কুলে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বলিয়া ছাত্রগণের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া

খুব কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। আমার জীবনপ্রসঙ্গে ইঁহার কথা আবার আসিবে।

গুপ্তবৃন্দাবন দর্শন

গ্রীষ্মের ছুটীতে (১৮৮৫) সোজা পথে বাড়ীতে না যাইয়া কতিপয় বন্ধুর সহিত গুপ্তবৃন্দাবন দেখিতে চলিলাম। ঢাকার উত্তর হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত বন ভাওয়ালের ও মধুপুরের গড় অথবা পাহাড় নামে পরিচিত, তাহার অভ্যন্তরে, ময়মনসিংহ সহর হইতে ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই তীর্থ অবস্থিত। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে আশ্রমে বা আখড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দুই একটী বৈরাগী মশাল লইয়া জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আমাদিগকে চাল ডাল আনিয়া দিল, আমরা খিচুড়ী খাইয়া সেই নিবিড় বনে একটা দ্বারহীন গৃহে রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে এক আশ্রমবাসী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইল। এই কেশীঘাট, এই লতায় কৃষ্ণ দুলিতেন, এই গাছে ঐ যে সাদা দাগগুলি, ওখানে ঠাকুর মাখন খাইয়া হাত মুছিতেন—ইত্যাদি কত দেখিলাম, কিন্তু কোনটাই প্রামাণিক বলিয়া মনে হইল না। তারপর আমরা নয় দশ মাইল বিস্তৃত সেই অরণ্য পার হইয়া সারাদিন হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় কুটুরিয়া গ্রামে পঁহুছিলাম। তখন খুব বৃষ্টি হইতেছে। আমরা এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় চাহিয়া নিরাশ হইলাম। অপর এক ব্রাহ্মণের আঙ্গিনার উপর দিয়া জলধারার মধ্যে দ্রুত যাইতে দেখিয়াই তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া তাঁহার গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, আমরা তাঁহার সযত্ন আহার ও শয়নের ব্যবস্থায় আপ্যায়িত হইলাম। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে আমি বানিয়াফৈর গ্রামে

আমার এক মাসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম; তাঁহার ভাসুরপুত্র ও ঐ গ্রামের এক সহাধ্যায়ী আমার সঙ্গী ছিল। এই মাসীমাকে আমি পূর্ব্বে বা পরে আর দেখি নাই। সেখানে তিন চারি দিন থাকিয়া একটী ত্রিভুজের দুই বাহু বেষ্টন করিয়া বাড়ীতে যাইয়া পর্য্যটন সমাপ্ত করিলাম।

জুলাই কি আগষ্ট মাসে একদিন প্রাতঃকালে ময়মনসিংহে প্রবল ভূমিকম্প হইল; তাহাতে জেলা স্কুলের বাড়ী স্থানে স্থানে ফাটিয়া গেল। বোধ হয় দুই এক দিন স্কুল বন্ধ ছিল, তারপর স্থির হইল স্কুল বসিবে। প্রথম দিন পাঠ আরম্ভ হইবার সময়ে আমরা অনেকগুলি ছাত্র ব্যায়ামের ঘরে সমবেত হইলাম, এবং নির্দ্ধারণ করিলাম, বারাণ্ডায় পড়িতে যাইব না, কেন না, আমাদের মতে তাহাতে বিপদ আছে। কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া শিবেন্দ্র বাবু বারাণ্ডা হইতে আমাদিগকে ডাকিলেন, আমরা গেলাম না। আরও কিছু কাল পরে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে স্কুলে যাইতে আদেশ করিলেন, আমরাও দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্লাসে যাইয়া বসিলাম। কিন্তু যাহারা পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত ছিল, শিবেন্দ্র বাবু শুধু তাহাদিগকেই পড়ার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন না কেন?" তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগকে (unruly boys) কিছু বলিতে চাই না।" তখন আমি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে লিখিত অভিযোগ করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া মিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিলেন, এবং ক্লাসে যাইয়া শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন। স্কুলের কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকারই চলিল।

শিবেন্দ্র বাবু রত্নমণি বাবুর আত্মীয় ছিলেন। সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া আসিয়া শুনিলাম, তিনি আমাকে পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমি যথাসময়ে তাঁহার বাসায় গেলাম। গুপ্ত মহাশয় আমাকে মধুর বাক্যে উপদেশ দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, শুধু পড়াশুনায় ভাল হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল না, আমাকে ব্যবহারেও বিনম্র হইতে হইবে; মেধাবী ছাত্র চরিত্রেও সুন্দর হইবে, ইহাই আদর্শ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের ইংলণ্ড-প্রবাস বর্ণনা করিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আমি শিবেন্দ্র বাবুর উপদেশ শুনিয়া আকৃষ্ট ও উপকৃত হইলাম। ইহার পরে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ উভয় পক্ষেই প্রীতিপ্রদ ছিল। পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন, এবং পর বৎসর দর্শনে এম্. এ. পাস করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জেলা স্কুলে একটা ছাত্রসভা ছিল, প্রতিবৎসর বসন্তকালে সমারোহের সহিত তাহার বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইত। এই বৎসর জেলা স্কুল ও ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনের ছাত্রদিগকে লইয়া একটা মিলিত সমিতি স্থাপিত হইল; শেষোক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ রোহিণীকুমার গুহ, বি. এ., ও চতুর্থ শিক্ষক পূজনীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলাম, এবং এই সূত্রে ইঁহাদিগের, বিশেষতঃ গুরুদাস বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিতে লাগিলাম। শারদীয় অবকাশের প্রাক্কালে জেলা স্কুলের হলে সমিতির এক বিপুল অধিবেশন হইল, তাহার জন্য আমি একটা ইংরেজী কবিতা লিখিলাম,

মহিম তাহা পাঠ করিলেন। আমি তখন ইংরেজী ছন্দের কিছুই জানিতাম না, তথাপি উহা উভয় স্কুলের শিক্ষকগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এইরূপে দুর্লক্ষ্য পথে আমি বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী

দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ময়মনসিংহে আসিয়া রত্নমণি বাবুর বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে পরিশেষে তাঁহার বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক গৌরকান্তি যুবক পাঠে নিমগ্ন আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোবিন্দনাথ গুহ কি এই বাড়ীতে আছেন?' তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ বাবু, আপনার ভাই আসিয়াছে।" দাদা অন্য ঘরে ছিলেন। পরে জানিলাম, ইনি শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইঁহারা দুইজন এক সঙ্গে বাস করিতেন ও একত্র ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, দুইজনেরই ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্বভাবতঃই অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে আমাদিগের এক বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। আহার করিতে করিতে গুরুদাস বাবু আমার পাতা হইতে ভাত তুলিয়া খাইলেন, আমি তো দেখিয়া একেবারে অবাক্। পরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুদাস বাবু না ব্রাহ্মণ, তবে আমার উচ্ছিষ্ট ভাত খাইলেন কিরূপে?" দাদা বলিলেন "গুরুদাস বাবু ব্রাহ্ম, জাতি মানেন না।" মুক্তাগাছা ফিরিয়া যাইবার সময় দাদা আমাকে বলিয়া দিলেন, "গুরুদাস বাবুকে প্রণাম করিয়া যাইও।"

তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম, এবং তদবধি আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

আমি যখন জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, তখন গুরুদাস বাবু এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িতে গিয়াছেন। ১৮৮৪ সনে তিনি এফ্. এ. পাশ করিয়া ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনের চতুর্থ শিক্ষক হইয়া আসিলেন। রত্নমণি বাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, এবং তিনি ইঁহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; সুতরাং সময়ে সময়ে আমরা ইঁহাকে আমাদিগের গৃহে দেখিবার সুযোগ পাইতাম। গুরুদাস বাবু আসিলেই আমাদিগকে পাঠ ও ধর্ম্মবিষয়ে সদুপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ ইনি আজন্মসিদ্ধ শিক্ষক ও আচার্য্য ছিলেন। শিক্ষকতার কার্য্যে গুরুদাস বাবু কেমন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইনি যখন নূতন স্কুলে কর্ম্ম লইলেন, তখন আমরা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। অল্প কালের মধ্যেই সুশিক্ষক বলিয়া ইঁহার নাম প্রচারিত হইল, এবং তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমরা একদিন ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনে যাইয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া ইঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিলাম। তারপর ইনি মহিম চন্দ্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে আমার অন্তরে একটা আতঙ্ক জন্মিল; আমি ভাবিলাম, এমন শিক্ষকের নিকটে যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় কিছুতেই পারিয়া উঠিব না। উদ্বেগের তাড়নায় একদিন মহিমের বাড়ী যাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ইঁহার পড়াইবার বিষয় ও রীতি দেখিলাম। তৎপরে ইনি যে পুস্তক হইতে মহিমকে বাঙ্গালা-ইংরেজী তর্জ্জমা করাইতেন, আমিও তাহা হইতে তর্জ্জমা করিতে আরম্ভ করিলাম, মহিম নিজের খাতায় গুরুদাস

বাবুর সংশোধন দেখিয়া আমার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন। ইহাতে আমার খুব উপকার হইয়াছিল। এখানে বলা কর্ত্তব্য, যে বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্য ও ব্যাকরণে মহিম আমার অপেক্ষা মোটে এক নম্বর কম পাইয়াছিলেন।

পূজার ছুটীর পরে, নবেম্বর মাসে (১৮৮৫) প্রায়শঃ সায়ংকালে গুরুদাস বাবুর নিকট যাইতে লাগিলাম। এক দিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তিনি আমাকে প্রার্থনাপূর্ব্বক এক সমিতির সভ্য করিলেন; কে কে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমাকে জানিতে দিলেন না; সহি করিবার কাগজখানা এমন করিয়া ধরিলেন, যে আমি শুধু নিজের নাম লিখিবার স্থান পাইলাম, অপর কাহারও নাম দেখিতে পাইলাম না। পরে জানিলাম, সমিতির নাম "বিশ্বাসী মণ্ডলী" (The band of the Faithful)। ইহার তিনটী মূলমন্ত্র ছিল—

In God Almighty is our strength. (সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে আমাদের শক্তি নিহিত) United we stand, divided we fall. (ঐক্যে জয়, অনৈক্যে পতন) Whatever I do I shall do for my country. (আমি যাহাই করি না কেন, আমার দেশের জন্য করিব)

কয়েকদিন পরে কথায় কথায় গুরুদাস বাবু বলিলেন, "তুমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছ, 'যাহা কিছু করিবে, দেশের জন্য করিবে; তবে তুমি স্বদেশী বিদ্যালয় (native institution) থাকিতে সরকারী স্কুলে (Government school এ) পড়িবে কিরূপে?" হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনিয়া আমার মনে বিষম ধাক্কা লাগিল; সে দিন আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইল না, আমি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া গেলাম।

কয়েক সন্ধ্যা ধরিয়া দুই জনের মধ্যে সমস্যাটীর বিচার চলিল ; আমার মন প্রস্তুত করিতে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

মন প্রস্তুত করিবার কাজটা বড় সহজ ছিল না। পূজনীয় রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় আমাকে দৈন্যের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন ; আত্মীয় ছাড়া আর কোনও ছাত্রকে তিনি এত নীচের শ্রেণী হইতে নিজের গৃহে রাখেন নাই ; আমাকে এই আশায় রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি তাঁহার পাঁচ বৎসরের ব্যয়ভারবহন সার্থক করিব। তাঁহার আশ্রয়ে আমরা আহার ও পাঠ সম্বন্ধে খুব আরামে ছিলাম ; আমাদিগের দুই বেলা আহার পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ হইত ; রাত্রিতে পড়িবার জন্য প্রয়োজনমত তৈল পাওয়া যাইত। তাঁহার পরিবারের ও ছাত্রদিগের মধ্যে অন্নব্যঞ্জনের কোনও পার্থক্য ছিল না। আমরা খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পাইতাম, পুরাতন রাঁধুনীটীও চমৎকার রাঁধিত। রত্নমণি বাবু আমাদিগকে কাজের ফরমাইস দিয়া কখনও পাঠের ব্যাঘাত ঘটাইতেন না। তাঁহার মুখে কখনও রুক্ষ ভাষা শুনি নাই ; উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও তিনি উত্তেজিত হইতেন না, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীকে পিসীমা বলিয়া ডাকিতাম, এবং তিনিও আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন।

তারপর, জেলা স্কুল আমার নিকট একটা গর্ব্বের বস্তু ছিল; ইহার বৃহৎ অট্টালিকা, ব্যায়ামশালা, উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, বিস্তৃত ক্রীড়ার মাঠ, ইহার ছাত্রসংখ্যা ও অর্থবল—সকল বিষয়েই তিন বৎসরের শিশু ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসন ইহার সহিত তুলনায় নগণ্য বলিয়া বোধ হইত, এবং যখন তখন আমার কথাবার্ত্তায় তাহা প্রকাশ পাইত। একটা পরিণত তরুকে সমূলে উৎপাটন করিয়া অন্যত্র

রোপণ করা যেমন কঠিন, উক্ত দুই কারণে জেলা স্কুল ছাড়িয়া যাওয়ার প্রস্তাবও আমার পক্ষে সেইরূপ কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

কিন্তু যে মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতেই হইবে। যে স্কুলে পড়িতেছি, তাহা গবর্ণমেণ্টের, যে স্কুলে যাইবার প্রশ্ন আমার চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে, তাহা আনন্দ-মোহন বসুর পরিচালনায় তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ স্থাপন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যোগ বাড়িতেছে, তদুপরি অন্তরে সদ্যঃ স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; সুতরাং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলাম—যতটুকু বুঝিলাম—তাহার নিকট নতি স্বীকার করিতে হইল। আমি জেলা স্কুল, অতএব তৎসহ হেড্-মাষ্টার মহাশয়ের গৃহ, ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলাম।

কর্ত্তব্য নির্ণয়ের পরে গুরুদাসবাবুর সহিত উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল। আমার ছাত্রবৃত্তি শেষ হইতে একমাস কয়েকদিন বাকী ছিল। ১৮৮৬ সন হইতে কিরূপে অত্যাবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে, সেই দুশ্চিন্তায় আমার মন কখনও কখনও প্রপীড়িত হইত। গুরুদাসবাবু স্বয়ং-প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে জানাইলেন, তিনি আমাকে নিজের কাছে রাখিবেন ও খাইতে-পরিতে দিবেন। তিনি তখনও বিবাহ করেন নাই, বেতনও সামান্য পাইতেন। আমি তাঁহার উদার আহ্বানে পরমপিতার করুণার পরিচয় পাইলাম। তিনি রত্নমণি বাবুর নিকটে অন্নের ও স্নেহের ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, এজন্য নির্দ্ধারিত হইল যে, আমি জেলা স্কুল ছাড়িয়াই তাঁহার গৃহে বাস করিতে আসিব না, এক সপ্তাহ অন্যত্র আহার করিব।

১৮৮৫ সনের ২৩এ নবেম্বর সকালে হেড্মাষ্টার মহাশয়কে

একখানি পত্র, ও ট্র্যান্‌স্‌ফার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত লিখিয়া রাখিলাম। আমি সারদারঞ্জন সেনকে গোপনে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম। আহারান্তে পত্রখানা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে ইহা রত্নমণি বাবুকে দিও।" সে তাহাই করিল। শুনিলাম, পত্র পাইয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া আমাকে ডাকিয়াছিলেন। এদিকে আমি পূজনীয় শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের গৃহে যাইয়া দরখাস্তখানি তাঁহাকে দেখিতে দিলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি এই অল্পদিন হইল হেড্‌পণ্ডিতের পদ পাইয়াছি, তোমরা ভাল ছাত্ররা যদি চলিয়া যাও, তবে তাহাতে আমার ক্ষতি হইতে পারে।" ইহার অধিক তিনি বলিলেন না, এবং আমার সংকল্পের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত অমতও প্রকাশ করিলেন না। তিনি স্কুলে চলিয়া গেলেন, একটু পরে আমিও গেলাম। যাইয়া দেখি, হেড্‌ মাষ্টার মহাশয় ও তাঁহার মধ্যে পশ্চিমের বারাণ্ডায় মন্ত্রণা চলিতেছে। আমি দরখাস্ত-খানা রত্নমণি বাবুর হাতে দিলাম। তিনি পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এই স্কুল ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছ? আমার বাড়ীতে কি তোমার অসুবিধা হইতেছে?" আমি বলিলাম, "আপনার বাড়ীতে আমি খুব সুখে আছি।" "তবে কেন যাইবে?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি এই Principle গ্রহণ করিয়াছি যে, native institution থাকিতে Government institutionএ পড়িব না।" তিনি বলিলেন, "জেলা স্কুলও তো native institution." আমি চুপ করিয়া রহিলাম, এবং একটু পরে ক্লাশে যাইয়া বসিলাম। তখন আমার অন্তরে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছে, শিক্ষক আমার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, কি একটা হইয়াছে। তিনি আমাকে বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হইয়াছে?" উত্তরে

বলিলাম, "আমি এই স্কুল ছাড়িয়া যাইতেছি।" তিনিও অল্পদিন পূর্ব্বে তৃতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়াছেন; আমাকে বলিলেন, "আমি অনুরোধ করি, তুমি এই ক্লাশটা থাকিয়া যাও, পরে চলিয়া যাইও।" ইতিমধ্যে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সেখানে আসিয়া পড়িলেন, এবং তৃতীয় শিক্ষককে বলিলেন, "ওকে কিছু বলিবেন না," আমাকে আদেশ করিলেন, "যাও, ক্লাশে যাও।" কিন্তু আমি আর থাকিতে পারিলাম না; কিয়ৎক্ষণ পরেই তৃতীয় শিক্ষকের অনুমতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং দ্রুতবেগে ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসনে যাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে নীরবে বসিয়া রহিলাম। বোধ হয় অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম।

পর দিন সার্টিফিকেট আনিতে জেলা স্কুলে গেলাম। সে দিনও হেড্‌মাষ্টার মহাশয় মিষ্ট কথায় আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; অপর অনেকে, এমন কি দপ্তরী পর্য্যন্ত, অন্য স্কুলে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া আসিলাম।

তৃতীয় দিন আবার সার্টিফিকেটের জন্য গেলাম। সে দিনও হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সার্টিফিকেট দিলেন না; পুনশ্চ আমার মতি ফিরাইবার প্রয়াস পাইলেন, এবং পরিশেষে বিরক্তির সুরে বলিলেন, "আমি ungrateful (অকৃতজ্ঞ) বলিয়া সার্টিফিকেট দিব"

সেই দিন সন্ধ্যার পরে নূতন স্কুলের সহিত সংসৃষ্ট কয়েকজন এক প্রসিদ্ধ উকীলের গৃহে পরামর্শ করিবার জন্য সমবেত হইলেন, গুরুদাস বাবুও তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে তিনি আমাকে একটা দরখাস্তের খসড়া আনিয়া দিলেন, উহা উকীলের নিজের হাতে লেখা। ইহার মর্ম্ম এই,—আমি ময়মনসিংহ ইনষ্টি-টিউসনের হেড্‌মাষ্টারের নিকটে আবেদন করিয়া বলিতেছি যে, চারি

দিন হইল আমি জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের নিকটে ট্র্যানস্‌ফার সার্টিফিকেট চাহিয়া দরখাস্ত করিয়াছি, কিন্তু আজিও তাহা পাইলাম না; অতএব আপনি যথাবিহিত প্রতীকার করুন।

পর দিন নূতন স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের নিকটে এই দরখাস্ত দিলাম। তিনি তাহা জেলা স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন।

রত্নমণি বাবু কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর দিলেন, "As the guardian of the boy I objected to his transfer. The certificate, however, is ready." (আমি অভিভাবক রূপে এই ছেলেটীর অন্য স্কুলে চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলাম; সে যাহা হউক, সার্টিফিকেট প্রস্তুত আছে।) এই উত্তর আসিলেও আমি কয়েক দিন সার্টিফিকেটের জন্য জেলা স্কুলে যাই নাই।

আমি প্রথম দিন বৈকালেই দাদাকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম যে, রত্নমণি বাবুর গৃহ ও জেলা স্কুল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। প্রত্যুত্তরে তিনি গুরুতর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "তুমি যখন রত্নমণি বাবুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ কর, তখন কথায় না হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার নিকটে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলে (This was an implied contract with him) যে তুমি তাঁহার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিবে। তোমার কার্য্য দ্বারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ হইয়াছে।"

পূর্ব্বের ব্যবস্থানুসারে আমি এক সপ্তাহ এক মেসে খাইলাম, কিন্তু গুরুদাসবাবুর সহিত এক শয্যায় রাত্রিযাপন করিতাম। তারপর রীতিমত তাঁহার গৃহের অধিবাসী হইলাম।

এক দিন তিনি স্কুলে আমাকে বলিলেন—"জেলা স্কুল হইতে সার্টিফিকেট লইয়া আইস।" এবার যাইয়াই উহা পাইলাম। পথে

খানিক দূর আসিয়া সার্টিফিকেটটা পড়িলাম, পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, কুটি কুটি করিয়া সার্টিফিকেট ছিঁড়িয়া কাগজের টুকরাগুলি গুরুদাসবাবুর হাতে দিলাম, এবং উগ্র মূর্ত্তি ধরিয়া ক্লাশে বসিয়া রহিলাম। দেখিলাম, তিনি ও অপর কয়েকজন শিক্ষক সেগুলি জোড়া দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া গুরুদাসবাবু আমাকে সার্টিফিকেটে কি ছিল, লিখিয়া দিতে বলিলেন। গদবাঁধা কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া প্রয়োজনীয় বাক্য দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি—His class teachers have reported against his conduct. He leaves the school with an unsatisfactory character." (তাহার শ্রেণীর শিক্ষকেরা তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। সে অসন্তোষজনক চরিত্র লইয়াই এই স্কুল ত্যাগ করিতেছে।) মৃদুপ্রকৃতির লোক চটিলে আর রক্ষা নাই।

আমার বৃত্তির চারি বৎসর পূর্ণ হইতে এক মাস সাত দিন বাকি ছিল। এই কালের জন্য বৃত্তি জেলা স্কুল হইতে ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনে উঠাইয়া আনিবার জন্য ঢাকা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টরের নিকটে আবেদন পাঠাইলাম। তিনি ট্র্যান্‌সফার সার্টিফিকেট চাহিলেন। কাজেই টাকা দিয়া duplicate certificate লইতে হইল। তারপর কি হইল, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, পাঁচ টাকার ব্যাপার, জানিবার ব্যাকুলতাও ছিল না।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ

ডিসেম্বর মাসে দাদা কলিকাতা হইতে লিখিলেন, মা গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, আমাকে পত্র পাইয়াই বাড়ী যাইবার

পথে ঘোগা গ্রামে তাঁহার এক বন্ধুর জননীর নিকটে ঔষধের উপাদান লিখিয়া লইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তাঁহার আদেশানুসারে ঘোগা হইয়া বাড়ী গেলাম এবং ঔষধ প্রস্তুত করিয়া মাকে খাওয়াইলাম। দুই এক দিন পরে দেখা গেল, ব্যারামটা কঠিন কিছু নয়। এই সময়ে একদিন বৈকালে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মনে হইল, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তাহা তো করিলাম; এইবার ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইবার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব।

আমি পিতামাতার স্বধর্ম্মনিষ্ঠার উত্তরাধিকারী হই নাই। বাল্যকালে আমার হিন্দুধর্ম্মে গাঢ় বিশ্বাস ছিল না; আমি সুযোগ পাইলেই আচারবিগর্হিত কাজ করিতাম; মনে আছে, এগার বৎসর বয়সে, টাঙ্গাইল হইতে বাড়ী আসিবার পথে নৌকায় মাঝির অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম। ১৮৮১ সনের গ্রীষ্মের ছুটীতে দাদার নিকটে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা শুনি, এবং তাঁহার উপদেশে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করি, কিন্তু তাহা নামমাত্র। দুই তিন মাস পরে প্রতিদিন চক্ষু মুদিয়া বসিবার নিয়মও ছাড়িয়া দিলাম, এবং আমার ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় উপস্থিত হইল। অন্তরের এই অবস্থা লইয়া আমি ময়মনসিংহে পড়িতে গেলাম।

পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ

এই সময়ে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ জেলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য আচার্য্য ছিলেন। স্বগ্রামে থাকিতেই ইঁহার নাম জানিতাম। ঘাটাইল স্কুলে ইহার ‘সুখবোধ ব্যাকরণ’ পড়িয়াছিলাম; এবং ইনি যে মহিলার পাণিগ্রহণ করেন,

তাঁহার পিত্রালয় আমাদের গ্রামের সন্নিকট বলিয়া বাল্যকালেই মা মাসীমা জেঠাইমার মুখে ইঁহাদের কথা শুনিয়াছিলাম। এই স্থলে পণ্ডিত মহাশয়ের "ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর" নামক আত্মচরিত হইতে আমার স্মৃতিলিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

আমার জেলা স্কুলে প্রবেশ করিবার তিন সপ্তাহ পরে "একই সময়ে সারস্বত উৎসব ও মাঘোৎসব সম্পন্ন হয়। সেবার ১২ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী ছিল। আমি তখন মাঘোৎসব কাহাকে বলে জানিতাম না।" এক দিন স্কুল হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম, পথের পার্শ্বে এক আঙ্গিনায় বয়স্ক, পরিচ্ছন্নবেশধারী ছাত্রেরা কেহ কেহ মাটি খুঁড়িয়া বাঁশ পুঁতিতেছেন, কেহ কেহ ঘরে বসিয়া সঙ্গীত করিতেছেন। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। ক্রমশঃ সেখানে মণ্ডপ উঠিল, মণ্ডপ লতাপল্লবে সজ্জিত হইল। তারপর "এক দিন সন্ধ্যাকালে আমি সারস্বতক্ষেত্র হইতে মাঘোৎসবের স্থানে গমন করি। যাইয়া দেখি আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ এবং অন্যান্য কতিপয় যুবক এবং স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি বহুলোক চক্ষু মুদিয়া (বসিয়া) আছেন।" পণ্ডিত মহাশয় "একটা উচ্চ মঞ্চ হইতে কি উপদেশ দিতেছেন। একটী কথা আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বর আছেন কি না, ইহা কেবল মতে বিচার করিলে চলিবে না; তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথা হইতে আমি উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলাম। বড় দাদা ইহার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, আমার সহাধ্যায়ী মধ্যম দাদাও এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাকে ডাকিলেও আমি যাইতাম না।" (২৪৩ পৃঃ)

ইহার পরে আমি কিরূপে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের দিকে

আকৃষ্ট হইলাম, তাহা অতি সংক্ষেপে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। "১২৮৯ সালের ১লা বৈশাখ (১৮৮২) প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম আমাদের বাসার ছাত্রগণ স্নান করিয়া কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমিও স্নান করিয়া" তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম দোকানে গেলাম। "সেখানে প্রাতঃ সন্ধ্যায় নববর্ষের উৎসব হইল। প্রাতঃকালে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ ও সায়ংকালে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। ১৫ই বৈশাখ আমি সঙ্গতের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হই এবং এই সময় হইতে একরূপ নিয়মিতরূপেই সঙ্গতে ও শাখাসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করি।" এই বৎসর আষাঢ় মাসে শাখাসমাজের উৎসবে প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ময়মনসিংহে আগমন করেন, সে কথাও বলা হইয়াছে। "আমি তাঁহাকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; প্রথমটী ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ; দ্বিতীয়, মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় যায়।" (২৪৪ পৃঃ)

উৎসবের পরেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই আমার প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে যোগদান ও ব্রাহ্মের গৃহে আহার।

এই বৎসর বর্ষাকালে চন্দ মহাশয় আমাদিগকে কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত True Faith নামক পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ "প্রকৃত বিশ্বাস" পড়াইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা খুব উপাদেয় বোধ হইয়াছিল। আমি একখানি খাতায় কয়েকটী অধ্যায় ও টীকা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, উহা এখনও আছে। ব্যাখ্যাতা মধ্যে মধ্যে মূল ইংরেজী বাক্য উদ্ধৃত করিতেন। True Faith আমি তিন চারি বৎসর পরে পাঠ করি।

সপ্তম শ্রেণীর ডাএরীতে দেখিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পর হইতে আমি প্রতিদিন উপাসনা করিতাম ; উপাসনা কিরূপ হইত, তাহা স্মরণ নাই। কিন্তু অন্ততঃ দুই বৎসর আমাকে একটী দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল—সেটী আমার নিদ্রাতুরতা। সেই যে নববর্ষের উৎসবে প্রথম সামাজিক উপাসনায় যোগ দিলাম, সে দিন সায়ংকালে উপাসনার প্রারম্ভেই হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম ; জাগিয়া দেখিলাম, সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, আমি একাকী বসিয়া আছি।

একদিন বৈকালে পণ্ডিত মহাশয় যুবকদিগকে তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস শুনিতে আহ্বান করিলেন। বক্তৃতার আরম্ভেই আমি একখানা খাটিয়ায় শুইয়া নিদ্রায় অচেতন হইলাম ; চেতনা লাভ করিয়া শুনিলাম, বক্তা বলিতেছেন, "এই তোমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বলিলাম।"

সঙ্গতে যাইয়া এক এক রাত্রি সকলের পশ্চাতে লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতাম। কয়েকবার আমার দশা দেখিয়া উপদেষ্টা বলিতে বাধ্য হইলেন, "রজনী, যদি এখানে আসিয়া এইরূপ ঘুমাইয়া পড়, তবে তুমি আসিও না, ইহাতে তোমার নিজের ক্ষতি, অপরেরও ক্ষতি।"

বোধ হয় নিদ্রালুতার জন্য অতঃপর আর তিরস্কারভাজন হই নাই।

আমাকে আর একটী রিপুর সহিত অন্ততঃ দুই বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আমি বাল্যাবধি অতিশয় লোভী ছিলাম। রত্নমণি বাবুর অনুগ্রহে আমার আহারের ব্যয় বাঁচিয়া গেল ; তখন ছাত্রবৃত্তির টাকা বেশীর ভাগ রসনার তৃপ্তিতে উড়িয়া যাইতে লাগিল। সকালে, বৈকালে, রাত্রিতে আহারের পরে—সময় অসময় ছিল না,

একাকী বা সঙ্গীদিগের সহিত মিঠাই খাইতাম। কতবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, লোভ দমন করিব, কিন্তু রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে ময়রার দোকানের সম্মুখে যাইয়াই যেন অজ্ঞাতসারে তাহাতে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পরিশেষে ১৮৮৪ সনে প্রার্থনাপূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহা অটল রহিল। ইহার অল্প দিন পরে রত্নমণি বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে গৃহে সহস্রাধিক লোকের জন্য ভূরি ভূরি মিঠাই মণ্ডা তৈয়ার হইয়াছিল, আমার পাতে যাহা দেওয়া হইত, একপাশে সরাইয়া রাখিতাম, কণামাত্র রসনাগ্রে আস্বাদন করিতাম না। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন বুঝিলাম, রসনা সংযত হইয়াছে, তখন মিষ্ট বর্জ্জনের সংকল্প ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে যাইয়া পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দকে উপদেষ্টা ও শিক্ষক উভয়রূপেই পাইলাম। ইঁহার শিক্ষাদানরীতি অতীব হৃদয়গ্রাহী ছিল। অমায়িক স্বভাব, সদাসহাস্য বদন, চিত্তহরণ বাক্‌পটুতা, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাপ্রণালী, অকৃত্রিম শিষ্যবৎসলতা—এই সকল গুণ একনিষ্ঠ সাধকের ভগবদ্‌বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত মিলিত হইয়া ইঁহাকে একজন আদর্শ শিক্ষকরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমি প্রায় তিন বৎসর কাল ইঁহার নিকটে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, একদিনের তরেও ইঁহাকে রুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই, কিংবা ইঁহার মুখে কর্কশ বাক্য শুনি নাই। অথচ প্রকাশ্য সভায় ন্যায়বিরোধী কথা শুনিলে ইনি প্রতপ্ত ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, তখন, যেন ইঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইত। পড়াইবার সময়ে ছাত্রগণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষণ করিতে ইঁহাকে বেগ পাইতে হইত না, কেন না, তাহারা ইঁহাকে যুগপৎ ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। পণ্ডিত মহাশয় যদি পথে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল আমাদের

সহিত আলাপ করিতেন, আমরা তাহা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। ইনি এমন মধুরভাষী ছিলেন যে, আমি এক ভক্তিভাজন শিবনাথ শাস্ত্রী ছাড়া তুলনা করিবার যোগ্য আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িবার কালে আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাক্ষিক পত্রিকা "তত্ত্ব কৌমুদী" লইতাম, এবং "শ্লোক সংগ্রহ" হইতে কতকগুলি শ্লোক নকল করিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম। এই সময়ের একটা কৌতুকাবহ ঘটনা মনে আছে। রত্নমণি বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে বিক্রমপুর হইতে তিনজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসিয়াছিলেন, একজনের উপাধি ছিল "বিদ্যাভূষণ"। আমি ব্রাহ্মসমাজে যাই শুনিয়া ইঁহারা কেহ কেহ আমাকে যেন একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। একদিন কথায় কথায় এক পণ্ডিত আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "গৌঃ শব্দায়তে এই বাক্যে কর্ম্ম কি?" আমি হাসিয়া বলিলাম, 'শব্দায়তে' অকর্ম্মক ক্রিয়া, উহার আবার কর্ম্ম কোথায়? তারপরে তাঁহাদিগকে এই শ্লোকটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভি কৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অপর দুইজন কিছুই বলিতে পারিলেন না; বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করিয়া নিরুত্তর হইলেন। গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময়ে প্রশ্নকর্ত্তা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, "এই ছেলেটীর সংস্কৃতে বেশ জ্ঞান আছে।" ইহার কিছু দিন পরেই দাদা আমাকে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু আমি যদিচ দুই বৎসর ধরিয়া সামাজিক উপাসনা ও সঙ্গতের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, তথাপি তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আমার মতি অবিচল হয় নাই। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের নব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল; তৎসংস্রবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ময়মনসিংহে কতকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "১২৯১ সালে (১৮৮৪-৫) শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ময়মনসিংহ আগমন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ও বাল্যাশ্রম প্রভৃতি গঠন করেন। আমি কিছুদিন বাল্যাশ্রম ও শাখাসমাজ উভয়ত্রই গমন করিতাম।" একবার বাল্যাশ্রমে 'অধর্ম্ম যাহার ভিত্তি দুর্গতি তাহার পরিণাম' এই নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তারপর বাল্যাশ্রমের উৎসবোপলক্ষে যে নগরকীর্ত্তন হয়, পশ্চাতে থাকিয়া নীরবে তাহারও অনুগমন করিয়াছিলাম। এই কীর্ত্তনে প্রধান গায়ক ছিলেন কলিকাতা হইতে আমন্ত্রিত এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। নির্দ্দিষ্ট কীর্ত্তনগুলি শেষ হইতেই তিনি 'তোমাতে যখন, মজে আমার মন, তখনই ভুবন, হয় সুধাময়'—ব্রহ্মসঙ্গীতের এই সুপরিচিত গানটী ধরিলেন। আমার নিকটে অপ্রত্যাশিত বলিয়া ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। "যদিও ইহার পূর্ব্বেই বড় দাদা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তথাপি এই সময়ে আমার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। বরং মন আস্তে আস্তে আর্য্যধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু আপনার (পণ্ডিত মহাশয়ের) নিকট অধ্যয়ন করিতাম বলিয়া আপনার স্নেহের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া আসিতে কখনও ইচ্ছা হয় নাই।" (ব্রাঃ সঃ চঃ বৎসর, ২৬৮পৃঃ)

সাধনবিধি গ্রহণ

কিন্তু পর বৎসর নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসাধনার্থে নূতন বিধি গ্রহণ করিলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়কে আমি ইহার যে বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলাম, এখানে তাহার প্রতিলিপি দিতেছি।

"১৮৮৫ সনের পূজার ছুটীর পূর্ব্বে আপনি জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে বিশেষ ভাবে সাধনবিধি গ্রহণের জন্য আপনি ব্রাহ্ম যুবকদিগকে আহ্বান করেন, তদনুসারে আমরা কয়েকটী যুবক উক্ত সনের ২রা আশ্বিন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এই বিধি গ্রহণ করি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই আমার জীবনে যথাকথঞ্চিৎ ধর্ম্মসাধন আরম্ভ হয়। আমি এই সাধনবিধি হইতে প্রচুর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নিম্নে উহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।"

সাধনবিধি

(ধর্ম্ম প্রবেশার্থীর জন্য)

বিশ্বাস

১। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক পরিবার।

২। ঈশ্বর পিতা, নরনারী ভাই ভগিনী।

৩। জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল বিধাতাপুরুষ নিত্য জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন।

৪। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাহইতে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য লাভ করিয়াই মনুষ্য ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হয়।

৫। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছা জীবনে সম্পন্ন হইতে দিলেই মানব পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।

৬। সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা যোগে ভগবানের করুণা জীবনে অবতীর্ণ হয়।

৭। সকল দেশের সকল জাতীয় সাধু মহাত্মারা আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

৮। মনুষ্য দৃষ্টান্তমাত্র ; আদর্শ কেবল সেই এক মহান্ ঈশ্বর।

নিত্যকর্ম্ম

১। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে ঈশ্বরের করুণা ও স্নেহ স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে।

২। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে বিধাতার বিদ্যমানতা স্মরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা অনুসরণ করিবে।

৩। স্নানান্তে পবিত্র হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে।

৪। কৃতজ্ঞচিত্তে অন্নদায়িনী জননীকে স্মরণ করিয়া আহার গ্রহণ করিবে।

৫। বিদ্যালয়ে বা কার্য্যক্ষেত্রে ঈশ্বরের আবির্ভাব মনে রাখিবে।

৬। যথাসময়ে নিষ্ঠার সহিত দৈনিক উপাসনা করিবে।

৭। দিনান্তে বা শয়ন সময়ে সমস্ত দিনের অবস্থা চিন্তা করিবে এবং পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ও বল প্রার্থনা করিবে।

৮। শয়ন সময়ে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে স্মরণ করিবে এবং মার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছি এই ভাব লইয়া পবিত্র মনে নিদ্রিত হইবে।

বিধি

১। সত্নৎসাহে সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।

২। পরগুণে সমাদর ও পরদোষে ক্ষমা প্রদর্শন করিবে।

৩। সপ্তাহান্তে নিয়মিত রূপে সমবিশ্বাসীদিগের সহিত সামাজিক উপাসনা করিবে।

৪। ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিবে।

৫। সঙ্গত সভায় সরল হৃদয়ে মন খুলিয়া আলোচনা করিবে।

৬। সাধুগ্রন্থ অধ্যয়ন, সাধু জনের সংসর্গ, সাধুচিন্তা ও সাধু আলাপে অবকাশ সময় যাপন করিবে।

৭। মনঃসংযমন ও আত্মচিন্তার জন্য সময়ে সময়ে নির্জ্জনে গমন করিবে।

৮। গুরুজনে শ্রদ্ধা, বন্ধুজনে প্রীতি, কনিষ্ঠজনে স্নেহ প্রদর্শন করিবে।

নিষেধ

১। কটুকথা ও কর্কশব্যবহার পরিত্যাগ করিবে।

২। পরের দোষ লইয়া আমোদ করিবে না।

৩। কুসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

৪। ধর্ম্ম লইয়া বৃথা তর্ক ও কলহ করিবে না।

৫। অসৎগ্রন্থ পাঠ, অসদালাপ ও অসৎচিন্তা পরিত্যাগ করিবে।

৬। কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিবে না।

৭। আপনাকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিয়া সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিবে।

৮। আহারে লোভ, বেশভূষায় বিলাস, কর্ম্মে আলস্য, ব্যবহারে অবিনয় ও আমোদে অবিশুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিবে।

প্রতিজ্ঞা

আমি শ্রীরজনীকান্ত গুহ—

পবিত্র ধর্ম্ম-জীবন লাভের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই সকল সাধনবিধি গ্রহণ করিলাম। করুণাময় পরমেশ্বর এই প্রতিজ্ঞাপালনে আমার সহায় হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সন—১২৯২
তারিখ—২রা আশ্বিন।

১লা জানুয়ারী (১৮৮৬) প্রত্যূষে গুরুদাস বাবুর আহ্বানে 'বিশ্বাসী মণ্ডলীর' সভ্যগণ তাঁহার গৃহে সমবেত হইলেন। সারাদিন ছোট রকমের একটী উৎসব হইল। তখন আমরা জানিতে পারিলাম, কে কে উহার সভ্য—মহিমচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার বসু, উমেশচন্দ্র বাগচী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দবিহারী মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত বসু, যামিনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতি বারজন মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম বৎসর সভ্যগণের মধ্যে একটা জমাট ভাব ছিল, ক্রমশঃ নানা-কারণে প্রাণযোগ শিথিল হইতে থাকে। ইঁহাদের অনেকেই এখন পরলোকে।

দীক্ষা

বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আমি পণ্ডিত মহাশয় ও গুরুদাস বাবুকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সংকল্প জানাইলাম। আমি প্রথমতঃ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় যাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ভক্তিভাজন পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিব, কেন না, দাদা তাহাই করিয়াছিলেন। দাদাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম, কিন্তু তিনি তাহা তেমন অনুমোদন করিলেন না; ব্যয়বাহুল্য বিবেচনা করিয়া গুরুদাস বাবুও প্রস্তাবটীর পক্ষে উৎসাহ দেখাইলেন না। একদিন তিনি বন্ধুজনের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে বলিলেন, "ঢাকায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আছেন, তিনি বিখ্যাত প্রচারক, তাঁহার নিকটে যাইয়া দীক্ষিত হও।" আমি এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হইলাম। কিন্তু পরিশেষে বিশ্বাসী মণ্ডলীর সভ্যদিগের আগ্রহাতিশয্যে ময়মনসিংহে দীক্ষিত হওয়াই নির্দ্ধারিত হইল। এইবার চন্দ মহাশয়ের আত্মচরিত হইতে আমার দীক্ষার ও তদানুষঙ্গিক বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি নববিধান সমাজের উৎসবে নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ আপনার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তৎপর আমার জেলা স্কুল ত্যাগ আপনি তেমন অনুমোদন করিতে পারেন নাই; এজন্য সমাজমধ্যে একটু মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়। ইহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মাঘোৎসব আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আপনি ও গুরুদাস বাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন; এবং বোধ করি আপনাদিগের আকুল প্রার্থনার ফলেই ১২৯২ সালের (১৮৮৬) মাঘোৎসবে ভগবানের অপার কৃপা বর্ষিত হয়। এবার গুরুদাস বাবুর গৃহে উৎসব সম্পন্ন হয়। শাখাসমাজের সভ্যগণ উৎসাহের সহিত গৃহ ও প্রাঙ্গণ সজ্জিত করেন। আমি তখন গুরুদাস বাবুর গৃহে বাস করিতাম। ১লা মাঘ হইতে প্রস্তুতির উপাসনা আরম্ভ হয়। আমরা প্রত্যূষে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া আসিতাম, উপাসনার পর

৫।৭ জনের জন্য প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ১০।১২ জনে ভোজন করিতাম। আমার বেশ মনে আছে, আপনি ভাত, ডাল ও অন্যান্য উপকরণ একত্র মাখিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, আমরা মহানন্দে তাহা গ্রহণ করিতাম।

"১১ই মাঘ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে আপনি আচার্য্যের কাজ করেন। রাত্রির উপাসনার পর বঙ্কবিহারী দাস ও আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই। (পূর্ব্বেই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল।) গুরুদাসবাবু আমাদিগকে দীক্ষার জন্য উপস্থিত করেন। আপনি উদ্দীপনাপূর্ণ সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন (আমরা দুই জনেই দীক্ষার পরে প্রার্থনা করিয়াছিলাম।) এই উপলক্ষে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়াছিল।" উপদেশ শেষ হইলে অনেকক্ষণ সঙ্গীত চলিতে থাকে। রাত্রি ১১টার সময় অদ্যকার উৎসব সমাপ্ত হয়। বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্য এবং গুরুদাস বাবু ও তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু মহাশয় আমাকে ধর্ম্মপুস্তক উপহার দেন। "এই দিনের উজ্জ্বল চিত্র এখনও মনে মুদ্রিত রহিয়াছে।" (২৮৯-৯১ পৃঃ)

দীক্ষান্তে এক বৎসরের জন্য মৎস্যমাংস বর্জ্জনের সংকল্প গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী

যথাসময়ে বার্ষিক পরীক্ষা হইল। ইংরেজী সাহিত্যে আমার জন্য স্বতন্ত্র প্রশ্নপত্র ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক জেলা স্কুল হইতে ভিন্ন হইলেও আমি নূতন পাঠেই পরীক্ষা দিলাম। আমি সকল বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। এক উকীল ইংরেজীর পরীক্ষক ছিলেন; তিনি আমার কাগজ সম্বন্ধে

খুব প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহিমচন্দ্র জেলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথম হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। আরও কয়েকটী সহাধ্যায়ী আসিল; মধ্যম দাদা পরীক্ষার পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ময়মনসিংহে আগমন।

নববর্ষের উৎসবোপলক্ষে ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১২৯২ সনের ২৯এ চৈত্র (১৮৮৬) ময়মনসিংহে আগমন করেন; এই তাঁহার প্রথম আগমন। তাঁহার সহিত কলিকাতা ও ঢাকা হইতে আট দশ জন যুবক আসিয়াছিলেন, এবং কাওরাইদ হইতে ব্রহ্মপরায়ণ কালী নারায়ণ গুপ্ত মহাশয় নিজের দল লইয়া উৎসবে যোগ দিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সপ্তাহ কাল থাকিয়া প্রতিদিন উপাসনা, তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা, ছাত্রগণের সহিত আলোচনা প্রভৃতি উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "মুক্তিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব", "ধর্ম্ম ও মানব সমাজ", এবং "নবভারতে নবশক্তি"। এপ্রকার জ্ঞানগর্ভ, উদ্দীপনাপূর্ণ, ওজস্বিনী বক্তৃতা পূর্ব্বে আমি কখনও শুনি নাই। ১লা বৈশাখের সায়ংকালীন উপাসনা সম্বন্ধে আমার ডায়েরীতে লেখা ছিল,—Many cried loudly; very deep prayer; new scene. এই উৎসবের মধ্যে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ছাত্রজীবনের নব প্রতিজ্ঞার কথা, বিশেষতঃ এফ্.এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কি বিস্ময়কর শ্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। বহুবৎসর পরে এই বৃত্তান্ত তাঁহার আত্ম-চরিতে আমরা যেমন শুনিয়াছিলাম, অবিকল সেইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। অপর

এক দিন তিনি একখানা ভগবদ্গীতা চাহিলেন; আমি আহ্লাদের সহিত আমার গীতাখানা তাঁহার হাতে দিলাম। আশা করিয়াছিলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, এই গীতাখানি কাহার? কিন্তু তাঁহার সে কৌতূহল ছিল না, কাজেই আমি নিরাশ হইলাম। এইবার আমি তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হই। আমার দাদার নাম শুনিয়া বলিলেন—পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনিই তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন—"আমি তাহাকে সিংহলের লোক মনে করিয়াছিলাম।"

এক দিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় আমি ও আর একটী যুবক ঠিক তাঁহার সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ আমাদিগের ভোজন লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন, "এখানে দুটী ক্ষুদ্র রাক্ষস বসিয়াছে।" তাঁহার গভীর জ্ঞান, সরস বাক্‌-পটুতা ও অমায়িক সস্নেহ ব্যবহার তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল।

বিক্রমপুরে একরাত্রি

উৎসবের কয়েক দিন পরে আমাদের দলের আনন্দবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্র আসিল। ইনি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আনন্দবিহারী মাতুলালয় হইতে লিখিয়াছেন, তাঁহার মাতুল ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, বিবাহের সম্বন্ধ এবং দিন স্থির হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, অতএব বন্ধুরা তাঁহাকে উদ্ধার করুন। এই পত্র পাইবার পরে গুরুদাস বাবু মণ্ডলীর সভ্যদিগকে ডাকিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। সিদ্ধান্ত হইল যে, একজন বিক্রমপুরে যাইয়া

আনন্দবিহারীকে লইয়া পলাইয়া আসিবেন। আমার উপরে এই কার্য্যের ভার পড়িল। উমেশচন্দ্র বাগচী আনন্দবিহারীর প্রিয় বন্ধু ছিলেন; তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সঙ্গী হইতে চাহিলেন; আমিও তাহাতে একটু বল পাইলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে আমরা রেলে রওনা হইয়া অপরাহ্নে ঢাকা পঁহুছিলাম। এক মাস পূর্ব্বে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ খুলিয়াছিল। ঢাকায় নববর্ষের উৎসবে পরিচিত এক ভদ্রলোকের আবাসে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন সকালে গহনার নৌকায় উঠিয়া আমরা বৈকালে সিরাজদিঘা গেলাম, এবং তথা হইতে পদব্রজে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোলা গ্রামে উপনীত হইলাম—ঐ গ্রামেই আনন্দের মাতুলালয়। অতঃপর আমাদের ভাবনা হইল আমরা কি করিয়া তাহাকে আমাদের আগমনের সংবাদ দিব, এবং রাত্রিতে কোথায় থাকিব। উমেশ বলিলেন, কোলার দুই তিন মাইল পশ্চিমে ময়মনসিংহের এক ডাক্তারের বাড়ী, সেখানে রাত্রি কাটাইব। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমরা গ্রামের বাহিরে সড়কের পার্শ্বে বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। ইতোমধ্যে সেখানে একটী বালক আসিল। তাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আনন্দবিহারী মুখোপাধ্যায়কে চেন?" সে বলিল, "হাঁ, চিনি।" "তাহাকে এই পত্রখানা দিতে পারিবে?" "পারিব।" আমরা তাহার হাতে একখানা পত্র দিলাম; তাহাতে লিখিলাম, "আমরা তোমার জন্য একটা ফুলের মালা আনিয়াছি, পথে অপেক্ষা করিতেছি, আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মালা লইয়া যাও।" বস্তুতঃও বন্ধুগণ আনন্দবিহারীর জন্য একটা বকুল ফুলের মালা দিয়াছিলেন। পত্রখানি আনন্দের হাতে পড়িবে কি না, সে বিষয়ে খুবই ভাবনা হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ

পরেই দেখি, আনন্দবিহারী ও তাহার মাতুলপুত্র দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত। দেবেন্দ্রও আমাদিগের সহাধ্যায়ী ছিল। তখন আমরা মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যপ্রণালী গঠন করিলাম। আমরা ঐ গ্রামেই কোনও বাটীতে আশ্রয় লইব; শেষ রাত্রিতে আনন্দবিহারী আসিয়া আমাদিগের সহিত জুটিবে, এবং গ্রামবাসী-দিগের সুষুপ্তির অবসরে আমরা পলায়ন করিব। তাহারা আমাদিগকে বসুবংশীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে লইয়া গেল; তিনি গুপ্তমন্ত্রণার বার্ত্তা শুনিয়া সাগ্রহে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় মনে হইল, মাথায় একটু ছিট আছে। তিনি ভারত স্বাধীনতার কথা আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, "আপনারা ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগকে বলিবেন, তাঁহারা যদি আমার হস্তে নগর সমর্পণ করেন, আমি ত্রিশ বৎসর উহা স্বাধীন রাখিব।" সে যাহা হউক, তিনি আমাদিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন; তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; হঠাৎ আনন্দ ও দেবেন্দ্র আসিয়া বলিল, এখনই পলায়ন করিতে হইবে। অন্ধকার রাত্রি, বারিধারার মধ্যে অপরিচিত প্রদেশে পথ চলা দুঃসাধ্য, বসুজ নিজে হইতেই তাঁহার লণ্ঠনটী আমাদিগকে দিলেন; আমরা তিন জন তালতলার পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। খুব উচ্চ সড়ক, দুই পাশে শস্যক্ষেত্র, দূরে দূরে এক একটা গ্রাম, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে এইরূপই বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে সহসা বিপরীত দিক হইতে দুইটী লোক লণ্ঠন লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি এই রকম একটী বালক দেখিয়াছেন?"—বলিয়া বর্ণনা দিল। তাহারা আনন্দবিহারীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, এই ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু দুই এক কথায় বুঝিলাম, তাহারা

অন্য এক পলাতকের সন্ধানে চলিয়াছে। তাহারা চলিয়া গেল, আমরা নিরাপদে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তালতলার বাজারে যাইয়া এক মুদিদোকানে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। অতি প্রত্যূষে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; আমি সঙ্গীদিগকে তখনই জাগাইলাম, এবং অবিলম্বে নদীতীরে যাইয়া আমরা নারায়ণগঞ্জ যাইবার মানসে একখানা নৌকা ভাড়া করিলাম। মাঝিকে বলিলাম, গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে বখ্‌শিস্ দিব। সে সারা পথ এমন জোরে নৌকা চালাইল যে, আমরা যখন নারায়ণগঞ্জে আসিলাম, তখনও ময়মনসিংহের গাড়ী ছাড়িতে বহু বিলম্ব আছে। বেলা তখন সাড়ে সাতটা কি আটটা হইবে। আমরা এদিক্ ওদিক্ একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্টেসনে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে দেওয়ালের গায়ে সময়পঞ্জী পড়িতেছি, অকস্মাৎ একটী লোক পশ্চাৎ হইতে আনন্দ বিহারীকে জড়াইয়া ধরিল; দেখিলাম, তাহার সঙ্গে আরও একটি লোক আছে। তাহারা আনন্দকে একখানা পত্র দিল; উহাতে দেবেন্দ্র লিখিয়াছে, আনন্দবিহারীর পলায়ন প্রকাশিত হইবামাত্র বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়াছে; তাহার পিতা গুরুদেবের পা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছেন যে, তিনি তাহার বিবাহ দিবেন না, সুতরাং সে যেন পত্র পাইয়াই গৃহে ফিরিয়া আইসে। আনন্দবিহারী পত্রখানি আমাদিগকে পড়িতে দিল। আমরা আর কি বলিব, "তুমি যদি যাওয়াই ভাল মনে কর, যাও।" লোক দুটী আমাদিগকে লজ্জা দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "আপনারা কি রকম লোক? যে ভদ্র সন্তান আপনাদিকে আশ্রয় দিল, আপনারা তাহার লণ্ঠন চুরি করিয়া লইয়া আসিলেন?" শুনিলাম, আনন্দের আত্মীয়েরা যখন বসু মহাশয়কে চাপিয়া ধরিলেন যে, তিনি তাহার পলায়নে সাহায্য করিয়াছেন,

তখন নিজের দোষক্ষালনের অভিপ্রায়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কিছুই জানিতাম না; এই দেখুন না, লোক দুটী আমার লণ্ঠনটা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; পরে আরও শুনিয়াছিলাম, ইহাদের উপরে হুকুম ছিল, আন্দবিহারীকে ধরিতে পারিলে প্রথমেই আমাদিগের দুই জনের মাথা ভাঙ্গিবে। ষ্টেসনের প্রকোষ্ঠে দুই পক্ষের মিলন হওয়াতে মাথা বাঁচাইবার জন্য আমাদিগকে বেগ পাইতে হয় নাই।

আনন্দ অন্তর্হিত হইবার অল্পকাল পরেই মাতুলেরা জানিতে পারিলেন, সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ শ্রীনগর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দিকে তাহার অন্বেষণে লোক প্রেরিত হইল। যাহারা শিকার ধরিল, তাহারা বরাবর হাঁটিয়া নারায়ণগঞ্জে আসিয়াছিল। তাহারা আনন্দবিহারীকে লইয়া চলিয়া গেলে আমরা সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একান্ত বিষণ্ণচিত্তে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

তারপর সংবাদ আসিল, নির্দ্দিষ্ট দিনে আনন্দবিহারীর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার তিন বৎসর পরে এক দিন সিটি কলেজে তাহাকে দেখিয়াছিলাম; তদবধি আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও খবর পাই নাই।

সামাজিক উৎপীড়ন

গ্রীষ্মের ছুটীতে শ্রীনাথবাবুর সম্বন্ধী, ঢাকার নববিধান মণ্ডলীর প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত গোরুর গাড়ীতে বাড়ী গেলাম। ইঁহার বাস-গ্রাম বীরসিংহ, আমাদের বাটী হইতে অনুমান এক মাইল পশ্চিমে; আমাদের গ্রাম হইয়াই যাইতে হয়।

আমরা পূর্ব্বাহ্ণে পঁহুছিলাম ; ঘোষ মহাশয় সোজা নিজের বাড়ীতে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক আমাদের গৃহে স্নানাহার করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম, তিনিও সম্মত হইলেন। আমার একটা মতলব ছিল, তাহা এই যে, আমি ইঁহার সহিত প্রকাশ্যে একত্র ভোজন করিয়া গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দিব যে, আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি, জাতি ত্যাগ করিয়াছি। কাজেও তাহাই হইল। বৈকুণ্ঠ বাবু আমাদের অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। "গুরু ঘোষের ছেলে তাহার বিধবা ভগিনীকে রাত্রিতে হাতীর পিঠে উঠাইয়া বাড়ী হইতে নসিরাবাদ সহরে লইয়া গিয়াছে"—এ গল্প আমরা গ্রামে থাকিতে কতবার শুনিয়াছি। ঘোষ মহাশয় স্নানের পর জেঠামহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া দীর্ঘকাল উপাসনায় নিমগ্ন রহিলেন। মা আমাকে ইতোমধ্যে আহার করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন ; আমি অতিথির অগ্রে আহার করিতে সম্মত হইলাম না। উপাসনার পরে আমরা দুই জন দক্ষিণদ্বারী ঘরের খোলা বারাণ্ডায় পাশাপাশি খাইতে বসিলাম। আহার যখন প্রায় শেষ হইল, তখন আমি বৈকুণ্ঠ বাবুর নিকট হইতে দৈ-ভাত চাহিয়া খাইলাম। জেঠাইমা তাঁহার বাড়ীর পূর্ব্বদ্বারী ঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতে-ছিলেন। অবিলম্বে গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, "রজনী বৈকুণ্ঠ ঘোষের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছে।"

পরদিন দুপুরবেলা আমি ঘাটাইল গেলাম, সেখানে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের একটা সভা ছিল; উহার উদ্যোক্তা ছিলেন ঐ গ্রামের সকল সৎকর্ম্মে উৎসাহী কালীচরণ রায় এবং আমাদের অঞ্চলের প্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার ও বৈকুণ্ঠনাথ সোম। ঘাটাইলের কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন, ভারতসভার একটা শাখা স্থাপিত হইল, উদ্যোক্তারা বক্তৃতা করিলেন, আমিও অন্যতম বক্তা ছিলাম। সে রাত্রি আমরা কয়েক জন কালীচরণ বাবুর আতিথ্য স্বীকার করিলাম ; পর দিন সভার বিবরণ লিখিত হইল, হরেন্দ্র বাবু ও বৈকুণ্ঠবাবু বলিয়া গেলেন, আমি লিখিয়া দিলাম।

বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। জাতি-নাশার পাতের ভাত খাইয়া আমারও জাতি গিয়াছে। মা কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও গুরুদাস বাবুকে গালাগালি করিতেছেন। "রজনী ধর্ম্মের কি বুঝে ? গুরুদাস ঠাকুর ওকে মেয়ে বিবাহ দিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়া ব্রাহ্ম করিয়াছে।" বলা বাহুল্য গুরুদাসবাবু তখনও বিবাহ করেন নাই। তারপর মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। আমাদের কুলক্রমাগত বিগ্রহ আছে। তাহার পূজা না হইলে মা জল গ্রহণ করেন না। যে ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ পূজারীর কাজ করিত, বিরোধীরা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, আমাদের বাড়ী পূজা করিলে, তাহাকে একঘরে করিবে, সে অন্য কোনও বাড়ীতে পূজা করিতে পারিবে না। এই উৎপীড়নের ফলে মা দিনের পর দিন উপবাসে কাটাইবেন, এই প্রকার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি ভীত হইলাম এবং বুঝিলাম আমি গৃহত্যাগ করিলেই অত্যাচারের নিবৃত্তি হইবে। পর দিন প্রত্যূষে যাত্রার পূর্ব্বে দেখিলাম, মা শুইয়া আছেন, তাঁহাকে কয়েক বার মা মা বলিয়া ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না ; ভাবিলাম তিনি ঘুমাইতেছেন ; তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঘরের বাহির হইলাম। একবৎসর পরে বাড়ী গেলে মা আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি জাগিয়াই ছিলেন, রাগ করিয়া কথা বলেন নাই, এবং সে জন্য মনের কষ্টে সারা বৎসর কাঁদিয়াছেন।

বাড়ী হইতে ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইবার পরেই কয়েক দিন জ্বরে ভুগিলাম। আষাঢ় মাসে সুখদাসুন্দরীর মোকদ্দমায় সহরে প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়ের আত্মচরিতে উহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। আমার সহিত ঘটনাটীর সংস্রব এইটুকু যে, আমি অন্যান্য যুবকের সহিত যষ্টি লইয়া সুখদাসুন্দরীর পালকীর সহিত কাছারীতে গিয়াছিলাম, এবং কয়েক রাত্রি পণ্ডিত মহাশয়ের বাহিরের ঘরে শয়ন করিতাম, সঙ্গে একটা ছোট ছোরা থাকিত।

পণ্ডিত মহাশয় পত্নীর চিকিৎসার জন্য ঢাকায় গেলে, আমার সহবাসী ও সহাধ্যায়ী শ্যামাচরণ দে ও আমাকে তাঁহার বাটীর রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছিলেন। এক রাত্রি আমি একাকী ছিলাম। সেখানে জ্বর হওয়াতে নিজের বাসায় চলিয়া যাই। এবারকার জ্বরের পরে গুরুদাসবাবুর উপদেশে স্বাস্থ্যরক্ষার হেতু এক দিনের জন্য আমিষ বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলাম। ইহাতে এমন অনুতাপ হইল যে, সংকল্পিত বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে আর ব্রতচ্যুত হই নাই।

শরৎকালে পুনর্ব্বার জ্বর হইল ; বস্তুতঃ এই বৎসর আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার পরে তিন বৎসর আমার জ্বর হয় নাই। জীবনে এত দীর্ঘ নিষ্কৃতি এই প্রথম ও শেষ।

শারদীয় অবকাশে গুরুদাস বাবুর সহিত আমরা তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত গোলোক চন্দ্র দাসের ভাবখালী গ্রামস্থ বাটীতে এক দিন কাটাইলাম ; পর দিন আমি রৌহাগ্রামে সহাধ্যায়ী বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে যাইয়া কয়েক দিন পরম সমাদরে যাপন করিলাম। ইতোমধ্যে গুরুদাসবাবু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন ; আমি সহরে

ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্ম দোকানে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় ও অমরচন্দ্র দত্তের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। দোকানটী এক বৃহৎ পাকা বাড়ীতে ছিল, ঠিক ব্রহ্মপুত্রের উপরে; অবস্থানের শোভাতে চক্ষু জুড়াইত। দোকানের সরকার দুই বেলা শুধু ভাত ও মসূরীর ডাল রাঁধিতেন, সকলে তাহাই খাইতাম।

ছুটীর মধ্যেই শরৎবাবু সংবাদ দিলেন গুরুদাস বাবু কলিকাতায় কঠিন রক্তামাশয় রোগে পীড়িত হইয়াছেন; আমাকে অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি আরোগ্য লাভ করিলে জানিতে পারিলাম, তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে।

শরৎবাবুই আমার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত নিমচাঁদ দে ময়মনসিংহের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার বড় ও মেজ ছেলে আমাদের স্কুলে নিম্ন শ্রেণীতে পড়িত। আমি ছেলে দুটীর পড়া বলিয়া দিব, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া যাইব, শরৎবাবু এই প্রকার কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন, আমি তদনুসারে নিমচাঁদবাবুর গৃহে গেলাম। তিনি বিপত্নীক ছিলেন, তাঁহার মাতা ও বিবাহিতা কন্যা, শিশু দৌহিত্র, চারি পুত্র, এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেন। এক ভদ্র বিধবা রাঁধিতেন, তাঁহার ছোট মেয়েটী তাঁহার কাছেই থাকিত; বড় মেয়েটী বালবিধবা, কলিকাতায় এক ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। দুইটী কন্যাই পরে সঙ্গতিপন্ন সৎপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন। ভদ্র মহিলাটীর কথা এতটুকু বলিলাম এই জন্য যে, আমি এখনও ইঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি; ইঁহার রন্ধন-নৈপুণ্য যেমন চমৎকার ছিল, সৌজন্যও সেই প্রকার সহজেই চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি তখন নিরামিষভোজী ছিলাম,

এজন্য একরাশি ভাত খাইতাম। ইনি ভাতগুলি মঠের মত করিয়া সাজাইয়া দিতেন; দেখিয়া আমার লজ্জা বোধ হইত। ফলতঃ নিমচাঁদবাবুর গৃহে আমি সুখেই ছিলাম; কিন্তু আমার দ্বারা আসল কাজের বিশেষ কিছু হয় নাই। ছাত্র দুটীর একটীর বয়স তের কি চৌদ্দ এবং দ্বিতীয়টীয় বয়স এগার কি বার হইবে। দুটীই অত্যন্ত চঞ্চল ও অনাবিষ্ট ছিল; লেখাপড়ায় ইহাদিগের মোটেই রুচি ছিল না। ছোটটী দেয়াল কি টেবিলের পায়া ঠেস দিয়া দিব্য ঘুমাইতে পারিত। এক দিন পাঠে অমনোযোগের জন্য সামান্য একটু শাসন করিয়াছিলাম; সে দুই এক ফোটা চোখের জল ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের বইখানা মাটীতে পড়িয়া গেল। বার চৌদ্দ দিন পড়ার বই মাটীতেই রহিল। তাহার উপরে এক ইঞ্চি পুরু ধূলি জমিল, তবু এই বালক বইখানি উঠাইল না। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাইতাম, কিন্তু "শুধু ভস্মে ঘি ঢালা।"

ছুটীর পরে গুরুদাসবাবু সুস্থ দেহে ফিরিয়া আসিলেন। সিমলা প্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরীর প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। নবেম্বরের শেষ দিকে তিনি বিবাহ করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। আমরা ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থান করিলাম; নিকটেই ১৬নং রাজা লেনে দাদার ছাত্রাবাস, আমি অনেক সময় সেখানে কাটাইতাম। ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সমারোহের সহিত বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আমি অজ্ঞাত যুবক হইলেও "আমার দাদার বিবাহ" এই দাবিতে বেদির পশ্চাতে বসিয়া অনুষ্ঠান দর্শন করিলাম।

দুই এক দিন পরে বরকন্যা, কন্যার এক ভ্রাতা এবং আমি, আমরা এই চারজন ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে গুরুদাস বাবুর শাশুড়ী মূর্চ্ছিতা হইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে পত্নীর দুই চোখ ফুলিয়া গেল। নারায়ণগঞ্জের নিকটে ষ্টীমার আসিলে নদীতীরে খড়ের ঘর দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ দেখুন, ময়মনসিংহে কি এইরকম ঘর?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" এতক্ষণ তাঁহার মুখে কথা শুনি নাই।

একটা ঘটনা বলি। ষ্টীমারে দুপুর বেলা কি খাইব, এই প্রশ্ন উঠিল। আমি নিরামিষভোজী, সুতরাং বাট্‌লারের মাংসভাত খাইতে পারি না। সঙ্গে পাঁউরুটী ছিল, কিন্তু দেখা গেল, চিনি আনিবার কথা কাহারও মনে ছিল না। এক হাঁড়ি নূতন গুড়ের সন্দেশ ছিল; গুরুদাস বাবু বলিলেন, "সন্দেশ দিয়া রুটী খাও।" আমি সন্দেশ প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে রাজি হইলাম না। তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, বলিলেন "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।" আমার মন তাহা মানিল না; আমি শুধু পাঁউরুটী খাইয়াই সারাদিন রহিলাম।

এক দিন দুই রাত্রি পথে থাকিয়া আমরা ময়মনসিংহে পৌঁছিলাম। নবদম্পতী গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করিলেন, আমি নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলাম। কয়েক দিন পরে গুরুদাস বাবু বৌভাত উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবকে আহার করাইলেন, আমি তাহাতে কাজকর্ম্ম করিলাম

প্রায় এক বৎসরকাল গুরুদাস বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস করিলাম। এই সময়ে তাঁহাতে যে কয়টী বিশেষ গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর; কেন না, দ্বিতীয় বর্ষে আমাদের দুই জনের সম্পর্কে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী একজন খাঁটি ব্যাকুলপ্রাণ ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে আমাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন। শ্যামাচরণ দে ও আমি, এই দুইজন তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম, কখনও কখনও আর দুই একটী ছাত্রও থাকিত। এটী নিত্য উপাসনা; সময়ে সময়ে নৈমিত্তিক উৎসব হইত; কোনটী প্রাতঃকালে, কোনটী সায়ংকালে, কোনটী গভীর রাত্রিতে; শেষোক্ত উৎসবে তিনি বিশ্বাসী মণ্ডলীর সভ্যদিগকে আহ্বান করিতেন। উৎসবের সংস্রবেও তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছিলাম। এক দিন তিনি আমাকে ও আমার এক বন্ধুকে বলিলেন, "কাল উৎসব করিব, কিছু ফুল চাই।" আমরা পরদিন প্রাতঃকালে দুই তিন মাইল দূরে ফুল সংগ্রহ করিতে গেলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে ইনি ইংরাজীতে ব্যাকরণ পড়াইতেন—আমি অল্প কয়েকদিন ইঁহার কাছে পড়িয়াছিলাম। সে দিন আমার পড়া প্রস্তুত হইল না। গুরুদাসবাবু ক্লাসে আসিয়া আমাদিগকে পড়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যাহারা উত্তর দিতে পারিল না, তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। আমার পাঠ কেন তৈয়ারী হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু বাড়ীর উৎসব এবং স্কুলের পাঠ স্বতন্ত্র রাখিলেন।

গুরুদাসবাবুর শাসনপ্রণালীতেও একটু বিশেষত্ব ছিল। আমি অন্যায় কিছু করিলে ইনি রাগের মাথায় বকাবকি করিতেন না, শান্তভাবে দণ্ড দিতেন। একদিন ইহার ঘরে খেলিতে খেলিতে আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম; সে দিন কিছু বলিলেন না। আর এক দিন অসাবধানতাবশতঃ বেঞ্চ ফেলিয়া দিয়া ল্যাম্পটা চুরমার করিলাম। সে দিন বলিলেন, "তুমি এ ঘরে আর আসিও না।"

তারপর কয়েক মাস আমাকে না ডাকিলে আমি সে ঘরে যাই নাই। তৃতীয় একদিন ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইয়া এক বন্ধু ও আমি সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইয়া ঝাউবনে বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলাম, গায়ের কাপড় গায়ে শুকাইল। দীর্ঘকাল পরে যখন বাড়ী আসিলাম, তখন গুরুদাসবাবু আমাকে শুধু বলিলেন, "তুমি আর নদীতে স্নান করিতে যাইবে না।" অন্য একটা ঘটনা বলিতেছি। আমাদের গণেশ নামে একটী অল্পবয়স্ক হিন্দুস্থানী চাকর ছিল; সে একাকী রান্না ও আর সব কাজ করিত। তাহাকে আমরা বড় ভালবাসিতাম, তাহার সঙ্গে এক থালায় খাইতাম, এক বিছানায় শুইতাম। এক দিন গুরুদাসবাবু বাড়ী ছিলেন না, গণেশ আমার সহিত বেয়াদবী করিতে আরম্ভ করিল, দুই তিন বার নিষেধ করিলাম, গ্রাহ্য করিল না, তখন তাহাকে মারিলাম। আমি নিজের ঘরে যাইয়া রাগে টং হইয়া বসিয়া রহিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ যদি গুরুদাসবাবু আমাকে কিছু বলেন, তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইব। কিছুকাল পরে তিনি আসিয়া দেখিলেন, গণেশ কাঁদিতেছে; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আমি তাহাকে মারিয়াছি। তখন তিনি নিঃশব্দে আমার ঘরে আসিলেন, এবং আমার চেহারা দেখিয়াই নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ কিছু অন্যায় করিয়াছ কিনা?" প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল যে, আমি গণেশকে মারিয়া অন্যায় করিয়াছি। তাহাকে শুধু মারিয়াছি বলিয়াই যে আমার দোষ হইয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু রাগ করিয়া মারিয়াছি, আমার দোষ এইখানে। আমি যে খুব রাগিয়া গিয়াছিলাম, আমার মুখের ভাবেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি অবনত মস্তকে ত্রুটি স্বীকার করিলাম। তখন তিনি আমার প্রতি এই দণ্ডবিধান করিলেন—"তুমি আজ রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া উপাসনার ঘরে যাইয়া বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুবচরিত্র পাঠ করিবে ও তৎপরে প্রার্থনা করিবে।" আমি ঠিক চারিটায় উঠিয়া পাঠ ও প্রার্থনাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা যাপন করিলাম; ভোরে তিনি আমাদিগকে লইয়া যথারীতি উপাসনা করিলেন; আদর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

আমি গুরুদাসবাবুকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম, এবং তিনিও আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমি এই সময়ে তাঁহার একটা আদেশও লঙ্ঘন করি নাই। তাঁহাকে না বলিয়া বেড়াইতে যাইতাম না। তিনি যদি বলিতেন, 'দক্ষিণ দিকে যাইও না; উত্তর দিকে যাও' তবে সেই কথাই শিরোধার্য্য করিতাম। তিনি কতবার আমার হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিতেন, 'চিঠিখানা ডাকে দিয়া এস, কিন্তু শিরোনাম দেখিও না", আমি ঠিক আদেশানুযায়ী চিঠি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিতাম। এক বৎসর পরে জানিতে পারিলাম, পত্রগুলি তাঁহার ভাবী পত্নীকে লিখিতেন।

১৮৮৬ সনের ২৭এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গুহ মহাশয়কে আমরা বিদায়সূচক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলাম। তদুপলক্ষে স্কুলে একটী বিপুল সভা হইল, তাহাতে ছাত্রগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দনপত্র জেলা স্কুলের একটী ছাত্র কবিতায় লিখিয়া দিয়াছিলেন, কবিতাটী সুন্দর হইয়াছিল, দুই একটী পদ এখনও মনে আছে। আমি একটা ইংরেজী কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। আমরা রোহিণীবাবুকে হৃৎপিণ্ডের আকৃতি রূপার কৌটায়

একটী সোণার আংটী উপহার দিলাম। তিনি মনোহর ভাষায় সময়োচিত উত্তর দিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমরা কয়েকটী অনুরাগী ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গৃহে গেলাম; সেখানে তিনি আমাদিগকে দুই একটা গান গাহিয়া শুনাইলেন। রাত্রি প্রায় দশটায় বিদায় পর্ব্বের পরিসমাপ্তি হইল। দুই এক দিন পরে তিনি ঢাকায় যাইয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

রোহিণীবাবু গৌরবর্ণ, সুগঠন ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তিনি এণ্ট্রান্স হইতে বি. এল্. পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরীক্ষাও একবারে পাশ করেন নাই; অথচ ইংরেজী গণিত প্রভৃতি যাহা পড়াইতেন, তাহাতেই ইঁহার শিক্ষাদানের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। ইঁহার ইংরেজীর উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল, ইংরেজী বক্তৃতাও হৃদয়গ্রাহী হইত। ইঁহাকে পড়াইবার সময়ে কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই; কোন ছাত্রকে তিরস্কার করিতে হইলে তিনি রুক্ষ বাক্য ব্যবহার করিতেন না, মিষ্ট শ্লেষাত্মক ভাষায় তাহাকে লজ্জা দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি গুহভ্রাতাদিগের অনুরাগ ছিল; ইনি চমৎকার গান করিতে পারিতেন, ছাত্রদিগকে লইয়া সভাসমিতি করিতেন, ব্যায়ামে, খেলাধূলায় উৎসাহ দিতেন, আমাদিগের সহিত পাঞ্জাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ এমন চৌকস সর্ব্বগুণসম্পন্ন শিক্ষক আমি আর দেখি নাই। আমি ইঁহার নিকটে এক বৎসর কাল শিক্ষা পাইয়াছিলাম; ইনি আমার যথার্থ হিতকামী ছিলেন, শিক্ষকতা ত্যাগ করিবার পরেও ইঁহার সহিত আমার পত্রালাপ হইত।

বালকপ্রার্থনা সমাজ

১২৯৩ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (১৮৮৬) আমরা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া "বালকপ্রার্থনা সমাজ" নামক একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী স্থাপন

করি। পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ যে সাধনপ্রণালী দিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপরে কয়েকটী বিশেষ বিধি যোগ করিয়া এই মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইহা দ্বারা সভ্যদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি বর্দ্ধিত করা। প্রত্যহ তিন বার উপাসনা ও প্রার্থনা, প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তাঁহাকে স্মরণ করা, এবং সদাসর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখা—এই তিনটি বিধি নূতন যুক্ত হইল। মণ্ডলীর ভাব দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে দুইটী নিয়ম গৃহীত হইল—(১) সপ্তাহে যথানির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত উপাসনা করিবে; (২) মাসে অন্ততঃ একবার সকলে একত্রিত হইবে এবং এই সকল নিয়ম কত দূর প্রতিপালিত হয়, তাহার আলোচনা করিবে।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের চিত্তে বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের সংকল্প জাগিয়াছিল —নিম্নোক্ত নিয়মটী তাহার প্রমাণ।

"প্রার্থনা সমাজের অনুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক কোনও বস্তু ব্যবহার না করা।"

পরিহার্য্য দশটী বিষয়ের মধ্যে একটী ছিল অভিনয় দর্শন।

বিশেষ নিয়মের মধ্যে একটী উল্লেখ করিতেছি—

স্কুল বন্ধ হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে স্ব স্ব আলয়ে উপাসনা করিবে, এবং ডাকযোগে পরস্পরের বার্ত্তা জানাইবে।

১২ই ফাল্গুন অশ্বিনীকুমার বসু, মহিমচন্দ্র রায়, কেদারনাথ সাধ্য এবং আমি, এই প্রার্থনা সমাজভুক্ত হই। পর বৎসর পৌষ মাসে দুর্গাদাস রায় ও বসন্তচন্দ্র দাস এবং মাঘ মাসে কৈলাসচন্দ্র

রায় ও দেবেন্দ্রকিশোর বিশ্বাস মণ্ডলীতে যোগ দেন। সভ্যগণ সকলেই যত দিন ময়মনসিংহে ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যে ঘন-নিবিষ্টতা ছিল।

নব সংকল্প গ্রহণ করিবার পরে সখের অভিনয় দর্শন বন্ধ করিলাম; থিয়েটারে এ জন্মে যাই নাই। বিলাতী জুতা কখনও ব্যবহার করি নাই। ষ্টীল পেন ত্যাগ করিলাম, কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় খাগের, এবং এণ্ট্রান্স পরীক্ষার সময় হাঁসের পাখার কলম ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

ষ্টীমারে গুরুদাসবাবুর অনুরোধেও গুড়ের সন্দেশ খাই নাই; কিন্তু মাস তুইয়ের মধ্যে মিঠাই বর্জ্জনের সংকল্প ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। যে অবস্থায় পড়িয়া সংকল্প ছাড়িয়াছিলাম, তাহা একটু খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

এক দিন ষ্টেশনের অদূরে এক ভদ্রলোকের গৃহে নিমচাঁদবাবুর বাড়ীর সকলের রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। যিনি আমাকে নিমন্ত্রণের সংবাদ দিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি মাছ মাংস খাই না, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাহা জানেন তো?" তিনি উত্তর দিলেন "হাঁ, জানেন, নিরামিষও থাকিবে।" নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আহার করিতে বসিলে প্রথমেই আসিল মাংসের পোলাও। আমি নিরামিষ-ভোজী জানিয়া বাড়ীর সকলে একেবারে অপ্রস্তুত, আমিও অপ্রস্তুত, হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন একজন তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধিতে গেলেন; এবং আর সকলের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাকে গরম গরম ভাত ও ছোলার ডাল আনিয়া দিলেন। তারপর পরিবেশনকারী আমার পাতে কতকগুলি পানতুয়া ঢালিয়া দিলেন; লজ্জায় আমার মুখে কথা সরিল না, আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া

মিষ্টগুলি আহার করিলাম। ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, সংকল্পত্যাগের জন্য আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই।

এই বৎসর মাঘ মাসে সারস্বতোৎসবে আমি "হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলনবিষয়ে রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া দশ টাকা পুরস্কার পাই। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় বলিলেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কি একটা কাজে টাকার প্রয়োজন। শুনিয়া টাকা কয়টা শরৎবাবুর হাতে দিলাম। তখন আমার পায়ে জুতা ছিল না, সকল দিকেই দারুণ অভাব ছিল।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ সারস্বতমণ্ডপে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পঠিত হইত। আমাকে একদিন সংবাদ দেওয়া হইল, রাত্রিতে নাট্যাভিনয় আছে, তৎপূর্ব্বে আমাকে প্রবন্ধ পড়িতে হইবে। আমি যাইয়া দেখিলাম, বিস্তর লোক জমিয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধ পাঠের বিষয়ে তখনও নিশ্চিত কিছু ঠিক হয় নাই। অমরবাবু একজন কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও 'হাঁ', 'না' কিছু বলিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "প্রবন্ধ পড়া হইবে কিনা, ঠিক করিয়া বলুন, যদি না হয়, বাড়ী চলিয়া যাইব, আমরা অভিনয় দেখি না।" তিনি অমনই উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন, "Why do you make a party of it ?" "তুমি দল পাকাইতেছ কেন ?" আমি বাড়ী চলিয়া গেলাম। পরদিন প্রাতঃ-কালে বড় বাজারে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে বসিয়াছি, ভক্তিভাজন বিজয়কুমার গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন, বিখ্যাত কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের দল সঙ্গীতের ভার লইয়াছেন, মাঝখানে এক জন আমাকে সারস্বত মণ্ডপে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, সেখানে কয়েক শত শ্রোতার সমক্ষে প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম।

গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের আগমনে এবার সারস্বত উৎসবের আকর্ষণ খুব বাড়িয়াছিল। কিন্তু একদিনের একটা অপ্রীতিকর ঘটনা আজও ভুলিতে পারি নাই। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের দল সারস্বত ক্ষেত্রে বিবিধ সঙ্গীত করিতেছেন, বিপুল জনমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে, হঠাৎ 'যবন' শব্দ শুনিয়াই তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমান সমাজের নেতা উকীল হামিদ উদ্দিন আহ্‌ম্মদ প্রতিবাদ করিয়া সঙ্গীতে বাধা দিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, 'যবন' শব্দের অর্থ 'বলবান্', উহাতে অবজ্ঞাব্যঞ্জক কিছুই নাই। কিন্তু তিনি শুনিলেন না, সঙ্গীত বন্ধ করিতে হইল।

হামিদ উদ্দিন আহ্‌ম্মদের গোঁড়ামি ছিল না; ইনি হিন্দুদিগের সহিত নানা সৎকর্ম্মে যোগ দিতেন, হিন্দুমুসলমানে মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইনিও তৎকালীন সাহিত্যে সদাপ্রচলিত যবন শব্দটা সহিতে পারেন নাই।

নূতন পরীক্ষার সূত্রপাত

"ঘটনার বিচিত্র বিধান,
কোথা হতে কোথা নিয়ে যায়।"

ঘটনা তো চক্রধরের চক্র; তাঁহার চক্র আমাকে আবর্ত্তে ফেলিয়া কেমন হাবুডুবু খাওয়াইবে, আবার অপার কৃপাগুণে তিনি স্বয়ং আমাকে উদ্ধার করিয়া কিরূপে আমার ভবিষ্য জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবেন, এই বার তাহা বলিবার সময় আসিয়াছে।

বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যাবেলা (১৮৮৭) নিমচাঁদ বাবু আমার কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পর দিন গুরুদাস বাবুকে বলিলাম, "আমি আপনার বাড়ীতে থাকিতে চাই।" তিনি

তৎক্ষণাৎ বলিলেন, You are always welcome (তুমি যখন আসিবে, তখনই সাদরে গৃহীত হইবে।) তাঁহার বেতন তখন ত্রিশ টাকা, গৃহশিক্ষকতা করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন; সবে নূতন সংসার আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এই ঔদার্য্য ভুলিবার নয়। আমি অবিলম্বে তাঁহার গৃহে চলিয়া আসিলাম। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা জয়াবতী চক্রবর্ত্তী স্বামীর যোগ্যা সহচরী,—শ্রমশীলা, সরলপ্রকৃতি উদার-হৃদয়, রন্ধনে নিপুণ, পরিবার পরিজন ও অতিথি অভ্যাগতের সেবায় তৎপর। এই নবদম্পতীর নিকটে থাকিয়া অনুভব করিতাম, আমি ইঁহাদেরই এক জন।

কিছুদিন পরে কলিকাতা হইতে গুরুদাসবাবুর শ্যালক দেবেন্দ্র একটা পরামর্শের জন্য আসিলেন। তাঁহার পিতা কন্যার বিবাহ দিয়াই সিমলায় চলিয়া গিয়াছিলেন; তিনি শীঘ্রই স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাদিগকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে চাহেন। যাহারা স্কুলে পড়িতেছে, তাহাদিগের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র, দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্ণলতা, ভ্রাতুষ্পুত্র রাজেন্দ্র এবং দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্র, গুরুদাসবাবু এই কয়জনকে শিক্ষার জন্য আপনার নিকটে রাখিবেন, চৌধুরী মহাশয় অর্থ সাহায্য করিবেন, দেবেন্দ্র এই প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। নরেন্দ্র আমাদিগের সঙ্গেই আসিয়াছিল। গুরুদাসবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কয়েক দিনের মধ্যে দেবেন্দ্র ভাইভগিনী দুটীকে লইয়া আসিলেন।

দেবেন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষার পরে আমাদিগের সহপাঠী হইলেন, স্বর্ণলতা মধ্যবাঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, রাজেন্দ্র ও নরেন্দ্র আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

মার্চ্চ মাসে বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গেল। আমি সকল বিষয়েই

প্রথম স্থান অধিকার করিলাম, এবং স্কুলের মাসিক ছয় টাকার একটা বৃত্তি পাইলাম। মহিমচন্দ্র দ্বিতীয় হইলেন।

ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তর লিখিতে লিখিতে হঠাৎ আমার মনে একটা নূতন ভাব উপলব্ধি করিলাম।

প্রথম শ্রেণী

৫ই এপ্রিল স্কুলের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া বেশ একটু গর্ব্ব হইল। আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পাঠ আরম্ভ করিতেই ইঁহাকে এমন রুক্ষ স্বভাব বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, ইহাতে আমার মন একেবারে দমিয়া গিয়াছিল, সারা দিন ও সারা রাত্রি এই দুর্ভাবনাই আমাকে পীড়া দিতেছিল যে, আমি এক বৎসর কিরূপে ইঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে যাপন করিব? কিন্তু ক্রমশঃ দেখিলাম, ইঁনি শুধু সুদক্ষ ও বহুদর্শী শিক্ষক নহেন, ইঁহার হৃদয় সুকোমল, আমার প্রতি স্নেহে উচ্ছ্বসিত। গিরিশবাবুর যে কোন একটা বিষয়ে অনন্য-সুলভ পাণ্ডিত্য ছিল, এমন বলিতে পারি না; তিনি অপর শত জনের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. উপাধিধারী ছিলেন, এই মাত্র; কিন্তু ইংরেজী, গণিত, ভূগোল—ইনি যাহা পড়াইতেন, তাহাতেই ইঁহার শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। স্কুলটী নূতন, তখনও আয়ব্যয়ের সমতায় উপনীত হয় নাই। তিনি ইহার উন্নতি সাধনে মনপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিদ্যালয়টীর ফল যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তদর্থে ইনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেন। প্রতিদিনের সযত্ন অধ্যাপনা ছাড়া সপ্তাহে সপ্তাহে আমাদিগের পরীক্ষা লইতেন, এবং কাগজগুলি সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। প্রথম শ্রেণীতে আদি হইতেই

পাঁচজনের গুণানুসারে একটা ক্রম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই—রজনীকান্ত গুহ, মহিমচন্দ্র রায়, শশিমোহন চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ নাগ। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফলও হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের বিচারশক্তি সমর্থন করিয়াছিল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে গিরিশবাবু প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নিজের বাড়ীতে ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অনেকগুলি ছাত্র উপস্থিত থাকিত। দশ পনর দিন পরে আমি বাড়ী গেলাম। পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই। মায়ের কাছে দুই এক টাকা পাই কি না, ইহাও বাড়ী যাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দাদা বি.এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছেন, সে আকর্ষণ তো ছিলই। কিন্তু বাড়ী যাইবার পরেই আমাকে দিবা-নিদ্রা অভিভূত করিয়া ফেলিল। প্রত্যহ মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে তিন চারি ঘণ্টা ঘুমাইতে লাগিলাম। আমার পড়াশুনা অল্পই হইতেছে, ওদিকে সমপাঠীরা হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে পাঠ করিয়া আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, এই দুর্ভাবনা আমাকে কাতর করিল। বাড়ীতে টাকা পয়সাও কিছু মিলিল না; এক সপ্তাহ পরে আমি খালি পায়ে খালি গায়ে ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এই ত্বরিত প্রত্যাবর্ত্তনের কদর্থ আমার আসন্ন বিপত্তির সহায় হইল।

দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আমি একত্র পড়িতাম, এক ঘরে থাকিতাম, সুতরাং তাহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। এক দিন সে আমাদের ঘরের আরও দুই একটী ছাত্রের সম্মুখে আমাকে এই ভাবের কতকগুলি কথা বলিল যে, আমার সাবধান হইয়া চলা উচিত; আমি এত শীঘ্র কেন বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছি, তাহা

কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। এই প্রকার অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এবং গুরুদাসবাবুকে তাহা জানাইলাম। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে দেবেন্দ্র নির্ব্বোধ—এই দেখ সিমলা হইতে এক আত্মীয় তাহার বিষয়ে কি লিখিয়াছেন—তাহার কথার কোন মূল্য নাই। আমি আশ্বস্ত হইলাম; ভাবিলাম, গোলযোগ মিটিয়া গেল। জানিতাম না, সঙ্গোপনে আমার বিরুদ্ধে একটা অগ্ন্যুদ্গার ধূমায়মান হইতেছে।

এইখানে আমার মনোভাব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এ কথা সত্য, যে স্বর্ণলতার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমার আচরণে তাহা প্রকাশ পাইত, ইহা বলিতে গেলে অনেকখানি কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। আমি কখনও তাঁহার সহিত একাকী কথা বলিতাম না, বলিবার সুযোগও খুঁজিতাম না। দুই বেলা তাঁহার ভাইদের সহিত পাকঘরে একত্র আহার করিতাম, তিনি পরিবেশন করিতেন; তাঁহাকে দেখিবার ইহাই আমার প্রধান অবসর ছিল। এক পরিবারে বাস করিলে একে অপরের সহিত প্রয়োজন মত কথা বলিতেই হয়; আমাকেও বলিতে হইত; যাহা বলিবার, আমি অপরের সমক্ষেই বলিতাম। স্বর্ণলতাও এই নিয়ম মানিয়া চলিতেন। তিনি আমার সহিত সাধারণ ভদ্র ব্যবহার করিতেন—যতটুকু না করিলে অশোভন হয় তদতিরিক্ত কিছু করিতেন না।

বহিষ্কার

এক বাস্তুভিটার উত্তরার্দ্ধে শ্রীযুক্ত শশীকুমার বসু ও দক্ষিণার্দ্ধে গুরুদাসবাবুর বসতবাটী ছিল। গুরুদাসবাবু প্রাতঃকালে স্নানান্তে

পারিবারিক উপাসনা করিয়া ছেলে পড়াইতে যাইতেন, এবং বাড়ীতে আসিয়া আহারের পরেই স্কুলে উপস্থিত হইতেন, ফিরিয়া আসিতে প্রায় পাঁচটা বাজিয়া যাইত। সায়ংকালেও কোন কোন দিন ব্রাহ্ম-সমাজের ও অন্যবিধ কাজে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইত। তিনি দিবার অধিকাংশ ভাগ গৃহে থাকিতেন না, যেটুকু থাকিতেন, তাহাতে অসঙ্গত কিছু দেখিতে পাইলে আমাকে ও তাঁহার আত্মীয়াকে অবশ্যই তাহা বলিতেন। তাঁহার স্ত্রী নিরীহ ভাল মানুষ; কাহাকেও সন্দেহের চক্ষুতে দেখা, অথবা কল্পনাবলে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করা—সে দিকে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না; সুতরাং গুরুদাসবাবুর কাণে যখন জানি না কে কতকগুলি কথা ঢালিল, তখন তিনি একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন; এবং ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে শশীবাবুর গৃহে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলেন।

৮ই আগষ্ট সোমবার (১৮৮৭) অপরাহ্ণে আমার কক্ষে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত পড়িতেছিলাম, প্রায় এক ঘণ্টা পরে গুরুদাসবাবু আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে দিন সঞ্জীবনী আসিবার কথা, তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "সঞ্জীবনী আসিয়াছে?", তিনি 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া চলিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই আবার আসিয়া বলিলেন, "দেখ, রজনী, উঁহারা মনে করেন, তোমার এখানে থাকা উচিত নয়; তুমি শ্রীনাথবাবুর বাসায় চলিয়া যাও।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উঁহারা কে?" উত্তর—"শ্রীনাথবাবু, শরৎবাবু, চন্দ্রমোহনবাবু, শশীবাবু।" আমি তখন বলিলাম, "আমাকে আগে বলেন নাই কেন?" একথা বলিবার কারণ এই যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে মধ্যম দাদা টাঙ্গাইল গ্রেহাম স্কুল হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমি যদি সেই স্কুলে যাই, তবে কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে বৃত্তি দিতে

প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আগষ্ট মাসে স্কুল ছাড়িয়া গেলে আমাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার অধিকার হারাইতে হইবে। গুরুদাসবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথায় বুঝিয়াছিলাম, আমার পরদিন সকালে গেলেই চলিবে। কিন্তু আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিলাম না, তখনই বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। তিনি পুনরায় পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "উঁহারা এ কথাও বলিতেছেন, তুমি আমার কিংবা শশীবাবুর বাড়ীতে আসিও না।" আমি মনে মনে বলিলাম, "এ নিষেধবাণী একেবারেই অনাবশ্যক, আমি আর আপনাদের বাড়ী মাড়াইব না।" রাস্তায় উঠিয়া অনুভব করিলাম, আমি অকূলে ভাসিলাম। তখনই পণ্ডিত মহাশয় আসিলেন; দুইজনে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। তাঁহার নিকটে জানিতে চাহিলাম, আমার সম্বন্ধে কি আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন, "এই কথা হইল যে, তোমার গুরুদাসের বাড়ীতে না থাকাই ভাল।" আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি, সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিলাম না। তিনি শুধু বলিলেন, "এই তো সেদিন এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, রজনী অত তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল কেন?" তিনি এক ভদ্রলোকের অসঙ্গত ব্যবহারের একটা দৃষ্টান্ত দিলেন, আমার সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। তারপর আমি কোথায় থাকিব, এই প্রশ্ন উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমার বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার।" আমি—"আপনার বাড়ীতে পড়াশুনার সুবিধা হইবে না।"

পণ্ডিত মহাশয়—"কেন?"

আমি—"আপনার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অসুস্থ থাকে, সে অবস্থায় পড়ার ব্যাঘাত ঘটিবে।"

পণ্ডিত মহাশয়—"আমি তোমাকে কিছু করিতে বলিব না।"

আমি—"আপনি না বলুন, কিন্তু আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে; ছেলেমেয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে আমি কিরূপে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব?"

তখন তিনি বলিলেন, "যদি আমার বাড়ীতে না থাক, তবে অমর বাবুর বাড়ীতে থাকিতে পার, কিন্তু সেখানে থাকিলে তোমাকে রান্না করিয়া খাইতে হইবে।" আমি তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিলাম, "রান্না করিতে হইলে পড়িব কখন?" তিনি বলিলেন, "তোমাকে বামুন রাখিয়া দিবে কে?" আমি ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর আমরা তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন, আমি বাহিরের ঘরে বসিয়া আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিলাম। সে দিন প্রাণে যেরূপ বল পাইয়াছিলাম, সেরূপ অধিক দিন পাই নাই।

আহারের পরে আমি উকিল শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিশ্বাসের বাসায় আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু শশিমোহন চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। সে আমার বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। একটু পরেই বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাকে আহার করিতে ডাকা হইল। শশী খাইয়া আসিয়া বলিল, "দেখ, খাইতে খাইতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়াছে। চল, আমরা শরৎবাবুর নিকটে যাই।" এখানে বলা কর্ত্তব্য, সে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিল, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহার সহানুভূতি ছিল না। আমরা ব্রাহ্ম দোকানে যাইয়া দেখি, শরৎবাবু শুইয়া আছেন, কিন্তু তখনও ঘুমান নাই। আমাদিগের কথা শুনিয়াই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, এবং নদীতীরে দাঁড়াইয়া আমার যাহা বলিবার ছিল, শুনিলেন। শরৎবাবুও স্বীকার

করিলেন, "শ্রীনাথবাবুর বাড়ীতে তোমার পড়াশুনার সুবিধা হইবে না।" খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কাল সকালে আসিও, চন্দ্রমোহনবাবুকে বলিয়া দেখিব, তাঁহার বাড়ীতে তোমার থাকিবার ব্যবস্থা হয় কিনা।" শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, উহারই একাংশে বাস করিতেন। পরদিন প্রাতঃকালে শরৎবাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। শরৎবাবুর প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, আমি দিনের বেলায় আমার স্কুলে পড়াশুনার জন্য থাকিব, তাঁহার গৃহে আহার ও রাত্রি যাপন করিব। বিদ্যালয় দুইটীর মধ্যে শুধু জোড় পুষ্করিণীর ব্যবধান, সুতরাং এই ব্যবস্থা আমার পক্ষে ভালই হইল। চন্দ্রমোহন বাবু এক জন বিশ্বাসী, সরলচিত্ত, ব্রহ্মপরায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম ছিলেন; তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমি সুখী ও উপকৃত হইলাম।

কিন্তু এই ব্যবস্থার খবর পাইয়া গুরুদাসবাবু আপত্তি করিলেন, এবং তাঁহার আত্মীয়ার বালিকা-বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। অগত্যা আমি ব্রাহ্মদোকানে পূর্ব্বকার সেই ঘরে থাকিবার স্থান করিয়া লইলাম। ইহাতে আমার খুব অসুবিধা হইতে লাগিল; বর্ষাকাল, বাসস্থান হইতে আহারের স্থান দূরে; দিনের বেলায় তবু এক রকম চলিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিতে এক এক দিন বৃষ্টিতে কাপড় চোপড় ভিজিয়া যাইত, প্রয়োজনীয় পরিধেয়ের অভাবে আর্দ্র বস্ত্রেই রাত্রি কাটাইতে হইত। কোন কোন দিন বৃষ্টির জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ে যাইতেই পারিতাম না; সে দিন শরৎবাবু ও অমরবাবুর নিকট হইতে ভাত চাহিয়া লইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতাম।

দুই এক মাস পরে ষ্টেশনের দক্ষিণে ব্রাহ্মপল্লীর পত্তন হইল ; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত বাড়ী করিয়া উহার প্রথম অধিবাসী হইলেন, ব্রাহ্মদোকান উঠিয়া গেল, আমি আপাততঃ অমরবাবুর গৃহে স্থান পাইলাম।

এই সমস্ত গোলযোগ ও অসুবিধার দরুণ আমার ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হইল, আমি কোন বিষয়েই প্রথম হইতে পারিলাম না।

১লা কার্ত্তিক গুরুদাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। প্রায় একমাস পরে তিনিও ব্রাহ্মপল্লীতে নিজের নূতন বাটীতে চলিয়া গেলেন ; তাঁহার ভদ্রাসন জেলা স্কুলের পঞ্চম শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু ক্রয় করিলেন। তিনি তাঁহার পরিবার পৈত্রিক বাড়ীতে রাখিয়া একাকী নবগৃহে বাস করিতে আসিলেন। এই অবসরে আমাদের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিকুমার বসু আমাকে জানাইলেন যে, আমি যদি দ্বিতীয় শশীবাবুর গৃহে বাস করিবার অনুমতি পাই, তবে তিনি তাঁহার পরিবারে আমার আহারের ব্যবস্থা করিবেন। জেলা স্কুলের শশীবাবুও আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন, আমি শীতের প্রারম্ভে গুরুদাসবাবুর পূর্ব্বতন শয়ন ঘরেই প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

আমি অমরবাবুর বাড়ীতে দুই কি তিন মাস ছিলাম। ১৮৮২ সন হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। তাঁহার ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত কাঞ্চনকান্তি, দীর্ঘশ্মশ্রু, সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, বক্তা, গ্রন্থকার, সংবাদপত্রসম্পাদক, সুগায়ক, স্বদেশসেবক, যুবকসমাজের নেতা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের

অন্যতম অধিনায়ক—নানা ক্ষেত্রেই তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত। তাঁহার বক্তৃতায় রসিকতা ও অনুপ্রাসের হিল্লোল শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিত। বৎসরের পর বৎসর তিনি এক একটী যুবককে প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে আপনার অনুগামী করিয়া রাখিতেন। অনেকে তাঁহাকে কূটনীতিবিশারদ বলিয়া জানিতেন। আমি কখনও তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে পারি নাই। অমরবাবু ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তিনি উহাতে ষষ্ঠ শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন বটে; কিন্তু ময়মনসিংহে শিক্ষা, ধর্ম্ম ও জনসেবার ক্ষেত্রে তাঁহার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।

দুই শশীবাবুর অনুগ্রহে অবশিষ্ট দুই তিন মাস আমার আরামেই কাটিল। আটমাসে ছয় জনের অন্ন খাইলাম, সহরের চারি কোণ প্রদক্ষিণ করিলাম।

এই পরিভ্রমণের ফলে আমার অপরাধের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম; দেখিলাম, বিপক্ষেরা কেহ তিলকে তাল করিয়াছেন, কেন্দ্র বিন্দুর উপরে সৌধ গড়িয়াছেন, কেহ বা নিছক মিথ্যা রটনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

ডিসেম্বরের কিংবা জানুয়ারীর প্রথম ভাগে (১৮৮৮) আমাদের Test Examination হইল। আমি সকল বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিলাম, মহিমচন্দ্র দ্বিতীয় হইলেন। অতঃপর গিরিশ বাবু আমার জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছি। আমি মোটের উপরে শতকরা ৭৬ নম্বর পাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৪ নম্বর বাড়াইতে পার তবে প্রথম স্থান অধিকার করিবে। এজন্য তোমাকে আরও পরিশ্রম করিতে হইবে। তিনি

নিজের হাতে একটা রুটিন লিখিয়া দিলেন, তাহা এখনও আছে। উহাতে সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পড়িবার ব্যবস্থা হইল—

6—9	9—10½	11½—12½	12½—1
History of England	General Geography	Sanskrit	Recapitulation
1—2½	2½—4	4—5	5—6
English	Grammar & Exercise	Arithmetic & Mensuration	Rest & Recapitulation of History
6—8		8—10	10—12
History of India		Physical Geography & Mensuration	Geometry & Algebra

গিরিশবাবু জানিতেন না, কিরূপ অপদার্থের উপরে আশা স্থাপন করিয়াছেন। আমি একদিন যদি অশেষ কষ্টে ১২ টা পর্য্যন্ত পড়িতাম, তবে পরদিন ৮টার পরে আর চোখ মেলিতে পারিতাম না। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে আমরা তিনটী বন্ধু রাত্রিতে একত্র বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িবার বন্দোবস্ত করিলাম; রাত্রিতে ভাত খাইলে বেশী ঘুম পায়, এজন্য রুটী ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপদ কাটিল না। আমি চেয়ারে বসিয়া লেপ গায়ে দিয়া পড়িতে বসিতাম, খানিক পরেই টেবিলের উপরে পা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম, পরিশেষে বেঞ্চের উপরে অঘোর নিদ্রায় রাত্রি কাটাইতাম, হাতের কাছেই রুটি পড়িয়া থাকিত।

তারপর জানুয়ারী মাসে প্রায় তিন সপ্তাহ সারস্বত ও মাঘোৎসবে মাতিয়া পড়াশুনায় খুব অবহেলা করিলাম। কিন্তু গিরিশবাবু আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের কঠিন কঠিন স্থলের ব্যাখ্যা লিখিয়া দিতেন; একখানি ব্যাকরণের আদ্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশগুলি লালনীল পেন্সিলে দাগ দিয়া দিলেন; আমার সহিত একত্র জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করিতে বসিতেন; কখনও তিনি অগ্রে সমাধান করিতেন, কখনও আমি করিতাম, ইহাতে তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিত না।

গিরিশবাবু শ্রুতকীর্ত্তি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে গৃহে এবং বিখ্যাত ছাত্র উপেন্দ্র লাল মজুমদারকে স্কুলে পড়াইয়াছিলেন। আমাকে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে তিনি আমার নিকটে ইঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে এই দুই জনের সহিত আমার পার্থক্য, তাহাও বলিতেন। তাঁহার এক একটা কথা মনে পড়িলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। আমি যে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইব, সে সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের এক তিল সন্দেহ ছিল না; আমার দ্বারা তাঁহার বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে, এইটীই তাঁহার আকিঞ্চন ছিল।

এবারকার সারস্বত উৎসবের একটা ঘটনা বলিয়া রাখি। সে সময়ে বিপুল সমারোহের সহিত এই উৎসব সম্পন্ন হইত। (ব্রাহ্ম-সমাজে চল্লিশ বৎসর, ২০৯-১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। একদিন সায়ংকালে চন্দ্রাতপতলে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে; হঠাৎ দেখিলাম, যাদব চন্দ্র লাহিড়ী নামক এক উকীলের সহিত কতকগুলি ছাত্রের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে দুই একটী আমার পরিচিত ছিল। আমি দৌড়াইয়া গিয়া মধ্যে পড়িয়া উত্তেজিত ছাত্রদিগকে থামাইতে

চেষ্টা করিলাম, এবং উকীল মহাশয়কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে দেখিয়া বলিলাম, "Sir, it is beneath your dignity to talk with these men". আর যাও কোথায়; কথাটা শুনিয়াই অমর বাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। "You have come to deliver a moral lecture—brought up in our society and fed with our food—though you are the head boy of my own institution, I don't care"—ইত্যাদি মর্ম্মভেদী বাক্য বলিয়া গেলেন। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখিয়াছিলেন, তিনি অমরবাবুকে বলিলেন, "ওকে বকিতেছেন কেন ? ও তো পরে আসিয়াছে।" অমর বাবু, "আপনি চুপ করুন", বলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন, বকুনি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, গালাগালি থামিলে বলিলাম, "আমি যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি, সেজন্য ক্ষমা চাহিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে যাদববাবুর নিকটে লইয়া চলুন।" তারপর যাদববাবুকে বলিলাম, "Sir, pardon me if I have done anything wrong." তিনি তখনও চেঁচাইতেছিলেন, আমার কথা কাণেই তুলিলেন না। আমার প্রতি যে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এ প্রকার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

আমি বাক্-শল্যে দগ্ধ হইয়া বাসায় যাইয়া শুইয়া রহিলাম। সে রাত্রিতে একদল যুবকের ব্যায়াম দেখাইবার কথা ছিল। তাহারা আমার অপমানের বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্যায়াম প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃত হইল। অমরবাবুর অনুগত ও আমার দাদার ভূতপূর্ব্ব সহাধ্যায়ী প্রভাতচন্দ্র ঘোষ আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং আমি পুনরায় উৎসবক্ষেত্রে গেলে বলিলেন, "তুমি ব্যায়ামের দলকে বলিয়া কহিয়া

ক্রীড়া দেখাইতে রাজী কর।" তাহারা তখন কোথায় ছিল, জানিতাম না, আমিও কিছু বলিতে সম্মত হইলাম না—বাড়ী যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন শুনিলাম, অনেক সাধ্যসাধনায় যুবকেরা ব্যায়াম দেখাইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় ময়মনসিংহে আগমন করেন। ৯ই তারিখ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য হার্ডিঞ্জ স্কুলের হলে এক বৃহৎ জনসভার অধিবেশন হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। অভিনন্দন পত্র প্রদানের পরে আমি একটা ইংরেজী কবিতা পাঠ করি। রমেশ দত্তের সম্মুখে স্কুলের এক ছাত্র ইংরেজী কবিতা পাঠ করিতেছে—ধৃষ্টতা কম নয়। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায়—সেকালে বাঙ্গালীর একমাত্র ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র—সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে ছিল, "Some English stanzas were read."

প্রবেশিকা পরীক্ষা

৬ই মার্চ্চ সোমবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। তখন ময়মনসিংহে পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না, পরীক্ষার্থীদিগকে ঢাকায় যাইয়া পরীক্ষা দিতে হইত। আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গুহকে লিখিলাম, তাঁহার আবাসে আমার থাকিবার সুবিধা হইবে কিনা। ভিতরবাড়ীর ঘরগুলি পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ ছিল। তিনি বৈঠকখানা ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি, মহিম ও আরও কয়েক জন ছাত্র ২৮এ ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০৷৷টার গাড়ীতে যাত্রা করিয়া ভোরে ঢাকায় পঁহুছিলাম। গাড়ী ছাড়িতেই সকলে মিলিয়া গান ধরিলাম, "মা-ই সব,

মা-ই সব, এই আমাদের মাতৃস্তব, জানি না আর সাধন ভজন।” সারারাত্রি গানে ও গল্পগুজবে মহোল্লাসে কাটিয়া গেল, কেহই ঘুমাইলাম না।

হেড মাষ্টার মহাশয় বলিয়া দিলেন, প্রতিদিনের প্রশ্নপত্র তাঁহাকে পাঠাইয়া জানাইতে হইবে, কেমন পরীক্ষা দিলাম।

ইংরেজী ভালই হইল। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে পাটীগণিত ও বীজ গণিতের তুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। অপরাহ্নে জ্যামিতি সন্তোষজনক হইল না, পরিমিতি আবার সকল আশা ভরসা চূর্ণ করিয়া দিল। মন এত খারাপ হইল, যে রাত্রিতে আর বই স্পর্শ করিলাম না। তৃতীয় দিন সংস্কৃত ও চতুর্থ দিন ইতিহাস-ভূগোলে মোটের উপর আশানুরূপ লিখিলাম।

আমি জানিতাম, গণিতে দক্ষতা না থাকিলে কেহই পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে না। আমি গণিতে চিরকালই অপরিপক্ক, যদিচ দ্বিতীয় শ্রেণীতেও শতকরা ৯৭ নম্বর পাইয়াছিলাম। শেষ পরীক্ষায় তুর্ব্বলতা ধরা পড়িল। বৃত্তি পাইব কি না, সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ রহিল।

ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইয়া গিরিশবাবুকে পরীক্ষার সবিশেষ বিবরণ বলিলাম। তিনি ফলাফল নিশ্চিত বুঝিবার অভিপ্রায়ে আমাকে বলিলেন, “ইংরেজী প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলি আবার লিখিয়া দেও।” শুনিয়া আমার গায়ে কাঁটা দিল, বলিলাম, “এখন লিখিলে পূর্ব্বের চেয়ে ভাল হইবে।” তিনি কথাটা মানিয়া লইলেন, আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম।

শ্রীযুক্ত রত্নমণি গুপ্তের সহিত দেখা করিলাম। তিনি এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন, "He expects a first grade scholarship."—সে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইবার আশা করে।"

কথাটার সহিত পরবর্ত্তী বিবরণের একটু সম্বন্ধ আছে। আমি সেই যে আড়াই বৎসর পূর্ব্বে আমার মধ্য-বাঙ্গলা পরীক্ষার বৃত্তি জেলা স্কুল হইতে উঠাইয়া আনিবার দরখাস্ত করিয়াছিলাম, এত পরে গিরিশবাবু আমাকে তাহার ফল জানিতে দিলেন। আমার দরখাস্ত ও তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র পরিশেষে ডিরেক্‌টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের হাতে যায়। অনেক লেখালেখির পরে তিনি জানাইলেন, "The Director of Public Instruction is pleased to cancel his scholarship," অর্থাৎ "তিনি আমার বৃত্তি রহিত করিলেন।" এতৎসম্পর্কে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ও আমার অন্যান্য হিতৈষীদিগের একটা গুরুতর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। আট নয় বৎসর পূর্ব্বে রত্নমণি বাবু জেলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর একটী কৃতী ছাত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ডিরেক্‌টর বাহাদুরকে অনুরোধ করেন, যে ঐ ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইলেও যেন তাহাকে বৃত্তি দেওয়া না হয়। পরিণামেও তাহাই দাঁড়াইল; ছাত্রটী বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইয়াও উহাতে বঞ্চিত হইল। গিরিশবাবুরা আশঙ্কা করিলেন, যে হয়তো রত্নমণিবাবু আমার বিষয়েও ডিরেক্‌টরকে ঐ প্রকার লিখিয়া থাকিবেন। এজন্য হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে; ইতোমধ্যে তাঁহারা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জানাইয়া রাখিলেন।

ভ্রমণ

পরীক্ষার পরেই বাড়ী যাইয়া তিন মাস নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিব, আমাদিগের ইহা ভাল লাগিল না। মুলুকচাঁদ চৌধুরী, উমেশচন্দ্র বাগচী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আমি—আমরা পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম, দেশ ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। রেল, ষ্টীমারে দূরদূরান্তরে যাইবার মত অর্থ বল নাই; অথচ একটা নূতন কিছু দেখিব, ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা। আমরা স্থির করিলাম, স্বাধীন ভারত দেখিব; স্বাধীন ত্রিপুরায় গমন আমাদিগের সাধ্যাতীত নহে, অতএব উহার রাজধানী আগরতলা আমাদিগের লক্ষ্যস্থানীয় করিলাম। পথে শ্রীহট্ট জেলার প্রসিদ্ধ বিথঙ্গলের মঠে তুই এক দিন অবস্থান করিব, ইহাও পর্য্যটনের অন্তর্ভুক্ত হইল।

মুলুকচাঁদবাবু যাত্রীদলের মধ্যে বয়সে সকলের অপেক্ষা বড় ছিলেন, তাঁহাকে আমরা নেতা মনোনীত করিলাম। তাঁহার সহিত কথা থাকিল, তিনি এখন বাড়ী যাইবেন, তথা হইতে তালজাঙ্গা গ্রামে বন্ধু মহিমচন্দ্র রায়ের বাটীতে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। উভয়ের বাসগ্রামই কিশোরগঞ্জ মহকুমায়।

১৯এ মার্চ্চ (১৮৮৮), ৭ই চৈত্র (১২৯৪) অপরাহ্নে উমেশ, সুরেশ, দেবেন্দ্র ও আমি, এই চারিজন ময়মনসিংহ হইতে যাত্রা করিলাম। রেলগাড়ীতে গফরগাঁ যাইয়া তথা হইতে পদব্রজে রাত্রিতে উথুরী গ্রামে কমলাপ্রসন্ন বল মহাশয়ের বাড়ীতে উপনীত হইলাম। বাড়ীর সকলে আমাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন, আমরা তথায় আরামে রাত্রি যাপন করিলাম।

পর দিন বেলা প্রায় ৯টার সময় হোসেনপুর গিয়া এক মুদি-দোকানে বিশ্রাম ও আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলাম, কাজেই সে আমাদিগকে ঘরের বাহিরে খাইতে দিল। জন প্রতি ছয় পয়সা দিতে হইল। উত্তপ্ত টিনের ঘরে ঘুমাইয়া ৩টার সময় পুনরায় রওনা হইয়া খরতর রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে আমরা সন্ধ্যার সময়ে কিশোরগঞ্জে পঁহুছিলাম। সেখানে ইটনার কালী কিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের জামাতা, বাবু প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হইব, আমাদিগের এই প্রকার মানস ছিল, কিন্তু তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখিলাম, তিনি ইটনা চলিয়া গিয়াছেন। "আমরা ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। তৎক্ষণাৎ আশ্রয় জুটিল। বাবু মথুরানাথ গুহ, স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্‌টর, আমাদিগকে তাঁহার বাসায় আনিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে উমেশের পরিচয় ছিল। এখানে পরম সমাদর পাইলাম। মোয়া, নারিকেল, বাতাসা দ্বারা জলযোগ করিলাম। বেশ খাওয়া হয়। হতাশের মধ্যে পরম সমাদরে অবস্থান করিলাম।" (নোট বুক; বিথঙ্গল পর্য্যন্ত গমনের বিবরণ ইহা অবলম্বনে লিখিত)

২১এ মার্চ্চ। "অদ্য প্রাতেও মথুর বাবু আমাদিগকে রাখিলেন। আমরা হয়বৎনগরের দেওয়ানসাহেবের বাড়ী, প্রামাণিকের বাড়ী, আখড়া প্রভৃতি দেখিলাম। বৈকালে বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা) আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদিগের বাসায় কিশোরগঞ্জ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনের সহিত আলাপ হইল। সন্ধ্যার পরে তিনি সংক্ষেপে উপাসনা করিলেন; বেশ হইল; পরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কিছু বলিলেন। তৎপর আহার ও নিদ্রা"

২২এ মার্চ্চ। সকালে উপাসনার পরে রওনা হইয়া আমরা প্রায় ১০টার সময় তালজাঙ্গায় বন্ধুবর মহিমচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহিম বাবুর পিতা রাজচন্দ্র রায় বি. এল. ময়মনসিংহের বিখ্যাত এবং ঐশ্বর্য্যশালী উকীল ছিলেন। পিতা অন্যত্র রহিয়াছেন, সুতরাং গৃহে মহিমের একাধিপত্য, তিনি ও তাঁহার জননী আমাদিগের আদর যত্নের সীমা রাখিলেন না। প্রতিদিন চারিবার আহার, প্রত্যেক বারেই বহুবিধ উপকরণ। এইখানে মুলুকচাঁদবাবু আসিয়া আমাদিগের সহিত জুটিলেন। ২৩এ তারিখ আমরা শ্রীপুর গ্রামে গোবিন্দ কিশোর চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে বৈকালিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলাম। ফিরিবার সময় প্রফুল্ল জ্যোৎস্না ও মুক্তবায়ুতে প্রশস্ত মাঠে আমরা উপাসনা করিতে বসিলাম ;একটী লোক ও কয়েকটী ছেলে ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। আমরা দূরে যাইয়া উপাসনা করিলাম, মহিম আচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

হোসেনপুরে জলকষ্ট দেখিয়াছিলাম, তালজাঙ্গায়ও তাই। এত বড় ধনীলোকের বাড়ীতেও সকলে যে পুকুরে স্নান করে, সেই পুকুরের জলই পান করে, তাহাও ছোট ছোট পানায় পরিপূর্ণ। বোধ হয় এ অঞ্চলে পাতকূয়া হয় না।

রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এবং অন্যান্য গ্রামেও একটী জিনিষ নূতন দেখিলাম। মণ্ডপঘর ও বৈঠকখানার মধ্যে প্রকাণ্ড নাটমন্দির— বড় বড় কাঠের খুঁটির উপরে বৃহৎ আটচালা, যাত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা আঙ্গিনাটী বারমাস আবৃত ও রৌদ্রে বঞ্চিত থাকে। আমাদের ওদিকে এ প্রকার ব্যবস্থা নাই।

মহিম বাবুর সহিত আনন্দে ও আরামে দুই দিন যাপন করিয়া

আমরা ২৪এ মার্চ্চ শনিবার জলখাবার খাইয়া পথে বাহির হইলাম। পর পর তিন শনিবার তিনটী বিশেষ ঘটনায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, এজন্য বারের উল্লেখ করিলাম। আমরা আসিতে আসিতে এক নদী পাইলাম। নদী পারের কোনও উপায় নাই দেখিয়া 'কেন রে মন ভাব বসে ভবনদীর কূলে'—এই গান গাহিতে লাগিলাম। কিছু-কাল পরে এক খেয়ার নৌকা আসিল ; যে গ্রামে আমরা গেলাম, তথায় নারায়ণগঞ্জের একটি পাটের কারখানা ঘরে আমাদের স্থান পাইবার কথা ছিল। কিন্তু যাইয়া দেখি, ঘর শূন্য। শরীর ক্লান্ত, ক্ষুধায় কাতর, কণ্ঠ শুষ্ক, রৌদ্রে উত্তপ্ত দেহ। নিকটে কোনও বাজার নাই। আমরা আর একটু পথ চলিয়া এক কুম্ভকার বাড়ীতে জল খাইতে গেলাম। কুম্ভকারের অবস্থা একটু ভাল ছিল বলিয়া বোধ হইল। গত শীতকালে ঐ বাড়ীতে ওলাউঠায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পাঁচ ছয় জনের মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধা কিছু দুঃখ প্রকাশ করিল, আমাদিগকে সমাদরে বসিতে বলিল, জল ও পান দিল। কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া আমরা সে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করা কর্ত্তব্য। এ গ্রামের নাম কমলভোগ ; এখান হইতে অদ্যকার রাত্রি যাপনের স্থান বড়ইবাড়ী দুই ঘণ্টার পথ। বেলা দুপ্রহর। বোধ হইল, আর কিছু কাল পরে চলিবার শক্তি থাকিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা নিকটে আর এক কুম্ভকারের বাড়ীতে গেলাম। বাড়ী দেখিয়া তাহাদের অবস্থা ভাল বোধ হইল। আমরা অতিথি হইতে চাহিলাম। একটী লোক আসিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে আর একটী লোককে ডাকিয়া আনিল। তাহার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

আমি। "এখানে কি অতিথি হওয়া যায়?"

উত্তর। "এখানে কেহ অতিথি রাখে না।"

"আমাদের কিছু চিড়াটিরা দিতে পার? এখানে বাজার নাই, আমরা কোথায় যাইব? বেলাও অনেক হইয়াছে।"

উত্তর। "আমরা তাহা কোথায় পাইব? পাক করিয়া খাইতে পারিলে চাল ডাল দিতে পারি।"

আমরা একখানা ছোট ঘরে বসিয়াছিলাম। একটী বৃদ্ধা আসিয়া বলিল, "তোমরা বাহিরে দাঁড়াও।" আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম, মনে করিলাম, তাহারা আমাদের জায়গা করিয়া দিতেছে, কিছু কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিলাম সে সব কিছু নয়, তাহারা তাহাদের কাজ করিতেছে। আমরা নিরুপায় হইয়া চলিয়া আসিলাম। একটী ছোট মাঠ পার হইয়া আমি এক গাছের তলায় শুইলাম—শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, দেখি মা কি করেন। যদি আহার পাওয়া আমার পক্ষে উপযুক্ত হয়, তবে পাইব; যদি অনাহারে থাকাই আমার পক্ষে উপযুক্ত হয়, তবে তাহাই হইবে; এক সন্ধ্যা না খাইয়া আর মরিয়া যাইব না। এইরূপ ভাবিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। মুলুকচাঁদবাবু আহারের অন্বেষণে চলিলেন। কিছুকাল পরে আসিয়া বলিলেন, খাওয়ার সুবিধা হইয়াছে। একজন মুসললান চাউল ও বেগুন লইয়া চাড়াল বাড়ী যাইতেছে, আমরা সেখানে পাক করিয়া খাইব। তখন আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম। তাহারা আমাদিগকে বসিতে দিয়া রান্নার সব আয়োজন করিয়া দিল। আমরা স্নান করিয়া রান্না উঠাইলাম। তাহারা মাছ আনিয়াছিল, আমরা তাহা রাঁধিলাম না, ডালসিদ্ধ ও বেগুনসিদ্ধ ভাত রান্না করিলাম। ৪টার সময় আমাদের খাওয়া হইল। ভগবান যাহা জোটান তাহাই ভাল। তাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বপ্রকার বিপদ

হইতে রক্ষা পাই। আহারের পরে আমরা গৃহস্বামীর পুত্রকে একটী সিকি দিলাম। তাহারা পান দিল, পান খাইয়া রওনা হইলাম। বাহির হইয়াই প্রকাণ্ড মাঠ—বিশাল, বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপ্ত। চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিতেছে; বৃক্ষটীমাত্র এ বিশাল প্রান্তরে দৃষ্ট হয় না; কেবল দূরে, অতি দূরে এক একখানি গ্রাম ধূমাবৃত রেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার উভয় পার্শ্বে দিয়া দেখিলে কেবলই দূরবিস্তীর্ণ প্রান্তর-সীমায় নীলাকাশ ও ভূপৃষ্ঠের সম্মিলনরেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোথাও ঘনক্ষুদ্র পাদপরাজির ভিতর দিয়া, কখনও সবুজ ধান্যবৃক্ষ ঠেলিয়া, কখনও বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঠের মধ্যে বক্রগামিনী স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী ভুজঙ্গসদৃশ চলিয়া গিয়াছে। জলপার্শ্বে গুল্মরাজি তীর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কখনও বা জলচর ও স্থলচর পক্ষিশোভিত নির্ম্মলবারি জলাশয় দৃষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যার স্বল্পোত্তাপে শীতল বায়ু প্রবাহে হরিৎ ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণ সুখকর বটে! বিশেষতঃ এমন শ্যামল শস্য ও হরিৎ গুল্মরাজি পরিপূর্ণ দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত দর্শন বস্তুতঃই মনোহর। দীর্ঘ, সতেজ ঘাসের এমন সুনিপুণ বিন্যাস দেখিয়া কার না প্রাণে আহ্লাদ হয়। এ প্রদেশে হরিৎ তৃণরাশির এত প্রাচুর্য্য, যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গবাদি পশুর সুস্থতা, সবলতা ও বৃদ্ধি এ প্রদেশে অবশ্যম্ভাবিনী। এই সুকোমল তৃণরাজির উপর ভ্রমণে বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দ হয়। এরূপ ঘন ও সুদীর্ঘ তৃণরাশির উপর দিয়া মনে সহজেই সর্পাদির ভয় হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ কিছু দেখিলাম না। এইরূপে আনন্দে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা সন্ধ্যার সময়ে ধনু নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। ধনু নদী বিস্তৃতা, গভীরা, বেগশালিনী। ইহার জল বড়ই মিষ্ট লাগিল। নদী পার হইয়া আমরা বড়ইবাড়ী সমপাঠী বন্ধু

ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে উপনীত হইলাম। তাঁহারা পরম সমাদরে অতিথি সৎকার করিলেন।

২৫এ মার্চ্চ, রবিবার, "প্রাতঃকালে চিড়া ও ঘোল দ্বারা জলযোগ করিয়া আমরা ইটনা অভিমুখে রওনা হইলাম। বড়ইবাড়ী ও ইটনার মধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর; উত্তরে দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইলের ন্যূন হইবে না। মাঝে মাঝে বড় বড় নলখাগড়ার বন, আর অতি দীর্ঘ ধানের ক্ষেত। আমরা দূরে একটীমাত্র গ্রাম দেখিয়াছিলাম। পথে কয়েকজন মেছুনী পাইলাম, তাহারা আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিল। বর্ষাকালে এই বিশাল প্রান্তর সাগর-সদৃশ হইয়া যায় (প্রাদেশিক নাম হাওর = সায়র = সাগর)। যাইতে যাইতে আমরা এক নদী পাইলাম, এটীও বিস্তৃত, গভীর ও বেগবতী। তখন প্রবল বায়ুবেগে উর্ম্মিমালায় নদীবক্ষ আন্দোলিত হইতেছিল। আমরা একটী খেয়ার নৌকায় উঠিলাম; নৌকা ভগ্ন ছিল, তাহাতে তরঙ্গের আঘাতে ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। মাঝি নৌকা ছাড়িতে সাহসী হইল না। মেছুনীরা তাহাকে সাহস দিল, মুলুকচাঁদবাবুও দিলেন। তিনি ও আমি বৈঠা ধরিলাম। নৌকা অপর তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে মুলুকচাঁদবাবু ক্লান্ত হইয়া বৈঠা ছাড়িয়া দিলেন, নৌকা আবার বহু দূরে যাইয়া পড়িল। যাহা হউক আমরা পরিশেষে নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হইলাম, এবং হাঁটিতে হাঁটিতে প্রায় দশটার সময় ইটনা পঁহুছিলাম। ভক্তিভাজন কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় আমাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ব্রাহ্ম ভৃত্য বঙ্গচন্দ্র দাসও আমাদিগের সহিত আলাপ ও সযত্ন ব্যবহার করিল। সায়ংকালে বিশ্বাস মহাশয় আমাদিগকে ও পরিবারস্থ সকলকে লইয়া উপাসনা করিলেন। একটী গান তিনি নিজে গাহিলেন; দুইটী গান আমরা

করিলাম, তারপর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে একটী গান করিতে বলিলেন ; তিনি ও বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাসের পত্নী "সহে না যাতনা আর"—এই গান করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা ও আমরা সমকণ্ঠে "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়"—এই গান গাহিলাম। উপাসনাটী খুব সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইল। উপাসনার পরে আলাপ ও আহার করিয়া আমরা শয়ন করিলাম।"

কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় কেশবচন্দ্র-যুগের একজন যথার্থ বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। আজীবন পল্লীগ্রামে বাস করিয়াও তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও তাহার বিধি পালন করিয়া গিয়াছেন ; সন্তানদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবেষ্টনে প্রতিপালন করিয়াছেন ; এবং কন্যা তিনটীকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে বিবাহ দিয়াছেন।

২৬এ মার্চ্চ প্রাতঃকালে আহারান্তে "আমরা বিথঙ্গল অভিমুখে রওনা হইলাম। বিশ্বাস মহাশয় মোহন্তকে একখানা পত্র দিলেন ; তাঁহার সাহায্যে পথ দেখাইবার জন্য একজন সঙ্গীও পাইলাম। জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দমোহন বসু মহাশয়দিগের বাটীর পার্শ্বে তাঁহাদিগের পিতার শ্মশানোপরি মঠ দেখিলাম, এবং প্রস্তর খোদিত স্মৃতিলিপি নকল করিলাম। এদিকেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ। চলিতে চলিতে ভেড়ামোনা নদীতীরে পঁহুছিলাম ; এ নদী পার হইলেই শ্রীহট্ট জেলা। তারপর আর একটী নদী পার হইলাম ; শুনিলাম ইহার নাম সুর্ম্মা। তৎপরে আমরা এক অতি বিস্তৃত মাঠে পড়িলাম। একস্থানে জলযোগ করিবার পরে পথ হারাইয়া ফেলিলাম ; অনেক দূর তৃণগুল্ম নলখাগড়া প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া অবশেষে পথ পাওয়া গেল। আমরা প্রায় চারিটার সময় বিথঙ্গল পঁহুছিলাম। মুলুকচাঁদবাবুর

পরিচিত সদয় ঠাকুর নামক মঠের এক বৈষ্ণব আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমরা প্রথমে সর্ব্বোত্তর দালানে (পাকা বাড়ীতে) একস্থানে ছাতা, জুতা, ইত্যাদি রাখিলাম ; তারপর আর এক প্রাঙ্গণ পার হইয়া নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় চিকন পাটীর উপরে বসিয়া ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিবার পরেই মোহন্ত আসিলেন ; বেশ সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ, দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসাদি করিয়া একজনকে আদেশ করিলেন, 'ইঁহাদিগকে জলখাবার দেও।' আমরা থাকিবার একটী কুঠরী পাইলাম, এবং দুধ, চিড়া ও সন্দেশ দিয়া জলযোগ করিলাম।"

"নাটমন্দির একটী বড় দোচালা ঘর, ইষ্টকের দেওয়াল, মার্ব্বলের মেঝে। ঘরখানি ঝাড়, দেওয়ালগিরিতে সুসজ্জিত ; তিনদিকের প্রাচীরে দুইসারি করিয়া নানা দেবদেবী-মূর্ত্তি। নাটমন্দিরের সহিত সংলগ্ন এক মঠ, তাহাতে রামকৃষ্ণ গোসাঞির সমাধি। মঠমধ্যে প্রত্যহ পূজা আরতি হয়। মঠের কপাট পিতলের, উহাতে একখানা মার্ব্বলের ও একখানা পিতলের খাট আছে। সেগুলি তাকিয়া, পাখা, চামর প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। মোহন্ত পিতলের চৌকীর পার্শ্বে একখানা আসনে বসেন। তাঁহার পরিধানে সামান্য মলমলের ধুতি এবং গায়ে মলমলে চাদর—বৈরাগীর বেশ। নিকটে চরণামৃতের বৃহৎ পাত্র, তাহাতে একটা চামচ থাকে। নাটমন্দিরের পশ্চিমে খুব বড় দোচালা রান্নাঘর, পূর্ব্বে ভাঁড়ার ঘর, ঐরূপ বড় দোচালা। উহার এক একটী ডেকে দুই মণ, আড়াই মণ, তিন মণ চাউল ধরিতে পারে। সদয় ঠাকুরের সহিত সমস্ত দেখিয়া আমরা ছাদের উপরে গেলাম। এই মঠের বাড়ী, বারাণ্ডা, আঙ্গিনা সমস্তই প্রকাণ্ড ; আঙ্গিনাগুলি বাঁধান

বারাণ্ডাগুলি খিলানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, পাকা ঘাটটী আশী হাত লম্বা।” মঠের প্রায় দুই শত গাভী আছে, সহস্র সহস্র নরনারী ইহার শিষ্য, সুতরাং বার্ষিক আয়ও বিপুল।

বিথঙ্গলের মঠ যাঁহার পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে, তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ গোসাঁই। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বনমালী চৌধুরী, মাতার নাম জাহ্নবী, নিবাস তরপান্তর্গত রিচি গ্রাম। রামকৃষ্ণ স্ব-রচিত সঙ্গীতে আপনাকে “হীন রামদাস” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি পূর্ণব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। একটী গানের ধুয়া—“ভাল দেখ রে পূর্ণব্রহ্মের লাগিছে বাজার।” আর একটীর আরম্ভ—“বড় ধন বড় ধন, পূর্ণব্রহ্ম দাতা, সাধু ভাই ও।” মঠে প্রতিদিন সায়ং-সংকীর্ত্তনে প্রথমেই এই গানটী গাওয়া হয়—“আর কি দেখরে, সদা শুদ্ধ শান্ত মনে সচৈতন্যে পূর্ণব্রহ্মে ডাক।” এটী আমাদের ব্রহ্ম সঙ্গীতে স্থান পাইয়াছে। ইহাও নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণের রচনা।

কিন্তু বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের প্রচারক রামকৃষ্ণ গোসাঁইর সম্প্রদায় কালবশে পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিষ্ঠাতার পূজা, ভোগ, আরতি তো আছেই; প্রাচীন সমাজের পর্ব্বও অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিস্তৃত বহিরঙ্গণে দীঘির কোণে একখানা রথ দেখিলাম; উহাতে রামকৃষ্ণের খড়ম স্থাপন করিয়া রথযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। অস্পষ্ট স্মরণ হইতেছে, সদয় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ইহাদের ঝুলনযাত্রাও আছে। এই মঠে অবস্থানের ব্যবস্থা, মধ্যাহ্নের ভোগ, সায়ংকালের বৈকালী, সমস্তই ইহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়। বর্ষাকালে এখানে শত সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নভোগের শেষ পদটী নূতন দেখিয়াছিলাম। উহাতে দুধ

চাউল, নানা তরকারী, চিনি এবং লবণ আছে; খাইতে মুখরোচক, মিষ্ট স্বাদই প্রধান থাকে। ইহার নাম মাধুপুরী।

পরদিন কুবের ঠাকুর নামক বৈষ্ণব আমাদের কক্ষে আসিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংস্কৃত ভাষায়াং বক্তুং শক্লোসি?" আমি বলিলাম, "কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শক্লোমি।" খানিক ক্ষণ দুইজনে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা চলিল; আমার সংস্কৃতের জ্ঞান প্রবেশিকার পাঠ্য পর্য্যন্ত; কুবের ঠাকুরও যে ঐ ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাঁহার বলিবার প্রণালীতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। তারপর তিনি বাঙ্গলায় আলাপ আরম্ভ করিলেন, আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ইনি বর্ত্তমান মোহন্তের তিরোধান হইলে তাঁহার গদিতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

বিথঙ্গলে দুই রাত্রি এক দিন আরামে বাস করিয়া আমরা ২৮এ মার্চ্চ রামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্র দিল্লী দেখিতে চলিলাম। সেখানে পঁহুছিতে বেলা প্রায় ৯টা হইল। স্থানটী সাধনের অনুকূল বটে। একটী প্রকাণ্ড হিজল বন; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটী বিস্তৃত নদী বনটীকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণে মিলিত হইয়াছে; উত্তরদিকে একটী ছোট নদী উভয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই ইহার মধ্যে গোসাঁইজীর অনুবর্ত্তীদিগের একটী আশ্রম। আমরা ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; এখানকার আচার, অনুষ্ঠান আদি মঠের অনুরূপ; পূজা, ভোগ, বৈকালী, সায়ংকীর্ত্তন সবই আছে। আমরা আশ্রমে একদিন থাকিলাম। দুই একটী বৈষ্ণবের ব্যবহার আমাদিগের ভাল লাগে নাই।

২৯এ মার্চ্চ প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকের নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দক্ষিণমুখে ষ্টীমার ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে আমরা মেঘনার তীরে এক অতি বৃহৎ নলখাগড়ার বনের উত্তর প্রান্তে পঁহুছিলাম। সেখানে এক দোকানে দৈ, সর, চিড়া, বাতাসা ও ক্ষীরাই খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। জোয়ারের জলে নদীতীরের পথ ডুবিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আমরা পথশূন্য বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে অরণ্য এমন ঘন, যে তাহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। মুলুকচাঁদবাবু কতকগুলি নলখাগড়া জাপটিয়া ধরিয়া নীচু করিয়া রাখিলেন, আমরা তাহা উল্লঙ্ঘন করিলাম, আমরা আবার ধরিয়া রহিলাম, তিনি আসিলেন। এই প্রকারে বহু ক্লেশে শ্রান্তক্লান্ত দেহে সন্ধ্যার দুই তিন দণ্ড পূর্ব্বে আমরা মেঘনার একটী স্বল্পবিস্তর গভীর উপনদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম, ওপারে ষ্টীমার ষ্টেশন। খেয়ার নৌকা নাই; একটী লোক নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল, তাহাকে পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম, সে আমাদের অনুনয়ে কর্ণপাত করিল না। অগত্যা আমি ও আর একজন অপর পার হইতে একখানা নৌকা আনিবার জন্য সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইলাম। আমি একটী ভুল করিলাম, দুই এক মিনিট খুব জোরে সাঁতার দিলাম, ফলে কূলে উঠিবার পরেই আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া সুস্থ হইলাম, তৎপরে ষ্টেশন ঘরে যাইয়া সকলে ষ্টীমারের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ষ্টেশনটীর নাম মনে নাই। এখানে আহার্য্য সামগ্রী কিছুই মিলিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষ্টীমার আসিল, এবং রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় গোয়াল-নগর যাইয়া মধ্যনদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল। আমরা এক হোটেলে যাইয়া আহার করিলাম। হোটেলওয়ালাই তাহার নৌকাতে আমাদিগের ষ্টীমার হইতে যাতায়াতের ব্যবস্থা

করিয়া দিল। তাহাকে সর্ব্বশুদ্ধ জনপ্রতি তিন আনা দিতে হইল। ৩০এ মার্চ্চ প্রত্যূষে ষ্টীমার ছাড়িয়া প্রাতঃকালে আজবপুর পঁহুছিল। আমরা চারিজন অবতরণ করিয়া কালীকচ্ছের দিকে যাত্রা করিলাম, দেবেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ হইয়া ময়মনসিংহে ফিরিয়া গেল, কারণ গুরুদাস বাবু তাহাকে আগরতলা যাইবার অনুমতি দেন নাই। আমরা প্রায় তিনঘণ্টা হাঁটিয়া দশটার সময় পরম শ্রদ্ধেয় আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাড়ীতে উপনীত হইলাম। অল্পক্ষণ ডিস্পেন্সারীর ঘরে অপেক্ষা করিবার পরে তাঁহার পুত্র ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী আসিলেন, তিনি আমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, 'আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছি।' তিনি আমার লম্বা চুল লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনাদের কি গানবাজনা অভ্যাস আছে?" আমি উত্তর দিলাম, "না; আমরা এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছি, ভ্রমণ করিতে করিতে আগরতলা পর্য্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা আছে।" তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের পাকের আয়োজন করিয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম "আমরা ব্রাহ্ম, আপনাদের পাকেই খাইব।" পূর্ব্ব বাঙ্গলার অনেকেই 'ব্রাহ্ম' শব্দটাকে 'ব্রাইহ্ম' উচ্চারণ করেন; আমি তাহা ঠিক উচ্চারণ করিলাম, কাজেই মহেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, আমরা ব্রাহ্মণ; তখন বলিলেন, "আমাদের তো (রসুই) ব্রাহ্মণ নাই।" আমি যখন কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম, তখন আমাদের আদর দেখে কে? তৎক্ষণাৎ চণ্ডীমণ্ডপের দোতালার একটী বৃহৎ কক্ষে আমাদের থাকিবার স্থান হইল। নন্দী-গৃহের নিয়ম, প্রাতঃ, সায়ং পারিবারিক উপাসনা শেষ হইবার পরে মহেন্দ্র বাবুর জননী নিজ হস্তে রন্ধন করেন; সুতরাং মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারে খুব বিলম্ব হয়। আমরা আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সহিত পাকশালায়

ষোড়শোপচারে দুই বেলা আহার করিলাম, তাঁহার পত্নী পরিবেশন করিলেন। বলা বাহুল্য, রাত্রিতে আমাদিগকে ঘুম হইতে জাগাইয়া খাওয়াইতে হইয়াছিল।

আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় প্রসিদ্ধ কালীসাধক, আগরতলার দেওয়ান রামদুলাল মুন্সীর বংশধর। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোৎসব প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ইঁহাদিগকে ভয়ানক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল। বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সাধক বলিয়া খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য দলে দলে লোক তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইতে আসিত। আমরা সন্ধ্যাকালে কয়েকজন দীক্ষার্থী দেখিয়াছিলাম। তিনি অবস্থানুসারে এক এক জনকে ব্রহ্মের এক একটী নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কালীকচ্ছ ত্রিপুরা জেলার একটী সুপরিচিত গণ্ডগ্রাম। ইহাতে বিস্তর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বসতি, অনেক বাড়ীতেই অট্টালিকা দেখিলাম। আমরা বৈকালে গ্রাম দেখিতে দেখিতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নন্দী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দক্ষিণাচরণ নন্দীর বাড়ীতে গেলাম। দক্ষিণাবাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলাস্কুলে পাঠ করিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত মুলুকচাঁদবাবু ও আমার পরিচয় ছিল। আমাদিগের আগমনের সংবাদ পাইয়া ইনি আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তারিণীবাবুও আমাদিগের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রকাশ করেন। ইঁহাদিগের ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ ছিল। কালীকচ্ছে ব্রাহ্মসমাজ আছে।

৩১শে মার্চ্চ শনিবার প্রাতঃকালে আমরা কালীকচ্ছ ছাড়িয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটী লোক এক হোটেল খুলিবার আয়োজন করিতেছিল, আমাদিগকে লইয়াই সে ব্যবসায় সুরু করিল। আমরা রাত্রি অনুমান নয়টার পরে আহার করিয়া শুইয়া আছি, এমন সময়ে বায়ুকোণ হইতে প্রবল ঝড় আসিল। ঘরখানির এই সবে জীর্ণসংস্কার হইয়াছে, উহা ঝড়ের বেগ সামলাইতে পারিল না; তখনই ঘন বরষা আরম্ভ হইল। ঝটকা বাতাসে ঘর মাথার উপরে পড়ে দেখিয়া আমি দৌড়িয়া বাহির হইয়া নিকটে এক ঘরে আশ্রয় লইলাম। একটু পরেই মুলুকচাঁদবাবু ও সুরেশও আসিলেন। তখনই ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ঘরটীর সম্মুখের দিক একেবারে খোলা, আমরা আপাদমস্তক ভিজিয়া শীতে থরথরি কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিতেছি, এ ঘরও খুব ঢুলিতেছে, আর আর্ত্তভাবে বিপদভঞ্জনকে ডাকিতেছি। ক্রমশঃ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি থামিল; উমেশ হোটেলের চালার নীচে হইতে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, সে বেশ ছিল, গায়ে এক ফোঁটা জল লাগে নাই। আমরা খানিক দূরে এক মুদি দোকানে যাইয়া প্রতি জনে দুই পয়সা ঘরভাড়া দিয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন, ১লা এপ্রিল, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়া আমরা দিনান্তে বৈচ্চাড়ণ গ্রামে আমাদের সহাধ্যায়ী জয়কুমার সরকারের বাড়ীতে পহুঁছিলাম। ইহারা মুলুকচাঁদবাবুর কুটুম্ব, সুতরাং আমাদের আদর আপ্যায়ন যথেষ্টই হইল। পরদিন জয়কুমার বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আমাদের ভূরিভোজনের জন্য বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করাইয়াছিলেন। ইঁহারা আঢ্য লোক!

৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার প্রভাতে রওনা হইয়া আমরা মধ্যাহ্নকালে আগরতলা উপনীত হইলাম। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভাবিলাম না জানি কতই সৌধচূড়া দেখিতে পাইব। কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া বড়ই নিরাশ হইলাম; দেখিলাম, ইহা ঘনপাদপরাজিপূর্ণ একটী জনস্থান, রাজবাটী ভিন্ন অন্যত্র একটীও ইষ্টকালয় নয়নগোচর হইল না। আমরা রাজ-সরকারের এক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিথি হইব বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলাম ; তিনি আগরতলায় থাকিতেন না ; আমরা তাহা জানিতাম না ; কিন্তু তিনি সেদিন তথায় এক ভদ্রলোকের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমরা সন্ধান করিতে করিতে সেই বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম ; গৃহস্বামীও আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বৈঠকখানা ঘরে স্থান দিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যাহ্নের আহার হইয়া গিয়াছে ; আমরা স্নান করিয়া বৈঠকখানা ঘরেই দই চিড়া আহার করিলাম। আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। রাত্রিতে সুপক্ক অন্ন-ব্যঞ্জন রসনার তৃপ্তি সাধন করিল।

বৈকালে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় নূতন হাবেলীতে নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন, এবং আমাদিগকে পরদিন তাঁহার গৃহে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরাও বিশ্রামান্তে নগর পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম। প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী মোহিনীমোহন বর্দ্ধন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; তিনি অমায়িক লোক, আমাদিগের সহিত মিষ্ট আলাপ করিলেন। তারপর মহারাজের বাগান দেখিলাম; সেখানে যুবরাজ আসিয়াছিলেন, আমরা দূর হইতে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। শেষে ত্রিপুরার রাজা ও রাণীদিগের সমাধিভূমি দেখিতে গেলাম। ১২৯০ ত্রিপুরাব্দে নির্ম্মিত

একটী মঠের প্রস্তরফলকস্থ সংস্কৃত স্মৃতিলিপির প্রতিলিপি আমার নিকটে এখনও আছে।

আগরতলায় উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু দেখিলাম না। চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে কয়েক শত মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া স্বাধীন ভারত দর্শন করিলাম, ইহাই আমাদিগের লাভ।

৪ঠা এপ্রিল, প্রাতঃকালে আমরা নূতন হাবেলীতে নিমন্ত্রণকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সেদিন আমাদিগকে সমাদরে রাখিলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে নূতন হাবেলীর পত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, লোকের বসতি অধিক ছিল না, অল্পসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী তথায় বাস করিতেন। কয়েক বৎসর পরে ত্রিপুরার রাজধানী নূতন হাবেলীতে স্থানান্তরিত হয়; উহার বর্ত্তমান নাম আগরতলা।

৫ই এপ্রিল উমেশ, সুরেশ ও আমি সূর্য্যোদয়ের পরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাণিকনগর ষ্টীমার ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম, মুলুকচাঁদবাবু বৈচ্চাড়া গ্রামে কুটুম্ব বাড়ীতে গেলেন। সারাদিন হাঁটিয়া রৌদ্রে দগ্ধ ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের গন্তব্যস্থানে পঁহুছিলাম। আসিতে আসিতে এক ব্রাহ্মণ পথিককে আমাদের সঙ্গী করিলাম। আমরা এক মুদিদোকানে দুই বেলা অবস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিলাম, ব্রাহ্মণটী দুই বেলাই রাঁধিলেন, তাঁহার নিজের অর্থব্যয় বাঁচিয়া গেল।

পরদিন, ৬ই এপ্রিল, দিবা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা ষ্টীমার ধরিয়া অপরাহ্নে নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিলাম। সুরেশ ময়মনসিংহ চলিয়া গেল, উমেশ ও আমি ঢাকায় যাইয়া লক্ষ্মীবাজারে এক ছাত্রাবাসে অবস্থিতি করিলাম।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঝড়বৃষ্টিতে আমাদের এক বন্ধুর আলোয়ান

ভিজিয়া গিয়াছিল। সেখানি আগুনে শুকাইবার সময়ে একটু জায়গা পুড়িয়া যায়। ধার করা আলোয়ান এ অবস্থায় বন্ধুকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না, সে জন্য আমরা দুই জনে ঐ দিনই সায়ংকালে চকবাজারের নিকটে এক শালওয়ালাকে উহা রিপু করিতে দিয়া আসিলাম।

৭ই এপ্রিল, ২৬এ চৈত্র শনিবার।
ঢাকার ঘূর্ণাবর্ত্ত

প্রাতঃকালে আমরা বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিলাম। অপরাহ্নে আলোয়ানখানা আনিতে গেলাম। দেখিলাম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বোধ হইল, বৃষ্টি হইবে। আকাশের অবস্থা ক্রমশঃই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, প্রকৃতি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। আমরা সত্বর নবাবের বাড়ী ছাড়াইয়া যাইয়া আলোয়ান লইয়া বাসার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। বাবুর বাজার ইস্‌লামপুর যাইতে না যাইতে আকাশের আকার ভয়াবহ হইল; বিন্দু বিন্দু বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। দুই জনের একটী ছাতা, ছাতা আর খুলিয়া রাখা যায় না। পটুয়াটুলী অতিক্রম করিয়া সদর ঘাটের নিকটে আসিয়া এই জলঝড়ে বাসায় উপনীত হওয়া অসাধ্য। আমরা ঢাকা কলেজের পূর্ব্বে আণ্ডাঘরের গাড়ীবারাণ্ডায় দাঁড়াইলাম। তখন রাত্রি হই-য়াছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত প্রভায় চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে; বজ্রনির্ঘোষে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইতেছে; কি রকম একটা গুড়্ গুড়্ ঘর্ ঘর্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, ভাবিলাম, গাড়ী চলিতেছে, কিন্তু গাড়ী দেখিলাম

না। শেষে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেগে রাস্তার খোয়াগুলি চটাচট্ চটাচট্ শব্দে উড়িতে আরম্ভ করিল, আমাদের নাক কাণ ধূলিবালিতে প্রায় বন্ধ হইল। আমার ভয় হইল, আওাঘর বুঝি ভূমিসাৎ হইবে, কেন না, আমি বাল্যকালে পাবনা জেলার স্থলবসন্তপুরে একটা মহা-প্রলয়ের গল্প শুনিয়াছিলাম। ঝড় থামিয়া গেলে, আমরা লক্ষ্মী-বাজারের আবাসে যাইয়া দেখিলাম, ছাত্রেরা জানালা দরজা খুলিয়া রাখিয়া তৈলের প্রদীপে পাঠ করিতেছে, একটা প্রদীপও নিবিয়া যায় নাই।

আমরা যাইয়াই আহার করিতে বসিলাম। একটু পরেই শুনিতে পাইলাম, লোকে "হায়, হায়, ইস্‌লামপুর বাবুর বাজার আর নাই," এই প্রকার বলিতে বলিতে পশ্চিম দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া সেই দিকে ছুটিলাম। পটুয়াটুলীর মোড়ে যাইয়া দেখিলাম, আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবদারু গাছ পড়িয়া সে পথে চলাচল বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ঘুরিয়া ঢাকা কলেজের উত্তর পশ্চিম কোণে যাইয়া দেখিলাম, শাঁখারীবাজারের গলিও অবরুদ্ধ। তার পর এ রাস্তায় সে রাস্তায়, কখনও গাছের নীচ দিয়া গলিয়া, কখনও গাছ ডিঙ্গাইয়া ইস্‌লামপুরে পূজনীয় রোহিণীকুমার গুহের বাড়ীতে গেলাম তাঁহার পায়খানার টিনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে, খড়ের রান্নাঘর চাপা পড়িয়া চাকরটি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ শরৎবাবুর ঘড়ির দোকানে দেখিলাম, তাঁহারা কয়েক জনে সম্মুখে দক্ষিণ দিকের দরজাগুলি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাই সেগুলি উড়িয়া যায় নাই, কিন্তু সমস্ত কপাট আগাগোড়া ফাটিয়া গিয়াছে। সে রাত্রি বেশী দূর অগ্রসর হইতে

পারিলাম না, দশটা কি এগারটার সময় বাসায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। রবিবার, ৮ই এপ্রিল প্রাতঃকালে আমরা বাহির হইয়াই বুঝিলাম, কি প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঢাকা কলেজ ঘূর্ণাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমা; কলেজ বাটীর ছাদের তিন চারি হাত রেলিং ভাঙ্গিয়াছে, আর কোনও ক্ষতি হয় নাই। আমরা শুভ মুহূর্ত্তে আবর্ত্তের বাহিরে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। ঢাকা কলেজ হইতে পশ্চিম দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই প্রকৃতির ধ্বংসলীলা বাড়িয়া চলিল। জগন্নাথ কলেজের বড় বড় ঘরের প্রকাণ্ড এক একটা শাল কাঠের খুঁটি প্রভঞ্জন যেন পাটশোলার মত মোচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া খুঁটিশুদ্ধ চালাগুলি কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। কত ইষ্টকালয়ের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। চকবাজার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, আমাদের শালওয়ালার দোকান কোথায় ছিল, বুঝিতেই পারিলাম না। পশ্চিম দিকে মহাপ্রলয়ের পরিধি কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, আমাদিগের জানিবার অবসর হয় নাই; কিন্তু ইহার কেন্দ্র ছিল নবাব আবদুল গণির বিশাল প্রাসাদ। তাঁহার ক্ষতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। উত্তর দিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, দোতালার প্রায় সকল কক্ষ লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। নবাব বাহাদুরের নিয়ম ছিল, আকাশে প্রবল ঝটিকার লক্ষণ দেখিলেই তিনি পরিজন সহ মৃত্তিকার নিম্নে এক গৃহে আশ্রয় লইতেন। তাঁহার দূরদর্শিতার ফলেই নবাব বাড়ীতে কাহারও অপমৃত্যু হয় নাই। ফলতঃ এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘূর্ণাবর্ত্তে ঢাকা সহরের পশ্চিমার্দ্ধ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।

উমেশ ও আমি সেই দিন বৈকালে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ষ্টেশনে যাত্রীদিগের নিকটে ঢাকার সংবাদ জানিবার

জন্য বহুলোক জড় হইয়াছিল। অনেকে আমাদিগের মুখে প্রথম সঠিক খবর পাইলেন।

তিন সপ্তাহে আমাদিগের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। আমার ইহাতে আধ পয়সা কম চারি টাকা চৌদ্দ আনা খরচ হইয়াছিল।

অবসর

ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কয়েক দিন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দের বাড়ীতে রহিলাম। নববর্ষের উৎসবের পরে ১৬ই কি ১৭ই এপ্রিল, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহের সহিত ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়ী গেলাম। এক বৎসর পরে আমাকে পাইয়া মা স্নেহের আবেগে রোদন করিলেন।

বাড়ীতে পরিপূর্ণ অবসর। আবার লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিলাম; এবার কোথাও ঠেকিলাম না; বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্ব্বনাম শেষ করিলাম। স্কটের আইভানহো আদ্যোপান্ত পড়িলাম। রাত্রিতে কেরোসিন তৈলের স্তিমিত প্রদীপে Macfarlane's History of India কিছু কিছু পড়িতাম। তিনি James Millকে metaphysical historian of British India বলিয়া বারংবার গালি দিয়াছেন, এইটুকু মনে আছে। আগতপ্রায় পাঠ্য রঘুবংশের কয়েকটা শ্লোকও পড়িয়াছিলাম। লেখাপড়া এই পর্য্যন্ত।

ইতোমধ্যে গ্রামে ওলাউঠা দেখা দিল। বাল্য-বিবরণে বলিয়াছি, এই পীড়া আমাদিগের গ্রামে কচিৎ দেখা দিত। আমার spirit of camphor ছিল। দুই এক জনের ভেদবমি তাহাতেই বন্ধ হইল। একটী স্ত্রীলোকের তাহাতে কোনও উপকার হইল না, দেখিয়া রাত্রিতে

নন্দনগাতী হইতে এক ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম, একটী যুবক আমার সঙ্গে গেল। ইনি পাসকরা ডাক্তার কিনা, বলিতে পারি না। ডাক্তার রোগিণীর পাশের বাড়ীতেই রহিলেন। পর দিন সকালে খবর লইতে যাইয়া দেখি, স্ত্রীলোকটী বিছানায় বসিয়া বার্লি খাইতেছে। ভাবিলাম, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। বাড়ী যাইয়া বসিতে না বসিতেই সংবাদ পাইলাম, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আরও দুই এক জন বিসূচিকায় ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিল। সময় বুঝিয়া সেই ডাক্তারটীও পলায়ন করিলেন। আমাদের বাটীর পনর মাইলের মধ্যে কোনও ডাক্তার ছিল না।

ময়মনসিংহে ছয় বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বাস করিলাম। আমাদের বাড়ী হইতে সহরের দূরত্ব অন্যূন চল্লিশ মাইল। আমি এক শারদীয় অবকাশে নৌকায় পাঁচ দিনে বাড়ী গিয়াছিলাম; গ্রীষ্মকালে একবার গোযানে ও একবার ঘোড়ার গাড়ীতে। অবশিষ্ট সময়ে বৎসরে দুইবার তিনবার পদব্রজে যাতায়াত করিয়াছি। আমি একদিনে ত্রিশ মাইল চলিতে পারিতাম, একবার বত্রিশ মাইল হাঁটিয়াছিলাম। মুক্তাগাছায় বড় বাড়ীর বড়দাদার বাসা আমাদের পান্থনিবাস ছিল; সুতরাং বাড়ী যাইবার মুখে যাত্রার দিন দশ মাইল ও পর দিন ত্রিশ মাইল হাঁটিতাম; প্রত্যাবর্ত্তনের কালে ত্রিশ ও দশ মাইল। ময়মনসিংহ হইতে পনর মাইল দূরে ঘোগা গ্রামে চারিবার রাত্রি যাপন করিয়াছি। কয়েক বার পথিপার্শ্বে চটীতে থাকিতে হইয়াছে। মধুপুর মদনগোপালের মন্দিরে অতিথি হইলে মধ্যাহ্নে শুভ্র আতপান্ন ও সায়ংকালে লুচি পাওয়া যাইত। কাকরাইদ ও গাবতলীর মধ্যে নয় মাইল বিস্তৃত শ্বাপদসঙ্কুল ভাওয়াল-মধুপুরের বন। কখনও আমরা দুই ভাই, কখনও আমি একাকী,

কখনও পাঁচ সাত জন সতীর্থ, পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে, বন পার হইয়াছি, কখনও কোন বিপদ ঘটে নাই। কিন্তু আমার এক সহাধ্যায়ী একবার বাঘ দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পরে কোন কোন বার প্রচণ্ড রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এমন কূপ, খাল, পচাপুকুর, নির্ঝরিণী ছিল না, যাহার জল পলে পলে না পান করিয়াছি; আবার এক এক বৎসর বর্ষার অবিরল বারিধারায় সারা পথ ভিজিতে ভিজিতে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। কত দূষিত জল পান করিয়াছি, স্মরণ করিলে আতঙ্ক হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে জন্য কোনও রোগ ভোগ করি নাই।

ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার অভ্যন্তরে যত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মকালে যথোপযুক্ত পানীয় জলের অভাব, এবং বারমাস দূষিত জল পানের ব্যবস্থা দেখিয়াছি। আগরতলার পথে এক কৈবর্ত্ত বাড়ীতে আমরা জল চাহিলাম; একটী স্ত্রীলোক এক ঘটী জল দিল; নিকটেই নদী, সুতরাং নদীর জল; পান করিতে যাইয়া দেখি, জলে ছোট ছোট পানা ভাসিতেছে। আমরা চাদর দিয়া ছাঁকিয়া জল পান করিতেছি দেখিয়া একটী ছোট মেয়ে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ওমা, গাঙ্গের জল ছাইক্কা খায়!"

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ

প্রথমবার্ষিক শ্রেণী

কলিকাতা

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দাদা কলিকাতা হইতে আনন্দের সহিত জানাইলেন, যে আমি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। তিনি আমাদের ও জেলা স্কুলের সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রের নাম পাঠাইয়াছিলেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ও কৃতকার্য্যতার সংবাদ দিয়া লিখিলেন, "You first five have passed in the First Division"—অর্থাৎ চিহ্নিত সেই পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৪২ জনের স্থলে আমাদের স্কুলে ৮৪ জন কৃতকার্য্য হইয়াছিল। আমার পত্রোত্তরে তিনি বলিলেন তুমি অবিলম্বে কলিকাতায় যাও। আমি দুই এক দিন পরেই ময়মনসিংহে গেলাম। বাড়ীতে প্রায় দেড় মাস ছিলাম। এত শীঘ্র চলিয়া যাওয়াতে মা আবার খুব কাঁদিলেন।

গিরিশবাবুরা ইতোমধ্যে মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে আমার বিষয়ে সমস্ত জানাইয়াছিলেন। বৃত্তির তালিকা বাহির হইবার পূর্ব্বে আমার কলিকাতায় উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য, এই প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহারা আমাকে শীঘ্র তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। আমি তদনুসারে জুন মাসের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোমের সহিত কলিকাতায় গেলাম।

দাদা ১৬নং রাজার লেনে ব্রাহ্মছাত্রাবাসে বাস করিতেন; তিনি এম্. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি, দেবেন্দ্র ও সুরেশ তাঁহার ঘরের পাশে একটী বড় কক্ষে থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। কয়েকদিন পরে আনন্দমোহন বসু মহাশয় গগনবাবুকে লিখিলেন, ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসনের দুইটী ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম ও তৃতীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছে। ইহার পরেই, আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইবার আশা আছে, এই দাবিতে বিনা বেতনে সিটী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। নাগাইদ ২০এ জুন কলিকাতা গেজেটে প্রবেশিকা পরীক্ষার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম প্রকাশিত হইল। দেখিলাম, ঢাকা বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তির তালিকায় আমার নাম প্রথম ও মহিমের নাম তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম, "আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না, আমি ২০৲ (কুড়ি টাকার বৃত্তি) পাইতে পারি।" পরীক্ষার বৎসরটা কিরূপ মানসিক সংগ্রাম ও অশান্তি অসুবিধার মধ্যে কাটিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এণ্ট্রান্স হইতে এম্, এ. পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষাতেই আমি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে পারি নাই। তারপর, আমার মেধা সকল বিষয়ে সমভাবে সবল ছিল না; অধিকন্তু আমি নিদ্রা, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতাও জয় করিতে পারি নাই। আমার পরম হিতৈষী শিক্ষকের ঐকান্তিক যত্ন নিষ্ফল হইল, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

যাহারা আমার মত পূর্ব্ববাঙ্গালার ক্ষুদ্র সহর হইতে কলিকাতায় পড়িতে যায়, প্রথম প্রথম তাহারা চিত্তবিক্ষেপকারী নানা অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে। কয়েকটী ভাল কাজে যোগ দিতে হইল। ময়মনসিংহ সম্মিলনী এবং ছাত্রসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের

সভার সভ্য হইলাম। পূজনীয় অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ২৮শে জুলাই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে একটী সাহিত্য সভা (Literary Club) স্থাপিত হইল; সমপাঠীরা আমাকে তাহার সম্পাদক মনোনীত করিলেন। প্রতি সপ্তাহে ইহার অধিবেশন হইত, হেরম্ব বাবু ও অন্যান্য অধ্যাপক সভাপতির কার্য্য করিতেন, সভ্যগণ ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। আমরা বিলাতের The Times, Tri-weekly Edition, The Pall Mall Budget (Weekly Edition of the Pall Mall Gazette), The Freeman's Journal (Dublin) প্রভৃতি সাময়িক পত্র কলিকাতাতেই সস্তাদরে ক্রয় করিতাম। কয়েক মাস উৎসাহের সহিত সভাটীর কাজ চলিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগ দেওয়া, ছাত্রসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় বক্তার বক্তৃতা শ্রবণ, তত্ত্ববিদ্যাসভায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্তের নিকটে অধ্যয়ন, এগুলি ছিল আমার নিত্যকর্ম্ম! নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে ছিল—আজ হিন্দু স্কুলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা, কাল টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, পরশু সিটী কলেজে ছাত্রসমাজের সান্ধ্য সম্মিলন— এসকলে উপস্থিত থাকাই চাই। তদুপরি যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, কোম্পানীর বাগান (Botanical garden), ফোর্ট উইলিয়ম, পরেশনাথের মন্দির ইত্যাদি তো আছেই! ঐ সান্ধ্য সম্মিলনেই আমি চিরস্মরণীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। আমার নাম শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "ইনিই বুঝি সেই ছাত্রটী, যাঁহার স্কলারসিপ পাওয়া সম্বন্ধে সংশয় ছিল?"

তবে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এখনকার মত ফুটবল, ক্রিকেট, হকি,

টেনিসের উদ্দাম তরঙ্গ ছিল না। আমরা কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে ফুটবল চোখে দেখি নাই ; গ্রামে থাকিতে বক্রমূল বাঁশের যষ্টি দ্বারা দেশীয় সংস্করণের হকি খেলিতাম। তখন কলিকাতাতেও স্কুল কলেজে ফুটবল ক্রিকেটের শৈশবাবস্থা। সিটী কলেজে ফুটবলের দল (team) ছিল না। ক্রিকেটের উৎসাহ এত নিস্তেজ ছিল যে, আমিও এগার জনের এক জন হইয়া শোভাবাজার ক্লাবের সহিত খেলিয়াছিলাম। আমাদের পরাজয় এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, আমরা যে রজনীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিলাম, তাহাতেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে নবাগত ব্যক্তিকে রোগের ঋণ শোধ করিতে হয়, আমাকেও করিতে হইল। আমি পৃষ্ঠব্রণে (carbuncle) কাতর হইয়া দশ বার দিন গৃহে আবদ্ধ রহিলাম। সেজন্য সিটী কলেজে বামাবোধিনী পত্রিকার রৌপ্যোৎসবে বিখ্যাত বক্তা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনিতে পারিলাম না, এই ক্ষোভ রহিল।

কলেজে প্রবেশ করিয়া স্বভাবতঃই নব আনন্দ আস্বাদন করিলাম। আমাদের শ্রেণীতে প্রায় এক শত ছাত্র ছিল। সাহিত্য সভার সম্পাদকরূপে আমার প্রায় সকলের সহিতই পরিচয় হইল, কতিপয় সহপাঠীর সহিত বন্ধুতাও জন্মিল। সিটী স্কুল হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু কুড়ি টাকার বৃত্তি পাইয়াছিলেন ; ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রথম দিন দূর হইতে ইহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিয়াছিলাম, "এবার তোমার নিকটে হারিয়া গিয়াছি ; আগামী পরীক্ষায় তোমাকে পরাজিত করিব।" তখন জানিতাম না মেধা, অধ্যবসায় এবং অধ্যয়নে নিষ্ঠা, সকল বিষয়েই

আমি ইঁহার কত পশ্চাতে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচার্য্য নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল হইতে পনর টাকার বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার সহিতও সৌহার্দ্দ হইল। ইনি উত্তরকালে বিদ্যাবত্তায় যশস্বী হইয়াছিলেন।

তখন ১৩, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের নবনির্ম্মিত বাটীতে সিটী কলেজ ও স্কুল বসিত। কলেজের চারিটী শ্রেণীর সঙ্কুলানের জন্য এক ত্রিতলের কক্ষগুলিই যথেষ্ট ছিল। এখানে আমার মনস্তত্ত্বের একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার সময় আমি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ছাত্র বলিয়া দিনের পর দিন আপনাকে হীন বোধ করিতাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিংশ শতাব্দীর সংস্কারের পূর্ব্বে ছাত্রগণের বিষয় নির্ব্বাচনের অধিকার ছিল না। ইংরেজী, গণিত, সংস্কৃত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physics), রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, এবং তর্কশাস্ত্র (Logic) আমাদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও গোপালচন্দ্র দাস (ঘোষ); উভয়েই এম্. এ. পরীক্ষায় সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোপাল বাবু অল্পকাল পরেই চলিয়া যান; তাঁহার স্থলে দুই তিন জন দশ পনর দিন কাজ করিয়া গেলেন। পরিশেষে হেরম্ব বাবুর অনুরোধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। ইনি সেই বৎসরেই (১৮৮৮) সিটী কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মৈত্র মহাশয় ইঁহার নিয়োগের কয়েক দিন পরেই আমাকে বলিয়াছিলেন, "নব্য বি. এ. উপাধিধারীদিগের মধ্যে (among young graduates) আমি রামানন্দের মত কাহাকেও দেখি নাই।"

রামানন্দ বাবু অচিরেই আমাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সহিত আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এক দিকে স্নেহ ও অপর দিকে ভক্তির সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলাম। তাঁহার চরিতাখ্যান পরে লিখিত হইবে। কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিয়া আমি তাঁহার দুইটী বৈশিষ্ট্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ মৈত্রমহাশয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপরে আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। তিনি অনর্গল বিশুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারিতেন; এক একটা দীর্ঘ বাক্য আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দগতিতে বহিয়া যাইত, কোথাও শব্দের বা রচনাবিন্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে হইত না। তৎপরে, ইনি ক্লাসে শৃঙ্খলা রক্ষায় সুদক্ষ ছিলেন। ইঁহার অধ্যাপনার সময়ে ছাত্রেরা উৎকর্ণ হইয়া বক্তৃতা শুনিত, "আলপিনটী মাটিতে পড়িলে তাহার শব্দ শুনা যায়," ক্লাসে এই প্রকার নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। দুরূহ পদাবলীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাতে ইঁহার যে দক্ষতা ছিল, তাহা সহজলভ্য নহে, একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

জানি না কোন্ গুণে আমি অত্যল্প কালের মধ্যেই মৈত্র মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এক দিন প্রাতঃকালে গোলদীঘি হইতে বাড়ী ফিরিতেছি, ইনি প্রাতভ্র্মণে বাহির হইয়াছেন; উভয়ে কলেজ স্কোয়ারের বিপরীত ফুটপাথে বিপরীত দিকে যাইতেছি; ইনি আমাকে দেখিয়াই আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কেমন আছ, অনেক দিন দেখি নাই।" তারপর রামানন্দ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে প্রশংসা শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার একটুকু উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় শিক্ষানৈপুণ্যে ও চরিত্রমাধুর্য্যে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে পলে পলে ইঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তো কথাই নাই, বি. এ. শ্রেণীতে ইঁহার নিকটে অর্থনীতি পড়িয়াছিলাম, ইনি তাহাও চমৎকার পড়াইতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে খুব স্নেহ করিতেন।

তর্ক ও দর্শনের অধ্যাপক মাননীয় অম্বিকাচরণ মিত্র সুশিক্ষক ছিলেন; ভদ্রতা ও মৃদুভাষিতা ইঁহার বিশেষ গুণ ছিল। ইনিও আমাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন।

ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় কালীশঙ্কর সুকুল, গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন—তিনজনই শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। আমি ইঁহাদের নিকটে অধিক কাল পড়ি নাই।

কয়েক মাস পরে আমার অন্তরে কি রকম একটা শুষ্কতা ও অবসাদ আসিল। কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতে মনে স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতাম না। পড়াশুনা করিতাম বটে, কিন্তু তাহাতে ঐকান্তিকতা ছিল এমত বলিতে পারি না।

পূজার ছুটীতে বাড়ী গেলাম। গণকেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ২০এ কার্ত্তিক কুরুক্ষেত্রযোগ, সেদিন পৃথিবী ধ্বংস হইবে। মা বলিলেন, "যদি পৃথিবী ধ্বংসই হয়, তবে কলিকাতায় যাইয়া কাজ নাই।" আমি ভাবিলাম, মাতার কথাই শিরোধার্য্য; কলেজ তাহার পূর্ব্বেই খুলিবে, এবং অধ্যক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, কলেজ খুলিবার পরেই ষাণ্মাসিক পরীক্ষা হইবে। আমি কুরুক্ষেত্র-যোগ পর্য্যন্ত বাড়ী থাকিব, তাহার পরে কলেজে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার দায় হইতে বাঁচিয়া যাইব।

এই দুষ্টবুদ্ধির প্রেরণায় আমি কুরুক্ষেত্রযোগের অপেক্ষায় বাড়ী বসিয়া রহিলাম, এবং বিদায় প্রার্থনা করিয়া অধ্যক্ষের নিকটে দরখাস্ত পাঠাইলাম। তিনি তাহা নামঞ্জুর করিলেন, এবং অনুপস্থিতির জন্য অক্টোবর মাসের তিন দিনের বৃত্তি কাটিলেন। আমি নাগাইদ ১০ই নবেম্বর কলেজে হাজির হইয়া অধ্যক্ষের আদেশ জানিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম, এবং তাঁহাকে ছুটীর জন্য ধরিয়া বসিলাম। উমেশবাবু কিছুতেই শুনিবেন না; শেষে বলিলাম, "মা আমাকে আসিতে দিলেন না, আমি মাতৃ-আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করিব?" এই কথা শুনিয়া তিনি আমাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু পরীক্ষাটা স্থগিত হইয়াছিল, আমি তাহার হাত এড়াইতে পারিলাম না। ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতির পরীক্ষা দিয়া গণিতের প্রশ্নপত্র হাতে লইয়াই সরিয়া পড়িলাম।

নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে দাদা এম, এ. পরীক্ষা দিয়াই গয়া ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি এখন হইতে ষোল আনা স্বাধীন হইলাম।

দুই এক দিন পরেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা তাঁহাকে একদিন সায়ংকালে আমাদের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলাম। তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইল।

আমাদের ছাত্রাবাসে বিজয়কৃষ্ণ বসু বাস করিতেন। তিনি বয়সে আমার দুই বৎসরের ছোট ছিলেন, কিন্তু দুই শ্রেণী উপরে পড়িতেন। বিজয় বাবু ও দেবেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুত্ব ছিল। পূজার ছুটীর অবসানে তিনি আমার সুপ্ত অনুরাগ জাগাইয়া তুলিলেন। দিনের পর দিন আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এই বলিয়া যে, বাঞ্ছিত জনের সহিত যথাকালে আমার নিশ্চয়ই মিলন হইবে। তিনি

দেবেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে ভরসা দিতেন, কাজেই আমিও তাঁহার নিকটে ঈপ্সিত আশ্বাস পাইয়া নাচিতে লাগিলাম।

শারদীয় অবকাশের মধ্যে দেবেন্দ্রের জননী সিমলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া চোরবাগানে বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলেন; দেবেন্দ্র তাঁহার গৃহে গেলেন, স্বর্ণলতাও ময়মনসিংহ হইতে মাতার নিকটে আসিলেন। আমি সে বাড়ীতে যাইতাম না, এবং দেবেন্দ্রের সহিত পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতাম না। কিন্তু বিজয় বাবুর সহিত অন্তরঙ্গ আলাপের দরুণ আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। জানিতে পারিলাম, তিনিও ভুক্তভোগী, কিশোর বয়সেই এক পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর তরুণী কন্যাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন, এবং সফলতার আশাও পাইয়াছেন।

মাঘ মাসে (জানুয়ারী ১৮৮৯) আমাদের মহোৎসব। এইবার আমি প্রথম কলিকাতায় মাঘোৎসবে যোগ দিলাম। তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শৈশবাবস্থা, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রদ্ধাভাজন নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, পূজ্যপাদ উমেশচন্দ্র দত্ত, মাননীয় আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তা ও আচার্য্যের মধ্যাহ্নকাল; শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সীতানাথ দত্ত পূর্ণযৌবনে উপস্থিত। আমাদের প্রাণে আশা ও আনন্দ আর ধরে না। আমরা ব্রাহ্ম ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা নিয়মিতরূপে উৎসবের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম; বিজয়কৃষ্ণ বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, বিহারীকৃষ্ণ দেববিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আমি আনন্দবাজারে পরিবেশন করিতাম। উৎসবের শেষ দিন, রবিবার উল্টাডিঙ্গীতে উদ্যান সম্মিলন হইল। উৎসব কমিটীর সম্পাদক ভক্তিভাজন গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় আমাদিগের উপরে উদ্যানোৎসব সুসম্পন্ন করিবার ভার দিলেন। আমরা পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইয়া বাগানে গেলাম, এবং উপাসনার প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ খাটাইয়া ও তাহা পত্রপুষ্পে সাজাইয়া আহারান্তে রাত্রি প্রায় বারটার সময় শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে নরনারী আসিতে লাগিলেন। আমি ভাঁড়ার ঘরের ভার লইলাম। প্রায় ৯॥ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল, ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন; উপাসনা একটু দীর্ঘ হইয়াছিল; বুভুক্ষু উপাসক উপাসিকারা অনেকেই ভাঁড়ার ঘরের দ্বারে আসিয়া হাত পাতিয়া মুড়ি ও বুঁদে লইয়া গেলেন। বারটার পরে চিরাগত খেচরান্ন প্রভৃতি দ্বারা উৎসবের যাত্রীরা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন, আমরাই পরিবেশন করিলাম। সকলের শেষে বেলা চারিটার সময় আমরা আহার করিবার অবসর পাইলাম। তৎপরে অবসন্ন দেহ লইয়া সায়ংকালে শান্তিবাচনের উপাসনায় যোগ দিবার মানসে বাগান হইতে মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ভক্তিভাজন পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় বেদি গ্রহণ করিলেন। আমি বেদি ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম। উদ্বোধন আরম্ভ হইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। সমস্বরে আরাধনার মন্ত্র, প্রার্থনা ও উপসংহার সূচক বৈদিক বচন উচ্চারণের কালে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তদতিরিক্ত আচার্য্যের একটী বাক্যও আমার কর্ণগোচর হয় নাই।

পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় এবারের মাঘোৎসবে প্রথমাবধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া আমি ও আর একটী ছাত্র তাঁহাকে আমাদের ছাত্রাবাসে লইয়া আসিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলাম। দেবেন্দ্রের পিতা পূজ্যপাদ কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার আতিথ্যই গ্রহণ করিলেন।

উৎসব শেষ হইলে একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে গেলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিবার পথে তিনি গোলদীঘির কোণে মাধববাবুর বাজারের সম্মুখে ট্রামগাড়ী হইতে নামিলেন, আমি মেছুয়াবাজারের মোড়ে নামিব বলিয়া ট্রামে বসিয়া রহিলাম। সেকালে কলিকাতায় ঘোড়ার ট্রাম ছিল। আমি দেখিলাম, পণ্ডিতমহাশয় নামিয়াই পড়িয়া গেলেন। আমি দৌড়াইয়া কাছে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার এক হাঁটুতে খুব আঘাত লাগিয়াছে, এবং ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে। তিনি গোলদীঘিতে যাইয়া ক্ষত ধুইয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহাকে আর এক ট্রাম গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে উহার সঙ্গে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত গেলাম, এবং তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া সঙ্গে করিয়া চোরবাগানে দেবেন্দ্রদের বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিলাম। তারপরে ডাক্তারের অন্বেষণে চলিলাম। আমাদের মেসে মেডিক্যাল কলেজের উচ্চ শ্রেণীর এক জন ছাত্র ছিলেন, প্রথমে তাঁহাকেই ধরিলাম, তিনি মানসিক কারণে ঘরের বাহির হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তৎপরে চাঁদনীচকে যাইয়া এক উদীয়মান এম্. বি. পাশ ডাক্তারকে পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিতে অনুরোধ করিলাম, তিনিও যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা আবার আমাদের বাসায় যাইয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (বর্ত্তমান সময়ে অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তকে শ্রীনাথবাবুর অবস্থা জানাইলাম। তিনি তখনই আমার সঙ্গে যাইয়া ক্ষত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সপ্তাহকাল ছুটী লইয়া চৌধুরীভবনে রহিলেন, আমি কখনও কখনও তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম ; যেদিন তিনি ময়মনসিংহে যাত্রা করিবেন, সেদিনও গিয়াছিলাম।

এই সূত্রে আমার দেবেন্দ্রদের বাড়ী যাইবার একটা পথ পড়িল। আমি সপ্তাহে কিংবা এক পক্ষে একবার সেখানে যাইতাম, দেবেন্দ্রের মাতা বিশেষ সমাদর করিতেন না, অনাদরও করিতেন না; অন্য দুই একজন পরিচিত যুবক যেমন যাইত, আমিও সেইরূপ যাইতাম, প্রভেদ এই ছিল যে, আমি স্বর্ণলতার সহিত কথা বলিতাম না, অপরের পক্ষে সেপ্রকার কোনও বাধা ছিল না। মাস দুই এইরূপ যাতায়াতের ফলে আমার মনে ধারণা জন্মিল যে, আমি সে গৃহে কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নই, হয়তো কোন একজনের আমার প্রতি অনুকূল ভাবও আছে।

একদিন সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে একখানা সঞ্জীবনী হাতে লইয়া কাগজখানা সেই সপ্তাহের কি না, তাহা জানিবার জন্য তারিখ দেখিবার চেষ্টা করিয়া তারিখটা পড়িতে পারিলাম না। স্বর্ণলতা সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া দেশলাই জ্বালিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু অনুরোধ করিয়াই, কেন আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কথা বলিলাম, এই ভাবিয়া আমার অনুতাপ হইল, আমি পর দিন হইতে সে বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিলাম।

ফাল্গুন মাসে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। শনিবার সোণার-পুর ষ্টেশন হইতে নগরকীর্ত্তনের দল যাত্রা করিল; গগনবাবু ও আমি তাহাতে নেতৃত্ব করিলাম, এবং দীর্ঘপথ কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় হরিনাভি উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার যাত্রীরা এক ভদ্র-লোকের গৃহে অতিথিসৎকার লাভ করিলেন। রবিবার উৎসবের প্রধান দিন; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপাসনা, উপদেশ, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইল। মধ্যাহ্নে আমাদের গৃহস্বামী বিবিধ উপাদানে

উৎসবকারীদিগকে ভূরিভোজন করাইলেন। পরদিন প্রভাতে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম।

হরিনাভির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। এই গ্রামের সন্নিকটে এক সময়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইত; নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; তলদেশের এক এক অংশ এক এক ভদ্রলোকের অধিকারে আছে, তাহার নাম "ঘোষের গঙ্গা," "বসুর গঙ্গা" ইত্যাদি। ব্যাপারটা খুব কৌতুকাবহ বোধ হইয়াছিল।

সোমবার কলিকাতায় আসিয়াই স্নানাহার করিয়া বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইলাম। প্রথম দিন, ইংরেজী, দুই দিন বই স্পর্শ করি নাই। কিন্তু এবার সকল বিষয়েই পরীক্ষা দিলাম। ইংরেজীতে ১৫০এর মধ্যে আমি পাইলাম ১২০, প্রবোধ পাইলেন ১৪০। সংস্কৃতে শতকরা ৬০; অঙ্কে ১০০র মধ্যে ৫৫। বিজ্ঞানে ভাল নম্বর পাই নাই; মনে আছে, রাজেন্দ্রবাবু আমার ফল দেখিয়া দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার অসুখ করিয়াছিল না কি? অন্য দুই বিষয়ের নম্বর স্মরণ নাই। একটা সান্ত্বনার বিষয় এই ছিল যে, ইংরেজীর পরীক্ষক রামানন্দবাবু মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Rajanikanta Guha writes the best English"; এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যও (for neatness) আমাকে ও আর একটী ছাত্রকে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন।

এই সময়েই প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে রচনার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হয়। স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (S. P. Sinha, Bar-at-Law, পরে Lord Sinha) পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে দশ টাকার বৃত্তিপ্রাপ্ত উমেশচন্দ্র দাসকে পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ

করেন ; প্রবোধ ও আমাকে দ্বিতীয় স্থান দেন। উমেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে রচনায় কি লিখিয়াছিল ; তাহার উত্তর হইতে বুঝিয়াছিলাম, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের স্কুল অপেক্ষা উন্নততর ছিল, এবং সে পাঠ্যাতিরিক্ত পুস্তকও আমার চেয়ে বেশী পড়িয়াছিল।

এদিকে বিজয়বাবু ও দেবেন্দ্রের মন্ত্রণা নিয়তই চলিতেছিল, এবং তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া আমার চিত্তও আনন্দ হিল্লোলে দুলিতে-ছিল। আমি ভাবিলাম, এক্ষণে দেবেন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলিবার সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া একদিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিলাম, "বিজয়বাবুর সহিত তোমার যে কথা হইতেছে, তাহা আমাকেই বল না কেন ?" সে বলিল, "আমি তোমার সহিত কোনও কথা বলিতে চাহি না।" আমি বিরক্ত হইয়া দূরে সরিয়া পড়িলাম। গ্রীষ্মের ছুটীতে দেবেন্দ্রের মা পুত্র-কন্যাসহ ময়মনসিংহ যাইবেন, এই প্রকার স্থির করিয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি দাদার অনুমতিও পাইয়াছিলাম। কিন্তু দেবেন্দ্রের ব্যবহারে আমি ময়মনসিংহ যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিলাম, এবং সোজা বাড়ী চলিয়া গেলাম।

এই গ্রীষ্মের ছুটীতে আমরা চারি ভাই টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলাম।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যেরূপ পড়াশুনা করিলাম, তাহাতে এফ. এ. পরীক্ষায় কলিকাতার প্রতিযোগিতায় বৃত্তি পাইবার আশা ক্ষীণ হইয়া আসিল। ছুটীতে দাদাও গয়া হইতে বাড়ী আসিলেন। তিনি আমার ডাএরী পড়িতেও ছাড়িতেন না ; তাহা হইতে আমার ভাবোচ্ছ্বাস সমস্তই জানিতে পারিলেন। একদিন আমাকে বলিলেন,

"আমি নিয়মিতরূপে বেতন পাই না ; তুমি যদি এফ. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি না পাও, তবে তোমার বি. এ. পড়া হইবে না। অতএব তুমি ঢাকায় যাও।" আমি গ্রীষ্মের অবকাশে বেশ পড়িলাম, এবং কলেজ খুলিলে কলিকাতায় যাইয়াও পাঠে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোনিবেশ করিলাম ; কিন্তু নিশ্চিত হইতে পারিলাম না ; অবশেষে ঢাকায় যাওয়াই স্থির হইল।

আমি সিটী কলেজে বিনাবেতনে পড়িতাম। কলেজের নিয়ম ছিল, আমার মত অনুগৃহীত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পূর্ব্বে অন্য কলেজে চলিয়া গেলে তাহাকে প্রাপ্য সমুদায় বেতন পরিশোধ করিতে হইবে। দাদা আমাকে ৬০৲ টাকা পাঠাইলেন। জুলাই মাসের প্রথমে আমি অধ্যক্ষ উমেশবাবুর নিকটে ট্রান্‌স্‌ফার সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিলাম ; তিনি উহা মঞ্জুর করিলে আফিসে যাইয়া চৌদ্দ মাসের বেতন ও ট্রান্‌স্‌ফার ফি বাবদে মোট ৪৫৲ টাকা দিয়া আমি ক্লাসে যাইয়া বসিলাম। টাকা অফিসের হিসাবের বহিতে জমা হইল, হাজিরার বহিতে আমার নাম transferred (অন্য কলেজে গত) বলিয়া চিহ্নিত হইল ; সার্টিফিকেট যথারীতি প্রস্তুত হইয়া অধ্যক্ষের স্বাক্ষরের জন্য তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইল। তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন এমন সময়ে হেরম্ববাবু কলেজে আসিলেন, এবং ব্যাপারটা শুনিয়াই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি অধ্যক্ষের ও অধ্যাপকদিগের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই মৈত্র মহাশয় আমাকে তাহারই একাংশে অধ্যক্ষের গোপন কামরায় লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি এই সার্টিফিকেট ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, তোমার দাদাকে বল, আমার নামে Director of Public Instructionএর নিকটে নালিশ করিতে।" বলিয়াই

সার্টিফিকেটখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি উচ্চবাচ্য করিলাম না; অফিসে যাইয়া টাকা ফেরৎ লইলাম এবং দাদাকে সমস্ত জানাইয়া টাকাগুলি সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়া পোষ্ট অফিসে জমা রাখিলাম; কেরাণীকে খাতাগুলি পুনরায় কাটিয়া সংশোধন করিতে হইল।

দাদা পত্রোত্তরে লিখিলেন, "আমার যাহা বলিবার, বলিয়াছি; এখন তোমার যাহা ইচ্ছা কর।" দাদাও সিটী কলেজের ছাত্র ছিলেন, এবং বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের মাসিক চল্লিশ টাকার রিপন বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দাদা যে আমাকে ঢাকা যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ইহাতে হেরম্ববাবু তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এইরূপে কয়েকদিন গেল।

ইহার পরে এক রবিবার সায়ংকালীন উপাসনায় মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম; আমাকে চুল আঁচড়াইতে দেখিয়া এক বয়ঃপ্রবীণ বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আর সিঁথি করিয়া কি হইবে?" আমি বলিলাম, "কেন, বলুন তো?" তিনি বলিলেন, "She has declared for another." (তিনি আর একজনের পক্ষে মত দিয়াছেন।" আমার তখনই মনে হইল, এখন কলিকাতা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এ দিকে দাদাও ঢাকা যাইবার জন্য নির্বন্ধ করিতেছেন। আমি পরদিন কলেজে যাইয়াই অধ্যক্ষের হাতে আমার দরখাস্ত দিলাম। হেরম্ববাবু তাঁহার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন; উমেশবাবু দরখাস্তখানা তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। মৈত্র মহাশয় উহা পড়িয়া শুধু বলিলেন, "তা, আমি আর কি করিব?" সেই দিনই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পাইলাম, এবং দুইএকদিনের মধ্যেই

ঢাকায় চলিয়া গেলাম। বন্ধুরা অনেকেই এই কার্য্যের বিরোধী ছিলেন; বিজয়বাবু যাত্রার সময়ে কিয়দ্দূর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শেষ মুহূর্ত্তেও বলিয়াছিলেন, "You will come back unsuccessful" (তুমি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিবে)।

ঢাকায় যাইয়া লক্ষ্মীবাজারে ব্রাহ্মছাত্রদিগের মেসে উঠিলাম, এবং পরদিন, জুলাই মাসের ১২ই কি ১৩ই ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। এই আমি চারি বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুল ও তাহার প্রধান শিক্ষক রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া "দেশীয় বিদ্যালয়ে" চলিয়া গিয়াছিলাম। রত্নমণিবাবু এখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ মাষ্টার। তিনি দেখিলেন, আমি "দেশীয়" জগন্নাথ কলেজে না যাইয়া গবর্ণমেণ্ট কলেজে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু এই অসঙ্গতি হইতে আমার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

লক্ষ্মীবাজারের বাসায় সকলের সঙ্কুলান না হওয়াতে আমরা বনগাঁয়ে উঠিয়া গেলাম।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী
ঢাকা

ঢাকা কলেজে তিনজন ইংরেজ অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যক্ষ এ. সি. এডোয়ার্ড্স আমাদিগকে Paradise Lost, Book I পড়াইতেন; তাঁহার হাতে, হাঁটুর উপরে ও টেবিলে তিন চারিখানা টীকার বহি থাকিত; বেশ বাক্যান্তর (paraphrase) করিয়া যাইতেন। সি. আর. উইল্‌সন Helps' Essays পড়াইতেন; তিনি নোট (notes) লিখাইয়া দিতেন, আমরা কালী দিয়া লিখিয়া

লইতাম। দফতরী প্রতিদিন ছাত্রদিগকে কালী জোগাইত। অধ্যাপক উইল্‌সন ভাল লোক ছিলেন, ইনি ছাত্রদের সহিত মিশিতেন, তাহাদিগের বাসায় যাইয়া আলাপ করিতেন। তাঁহার কথা বুঝিতে একটু বেগ পাইতে হইত। অধ্যাপক ঈ. এফ্. মণ্ডী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Physics) পড়াইতেন। তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ যেমন সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য, ব্যাখ্যাপ্রণালীও তেমনি প্রাঞ্জল ছিল। শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষ তাঁহার যোগ্য সহকারী ছিলেন; হাতে কলমের কাজগুলি (experiments) উৎকৃষ্ট হইত। দেশীয় অধ্যাপকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ শশিভূষণ দত্ত মহাশয়। আমি ঢাকায় পহুঁছিবার পরদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিচয়পত্র লইয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম; ইনি তদবধি আমৃত্যু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আমাকে অবিচ্ছেদে স্নেহ করিয়া গিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের বয়স তখন ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ বৎসর; কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি ইংরেজী, ইতিহাস ও লজিক পড়াইতেন, তিনটীর অধ্যাপনাই উত্তম হইত। ইঁহার কণ্ঠস্বর নারীজনোচিত অনুচ্চ ছিল, তাহা সত্ত্বেও ইনি যতক্ষণ উপস্থিত থাকিতেন, ছাত্রগণের মধ্যে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বর্ত্তমান থাকিত। শশীবাবু একদা আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, পরদিন ইতিহাসের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথাসময়ে এক একজনকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; যাহারা ঠিক উত্তর দিল—আমিও তাহাদিগের মধ্যে একতম ছিলাম —very good (অতি উত্তম) বলিয়া তাহাদিগের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। অনেকে পারিল না; তখন তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "Many of you

are husbands, and perhaps some of you are fathers" (তোমরা অনেকে বিবাহ করিয়াছ, হয় তো কেহ কেহ পিতাও হইয়াছ)। তিরস্কার-ভাজন ছাত্রেরা নীরব নিস্পন্দ থাকিয়া এই গ্লানি গ্রহণ করিল।

পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্. এ., যথাক্রমে সংস্কৃত পদ্য ও গদ্য পড়াইতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার নাম আমার পরিচিত ছিল। ইনি রঘুবংশের বড় বড় সমাসযুক্ত পদের ঠিক তদনুরূপ প্রতিশব্দ দিতেন, উচ্চকণ্ঠে পড়াইতেন, এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেও পারিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নব্য প্রণালীতে শিক্ষিত ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার অধ্যাপনা খুব হৃদয়গ্রাহী হইত। এমন নিরভিমান অধ্যাপক অল্পই দেখা যায়। একদিন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিধারী একটী ছাত্রের সহিত ইঁহার ব্যাকরণের একটা নিয়ম সম্পর্কে বিচার আরম্ভ হইল। অধ্যাপক পাণিনি বা মুগ্ধবোধের একটা সূত্র উদ্ধৃত করিয়া নিজের মত সমর্থন করিলেন, ছাত্র অন্য একটী সূত্রদ্বারা তাহা খণ্ডন করিলেন। গুরুশিষ্য এইরূপে সূত্রের পর সূত্র আবৃত্তি করিয়া তর্ক করিতেছেন, আমরা সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছি। পরিশেষে কালীপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "Yes, you are right" (হাঁ, তুমিই ঠিক বলিয়াছ)। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। বসু মহাশয়ের গণিত বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইনি সুনিপুণ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রগণের নাম স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা ইঁহার আশ্চর্য্য ছিল। আমাকে একদিন

দেখিয়াই চিনিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় দিন ক্লাসে বসিবার সময় "মিষ্টার গুহ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। রাজকুমারবাবু অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এণ্ট্রান্স হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেন মহাশয়েরও অধ্যাপনাতে খ্যাতি ছিল, তবে প্রাগুক্ত কারণে ইঁহার ইংরেজীর উচ্চারণ শ্রোতার রসবোধ উদ্দীপ্ত করিত।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল; কতকগুলি বিষয়ের অধ্যাপনা একত্র একতলায় গ্যালারীতে, কতকগুলি দোতলায় স্বতন্ত্র কক্ষে হইত। নিজ নিজ কক্ষ হইতে গ্যালারীতে যাইবার সময় ছাত্রদিগের মধ্যে রীতিমত দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলিত।

আমি তত্ত্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। পরীক্ষার পরেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রসমাজের উৎসবোপলক্ষে ঢাকায় আগমন করিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যে, ঢাকাতেই যেন আমার পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের হস্তে পরীক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে একদিন সায়ংকালে কলেজ হইতে যাইয়া ব্রাহ্মমন্দিরে আমি পরীক্ষা দিলাম। সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত লিখিলাম। ঘোষ মহাশয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অমায়িক সস্নেহ ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভক্তিভাজন

উমেশচন্দ্র দত্ত পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে অবগত হইলাম, আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। তত্ত্ব-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভায় আমি Martineau's Types of Ethical Theory, 2 Volumes, প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বি. এ. পরীক্ষায় উহা আমাদিগের পাঠ্য ছিল।

ঢাকায় অবস্থানকালে তিন বৎসর পরে আমার জ্বর হইল, তারপর আমাকে কষ্টদায়ক উদরাময়ে ধরিল। কলেজের ডাক্তার প্রতিদিন কলেজে বসিয়া রোগী দেখিতেন, তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে নিয়মপূর্ব্বক আহারাদি করিয়াও আরোগ্যলাভ করিতে তিন মাস লাগিয়াছিল, এবং আমার শরীরও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

ভ্রাতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক একটী ছাত্র ছিলেন, নাম সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; ইঁহার পিতা বিক্রম-পুরের ফুরসাইল গ্রাম-নিবাসী পূজনীয় জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌহাটী নর্ম্মাল স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্ম করিতেন; সতীশ তথাকার গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুল হইতে তের বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আসামের মাসিক কুড়িটাকার বৃত্তি এবং সেই প্রদেশে গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যয়নে অনুরাগের জন্য অধ্যাপকেরা ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ছাত্র বলিয়া ইনি অধ্যাপক মণ্ডীর সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। সতীশচন্দ্র বয়সে আমার সাত বৎসরের ছোট হইলেও আমরা ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। একদিন দেখিলাম, সতীশ

কলেজে অনুপস্থিত, পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি গতকল্য কলেজে আইসেন নাই কেন?" তিনি বলিলেন, "আমাদের সহাধ্যায়ী (B. sectionএর) অমুক কাল বাড়ী গিয়াছেন, সেজন্য মন এত খারাপ ছিল, যে কলেজে আসিতে পারি নাই।" কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইঁহাদের মধ্যে গভীর প্রণয় বিদ্যমান। আমি জানিতাম, আসক্তিমূলক প্রণয়পাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে কেহ মানুষ হইতে পারে না। তখন এই বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দিবার সংকল্প করিলাম। এই দুরূহ কার্য্য আমি ময়মনসিংহেও করিয়াছি। দিনের পর দিন সতীশকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, আসক্তির বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে। একদিন কলেজের পরে কথা আরম্ভ হইল, রাত্রি সাড়ে আটটায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা শেষ করিয়া আমরা স্ব স্ব গৃহে গেলাম। তারপর সতীশ বন্ধুকে পত্র লিখিয়া বন্ধন ছেদন করিলেন।

সতীশের সহিত যখন ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল, তখন আমার জানিতে ইচ্ছা হইল, তাঁহার ধর্ম্মমত কি, এবং তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি আছে কি না। দুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম।

(১) দাবদাহভীষণেঽত্র শোকতাপ পূরিতে
অস্তি কশ্চিদাত্মনোঽপি হৃদ্ব্যথাবিদূরণম্॥
পূজনং কথং ভবেত্তু তোষণঞ্চ জায়তে॥
চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তিণোত্তরং প্রদীয়তে॥

"দাবদাহের ন্যায় ভীষণ, শোকপাপপূর্ণ এই সংসারে আপনার হৃদয় ব্যথা বিদূরণ করিবার কেহ আছেন কি? কিরূপে তাঁহার পূজা করিতে হয়? কিসে তাঁহার তুষ্টি হয়? চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী (সতীশ) ইহার উত্তর দিবেন।"

(২) মলিনামবশামবসাদযুতাম্।
পরশাসনপীড়নভীত মুখাম্॥
অবলোকয় ধীর সখে জননীং।
অবরোধয় মা করুণাকণিকাম্॥

হে ধীর সখে, মলিনা, অবশা, অবসাদযুক্তা, পরশাসন পীড়াহেতু ভীতমুখী জননীকে অবলোকন কর; করুণাকণা রোধ করিও না। সতীশ ইহার উত্তরে দুইটী শ্লোক লিখিয়া দিলেন।

পরমেশ্বরমাহ নরঃ পিতরম্
পরমেশ্বরসৃষ্টমহঙ্কৃতিতঃ?
অবধীরয়তীতর জীবগণম্
স তু যোঽনৃতবাক্ কৃতিভির্গণিতঃ।
উদিতে গগনে তপনে তিমিরং
ভুবনং বিজহাতি যথা ত্বরিতম্
উদিতে চ তথা হৃদয়ে কলুষম্
সদুপাসন আত্মন এত্যচিরম্॥

সেপ্টেম্বর মাসে শ্লোকবিনিময় হইল।

সতীশের উত্তর হইতে অবগত হইলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাঁহার পিতা এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন, তিনিই তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। সতীশ পনর বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই আমিষাহার বর্জ্জন করেন।

এক দিন (২৪এ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে আমরা রমণায় বেড়াইতে গেলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই জনে অনুকূল স্থানে বসিলাম। আমি একটি সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলাম, সতীশ আমার

অনুরোধে “কেন কর মন বৃথা ভয়”—এই গানটি গাহিলেন। পরের রবিবার প্রাতঃকালে আমরা ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিলাম। সতীশের নিবিষ্টচিত্ততা দেখিয়া উপাসনার শেষে এক ব্রাহ্মযুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই যে ছেলেটী devoutly (নিষ্ঠার সহিত) উপাসনায় বসিয়াছিল, এ কে?” তখন ছাত্র-সমাজের শারদীয় উৎসব চলিতেছিল, আমরা তাহাতে যোগ দিলাম।

ইহার পরেই ২৬এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ হইয়া পূজার ছুটী আরম্ভ হইল। সতীশ বিক্রমপুরে গেলেন; আমি গয়াতে দাদার কাছে গেলাম।

গয়া ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউসনের বৃহৎ অট্টালিকার একাংশে পূজনীয় ইন্দুভূষণ রায় সপরিবারে বাস করিতেন; দাদার আহার তাঁহাদের সহিত চলিত, এবং স্কুলে বেঞ্চের উপরে রাত্রি কাটিত। আমিও এই ব্যবস্থাতেই সেখানে থাকিলাম। কিছুদিন পরে ঢাকার ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক চিরকুমার চণ্ডীকিশোর কুশারি মহাশয় সেখানে আসিলেন। তাঁহার একটা শক্তি ছিল; সময়ে সময়ে আমাদিগকে তাহার প্রকাশ দেখাইতেন। তিনি টেবিলের উপরে কাগজ ও পেন্সিল রাখিয়া তন্ময় হইয়া নাম সাধন করিতেন; তারপর উপস্থিত ব্যক্তিরা একে একে নীরবে যে প্রশ্ন করিতেন, তিনি অপরের হস্তের যন্ত্রের মত তাহার উত্তর লিখিয়া যাইতেন। সমস্ত উত্তরই যে ঠিক হইত, এমত বলিতেছি না; কিন্তু সতীশ সম্পর্কে আমার শব্দহীন প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর পাইয়াছিলাম। তারপর ইনি বিনা জিজ্ঞাসায় ক্রমাগত যাহা লিখিয়া গেলেন, তাহা বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্‌বাণী; তখন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহা অচিরেই ফলবতী হইল। আমি সতীশকে পত্র লিখিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রায় এক সপ্তাহকাল

তাহার সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আমার তিনটী মানসিক প্রশ্ন হইল—

১। Has his mind been changed ? (তাহার কি মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? উঃ—No. না।

২। Where is he ? (সে কোথায় ?)

উত্তর—At home. (বাড়ীতে)।

৩। How is he ? (সে কেমন আছে ?)

উত্তর—Well. (ভাল আছে)।

তার পর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, কিন্তু চণ্ডী বাবু লিখিতে লাগিলেন—

Love him as you do.

He will prove a great friend of you.

You should not be anxious.

You should not leave him.

God has given you a companion.

You should not neglect him.

There is a tinge of selfishness in your love.

Be unselfish.

Serve not your interest and everything will be right.

It is God's will.

You be not impatient.

"তাহাকে যেমন ভালবাস, সেইরূপ ভালবাসিতে থাক। সে তোমার পরম সুহৃৎ হইবে। তোমার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। তুমি

তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। ঈশ্বর তোমাকে এক সহচর দিয়াছেন। তাহার প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিও না। তোমার ভালবাসায় স্বার্থপরতার আভাস আছে। নিঃস্বার্থ হও। নিজের স্বার্থ সেবা করিও না, তবেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। তুমি অধীর হইও না।

দুই এক দিন পরেই সতীশের পত্র পাইলাম। তিনি ভাল আছেন; কোনও কারণে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

গয়ায় প্রায় একমাস ছিলাম। রামশীলা, আকাশগঙ্গা ও ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম। একদিন সকলে মিলিয়া বুদ্ধগয়া দেখিলাম। অপর একদিন স্কুলের বাড়ীতে স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের একটী উৎসব ও প্রীতিভোজন হইল। সাধু সদাত্মা কয়েকজনের সঙ্গ লাভ করিয়া উপকৃত হইলাম, দেহের স্বাস্থ্যও ফিরিয়া আসিল।

২৮এ অক্টোবর কলেজ খুলিল। ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কলিকাতা হইতে সতীশের জন্য একখানা ব্রহ্মসঙ্গীত লইয়া গেলাম। যাইয়াই দেখিলাম, সতীশের অগ্নি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সতীশ পিতামাতার প্রথম সন্তান; সে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেছে শুনিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া সস্নেহ তিরস্কারে পরিপূর্ণ পত্র লিখিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ ও অনুরোধ করিয়াছেন; অন্যতর জ্যেষ্ঠতাত, কোনও গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, পোষ্টকার্ডে অভদ্র ভাষায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালাগালি করিয়াছেন; এবং "উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" দিয়া এক নির্দ্দোষ আত্মীয়ের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে দারুণ দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এদিকে সতীশের মনেও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে বলিতেছে, সে

উপবীত ত্যাগ করিবে। চারি মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা; তাহার ফলাফলের উপরে তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমি ৮ই নবেম্বর গয়াতে দাদা ও চণ্ডীবাবুর পরামর্শ চাহিয়া পত্র লিখিলাম; সে দিন সতীশের বয়স ১৫ বৎসর ৩ দিন।

তারপরেই আমাদের বনগাঁয়ের ছাত্রাবাস উঠিয়া গেল; আমি ও অপর দুই একটী যুবক ব্রহ্মমন্দিরের গ্যালারীতে থাকিবার অনুমতি পাইলাম, এবং সমাজের ভৃত্য ক্ষেত্রের সহিত দুইবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

সতীশ সমাজ মন্দির হইতে অদূরে খুল্লতাত বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী উকীলের বাড়ীতে বাস করিত। গণিতে ও বিজ্ঞানে তাহার লোভনীয় মেধা ছিল। পূজার ছুটীর পূর্ব্বে গণিতের এক পরীক্ষায় তিনি পাইলেন পূর্ণ নম্বর, ৩০এর মধ্যে ৩০, আমি পাইলাম ৮। বিজ্ঞানে অধ্যাপক মণ্ডী সময়ে সময়ে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন; যে প্রশ্নের উত্তর আর কেহ দিতে পারিত না, মিঃ মণ্ডী সর্ব্বশেষে সতীশকে তাহার সমাধান করিতে বলিতেন। ইঁহার সহিত একত্র পাঠ করিলে আমি উপকৃত হইব, এই ভাবিয়া প্রস্তাব করিলাম, আমরা রাত্রিতে ব্রাহ্মসমাজে এক সঙ্গে পাঠ করিব, সতীশও এই প্রস্তাবে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইল। কয়েক দিন পরে, ১৮ই নবেম্বর আমি অসুস্থ বলিয়া রাত্রিতে দুধসাগু খাইলাম; যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, সতীশ খাইল। নিকটে প্রচারক শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন বসুর পুত্র, নীহার বসিয়াছিল, বয়স ছয় সাত বৎসর। সে বলিল, "সতীশবাবু, আপনি না বামণ, আপনি যে রজনীবাবুর উচ্ছিষ্ট খাইলেন?" সতীশ উত্তর দিল, "আমি বামণ নই।" বালকটী বলিল "আপনি বামণ না, তবে যে গলায় পৈতা আছে?" সতীশ বলিল,

"অমনই আছে।" তখন নীহার বলিল, "আমি তবে পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি?" সতীশ—"আচ্ছা।" সে তখন উৎসাহের সহিত উঠিয়া, "আপনি বামণ না তবে আমি পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি" এইরূপ বলিতে বলিতে পৈতা ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল; কয়েক গুণ ছিঁড়িবার পরে সতীশ নিজে অবশিষ্টগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিলাম। তার পর, একটু তীব্র স্বরে সতীশকে বলিলাম, "তুমি এই যে উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলে, উহা আবার ধারণ করিবে নাকি?" সে বলিল, "না, আমি আর উপবীত লইব না।"

পর দিন প্রাতঃকালে সতীশ তাঁহার কাকাকে জানাইল যে, সে উপবীত ত্যাগ করিয়াছে। কাকা নির্ব্বাক্ রহিলেন; এবং সেদিন তাহাকে নদীতে স্নান করিতে ও কলেজে যাইতেও দিলেন। কলেজে অল্পক্ষণ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলাম। কলেজ হইতে যাইয়াই সে বন্দী হইল। সন্ধ্যার পরে কাকা তাহাকে পুনরায় উপবীত লইতে আদেশ করিলেন, উপরোধ করিলেন, মিষ্ট কথায় অনেক করিয়া বুঝাইলেন; যখন সে কিছুতেই সম্মত হইল না, তখন তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন; প্রহারের বেগে সে চক্ষুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিল, তাহার পরিধেয় দূষিত হইল, তথাপি অবনত হইল না। তাহার কলেজে যাওয়া বন্ধ হইল, সুতরাং আমরাও ঠিক জানিতে পারিলাম না সে কি অবস্থায় আছে।

দুই তিন দিন পরে আমি সতীশের পক্ষে অধ্যক্ষ এডোয়ার্ডস্ সাহেবের হাতে একখানা দরখাস্ত দিলাম, তাহাতে লিখিলাম যে সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপরে ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে, সে গৃহে বন্দী আছে, অতএব তাহাকে ছুটী দেওয়া হউক। কলেজের হেড

ক্লার্কের সহিত সতীশের কাকার বন্ধুতা ছিল, অধ্যক্ষ ব্যাপারটা হেড্ ক্লার্কের মুখে শুনিয়াছিলেন। তিনি আমার দরখাস্ত পড়িয়া শুধু বলিলেন, "আমি সব শুনিয়াছি"—বলিয়াই উঠিয়া গেলেন।

তারপর একদিন সন্ধ্যাকালে আমি ও উমেশচন্দ্র বাগছী শশী বাবুর বাসায় সতীশকে দেখিতে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, বৈঠক-খানায় বিস্তর লোক, সতীশ ফরাসে বসিয়া আছে, দুই হাত বাঁধা, কাকা তাহাকে উপবীত ধারণের কর্ত্তব্যতা বুঝাইতেছেন, সে কোনও কথা বলিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ পরে শশীবাবুর প্রশ্নের ভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলাম, এইবার আক্রমণটা আমার উপরেই আসিয়া পড়িতেছে; আমি ও উমেশ তখন নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম।

বোধ হয় সেই রাত্রিতেই এক সহাধ্যায়ী আসিয়া আনন্দের সহিত সংবাদ দিলেন, সতীশ আবার পৈতা লইয়াছে। মনের যন্ত্রণায় আবার সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিল। সতীশ তখনও নজরবন্দী, খবরটা ঠিক কি না, জানিবার উপায় নাই। দুই তিন দিন পরে, (২৪এ নবেম্বর) এক প্রাতঃকালে সেই বন্ধুই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমাকে বলিলেন, সতীশকে পাওয়া যাইতেছে না। আমি তাহাকে রমণার বনে খুঁজিতে গেলাম; ফিরিবার পথে দেখিলাম, তাহার ছোট মামাও তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। (ইনিই সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিতেন)। কয়েক দিন কোনও সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম, এবং সঞ্জীবনীতে প্রকাশের জন্য একটা বিজ্ঞাপন লিখিয়া সহকারী সম্পাদক আমাদের ১৬, রাজার লেনের শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোমের নিকট পাঠাইলাম। বিজ্ঞাপনটা এই—

"ভাই চন্দ্রচূড়, তুমি কোথায় আছ, অবিলম্বে তোমার দাদাকে জানাইবে।"

প্রত্যুত্তরে জানিলাম, সতীশ কলিকাতায় আমাদের ছাত্রাবাসেই আছে। (নবেম্বর ১৮৮৯)

তাহার পলায়নের বৃত্তান্তটা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। সতীশ পুনর্ব্বার উপবীত ধারণ করিয়াছিল, সত্য, কিন্তু তাহা কারামুক্তির জন্য। একদিন সে তাহার প্রহরী ছোট মামাকে বলিল, "ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া থাকিয়া শরীরটা খারাপ হইয়া পড়িল, চলুন আজ একটু বেড়াইতে যাই।" তিনি সম্মত হইলেন। দুই জনে হাঁটিতে হাঁটিতে ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে সতীশ কোন অবসরে কলিকাতা যাইবার গাড়ীর সময় দেখিয়া রাখিল, মাতুল তাহা বুঝিতেই পারিলেন না। রাত্রিতে সতীশ গোপনে পলায়নের আয়োজন করিল; প্রয়োজনীয় পাথেয় নাই দেখিয়া সোণার আংটী পরিল; ব্রহ্মসঙ্গীত ও Ganot's Physics, এবং যৎসামান্য বস্ত্র সঙ্গে লইল। ভোর চারিটার সময় মেথর আসিল, কাকা শশীবাবু সতীশকে ফটক খুলিয়া দিতে বলিলেন; ভালই হইল, সে ফটক খুলিয়া রাখিয়া দোতালায় আসিল। তারপর মোমবাতি জ্বালিয়া জুতার আড়াল দিয়া, ছোট পুঁটলী লইয়া নিঃশব্দে সিড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াই দৌড়। ষ্টেশনে পঁহুছিবার অল্পকাল পরেই গাড়ী ছাড়িল। সতীশ নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের ষ্টীমারে উঠিল, এবং ষ্টীমার ছাড়িলেই গান ধরিল, "ওগো জননী, রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে"; গোয়ালন্দে এক হোটেলে আংটীটী খুব সস্তায় বিক্রয় করিল, এবং পরবর্ত্তী রাজবাড়ী ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইয়া পরদিন কলিকাতা যাইবার গাড়ী ধরিল।

সতীশ ব্রহ্মসঙ্গীতের মুখপত্রে দেখিয়াছিল, উহা ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে মুদ্রিত; এবং সে প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং

সঞ্জীবনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম জানিত। শিয়ালদহ হইতে সতীশ ১৩নং বাটীতে চলিল, এবং বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাবু হরিমোহন ঘোষালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রামকুমার বিদ্যারত্ন এই বাড়ীতে থাকেন?" হরিমোহনবাবু বলিলেন, "না, তিনি এখানে থাকেন না।" "কৃষ্ণকুমার মিত্র এখানে আছেন?" এই প্রকার প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনিয়া হরিমোহনবাবুর মনে হইল, বালকটি নিশ্চয়ই পিতামাতার নিকট হইতে পলাইয়া নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে। তখন তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন; সতীশও অকপটে তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ঘোষাল মহাশয় শুনিয়া তাহাকে সমাদরের সহিত এক ঘরে লইয়া বসাইলেন। সেখান হইতে সে ১৬নং রাজার লেনে ব্রাহ্মছাত্রাবাসে প্রেরিত হইল। (২৬এ নবেম্বর)। সেই দিনই সে সিটী কলেজে যাইয়া অধ্যক্ষের নিকটে ঢাকা কলেজ হইতে নাম ও বৃত্তি transfer করিবার দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত নিষ্ফল হইল।

সতীশ কলিকাতায় গিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়াই আমি সেখানে যাইবার সংকল্প করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে ট্রেন ধরিতে হইবে, এজন্য দোলাইগঞ্জ ষ্টেসনের সন্নিকটে গেণ্ডারিয়ায় শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম। তিনি বিজনীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বরদানাথ হালদারের নিকটে একখানা পত্র দিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন আমাদিগকে সাহায্য করেন। ইঁহারা কয়েকজন এক কুলীন কন্যাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং সমাজ-সংস্কারের এই অদম্য উৎসাহের জন্য আত্মীয়ের প্ররোচনায় ঢাকায় অন্ধকার নির্জ্জন পথে

এক গুণ্ডা বরদাবাবুর মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। হালদার মহাশয় আমাদিগের যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নয়।

২৯এ নবেম্বর শুক্রবার কলিকাতায় পঁহুছিলাম। ১লা ডিসেম্বর রবিবার সায়ংকালে সতীশ ও আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে গেলাম। আমরা বেদির দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। উপদেশের সময় আমি দেখিলাম, কয়েকটী অপরিচিত লোক গলায় মাথায় কম্ফার্টার জড়াইয়া আলোয়ান গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া সম্মুখের তুই তিনটা বেঞ্চে বসিল। তাহাদের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, ইহারা নিয়মিত উপাসক নহে। তাহারা সতীশকে দৃষ্টি-পথে রাখিল। একটু পরেই এক ব্রাহ্ম যুবক আমাকে কানে কানে বলিয়া গেলেন, সতীশকে ধরিবার জন্য লোক আসিয়াছে। সতীশ চক্ষু মুদিয়া মনোযোগের সহিত উপদেশ শুনিতেছে। তাহাকে একটু সরিয়া বসিতে বলিলাম; সে তুই বারে অতি সামান্যই সরিয়া বসিল। আমাদের বাসার যুবকদিগকে বলিয়া পাঠাইলাম, তাঁহারা যেন উপাসনার পরে অপেক্ষা করেন। চতুর্থ সঙ্গীত শেষ হইবামাত্র আমি সতীশের হাত ধরিয়া পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া মন্দিরের সন্নিহিত বরদাবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যাঁহারা সতীশকে ধরিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সতীশের পিতাও ছিলেন। তিনি দেখিলেন, পুত্র পশ্চাতের দ্বার দিয়া পলাইল। হালদার মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, "সতীশের পিতার সহিত আমার আলাপ আছে, তিনি নিশ্চয়ই এক্ষণই আমার বাড়ীতে আসিবেন; তোমরা এখন অন্যত্র যাও, তিনি চলিয়া গেলে আসিও।" আমরা তৎক্ষণাৎ প্রচারাশ্রমে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গৃহে গেলাম, তিনি সস্নেহে সতীশকে ভাত খাইতে

বসাইলেন। আমরা চলিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই সতীশের বাবা বরদাবাবুর বাড়ী আসিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, "সতীশ এই দিকেই আসিয়াছে, বোধ হয়, আপনার বাড়ীতেই আছে।" বরদাবাবু বলিলেন, "হাঁ, সতীশ আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন এখানে নাই, কোথায় আছে, তাহাও আমি জানি না।" জয়চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ আক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সতীশের গর্ভধারিণী কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য কাঁদাকাটি করিতেছেন, সতীশকে বলিবেন, সে একবার তাঁহার সহিত দেখা করুক।" তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার অনুচরেরা বহুক্ষণ মন্দিরের সম্মুখে সতীশের অপেক্ষায় পায়চারি করিয়াছিল।

প্রতিপক্ষ চলিয়া গেলে আমরা দুইজন বরদাবাবুর বাড়া গেলাম। সতীশের মা তাহাকে দেখিতে চাহিতেছেন, এই কথা শুনিয়া সতীশ দেখা করিতে সম্মত হইল, আমিও তাহাতে মত দিলাম; কিন্তু হালদার মহাশয় বলিলেন, "সতীশ যদি একবার মাতার সহিত দেখা করিতে যায় তবে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না; এখন না যাওয়াই কর্ত্তব্য; পিতামাতাকে নম্র ও ভক্তিপূর্ণ ভাষায় পত্র লিখিয়া বল যে, সে এখন দেখা করিতে পারিবে না।" আমরা তাঁহার পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে খাবার আনাইয়া দিলেন; আমার আহারের পরে সতীশ ও আমি প্রথমে দুইখানি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিলাম, তারপর সতীশ তাহা নকল করিল; এই দুটী কাজ শেষ করিতে রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল; সতীশ লিখিতেছে, আর ঘুমের আবেশে তাহার মাথা ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, এই প্রকার অবস্থা। চিঠি দুখানা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আমরা ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়া লইলাম। সতীশের পিতা নিশ্চয়ই বরদাবাবুর

নিকটে পুনরায় প্রাতঃকালেই আসিবেন, এই আশঙ্কায় অরুণোদয়ের পূর্ব্বে সতীশকে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের মোড়ে ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়ীতে সারা দিনের জন্য রাখিয়া আসিলাম। সে ঐ পরিবারের একটী প্রাণীকেও চিনিত না। কিন্তু তথাপি বেশ সমাদর লাভ করিল।

সন্ধ্যার পরে সতীশ রাজার লেনের ছাত্রাবাসে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানে তাহার থাকা নিরাপদ নয় জানিয়া পরদিন তাহাকে ৪৫।৫, বেনেটোলা লেনে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর গৃহে রাখা হইল। একদিন পরেই রাত্রি নয়টার সময় আমরা শুনিলাম, বিক্রমপুরবাসী এক ব্রাহ্মযুবক সতীশের পিতাকে তাহার ঠিকানা জানাইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ললিতমোহন দাস ও আমি দ্বারকাবাবুর বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিলাম। ততক্ষণ সতীশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত এক শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইয়া বাহিরে আনিলাম। গাঙ্গুলী মহাশয় ভারতসভার সহকারী সম্পাদক; তিনি উহার কেরাণী রসিকবাবুকে পত্র লিখিয়া বলিয়া দিলেন যে, সতীশকে যেন ৬২, বৌবাজার ষ্ট্রীট ভারতসভার ভবনে স্থান দেওয়া হয়। আমরা তাহাকে লইয়া সেই-খানে গেলাম, এবং রাত্রিতে আমি তাহার নিকটে রহিলাম।

সতীশ ও আমি দুই বেলা আমাদের বাসায় যাইয়া আহার করিতাম, এবং দিনের বেলায় অধিকাংশ কাল ও রাত্রি ভারতসভার বাড়ীতে থাকিতাম। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। ৮ই ডিসেম্বর আহারের পরে বৌবাজারের বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম সতীশের পিতা কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই পুত্রের সন্ধানে সেখানে আসিয়াছিলেন। বিপদের উপর বিপদ দেখিয়া আমরা নব্যভারত সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন

রায় চৌধুরীকে একটা নিরাপদ আশ্রয় স্থির করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি তাঁহার বন্ধু আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে একখানা পত্র দিলেন। আনন্দবাবু প্রেসিডেন্সী জেলের ডাক্তার ছিলেন; উহার হাতার মধ্যে, কারাগারের উচ্চ প্রাচীরের বাহিরেই তাঁহার আবাসবাটী (quarters) ছিল। রায়দম্পতী নিঃসন্তান; বাড়ীতে স্বামীস্ত্রী দুই জন ও এক ভৃত্য। ১০ই ডিসেম্বর রাত্রিতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন ও আমি গাড়ী করিয়া সতীশকে আনন্দবাবুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম। তাঁহারা দেবীবাবুর পত্র পড়িয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুত্রতুল্য স্নেহে গ্রহণ করিলেন।

ইতোমধ্যে এফ্. এ. পরীক্ষার ফি জমা দিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। এজন্য আমাকে ঢাকায় যাইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে পরীক্ষার ফি জমা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সেসনের শেষ অর্থাৎ মে মাস পর্য্যন্ত কলেজের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ বৃত্তিধারী ছাত্রদিগের পক্ষে এই সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে একবারে ছয় মাসের বেতন দিতে হইবে না, প্রত্যেক মাসে বৃত্তি হইতে বেতনের টাকা কাটিয়া রাখা হইবে। এ জন্য সতীশ ও আমার বৃত্তি কলেজে আবদ্ধ ছিল। আমার পরীক্ষার ফি দাদা দিলেন। সতীশের ফি জোগাড় করিতে হইবে। তারপর পরীক্ষার্থীকে আবেদন পত্রের সহিত পূর্ব্ববর্তী পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। সতীশের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার সার্টিফিকেট তাহার খুল্লতাত শশীবাবুর বাড়ীতে ছিল, তাহা পাইবার আশা নাই; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় বার সার্টিফিকেট (duplicate certificate) লওয়া প্রয়োজন। সিটী কলেজের অধ্যক্ষ ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত সতীশের দ্বৈত সার্টিফিকেটের

দরখাস্ত অনুমোদন করিলেন; আমি তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সহকারী রেজিষ্ট্রার মাননীয় ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলাম, এবং তাঁহার অনুগ্রহে অপরাহ্ণে সার্টিফিকেট পাইলাম। এখন ফি'র টাকার ভাবনা। ৫০ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আমার পরিচয় ছিল, এবং তিনি সতীশের সংগ্রামে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। হরেন্দ্রবাবু ঢাকায় তাঁহার এক বন্ধুকে পরীক্ষার ফি বাবদ টাকা দিতে অনুরোধ করিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিলেন। আমি সার্টিফিকেট ও পত্র লইয়া সেই দিনই ঢাকায় রওনা হইলাম। (১১ই ডিসেম্বর)

যথাসময়ে কলেজে যাইয়া অধ্যক্ষ এডোয়ার্ডস্ সাহেবের নিকটে সতীশ ও আমার পরীক্ষার দরখাস্ত ও ফি দিলাম। সতীশের দরখাস্ত দেখিয়া বলিলেন, তাহার পিতার অনুমোদন না পাইলে তাহাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিবেন না। সতীশকে তারে এই সংবাদ দিলাম, সে গৌহাটীতে পিতাকে তার করিল, তিনি কলেজের অধ্যক্ষকে তার করিয়া জানাইলেন, সতীশ এফ্. এ. পরীক্ষা দিবে, ইহাতে তাঁহার মত আছে। এতখানি হাঙ্গামার পরে তাহার আবেদন গৃহীত হইল।

কলেজের অধ্যাপনা বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং অতঃপর আমার ঢাকায় থাকিবার প্রয়োজন নাই; থাকা নিরাপদও নয়। তা'ছাড়া সতীশের জন্যও আমার কলিকাতায় অবস্থান করা আবশ্যক। আমি দাদার অনুমোদন সহ এক আবেদনপত্রে অধ্যক্ষ সমীপে প্রার্থনা করিলাম, যে আমাকে ঢাকা পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। তিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন, আমি কলিকাতায় চলিয়া গেলাম।

আমি ১৬ রাজার লেনে উঠিলাম। সতীশ একখানি ছাড়া সমস্ত পাঠ্যপুস্তক তাহার কাকার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে আমার পুস্তক পড়িতে হইত। এজন্য দুই জনের এক স্থানে না থাকিলে চলে না। আমি আনন্দবাবু ও তাঁহার পত্নীকে এই কথা জানাইলাম, তাঁহারা আমাকেও নিজ গৃহে গ্রহণ করিলেন। (২১এ ডিসেম্বর)।

কয়েকদিন রায়ভবনে অবস্থান করিয়া দেখিলাম, বিলক্ষণ অসুবিধা হইতেছে। আমাকে নানা প্রয়োজনে সদাসর্ব্বদা আমাদের বাসায় ও অন্যত্র যাইতে হইত। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে ছাত্রাবাস, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতি বহু দূর, অর্থাভাবে পদব্রজেই যাতায়াত করিতাম। পরীক্ষার পাঠ সম্বন্ধে সেখানে কাহারও সাহায্য পাইবার উপায় ছিল না। তারপর আমি বলিতে গেলে রবাহুত হইয়াই রায়পরিবারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই সকল কারণে আমরা দুই জন পুনরায় ব্রাহ্মছাত্রাবাসে আমার পূর্ব্ব বৎসরের কক্ষে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। (১লা জানুয়ারী, ১৮৯০)।

এখন হইতে দারিদ্র্যের নিপীড়ন অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিল। আমাদের বৃত্তির আয় বন্ধ হইয়াছে। সতীশ পিতার নিকট অর্থসাহায্য চাহিতে পারে না, চাহিলেও পাইবার আশা নাই। আমার অভি-ভাবক মাসে মাসে বেতনের অত্যল্পই পাইতেছেন, আমার কলিকাতার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার মত সম্বল তাঁহার নাই। দুইজনের "খট্টাভাবে ভূমিশয্যা", থাকিবার মধ্যে আছে আমার একখানা লেপ, তাহার উপরে জুটিল কাহার একটা পরিত্যক্ত বালিশ এবং একটা জীর্ণ মাদুর। এই মাদুরের উপরে আমাদের সারা শীতের রাত্রি কাটিয়া গেল। এক পয়সার মুড়িমুড়কি কিনিবার শক্তি নাই;

ক্ষুধার জ্বালায় পেটে গামছা বাঁধিয়া উভয়ে পাঠ করিতাম। মেসের নিয়ম ছিল, নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে অগ্রিম টাকা না দিলে কিংবা প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে দেনাদারের আহার রহিত (meal discontinued) হইবে। একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম কর্ম্ম-সচিব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, দেনার জন্য সতীশের রসদ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমরা প্রতিদিন যেমন ভোরে স্নানান্তে একত্র উপাসনা করিয়া পড়িতে বসিতাম, সে দিনও তাহাই করিলাম ; এবং মধ্যাহ্নে আর সকলে যখন আহার করিতে গেল, তখন নিজেদের ঘরে বসিয়া রহিলাম। তারপর দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কোথা হইতে চারি টাকা ধার করিয়া আনিয়া সতীশের নামে জমা দিলে আমরা আহার করিলাম। এই দুরবস্থার মধ্যে দাদা আমাকে লিখিলেন, "গয়া ট্রেনিং স্কুলের স্বত্বাধিকারী এক্ষণে কলিকাতায় আছেন ; তুমি এই পত্র লইয়া তাঁহার সহিত দেখা কর। আমার কয়েক শত টাকা বেতন পাওনা আছে ; তাহা হইতে তোমাকে কিছু দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি।" আমি স্বত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পত্রখানি তাঁহাকে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিলেন, এবং ব্যাগটী খুলিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভিতরে পরীক্ষা-পূর্ব্বক একটী সিকি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি "যথালাভ" ভাবিয়া সিকি লইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পরে দাদা যখন ঐ স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিলেন, তখন একাধারে উহার প্রতিষ্ঠাতা, স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক উকীল মহাশয়ের নিকটে তাঁহার পাঁচশত টাকার উপরে প্রাপ্য ছিল, জীবনে তাহার এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হন নাই। আমি এই দৈন্যের ফলভাগী হইয়াছিলাম বলিয়াই কথাটা উল্লেখ করিলাম।

সতীশের কাকা তাহার পুস্তকগুলি কলিকাতায় আনিয়া ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদিগের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন; বন্ধু ললিতমোহন দাস ও আমি একদিন সেগুলি লইয়া আসিলাম; সুতরাং একটা মস্ত অসুবিধা দূর হইল। তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোমের নিকট হইতে ছাত্রদিগের নাম লিখিয়া লইয়া মোকদ্দমা করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু গগনবাবুর জেদে কাগজখানা ফেরৎ দিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল।

পণ্ডিত জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সপ্তাহ দুই কলিকাতায় থাকিয়া পুত্রের সন্ধান না পাইয়া গৌহাটী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং শীতকালে আমরা নিরুপদ্রবে পড়াশুনা করিতেছিলাম। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় নীরব ছিলেন না। সতীশ ১৬, রাজার লেনে ব্রাহ্মছাত্রাবাসে বাস করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি সাধারণভাবে ব্রাহ্মদিগকে ও বিশেষভাবে ছাত্রাবাসের যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ ও গঞ্জনা পরিপূর্ণ এক পত্র বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন। সতীশকে বাধ্য হইয়া সত্যানুরোধে তাহার উত্তর দিতে হইল। এক স্থলে সে লিখিয়াছিল, "আমি বাল্যকালেই পিতার নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য শিক্ষা করিয়াছিলাম।" সম্পাদক বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, "সতীশ, তুমি ধ্রুব না প্রহ্লাদ।" সতীশের বয়স সম্পর্কে সম্পাদক যে পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত নয়। পণ্ডিত মহাশয়ের পত্র পড়িয়া এক ব্যক্তি বঙ্গবাসীতে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মদিগের নামে মোকদ্দমা করিলে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

সে যাহা হউক, আমরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পাঠে নিযুক্ত রহিলাম, মাঘোৎসবে যোগ দিলাম, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে

লাগিলাম। পরীক্ষার দিন যত নিকটবর্ত্তী হইল, ততই একটা সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিল। আমরা কোথায় পরীক্ষা দিব? ঢাকায় যাইয়া পরীক্ষা দেওয়া সতীশের পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়, তাহাতে আমার পক্ষেও বিপদ আছে। এজন্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি হিতৈষী ব্যক্তিদিগের পরামর্শ অনুসারে আমরা ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকটে দরখাস্ত পাঠাইলাম যে, আমাদিগকে ঢাকা কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে কলিকাতা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হউক। সে বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সি. এইচ্. টনী রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অধ্যাপক রায় উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং আমাদের আশা ছিল, আবেদন অগ্রাহ্য হইবে না। আমরা আশায় বঞ্চিত হইলাম; রেজিষ্ট্রার ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে লিখিলেন যে, পরীক্ষার সমুদয় বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এখন কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের আবেদন গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং আমাদিগকে অগত্যা ঢাকাতেই পরীক্ষা দিতে হইবে। সেখানে পরীক্ষার সুযোগে সতীশের আত্মীয়েরা যে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন, সে বিষয়ে কাহারও লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। সতীশ পরীক্ষাও দিবে, অথচ তাঁহাদিগের হাত এড়াইবে, কিরূপে যুগপৎ এই দুই কর্ম্ম সাধন করা যায়, ইহাই এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। আসাম গবর্ণমেণ্টের নিয়ম ছিল, যে-ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে, সে এফ্. এ. পরীক্ষা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেই পুনরায় দুই বৎসরের জন্য তাহাকে সেই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। সতীশ ইংরেজী ও সংস্কৃতে পারদর্শী, গণিত ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন; অতএব, লজিক ও ইতিহাসের পরীক্ষা না দিয়াও সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে

পারিবে, এবং তাহা হইলে তাহার কুড়ি টাকার বৃত্তিটীও দুই বৎসরের জন্য চলিতে থাকিবে ; তখন বি. এ. পড়িবার পথ নিষ্কণ্টক হইবে— এই প্রকার বিচার করিয়া আমরা স্থির করিলাম, সতীশ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে যথাক্রমে ইংরেজী, গণিত, সংস্কৃত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিয়া শেষোক্ত পরীক্ষার পরেই পলায়ন করিবে।

এই কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া ৫ই মার্চ্চ আমরা ঢাকায় যাইয়া ব্রাহ্মসমাজে উঠিলাম। প্রথমেই এক সঙ্কট উপস্থিত হইল। সমাজের সম্পাদক বলিলেন, সতীশ নাবালক, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত তাহাকে ব্রাহ্মমন্দিরে স্থান দিতে পারেন না। তাহার মাতা তখন পিত্রালয়ে ছিলেন; দুইটী বন্ধু অনুমতি পাইবার আশায় সতীশের পত্র লইয়া তাঁহার নিকটে গেল; তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন। তাহার বড়মামা পুলিশের কর্ম্মচারী, পত্রবাহক যুবক দুটীকে ভয়ও দেখাইলেন। আমাদের ঢাকায় গমনের পরেই সতীশের কাকা শশীবাবু আর একটী উকীলের সহিত ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তাহাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলেন, সে যাইতে সম্মত হইল না; যখন অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও তাঁহারা সতীশকে নরম করিতে পারিলেন না, তখন দুইজনে তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে আরম্ভ করিলেন, সেও টেবিল ধরিয়া চিৎ হইয়া পড়িল; তাঁহারা পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সতীশকে মন্দিরে থাকিবার অনুমতি দিলেন না, সতীশও সেখানেই রহিয়া গেল।

১০ই মার্চ্চ সোমবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। নির্ব্বিঘ্নে ইংরেজী, গণিত ও সংস্কৃতের পরীক্ষা হইয়া গেল। এইবার সতীশের অভি-

ভাবকেরা আমাদের চালের উপরে এক চাল চালিলেন। তাঁহারা জানিতেন সতীশ বিজ্ঞানের পরীক্ষা না দিয়া পলাইবে না, এজন্য তাহার পূর্ব্ব দিন তাঁহারা ফাঁদ পাতিলেন। সংস্কৃতের পরীক্ষা শেষ হইলে আমরা মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াছি, একটু পরেই তাহার মধ্যম সহোদর জ্যোতিষ আসিয়া বলিল, "মা কাকার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একটীবার দেখিতে চাহিতেছেন।" সতীশ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তিনি তাহাকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তারপর বলিলেন, "তুমি আমার নিকটে থাকিয়া বাকি পরীক্ষাগুলি দেও!" সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায়?" তিনি বলিলেন, "গৌহাটীতে।" সে সম্মত হইল, এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক লইয়া যাইবার জন্য জ্যোতিষের সহিত সমাজে আসিয়া আমাকে তাহার অঙ্গীকার জানাইল। আমি শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও দুঃখিত হইলাম। সে চলিয়া গেল, মনের ক্লেশে আমার সারারাত্রি ঘুম হইল না। সতীশ জননীর নিকটে যাইয়া বসিতেই তাহার পিতা পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বালক আবার বন্দী হইল।

পরদিন দশটার পূর্ব্বে সতীশের পিতা ও ভ্রাতা তাহাকে পরীক্ষার গৃহে রাখিয়া গেলেন; আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল, যাইতেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল, তাহার সহিত বিশেষ কথা হইল না, শুধু শুনিলাম, তাহার পিতা আসিয়াছেন। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের পরীক্ষার মধ্যে এক ঘণ্টার ছুটী, সেই অবসরে জয়চন্দ্রবাবু ও জ্যোতিষ আসিয়া তাহাকে জলযোগ করাইলেন; অন্যান্য দিন আমরা এক সঙ্গে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বাটী হইতে প্রেরিত খাবার খাইতাম, আজ সে আমাদিগের নিকটে আসিতেই পারিল

না। কিন্তু দৈব অনুকূল হইল, সতীশের পিতা ও ভ্রাতা তাহাকে খাওয়াইয়াই চলিয়া গেলেন, তাঁহারা কল্পনা করেন নাই, সে বিজ্ঞানের দ্বিতীয়ার্দ্ধের উত্তর না লিখিয়া অন্তর্হিত হইবে। প্রথমার্দ্ধে সে সমুদায় প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়াছিল। তাঁহারা চলিয়া গেলে সে ব্যাকুল হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আমাকে পরীক্ষার পরে ধরিয়া লইয়া যাইবেন, আমি বৈকালের পরীক্ষার মধ্যেই পলাইতে চাই, তুমি কি বল ?" আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইলাম। তাহার ভবিষ্যৎ এই বেলার পরীক্ষার উপরে নির্ভর করিতেছে, পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় অপরাহ্ণে বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিলে সে নিশ্চয় বৃত্তি পাইবে এইসমস্ত ভাবনায় আমার মুখে কথা সরিতেছে না, সতীশও ছাড়িতেছে না, পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, "বল কি করিব ?" ইতোমধ্যে প্রাথমিক ঘণ্টা পড়িল, আমরা আঙ্গিনা হইতে সতীশের পরীক্ষা কক্ষে গেলাম, তখন কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। হঠাৎ দেখি, সে কক্ষে প্রশ্নপত্র বিতরিত হইতেছে ; আর বিলম্ব করা চলে না—সতীশকে বলিলাম, "আচ্ছা, চলিয়া যাও।" সেই ঘরেই বন্ধু দ্বারকানাথ সরকার পরীক্ষা দিতেছিলেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, "সতীশ উঠিয়া গেলেই আপনি তাহার সঙ্গে যাইবেন।" দ্বারিকাবাবু বৎসরের পর বৎসর এফ্. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে ছিলেন, তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি পাশের ঘরে যাইয়া নিজের আসনে বসিলাম।

আমি একে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কাঁচা, তার উপরে মনের উদ্বেগে প্রায় কিছুই লিখিতে পারিলাম না। সতীশ যদি পরীক্ষা না দিয়া চলিয়া যায়, তবে সম্মুখে দারুণ সংগ্রাম, পলায়ন করিতে যাইয়া যদি ধরা পড়ে, তাহা হইলে মহা বিপদ। তাহার কক্ষ হইতে বাহিরে

যাইতে হইলে পরীক্ষার্থীকে আমার ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। আমি একটু শব্দ শুনিলেই পেছনে চাহিয়া দেখি, সতীশ যাইতেছে নাকি। এইরূপে তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পরীক্ষা শেষ হইলে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অধ্যাপক মণ্ডী আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "Well, you were poring over the paper all the while ; why ?" আমি বলিলাম, "Sir, I could not answer the paper well." অধ্যাপক তদুত্তরে বলিলেন, "Oh, if you could not answer this paper well, I do not know what you could." (আচ্ছা, তুমি সর্ব্বক্ষণ এক দৃষ্টিতে প্রশ্নপত্রের দিকে চাহিয়াছিলে কেন?" "স্যর, আমি প্রশ্নগুলির ভাল উত্তর দিতে পারি নাই।" "ওঃ তুমি যদি এই প্রশ্নপত্রেরই ভাল উত্তর দিতে না পারিয়া থাক তবে জানি না কোনটার পারিতে।")

পাঁচটার সময় সতীশের বাবা ও ভাই তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া দেখিলেন, সে উধাও হইয়াছে! তাঁহারা চলিয়া গেলেন; আমিও দ্বারকাবাবুর বাসায় গেলাম। তাঁহার নিকটে শুনিলাম, সতীশ পরীক্ষা গৃহ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও বাহির হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে কি?" সে বলিল, 'না।' "তবে পথে খাইবে কি?" "ক্ষুধা পাইলে জুতা চিবাইয়া খাইব।" এই কথা শুনিয়া তিনি নিকটের এক বাড়ী হইতে দুই টাকা ধার করিয়া আনিয়া তাহাকে দিলেন। সে চলিয়া গেল, কোথায় যাইবে তাহা বলিয়া যায় নাই। (১৩ই মার্চ্চ)।

দুই এক দিন পরে পণ্ডিত জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সমাজের গ্যালারীতে

আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন; প্রাতঃকাল, তিনি আসিতেছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ, পণ্ডিতের মত মোটেই নয়। তিনি প্রথমেই আমার কর মর্দ্দন করিলেন, তারপর আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, আপনার জন্যই সতীশের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হইল।" আমি নীরব রহিলাম। তারপর বলিলেন, "সতীশের গর্ভধারিণী তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, একবার তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিন।" তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, আমরা সতীশকে ঢাকাতেই কোনও বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমি বলিলাম, "সে কোথায় আছে, জানি না; আমি নিজেই তাহার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি।" বোধ হইল কথাটা তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলেন না। তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি পুনশ্চ বলিলাম, "আপনারা খুব ভাল করিয়া সতীশের অনুসন্ধান করুন, তাহার জন্য বড়ই দুর্ভাবনা হইতেছে।" পণ্ডিত মহাশয় ভদ্রভাবে বিদায় লইলেন। আমি এই একবারই তাঁহাকে দেখিয়াছি।

ইহার দুই তিন দিন পরেই বন্ধু জগচ্চন্দ্র দাস ময়মনসিংহ হইতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, সতীশ তথায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর গৃহে অবস্থিতি করিতেছে। সে পরীক্ষামন্দির হইতে বাহির হইয়া টাকা দুটী পাইয়াই দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঢাকা রেল ষ্টেশনে যায়, তথা হইতে ময়মনসিংহের দিকে সওয়া তের মাইল হাঁটিয়া টঙ্গী ষ্টেশনে উপনীত হয়। গাড়ী আসিবার বিলম্ব দেখিয়া সতীশ একখানা বেঞ্চের উপরে শুইয়া পড়িল। রাত্রিতে বনের ভিতরে একটী বালক আরোহী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইহা দেখিয়া ষ্টেশন মাষ্টার

বুঝিতে পারিলেন, ছেলেটী পলাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তিনি কোনও গোলযোগ করেন নাই। সতীশ নির্ব্বিঘ্নে ময়মনসিংহে পঁহুছিয়া গুরুদাসবাবুর বাড়ীতে যাইয়াই সাদরে গৃহীত হইল।

এই সংবাদ পাইয়াই ১৮ই মার্চ্চ আমি ময়মনসিংহ গেলাম। যাইবার পূর্ব্বে কলেজে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হইল। পরীক্ষার ফি জমা দিবার পরে কর্ত্তৃপক্ষ একটা নির্ব্বাচনী পরীক্ষা (Test Examination) লইয়াছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম, কাজেই পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এজন্য পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। জরিমানা মাপ করিবার জন্য অধ্যক্ষ এডোয়ার্ডসের নিকটে দরখাস্ত দিলাম; তিনি উহাতে "Pay 1/8", এই হুকুম লিখিয়া দেড় টাকা আদায় করিলেন।

ময়মনসিংহে যাইয়া মধ্যাহ্নে সতীশ ও আমি একত্র গুরুদাস বাবুর বাড়ীতে রন্ধনশালায় আহার করিলাম; দেবেন্দ্রের মাতা পরিবেশন করিলেন, স্বর্ণলতা দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তিনিই রাঁধিয়াছিলেন। তারপরে গুরুজনদিগের সহিত আমাদিগের ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইল। সতীশ দীর্ঘ অবসরকাল আমার সহিত জামুরিয়া গ্রামে বাস করিবে, আমরা এই প্রকার স্থির করিয়া ছিলাম। তাঁহারা পরামর্শ দিলেন, যেপথে আমরা বরাবর যাতায়াত করিতাম, সেই পুরাতন ময়মনসিংহ মধুপুর ঘাটাইল টাঙ্গাইলের পথে না যাইয়া ময়মনসিংহ ধলাপাড়া টাঙ্গাইলের নূতন পথে যাইতে হইবে; ইহাতে সময় বেশী লাগিবে, শ্রমও অধিক হইবে বটে, কিন্তু ধরপাকড়ের আশঙ্কা কিছুই থাকিবে না। আমি ও সতীশ এক সঙ্গে যাত্রা করিব, ইহাও তাঁহারা বুদ্ধিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। এই পরামর্শ অনুসারে সেই দিন অপরাহ্ণে আমাদের পুরাতন বন্ধু

গোপীনাথ দাস নামক এক যুবক সতীশকে লইয়া নূতন পথে বাহির হইলেন, এবং দশ বার মাইল দূরে এক মুসলমানের হোটেলে আমার প্রতীক্ষায় রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা ভাওয়াল-মধুপুর বনের অদূরে এক মুদি দোকানে গেলাম। দোকানদার আমাদিগকে রাত্রিতে ভাত রাঁধিয়া দিতে রাজি হইল। কিছুকাল পরেই তাহার স্বগ্রামের এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার জেঠামহাশয়কে জানিতেন। আমার পরিচয় পাইয়া ও আমরা ব্রাহ্ম জানিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; মুদিও তাঁহার আহার আরামের জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, আমাদিগের প্রতি আর দৃক্‌পাত করিল না। আমরা চিড়া চর্ব্বণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা প্রথমে নূতন রাজপথ দিয়া নয় দশ মাইল বিস্তৃত "বড় পাহাড়" পার হইলাম; তৎপরেই ধলাপাড়ার দিকে না যাইয়া আন্দাজ আধ মাইল পশ্চিমে "ছোট পাহাড়" অর্থাৎ ঘাটাইল মধুপুরের অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। এটীও প্রায় নয় মাইল প্রশস্ত। ইহাতে বাঁধান পথ নাই; লোকচলাচলের দরুণ যে সরু রাস্তা পড়িয়াছে, তাহা ধরিয়া চলিতে হয়। বনের প্রান্তবাসী এক মান্দাইজাতীয় চৌকীদার আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল, আমরা স্বচ্ছন্দে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাড়ীতে পঁহুছিয়া দুই দিনের শ্রান্তি অপনোদন করিলাম। (২০এ মার্চ্চ, ১৮৯০)।

এতক্ষণে পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর পাইলাম। এবৎসর কোন কোনও প্রশ্নকর্ত্তা আপন ছাত্রদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন লিখাইয়া দিয়াছিলেন। সংস্কৃতে রঘুবংশের পরীক্ষায় প্রায় অবিকল

সেই প্রশ্নগুলিই ছিল। পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে উহা সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হয়। দশকুমারচরিতের কয়েকটী প্রশ্নও পরীক্ষার্থীরা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল। এক বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক Conics-এর দুইটী কঠিন অতিরিক্ত চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন কি না, স্মরণ নাই, কিন্তু মনে হইতেছে, একটী অতিরিক্ত পরীক্ষায় ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে গদ্যাংশে Helps' Essays হইতে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহার কয়েকটী নাকি প্রশ্নকর্ত্তা স্বীয় শিষ্যবর্গকে বলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। আমার পরম আত্মীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায়ের অনুগ্রহে বাকি সমস্ত প্রশ্ন-গুলি পরীক্ষার দেড় মাস পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম।

এফ্. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে আশানুরূপ লিখিলাম। গণিতে অত্যন্ত ভয় ছিল; গুরুতর পরিশ্রম করিয়া অনুত্তীর্ণ হইবার বিপদ হইতে বাঁচিয়া গেলাম। সংস্কৃতে পদ্যভাগের প্রশ্ন প্রায় সবগুলিই জানা ছিল, সুতরাং অক্লেশে উত্তর লিখিলাম। গদ্যভাগও মন্দ হইল না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহাতে দুই প্রশ্নপত্রে ১০০ নম্বর থাকিত; নিয়ম ছিল, পরীক্ষার্থী ১৫ না পাইলে, তাহার নম্বর বর্জ্জিত হইবে। আমার নম্বর খুব সম্ভব ১৫ পর্য্যন্ত উঠে নাই। মোটের উপরে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার আশা অতীব ক্ষীণ হইল, বৃত্তি পাইবার অনিশ্চয়তাও বাড়িয়া গেল। নবেম্বর মাস হইতে পড়াশুনার যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তাহাতে এই প্রকার ফল হইবে, তাহা বিচিত্র নয়।

সঞ্জীবনী সম্পাদকের প্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয় এক অনুসন্ধান কমিটী স্থাপন করিলেন। রঘুবংশের প্রশ্নপত্রই অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়

ছিল ; ইংরেজী গদ্যের দ্বিতীয়ার্দ্ধও আলোচনায় স্থান পাইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম সংস্কৃত অধ্যাপকের বিরুদ্ধেই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ; তিনি তদীয় শিষ্যদিগের সাক্ষ্যে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। এই সম্পর্কে প্রশ্নপ্রকাশের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমি সঞ্জীবনীতে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অনুসন্ধান কমিটীকে মহিমবাবুর ও আমার সাক্ষ্য লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কমিটী তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে সংস্কৃতের প্রথম প্রশ্নপত্র (রঘুবংশ) নাকচ (cancelled) হইল, এবং তাহার পূর্ণ নম্বর (৬০) দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে (দশকুমারচরিত) যুক্ত হইল ; সুতরাং এক গদ্যের পূর্ণ নম্বর হইল ১২০। তৎপরে ইংরেজী সাহিত্যের গদ্যভাগে Helps' Essays হইতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলিও নাকচ হইল। অধিকন্তু অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ম করিলেন, যে অধ্যাপক যে পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়ের অধ্যাপনা করেন, তিনি সেই পরীক্ষার প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন না।

জুন মাসের প্রথমভাগে সঞ্জীবনীতে পরীক্ষার ফল দেখিলাম। সতীশ তৃতীয় ও আমি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। মহিম প্রথম শ্রেণীতে একবিংশ স্থান অধিকার করিলেন। মোট সাতাইশ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে আমাদিগের সহাধ্যায়ী একা রাজমোহন গাঙ্গুলী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

দুই তিন দিন পরে ময়মনসিংহ হইতে বন্ধু দ্বারকানাথ সরকারও পরীক্ষার ফল জানাইলেন। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম পত্রের নীচে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "Never mind ; come down to Cal-

cutta with Satis." "ভাবিও না; সতীশকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া এস।" তাঁহার এই আশ্বাসবাক্য প্রাণে বল সঞ্চার করিয়াছিল।

২৭এ জুন ঢাকা হইতে বন্ধু জগচ্চন্দ্র দাসের পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, যে ডিরেক্‌টর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-দিগের নাম প্রেরণ করিয়াছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সাতটী বৃত্তির মধ্যে মদনমোহন সাহা ও আমি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মদনমোহন সাহা, রাজমোহন গাঙ্গুলী ও রেবতীনাথ চক্রবর্ত্তী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন; এবার তিন জনই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইলেন। মদনবাবু ও রেবতীবাবু এফ্. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে নামিয়া গিয়াছিলেন।

আমি ও সতীশ একাদিক্রমে চারিমাস কাল জামুরিয়ার বাস-বাটীতে অতিবাহিত করিলাম। দুইজনে লাটিন শিক্ষার প্রথম ভাগ (Principia Latina, Part I) প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পড়িলাম। Sandford and Merton, Edgeworth's Popular and Moral Tales, Prescott's History of the Conquest of Peru প্রভৃতি দুই চারিখানি পুস্তকও পড়া হইল। আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইয়া শয়নগৃহে একত্র উপাসনা করিতাম। দূর সম্পর্কের এক পিসীমা কোন কোন দিন ঘরে ঢুকিয়া আমাদিগকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে "সতী মার সতীপুত্র" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কেহ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতেন না। সায়ংকালে মাঠে বসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিতাম। দুই জনই বুদ্ধিমান্ ও তর্কপটু; বিচার আরম্ভ হইলে সহজে থামিত না।

বাড়ীতে জলাচরণীয় চাকর চাকরাণী নাই ; মা ও বড় দিদি সমুদায় গৃহকর্ম্ম করেন ; এজন্য আমি ও সতীশ দুই বেলা এক থালায় ভাত খাইতাম, এবং থালাবাটী গেলাস নিজেরা মাজিতাম, সতীশের জন্য আমিও নিরামিষাশী হইয়াছিলাম; বিধবার সংসারে তাহাতে সুবিধাই হইয়াছিল। একটী ব্রাহ্মণ সন্তান কায়স্থের অন্ন আহার করিতেছে, ইহাতে সমাজে বিস্ময়ের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল, কিন্তু উপদ্রব ঘটে নাই।

সতীশ চরিত্রের মাধুর্য্যে ঠিক আমাদের পরিবারের একজন হইয়া গিয়াছিল। স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশে অগ্রজ ও কনিষ্ঠভ্রাতা বাড়ী আসিলেন, আমরা তখন পাঁচ ভাই হইলাম। সতীশ আমার মাকে মা ও দিদিকে দিদি বলিয়া ডাকিত। আমরা ছিলাম যথাক্রমে তাহার "বড় দাদা," "মধ্যম দাদা," "দাদা" ও "ছোড় দাদা।" মা তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তবে উচ্ছিষ্ট দিতে চাহিতেন না। আমরা পাঁচজন বাড়ীর ভিতরে পূর্ব্বদ্বারী ঘরে জোড়া তক্তপোষে শয়ন করিতাম, মা, দিদিও সেই ঘরে থাকিতেন। দুইটী বালকবালিকা তাহার নিকট পাঠ করিত, পাড়ার বৌঝিরা তাহাকে দেখিতে আসিতেন, গ্রামান্তর হইতে ছাত্রেরাও আসিত। আমার অনুরক্ত বাল্যসঙ্গী রুদ্রচন্দ্র বাগছি সারা বৈশাখ মাস আমাদিগকে নিজের বাগান হইতে গন্ধরাজ ফুল আনিয়া উপহার দিয়াছিলেন। বর্ষা আরম্ভ হইলে টাঙ্গাইল হইতে মেশোমহাশয় ও মাসীমা আসিলেন, সতীশের প্রতি তাঁহাদিগেরও প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সাত বৎসর পরেও মেশোমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার সে ঠাকুরটী কোহানে?" (তোমার সেই ব্রাহ্মণবালকটী এখন কোথায়?")

জুলাই মাসের গোড়ার দিকে আমার প্রবল জ্বর হইল। আমি জ্বরের মধ্যেই সিটী কলেজের অধ্যক্ষকে পত্র লিখিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। আমার আরোগ্যলাভের পরেই সতীশ জ্বরে পড়িল। পর পর দুই জনের জ্বর হওয়াতে আমাদিগের কলেজে উপস্থিত হইতে খুব বিলম্ব হইয়া গেল। ১৮ই জুলাই বৈকালে আমরা একখানি ছোট নৌকাতে কলিকাতা লক্ষ্য করিয়া ষ্টীমার ষ্টেশন সুবর্ণখালীর দিকে যাত্রা করিলাম। মা ও বড় দিদি দুই বেলা আহারের মত সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন কিন্তু উনুনের অভাবে সে দিন রাত্রিতে ও পর দিন মধ্যাহ্নে আমাদিগকে বিলক্ষণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে হইল। আমরা ১৯এ তারিখ এগারটার সময় ষ্টীমার ধরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোয়ালন্দ গেলাম, এবং ২০এ জুলাই প্রাতঃকালে কলিকাতায় পঁহুছিয়া ৪৫।৫, বেনেটোলা লেনের ব্রাহ্ম-ছাত্রাবাসে দুই বৎসরের জন্য নিশ্চিত পান্থশালা প্রাপ্ত হইলাম।

তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী

১৮৯০-৯২

জুলাই এর চতুর্থ সপ্তাহে আমরা কলেজে উপস্থিত হইলাম। সতীশ বিজ্ঞানে অনুরাগী ; সে বি. কোর্স লইয়া বিজ্ঞানে অনার্স পড়িবে, ইহাই পূর্ব্বে তাহার অভিলাষ ছিল। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটে ব্যয়সাধ্য বিজ্ঞানের পুস্তক কিনিবার সঙ্গতি ছিল না ; বাধ্য হইয়াই আমরা উভয়ে এ. কোর্স পড়া স্থির করিলাম। ইংরেজী ও দর্শন দুই জনেরই পাঠ্য ; সতীশ গণিত লইল, আমি সংস্কৃত লইলাম। তারপর অনার্স নির্ব্বাচনের প্রশ্ন। সতীশ দর্শনে অনার্স লইল। আমার চিরদিনই আত্মজ্ঞানের অভাব—আমি নির্ব্বাচন করিলাম,

ইংরেজী, দর্শন ও সংস্কৃত। অধ্যাপক বরদাকান্ত বিদ্যারত্নের একান্ত ইচ্ছা ছিল, আমি সংস্কৃতে অনার্স পড়ি।

কয়েকদিন এই তিন বিষয়ে অনার্সের শ্রেণীতে যোগ দিবার পরেই আমার পরামর্শদাতা বিজয়বাবু আমাকে বুঝাইলেন, আমি সংস্কৃতে অনার্স লইয়া পরিশ্রম করিয়া মরি কেন? ইতিহাস লইলে অক্লেশে পাস করিতে পারিব। তিনি নিজে ইতিহাস পড়িয়া বি. এ. পাস করিয়াছেন। গ্রীনের "ইংরেজ জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" কঠিন পুস্তক বটে, কিন্তু উহা পড়িবার প্রয়োজন নাই; এণ্ট্রান্সের পাঠ্য এডিথ টম্‌সনের ইতিহাস পড়িলেই চলিবে। আর বড় বড় ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্থলে রমেশ দত্তের ইতিহাসই যথেষ্ট। আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি এই পরামর্শের বশীভূত হইয়া সংস্কৃত ছাড়িয়া ইতিহাস পড়িতে অর্থাৎ আরাম করিতে আরম্ভ করিলাম। পরিণামে আমাকে এজন্য যৎপরোনাস্তি ভুগিতে হইয়াছিল। ইতিহাসেও অনার্স পড়িবার মোহ কিছুদিন ছিল, কিন্তু কাজে কিছু হয় নাই।

দর্শনের অনার্সে মার্টিনোর Study of Religion অন্যতম পাঠ্য পুস্তক ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে উহার অধ্যাপনা হইত। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রথম খণ্ড এবং শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ড পড়াইতেন। ব্রাহ্ম ছাত্রাবাসের ললিতমোহন দাস, সতীশ ও আমি ঐ বিদ্যালয়ে পড়িতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী মেধাবী ছাত্র উহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

আমাদের মেসের বড় বাড়ীটী তিনতলা, ছয়টী ঘর, প্রত্যেক ঘরে তিনজনের চৌকী পড়িয়াছে। আমরা একতলার একটী কক্ষে স্থান পাইলাম। আমাদের গলির ৪৫।১ হইতে ৪৫।৫ পর্য্যন্ত সমস্তগুলিই যথাক্রমে শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দে, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত

কৃষ্ণকুমার মিত্র, অধ্যাপক কালীশঙ্কর সুকুল এবং শ্রীযুক্ত উমাপদ রায়ের বাড়ী, একটী ছোট ব্রাহ্মপল্লী।

আমার ও সতীশের এক তহবিল, আয় আমার বৃত্তির মাসিক কুড়ি টাকা ; ২৫এ জুলাই হইতে সতীশ ৪৫।১ নং বাড়ীতে দুইটী ভাই-ভগিনীর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইল, বেতন মাসে পাঁচ টাকা। কলেজে বেতন দিতে হয় না, এই পঁচিশ টাকায় খুব হিসাব করিয়া আমাদিগকে ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে হইত। ঢাকা কলেজ হইতে প্রাপ্য বৃত্তির আমার প্রায় ত্রিশ ও সতীশের প্রায় একশত চারি টাকা পাওয়া গেল, তাহাতে পুস্তক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিবার অর্থ জুটিল।

আগষ্ট মাসে আসামের শাসনকর্ত্তার নিকটে সতীশের নামে একখানা দরখাস্ত প্রেরণ করা স্থির হইল। আবেদনপত্র আমি লিখিলাম, হেরম্ববাবু সংশোধন করিয়া দিলেন। উহাতে উপবীত ত্যাগের জন্য সতীশের উপরে যে ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া সে কেন এফ. এ. পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে পারে নাই, তাহার কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সে প্রার্থনা করিতেছে, যে সদাশয় চিফ্ কমিশনার দয়া করিয়া তাহার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বৃত্তিটী বহাল রাখুন। দরখাস্তের পোষকতার জন্য আমি অধ্যাপকদিগের সার্টিফিকেট আনিবার অভিপ্রায়ে ঢাকায় গেলাম। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ইংরেজীর, অধ্যাপক কালীপদ বসু গণিতের ও পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতের খুব ভাল প্রশংসাপত্র দিলেন। অধ্যাপক মণ্ডী তখন অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেছিলেন ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সার্টিফিকেট চাহিলাম ; তিনি সতীশকে আবেদন করিতে বলিলেন, এবং তাহার আবেদন পাইয়া এক প্রভূত সুখ্যাতি-

পূর্ণ দীর্ঘ সার্টিফিকেট পাঠাইয়া দিলেন ; তাহাতে অধিকন্তু লিখিলেন, যে যদি সতীশকে কোনওরূপ বৃত্তি দেওয়া হয়, তবে তিনি একান্ত আহ্লাদিত হইবেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল ; আসামের শাসনকর্ত্তা আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন।

৪৫।১ নং বাড়ী হ্যারিসন রোডের মধ্যে পড়িল ; এজন্য দে-পরিবার ২০৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উঠিয়া গেলেন ; তখন সতীশের বেতন সাত টাকা হইল। নবেম্বর মাস হইতে তাহার পিতা নিয়মিতরূপে মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিতে লাগিলেন। মার্চ্চ মাস হইতে সতীশ গৃহ শিক্ষকের কাজ ছাড়িয়া দিল। কয়েক মাস পরে তাহার হাতে হিসাব রাখিবার ভার দিলাম। তাহাকে প্রতিমাসে আমার বৃত্তি হইতে পনর ও তাহার টাকা হইতে পনর, মোট ত্রিশ টাকা দিতাম, তাহাতেই আমাদের সমুদায় খরচ চলিয়া যাইত। আমরা ক্রমশঃ একতলা হইতে দোতলায় ও দোতলা হইতে তিনতলায় উন্নীত হইলাম। বি. এ. পড়ার শেষ বৎসরটা আমাদের বেশ আরামেই কাটিয়াছিল।

একটী মুসলমান ভদ্রলোক প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি আমাদিগের দারুণ অভাবের সময়ে অযাচিতভাবে সতীশের জন্য আমার হাতে তিনটী টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তা আজিও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকি।

এইবার আমার নিজের কথা বলি।

নিজের কথা

বাড়ী হইতে আসিবার কয়েক দিন পরে এক বন্ধু বলিলেন, গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোম ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন ; সেই সময়ে তিনি স্বর্ণলতার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন

করেন ; স্বর্ণলতা তাহাতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার মনে বড় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। আমি যে-উদ্দেশ্যে ঢাকায় পলায়ন করিয়াছিলাম, তাহা সফল হয় নাই : স্বর্ণলতার প্রতি আমার মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। এ ধারণাও ঘুচিল না, যে তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন নহেন। চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য স্থির করিলাম, অতীতের স্মৃতিকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে ডাএরীর বহিখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম। তাহাতে লাভ হইল এই যে, বিথঙ্গল-আগরতলা ভ্রমণের যে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উহাতে লিখিত ছিল, তাহা বিনষ্ট হইল, কিন্তু অনুরাগ সুষুপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল।

অক্টোবর মাসে বিজয়বাবু বলিলেন, দেবেন্দ্র তাহার ভগিনীকে আমার সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছে, এবং তিনি তাহার উত্তরও দিয়াছেন। পত্র দুখানি এখন আমার নিকট আছে ; কিন্তু তখন তাহার মর্ম্ম বিশেষ জানিতে পারি নাই।

৫ই নবেম্বর সতীশের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ সীতানাথ দত্ত মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইয়া দেখিলাম, স্বর্ণলতা তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। পরে বিজয়বাবুর নিকটে শুনিলাম, তিনি যখন পূজার ছুটীতে ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন, তখন গুরুদাসবাবুর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ওদিকে আমার প্রতি তাঁহাদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িয়াছে। পরামর্শ করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন, স্বর্ণলতাকে কলিকাতায় রাখিলে দূর হইতে দুই চারিবার তাহাকে দেখিয়াই আমি ধরা পড়িব। বিজয়বাবু ইহার পশ্চাতে একটা বড় তত্ত্ব-কথা জানিতেন না।

৫ই ডিসেম্বর স্বর্ণলতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্র ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিল। সে বৈকালে আমাকে ঘরে একাকী পাইয়া কথায় কথায় বলিল, তাহার মেজদিদির বিবাহ ঠিক হইয়াছে। "কাহার সহিত?" "রজনীবাবুর সহিত।" আমি তো শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গীতে বিশ্বাস না করিয়াও পারিলাম না। নরেন্দ্র বলিল, পূজার ছুটীতে গুরুদাসবাবু স্থির করিলেন, একদিন ঢাকায় যাইয়া একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহার আত্মীয়ার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত করিবেন। যে দিন যাইবার কথা, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি স্বর্ণলতাকে বলিলেন, "আমি কাল সকালে তোমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া ঢাকায় যাইব। তুমি এইবার বল, তোমার রজনীকে বিবাহ করিবার মত আছে কি না?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, মত আছে।" তখনই বাজার হইতে মিঠাই আসিল, লাল দেশলাই জ্বালিয়া মিষ্টান্ন দ্বারা একটী ছোটখাট আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইল। ব্যাপারটা গোপন আছে, বিজয়বাবুকেও বলা হয় নাই।

নরেন্দ্রের মুখে এই প্রত্যয়জনক বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আমি সন্ধ্যার পরে ৪৫।১, বেনেটোলার বাড়ীর নীচের অন্ধকার ঘরে কয়েকটী বন্ধুকে লইয়া গিয়া রসগোল্লা খাওয়াইলাম। গৃহবাসীরা কিছু জানিতে পারেন নাই।

কিছুদিন পরে (১৮ই ডিসেম্বর) আমরা দুই জন এক অঙ্গীকার-পত্র বিনিময় করিলাম। আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে, এত দুর্য্যোগের পরে যদি মিলনাশার রশ্মি দেখা দিল, তবে তাহাকে একটু নির্ভরযোগ্য করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন

হইল। গুরুদাসবাবু প্রতিনিধি হইয়া আসিয়া আমাদের ছাত্রাবাসে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। তিনি স্বর্ণলতার মুখে অঙ্গীকার পত্রের কথা শুনিয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন; তাঁহার আদেশে পক্ষদ্বয় পত্রদুখানি পরস্পরকে ফিরাইয়া দিলেন। আমার খানা আমি পুড়াইয়া ফেলিলাম, অপরখানি অদ্যাপি অক্ষত আছে।

আমি জাতীয় মহাসমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। "রক্ষী" (warden) রূপে আগাগোড়া সভামণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া আমার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

মহাসমিতির অধিবেশন শেষ হইলে আমার পক্ষ হইয়া বিজয় বাবু গুরুদাসবাবুকে জানাইলেন, তিনি যথারীতি স্বর্ণলতার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। গুরুদাসবাবু সময় নির্দ্দেশ করিলেন রাত্রি বারটা। অতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কি করি, আমি গড়ের মাঠে Filip's Circus দেখিতে গেলাম। বারটার পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া বিজয়বাবু ও গুরুদাসবাবুকে জাগাইলাম। তারপর তিনজন গম্ভীরভাবে উপবেশন করিলাম। বিজয়বাবু "আমার বন্ধু রজনীকান্ত গুহ—" ইত্যাদি বলিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাব কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহার মত হইলে আমার আপত্তি নাই। তাঁহার উত্তর পাইলে আপনাদিগকে জানাইব।" পরদিন তিনি ময়মনসিংহে ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তাহ দুই পরে গুরুদাসবাবু জানাইলেন, চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথম কারণ, বর কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয় কারণ, সে শিক্ষিত নহে। অতএব আমার প্রতি উপদেশ, সে

অপেক্ষা করুক ; (Let him wait) ; বি. এ. পাস করিলে দ্বিতীয় আপত্তি ঘুচিয়া যাইবে।" স্বর্ণলতার পিতামাতা তাঁহাদের প্রথমা কন্যাকে সুরূপ ব্রাহ্মণপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়া কন্যা সম্বন্ধেও সেই প্রকার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু শিক্ষার অভাব বলিয়া যে আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই ; কেন না, প্রথম জামাতাও এফ্. এ. পাস ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত রায়, চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় সিমলা পাহাড়ে ভারতসরকারের কর্ম্ম করিতেন ; শীতকালে তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। স্বর্ণলতা এই সময়ে ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রচারাশ্রমে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন। আমি কখনও কখনও তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। তিনি আমার পরামর্শে কুমারী নীলের স্কুল ছাড়িয়া ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজীর প্রশ্ন পাঠাইতাম, তিনি উত্তর লিখিয়া দিতেন, আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া ফেরৎ দিতাম। দুই এক বার এই পরীক্ষার কাজ চলিয়াছিল।

তারপর মাঘোৎসব আসিল। আমি উৎসবের প্রায় সমস্ত বক্তৃতা ও উপদেশের সারাংশ লিখিয়াছিলাম। উৎসব শেষ হইলে মাসাধিক ধরিয়া আমি নোট দেখিয়া বলিয়া যাইতাম, সতীশ পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া লইত। পরে সেগুলি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বোধ হয় ১লা ফেব্রুয়ারী একটী ব্রাহ্মের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সমাজপাড়ায় গিয়াছিলাম। গৌরীবাবু আমার হাতে একখানা পত্র দিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে লিখিয়াছেন—"আমি গুরুদাসের পত্র পাইয়াছি। সে যে ছেলেটীর

সহিত স্বর্ণের বিবাহের কথা বলিয়াছে আমি তাহাতে মত দিয়াছি। যদি স্বর্ণ ইচ্ছুক থাকে, তবে আমার আপত্তি নাই। রজনীর ন্যায় একজন বুদ্ধিমান বালক (boy) পাইলে আমি সুখী হইব—যাহাকে দেবেন, গুরুদাস ও তুমি অনুমোদন (recommend) করিয়াছ।” ইত্যাদি।

ফেব্রুয়ারী মাসে স্বর্ণলতার মাতা ময়মনসিংহ হইতে আসিয়া সিমলায় যাইবার পথে কলিকাতায় মাসাধিক কাল থাকিয়া গেলেন। আমি দেখা করিতে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই আমাকে মায়ের মত আদর করিলেন; আমি হরষিত চিত্তে অনুভব করিলাম, সমুদায় বাধাবিপত্তির মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। তিনি পুত্রকন্যাসহ সমাজপাড়ায় শশিপদবাবুর বাড়ীর তেতলার ঘর ভাড়া লইলেন। আমি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সেখানে যাইতে লাগিলাম। আমরা দক্ষিণ দিকের খোলা বারাণ্ডায় বসিয়া আলাপ করিতাম। প্রথম প্রেমোচ্ছ্বাসের তরঙ্গে কিছুদিন রাত্রিতে পাঠের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। তবে আমার একটা বাঁচিবার পথ ছিল; আমি দিনের বেলায় যতক্ষণ পড়িতাম, নিবিষ্টচিত্তে পড়িতাম, তখন বাহিরের চিন্তায় মন আন্দোলিত হইত না।

১২ই মার্চ্চ রাত্রিতে স্বর্ণলতা আমাদের বাসার কয়েকজনকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইলেন। সমস্তদিন খাটিয়া বার তের পদ আহার্য্য রাঁধিয়াছিলেন, সমস্তগুলিই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দেবেন্দ্র, বিজয়বাবু, সতীশ প্রভৃতি খাইয়া চলিয়া গেলেন, আমি পরে খাইব বলিয়া বসিয়া রহিলাম। পরিশেষে আমার বিবেচনার ত্রুটিতে আনন্দোৎসব পণ্ড হইল। আমি একটার পরে আহার করিয়া ক্লিষ্ট হৃদয় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

এই সময়ে বোধ হয় আমার দাদা স্বর্ণলতাকে লক্ষ্ণৌ কুমারী থোবার্ণের স্কুলে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ব্যয়বাহুল্যের জন্য তাঁহার পিতামাতা ইহাতে সম্মত হন নাই।

২৫এ মার্চ্চ স্বর্ণলতার মাতা সিমলায় যাত্রা করিলেন। স্বর্ণলতা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে রহিলেন। আপাততঃ আমাদের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ থাকিল।

বেনেটোলার দাঙ্গা

১৮৯১ সনের শীতকালে ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতি আইনের পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ প্রস্তাবিত আইনের পক্ষপাতী ছিলেন, এজন্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ চলিতেছিল। ২৫এ মার্চ্চ (১২ই চৈত্র) দোলযাত্রার সংস্রবে বেনেটোলায় যে দাঙ্গা হয়, বোধ হয় ঐ বিক্ষোভই তাহার মূল। ঐ দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু বেনেটোলার ব্রাহ্মপাড়ার দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে হ্যারিসন রোড ও গলির মোড়ে একদল হোলি খেলার লোক তাঁহাদিগের গায়ে নাকে মুখে রংগোলা জল দেয়, তাঁহাদিগের নিষেধ ও অনুনয় তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। তখন তাঁহারা দুইজনকে ধরিয়া আমাদিগের বাসার দিকে অগ্রসর হন, এবং বিজয়বাবু মেসের ছাত্রদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকেন। আমরা তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া নীচে যাইয়া দেখি, বাসার সম্মুখে খোলা জায়গায় বিস্তর লোক জমিয়াছে, ইতোমধ্যে যে বালকটী কৃষ্ণ সাজিয়াছিল, কে তাহাকে আমাদের চিলাকোঠায়

লইয়া গিয়া আটক করিয়াছে, সে জানালায় দাঁড়াইয়া স্বদলের দৃষ্টিপথে কাঁদিতেছে। একব্যক্তি বিজয়বাবুকে আক্রমণ করিল, আমি তৎক্ষণাৎ আমার হাতের লাঠি দিয়া তাহার মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিলাম, কিন্তু সে আমার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। ক্রমশঃ জনতা বাড়িয়া গেল, আমরা তুইটী লোককে লইয়া শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্থকুলের বাড়ীর বহিরঙ্গণে ঢুকিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। একজনকে দ্বারিকাবাবু তাহার ধুতি দিয়া বারাণ্ডার থামের সহিত বাঁধিয়া ফেলিলেন, আর একজনকে আমার সহাধ্যায়ী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বস্থ জড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া আমাকে বলিলেন, "রজনীবাবু, মারুন।" আমি তুই এক ঘা মারিয়াছিলাম ; গুরু আঘাতের অক্ষমতার জন্য পরে অনেকেই আমাকে বিদ্রূপ করিতেন। এদিকে দলের লোক কালীশঙ্করবাবুর বাড়ীতে আবদ্ধ হওয়াতে শত্রুপক্ষ ক্ষেপিয়া গিয়া প্রাণপণে সদর দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থকুল মহাশয়, আর একজন ও আমি দরজা ঠেলিয়া ধরিয়া তাহাদিগকে ঠেকাইবার প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু পারিলাম না, তাহাদের আক্রমণে হুড়কা ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারা জলস্রোতের ন্যায় বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। আমি ভুলে লাঠি ফেলিয়া ভিতরের আঙ্গিনায় গেলাম। কতকগুলি লোক ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র তাহাদিগকে পিঠে কোমরে লোহার ডাণ্ডা মারিয়া তাড়াইয়া দেন। দাঙ্গাকারীরা তাহাদিগের সঙ্গী তুটীকে উদ্ধার করিল এবং কালীশঙ্করবাবুর সোণার চশমা কাড়িয়া ও আমার লাঠি লইয়া এবং লাঠির আঘাতে বিজয় বাবুর পৃষ্ঠ রক্তাক্ত করিয়া বাহির হইল। তারপর আমি দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইতেই তাহারা ইটপাটকেল ছুড়িতে লাগিল এবং আমাকে

মিষ্ট সম্বোধন করিয়া শাসাইল, "তোমাকে আমরা দেখাইব।" দাঙ্গার অবসরে কৃষ্ণবেশধারী বালকটী পলায়ন করিয়াছিল। আমাদের পক্ষে একজন সুকিয়া ষ্ট্রীট থানায় দাঙ্গার খবর দিতে গিয়াছিলেন, পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই আক্রমণকারীরা চলিয়া গেল। প্রতিপক্ষ যে পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র করিয়া দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, দূরদূরান্তরের লোক আসিয়া দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল।

পুলিশের তদন্তের পরে দুই পক্ষই ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ১০ই এপ্রিল আপোষে নিষ্পত্তি হইল। বিরুদ্ধ পক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে, ভবিষ্যতে তাহারা কোনরূপ উৎপাত করিবে না।

ইহার কিছু দিন পরে আলবার্ট হলে একটা সভা হইল। সভা আহ্বান করিয়াছিলেন রিপন কলেজের অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি; উদ্দেশ্য ছিল সম্মতিআইনের প্রতিবাদ করা। আমরা ছাত্রাবাসের আট দশ জন সভায় উপস্থিত হইলাম। আমরা এই সংকল্প লইয়া গিয়াছিলাম যে, কোনও বক্তা সম্মতি আইনের প্রতিবাদ করিলে বাধা দিব। কাজেও তাহাই হইল। কেহ পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে কথা বলিলেই আমরা 'না' 'না' ('no' 'no') বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলাম, আবার যখনই সপক্ষে কিছু বলা হইল, তৎক্ষণাৎ আমাদের 'হাঁ' 'হাঁ' ও প্রতিপক্ষের 'না' 'না' নিনাদে সভার কার্য্য পরিচালন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন; অনন্যোপায় হইয়া তিনি সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন আইনের বিরোধীরা অনেকে আমা-দিগকে "তোমরা কেন এখানে আসিয়াছ"? বলিতে বলিতে

আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল ; তাহাদের ঘুষি আমাদের নাক ছোঁয় আর কি ! আমাদের দলেও দুই একজন খুব বলবান্ যুবক ছিলেন ; আমরা নিশ্চয় করিয়াছিলাম, প্রতিপক্ষ আঘাত করিলে তবে আঘাত প্রত্যর্পণ করিব। তাহাদিগের আঘাত আমাদিগের গাত্র স্পর্শ করিল না, কাজেই আর একটা দাঙ্গা উৎপত্তির পূর্ব্বেই বিলীন হইল।

গিরিজাসুন্দরীর হত্যা

১০ই এপ্রিল রাত্রিতে আহারান্তে ঘুমাইতেছিলাম, বন্ধু ললিত-মোহন দাস আমাকে জাগাইয়া সংবাদ দিলেন, মন্দিরের সম্মুখে আততায়ী এক ব্রাহ্মমহিলাকে হত্যা করিয়াছে ; শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী তাহাকে ধরিতে যাইয়া সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন। ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত মনের ক্লেশে আর ঘুম হইল না। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, এই হত্যাকাণ্ডও ব্রাহ্মবিদ্বেষের ফল ; কিন্তু পরে জানা গেল, বসু নামধেয় এক প্রেমান্ধ যুবক ঠিক হত্যার পরেই আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকেই হত্যাকারী বলিয়া গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। পরদিন মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের কক্ষে আমি হত নারীর দেহ দেখিয়াছিলাম। রাত্রি নয়টার সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মত জনসমাকীর্ণ রাজপথে যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত আঘাতের পর আঘাত করিয়া চক্ষুর পলকে মহিলাটীকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা কোনও পেশাদারী গুণ্ডা ছাড়া আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, মৃতদেহ দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল ; পুলিশ কোর্টে বসুকে দেখিয়া সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। বসুর প্রেমপত্রগুলি তাহার বিনাশ অনিবার্য্য করিয়া

তুলিল ; হতভাগ্য যুবক শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াও ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইল।

মহেশবাবু দীর্ঘকাল জীবনমরণের সন্ধিস্থলে সংগ্রাম করিয়া আরোগ্যলাভ করিলেন।

ভ্রাতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পিতামাতার সহিত মিলন

গ্রীষ্মাবকাশে, ১লা মে, সতীশ গৌহাটীতে পিতামাতার নিকটে গেলেন। আমার ও তাঁহার অন্যান্য বন্ধুর মনে আশঙ্কা ছিল, হয়তো তিনি সেখানে গুরুতর বিপদে পড়িবেন। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এবার তিনি যে পিতামাতার স্নেহক্রোড়ে পুনরায় স্থান পাইলেন, তাঁহাদের জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাহাতে আর বঞ্চিত হইলেন না। সতীশ অতঃপর জ্যেষ্ঠপুত্র ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার যাবতীয় কর্ত্তব্য অপরাজিতচিত্তে পালন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তাগ্রজ গোবিন্দনাথ গুহের বিবাহ

১৮৯১ সনে দাদা কলিকাতার অদূরবর্ত্তী আন্দুল-মৌরী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। ১২ই এপ্রিল তিনি গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত বহরমপুর হইতে একখানি নিয়োগপত্র পাইয়া অবগত হইলেন যে, স্থানীয় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত উল্লসিত হইলাম। তখনও বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের পরিকল্পনা হয় নাই ; তাঁহাকে সমুদ্রগামী জাহাজে চারি দিনে গোপালপুর পঁহুছিয়া তথা হইতে ঘোড়ার অথবা গোরুর গাড়ীতে

বহরমপুর যাইতে হইবে। তৎপরে নিয়োগপত্রে দুই বৎসরের অঙ্গীকারের কথা ছিল। এই দুই কারণে, দুই বৎসর অতীত না হইলে তিনি কলিকাতায় আসিতে পারিবেন না, ইহা নিশ্চিত জানিয়া আমি ধরিয়া বসিলাম, যে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নূতন কর্ম্মস্থানে যাইতে হইবে। দাদা ইহাতে সম্মত হইলেন। আমি শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্তের আত্মীয়া শ্রীমতী যামিনীর সহিত দাদার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। ইনি স্বর্ণলতার বন্ধু ছিলেন, আমিও ইহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতাম। ২০এ মে বরকন্যার প্রথম আলাপ হইল, পরদিন সায়ংকালে তাহারা পরস্পরের মনোনয়ন জ্ঞাপন করিলেন। সীতানাথবাবু ও আমি বরাহনগরে যাইয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে বিবাহের নোটীশ দিয়া ১১টার সময়ে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীমতী যামিনী বালবিধবা ছিলেন, শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শশিপদবাবুর বিধবাশ্রমে বাস করিতেন।

৪ঠা জুন (২২এ জ্যৈষ্ঠ) সায়াহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রীতিভোজন হইল; বরপক্ষ ইহার ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

বরকর্ত্তারূপে আমার নামে নিমন্ত্রণপত্র বাহির হইয়াছিল; এবং বিবাহের টাকাকড়ি ও হিসাব আমি রাখিয়াছিলাম। মধ্যম দাদা বিবাহোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

৭ই জুন দাদা ও বৌদিদি একটী ভৃত্য সহ বহরমপুর যাত্রা করিলেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসের বিবাহের আন্দোলন

ইহার পরেই একটা ঘটনায় ব্রাহ্মসমাজে বিক্ষোভের তরঙ্গ আসিল। সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাস মহাশয় পঞ্চাশ পার হইয়া একটী সন্তানবতী বিধবা নারীকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। ইহাতে বহু বহু ব্রাহ্মের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। আমার অন্তরে এমন ক্লেশ হইল যে, আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া সপ্তাহ কাল পরে Indian Messenger পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একখানা পত্র লিখিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের হাতে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া দিতে বলিলেন; এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী লিখিত হইলে আমার পত্র ২৯এ জুনের কাগজে প্রকাশিত হইল। উহার প্রথমাংশে ব্রাহ্মবিবাহের আদর্শ বর্ণিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়াংশে ঐ বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্পাদক পত্রের নিম্নে এই মন্তব্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে তিনি পত্রপ্রেরকের সহিত একমত। সম্পাদকের সমর্থন হইতে ব্রাহ্মসমাজে বাগ্‌বিতণ্ডার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ছয় মাসের অধিক কাল উক্ত পত্রিকায় বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল, এবং পরিপূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইতে এক বৎসর লাগিয়াছিল। বিলাত হইতে কুমারী কলেট আমার পত্র ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

আমার পত্রে লেখকের নাম ছিল না, শুধু G. এই অক্ষরটী ছিল। মাদ্রাজের এক বিপত্নীক যুবক ব্রাহ্মবিবাহের আদর্শ বিষয়ক অংশটী পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া লেখককে সম্পাদকের বরাবর এক পত্র লিখিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, যে বিবাহের আদর্শ সম্বন্ধে লেখকের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, কিন্তু তিনি আলোচ্য

বিবাহ বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ করিতেছেন না। তাঁহার নাম মনে নাই।

নিজের কথা

এইবার নিজের কথা বলি। স্বর্ণলতার ছাত্রীনিবাসে যাওয়া হইতে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইলে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম, আমাকে স্বর্ণলতার সহিত দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হউক। দাদা, সীতানাথবাবু প্রভৃতি এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন। সম্পাদক একটা ব্যবস্থার মধ্যে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। ব্যবস্থাটী এই—১৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীর দক্ষিণার্দ্ধে দোতলায় ছাত্রীনিবাস ছিল; একতলার দুই তিনটী ঘরে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত সপরিবারে বাস করিতেন, অবশিষ্ট ঘরগুলিতে স্কুল বসিত। ছুটীতে হোষ্টেলে দুই তিনটীর অধিক ছাত্রী ছিল না। আমি সীতানাথ বাবুর ঘরে স্বর্ণলতার সহিত আলাপ করিবার অনুমতি পাইলাম; এবং তদনুসারে ৯ই মে বৈকালে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমি গেলে সীতানাথ বাবুর পত্নী স্বর্ণলতাকে ডাকিয়া দিতেন; তারপরে আমরা নিরুপদ্রবে কথাবার্ত্তা বলিতাম। আমি প্রায়শঃ এক দিন পর এক দিন যাইতাম; স্কুল খুলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়াছিল।

যে দিন স্বর্ণলতাকে দেখিতে যাইতাম, সে দিন আলাপে, যে দিন যাইতাম না, সে দিন পরস্পরকে পত্র লিখিতে বিস্তর সময় কাটিয়া যাইত। সুতরাং দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটীতে পড়াশুনা আশানুরূপ হইল না।

জুলাই মাসের প্রথম দিকে স্বর্ণলতার মাতা সিমলা হইতে তাঁহাকে

লিখিলেন, তাঁহার দিদি আসন্নপ্রসবা, তিনি ময়মনসিংহে যাইয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করুন। স্বর্ণলতা পড়াশুনা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিবেন, ইহা আমার নিকটে সঙ্গত বোধ হইল না; তিনিও আমার অমতে ময়মনসিংহে যাইতে চাহিলেন না। গুরুদাস বাবুরা এজন্য আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।

তারপর এক বিপদ উপস্থিত হইল। স্বর্ণলতার মাতা যখন তাঁহাকে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া সিমলায় চলিয়া যান, তখন কর্তৃপক্ষ জানিতেন যে, তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে কোনও আপত্তি উঠিল না। কয়েক মাস পরে তাঁহারা নিয়ম করিলেন যে, এই প্রকার কোনও বালিকা ছাত্রীনিবাসে বাস করিতে পারিবে না। স্বর্ণলতা তখন যান কোথায়? তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্থানীয় অভিভাবক, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, পিতামাতা বহু দূরে। থাকিবার স্থানের অভাবে অগত্যা নিরুপায়ের উপায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। তিনি তখন ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের নীচের তলার একটী ঘরে সঞ্জীবনীর জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া লেখা বন্ধ করিয়া বসিতে বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কেন আসিয়াছি। কথাটা পাড়িতেই নিমেষের তরে মুখখানা কালো করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন, "সে কথা তুমি কেন ভাবছো? তা দেবেন ভাব্‌বে।" বোধ হয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে কথাটা আমার প্রাণে বড় লাগিল। অমনি আবার প্রসন্ন হইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন, তুমি কন্যার অভিভাবকদিগের সহিত reason করিতে পার, তাঁহাদিগকে persuade করিতে পার, কিন্তু right of guardianship assume করিতে পার না। এমন মিষ্ট করিয়া

কথাগুলি বলিলেন, যে, আমি যখন বিদায় লইয়া আসিলাম, তখন আমার মনে লেশমাত্র কালিমা থাকিল না।

শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকটে বিফলমনোরথ হইয়া আমি কুমারী নীলের স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই বলিয়া দিলেন, তাঁহাদের হোষ্টেলে অ-খৃষ্টান ছাত্রী রাখা হয় না। তারপরে লক্ষ্ণৌএ কুমারী থোবার্নকে পত্র লিখিলাম। তিনি জানাইলেন যে, বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে এমন ছাত্রী হোষ্টেলে রাখিবার কোনও বাধা নাই। কিন্তু আমার আর অগ্রসর হইবার সাধ্য ছিল না। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইল না, কেন না, ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নব নিয়ম রহিত করিলেন না, স্বর্ণলতাও ছাত্রীনিবাসেই রহিয়া গেলেন। এই অবস্থায় আগষ্ট মাস শেষ হইল।

১লা সেপ্টেম্বর স্বর্ণলতা ময়মনসিংহ হইতে পত্র পাইলেন, গুরুদাস বাবুর প্রথম পুত্র সুকুমার জ্বর প্লীহা প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে অবিলম্বে যাইতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি সেই দিনই রওনা হইবার সংকল্প করিলেন। সতীশ ও আমি সায়ংকালে স্কুলের বাড়ীতে যাইয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া দিলাম, তাঁহার ডাএরী ও ছবিগুলি আমার নিকটে রাখিলাম, এবং দেবেন্দ্রের সহিত তাঁহাকে শিয়ালদহ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বাসায় ফিরিলাম। কথা থাকিল তিনি এক দিন পর এক দিন পত্র লিখিবেন।

কেন জানি না, কয়েক দিন আমার মন বড়ই অবশ হইয়া রহিল। কি যেন একটা আতঙ্ক, কি যেন একটা বিপদের আশঙ্কা চিত্তকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গুরুদাস বাবুর দ্বিতীয় পুত্রটী

হঠাৎ রক্তামাশয় হইয়া চলিয়া গেল। সুকুমারের রোগও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল। স্বর্ণলতা অক্টোবরের ৭ই পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে রহিলেন। নিয়মিতরূপে তাঁহার পত্র পাইতে ও তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হইয়া আসিল, আমিও পড়াশুনায় মন দিলাম।

পড়াশুনার কথা

গ্রীষ্মের ছুটীর পরে তত্ত্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিলাম। সীতানাথ বাবুর কাগজে সতীশ ও আমি প্রথম হইয়াছিলাম; কিন্তু ক্ষেত্র বাবুর কাগজে নামিয়া গেলাম। ললিতমোহন দাস প্রথম, সতীশ দ্বিতীয়, আমি তৃতীয়, ফ্রি চার্চ্চ কলেজের জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ, এই এইরূপ ফল দাঁড়াইল। এবার Martineau's Endeavour after a Christian Life পুরস্কার পাইয়াছিলাম। এই পরীক্ষার পরেই দর্শনে অনার্স ছাড়িয়া দিলাম, শুধু ইংরাজীতে অনার্স রাখিলাম।

পূজার ছুটীর পূর্ব্বে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর যান্মাসিক পরীক্ষা হইল। হেরম্ববাবু ইংরেজীর পরীক্ষক ছিলেন, তাহাতে প্রথম হইলাম। দর্শনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলাম। ইতিহাসে উমেশবাবুর কাগজে ও অর্থবিজ্ঞানে রাজেন্দ্রবাবুর কাগজে দশ বারটী ছাত্রের মধ্যে প্রায় সকলের নীচে স্থান পাইলাম। তাঁহারা দুই জনেই অনুযোগ ও দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

এদিকে কিছুদিন হইতে আমার চক্ষুতে বেদনা আরম্ভ হইল। অক্টোবরের প্রথম ভাগে মেডিক্যাল কলেজে যাইয়া চক্ষু পরীক্ষা করাইলাম। Dr. Leahy distant vision এর জন্য 1·25 নম্বরের carefully centred চসমার ব্যবস্থা দিলেন। পড়িবার জন্য স্বতন্ত্র চসমার দরকার হইল না। দাদা টাকা পাঠাইয়া দিলেন; আমি সেই

যে চসমা ধরিলাম, আজও তাহা আছে। প্রথম প্রথম চসমা পরিয়া বাহির হইতে বড়ই লজ্জা বোধ হইত।

ইতিহাসে Green's Short History of the English People অন্যতম পাঠ্যপুস্তক ছিল। পুস্তকখানি নূতন ধরণে লেখা, অধ্যাপকের সাহায্য ছাড়া তাহাতে প্রবেশ করা দুরূহ। আমাদের অধ্যাপক ক্লাসে বইখানি শুধু পড়িয়া যাইতেন; তাঁহার অধ্যাপনাতে কিছুই উপকার হইত না, বাড়ীতেও বিজয়বাবুর ভরসা পাইয়া উহাতে অবহেলা করিতাম। পূজার ছুটীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বার বৎসরের প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া দেখি, একটারও উত্তর জানি না। তখন চক্ষু স্থির। বিষম ভয় হইল, প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করিয়া গ্রীনের ইতিহাস পড়িয়া প্রশ্নগুলির উত্তর শিখিতে লাগিলাম। সংস্কৃত ছাড়িয়া ইতিহাস লইবার বোকামির দরুণ আমাকে যে কি ভুগিতে হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। দুই তিন মাস চসমা ব্যবহার করিয়াও চক্ষুর বেদনার নিবৃত্তি হইল না। এজন্য আবার মেডিক্যাল কলেজে চোখ দেখাইতে গেলাম। এবার ডাক্তার স্যাণ্ডার্স (Sanders) পরীক্ষা করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিলেন; বলিলেন, "What will you gain by passing the B. A. Examination, if you lose your eyes ?" 'যদি তুমি চক্ষুদুটী হারাও, তবে বি. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ?' আমি মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়াই তাহার সম্মুখে এক ডিস্পেন্‌সারীতে ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগছীর নিকটে গেলাম। চিকিৎসকরূপে তাঁহার খুব সুখ্যাতি ছিল। তিনি পরীক্ষা দিতে নিষেধ করিলেন না, খাইবার জন্য একটা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিলেন। পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমি তাঁহার ব্যবস্থা মতই চলিয়াছিলাম।

মানসিক অশান্তি

এই সময়ে গুরুদাস বাবুর পুত্র স্থকুমারের মত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র মাখন (সত্যানন্দ) জ্বর প্লীহায় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহে চিকিৎসায় স্থফল না পাইয়া তাঁহারা উভয়েই ৮ই অক্টোবর রুগ্ন পুত্রের আরোগ্য কামনায় কলিকাতায় আসিলেন; এবং ১১ই তারিখ মধুপুরে চলিয়া গেলেন। স্বর্ণলতা আবার ছাত্রীনিবাসে প্রবেশ করিলেন।

আমি পণ্ডিতমহাশয় ও গুরুদাসবাবুর স্বজনদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। স্নানাদির জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের আবাসেও আসিয়াছিলেন। দেখিলাম, আমার উপরে তাঁহার খুব বিরক্তির ভাব। ১০ই রাত্রি নটার সময় হ্যারিসন রোডে পায়চারী করিতে করিতে এক বন্ধুকে বলিলাম, "আমার প্রতি গুরুদাস বাবুর বড়ই বিরক্তির ভাব দেখিলাম।" সে বলিল, "বিরক্ত হবেন না কেন? তাঁহার মেয়ে হইবার সময় তুমি স্বর্ণকে ময়মনসিংহে যাইতে দেও নাই।" আমি বলিলাম, "সে কি রকম কথা? তাঁহার যদি বৎসর বৎসর ছেলে হয়, তাঁর শ্যালী পড়া বন্ধ করিয়া বৎসর বৎসর ময়মনসিংহ যাইবে?" পরদিন বৈকালে, মধুপুর যাত্রার পূর্ব্বে স্থকুমারের জন্য কিছু খেলনা লইয়া গুরুদাসবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি খেলনাগুলি যে ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, আমার উপরে চটিয়াছেন। দুই এক দিন পরে মেসে আহারের সময় আমি বিষয়টী তুলিতেই দেবেন্দ্র আমার ঐ কথা আবৃত্তি করিল; বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার গোপনীয় কথা গুরুদাস বাবুকে বলিয়া দিয়াছিলেন।

তারপর ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। ২২এ অক্টোবর শুশ্রূষার প্রয়োজনে স্বর্ণলতাকে মধুপুরে যাইতে হইল। তাঁহার পত্রে আভাস পাইলাম, একটা গোলযোগ চলিতেছে। ৩০এ তারিখ তাঁহার মাতা সিমলা হইতে পথে মধুপুরে দুই এক দিন থাকিয়া স্বর্ণলতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিলেন, গুরুদাস বাবু বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছেন; দেবেন্দ্রের মুখেও সেইরূপ শুনিলাম। তাহার মাতা মধুপুরে আমার বিরুদ্ধে কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, প্রথম সাক্ষাতের সময় তাঁহার অপ্রসন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু অচিরেই তিনি আবার প্রসন্ন হইলেন। স্বর্ণলতা পুনরায় মাতা ও ভাইবোনদিগের সহিত সমাজপাড়ার এক বাড়ীতে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তিনি মধুপুরে দুই এক দিন ছিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য তাঁহার পুত্রাদির সহিত আমিও হাবড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলাম; দেখিলাম, তিনিও আমার প্রতি বিরূপ হইয়া আসিয়াছেন। পরদিন তাঁহাদের বাড়ীতে গেলে স্বর্ণলতার মাতা আমাকে বলিলেন, রাত্রিতে তিনি স্বামীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়াছেন, তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহারেও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। ইহার পর তিনি যত দিন কলিকাতায় ছিলেন, আমার প্রতি সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন।

এই সকল গোলযোগের দরুণ কিছুকাল দুইজনকেই অশান্তিতে কাটাইতে হইল, এবং তাহাতে আমার পাঠেরও ব্যাঘাত ঘটিল। এতদুপলক্ষে আমার পত্রের উত্তরে ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস

মহাশয় আমাকে যে সদুপদেশ ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও আছে।

বালীগঞ্জে উদ্যানোৎসব

৫ই ডিসেম্বর শনিবার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির সহিত সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে আমরা অনেকে বালীগঞ্জে এক বাগানে যাই। সেখানে পঁহুছিলেই গান, কীর্ত্তন, প্রার্থনা, উপাসনা ও গ্রন্থপাঠ আরম্ভ হয়। এগারটার পরে আহারান্তে আবার কীর্ত্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি চলিতে থাকে। আমি ১টার সময় শয়ন করি; দত্ত মহাশয়, ললিতমোহন দাস আরও কেহ কেহ সারা রাত্রি কীর্ত্তন, উপাসনা ও ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ৬ই তারিখ প্রত্যূষে সকলে সমবেত হইয়া আবার কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিতে থাকেন, তৎপরে সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়। ১টার সময় প্রীতিভোজন, ক্ষণকাল পরেই আবার গান, প্রার্থনা এবং আলোচনা; এইরূপে সন্ধ্যার সময় উৎসব শেষ হয়।

আলোচনাতে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি যোগ দেন। উহাতে ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার রসবহুল হাস্যোদ্দীপক বাক্‌পটুতা বিশেষরূপে শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। মনে আছে, তাঁহারা মেদিনীপুরে একটা "সভানিবারণী সভা" স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন।

এই নৈমিত্তিক উৎসবটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে সম্পন্ন হইয়াছিল।

৯ই জানুয়ারী ১৮৯২ ক্লোরোফর্ম করিয়া স্বর্ণলতার বুকে tumourএর operation হইল। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস

অস্ত্রোপচার করিলেন, ডাক্তার নীলরতন সরকার সহকারী ছিলেন। ঘরে উপস্থিত ছিলেন দুই ডাক্তার ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্র ছাড়া স্বর্ণলতার আত্মীয়া শ্রীমতী ক্ষেমন্ত কুমারী চৌধুরী, গুরুদাসবাবু ও আমি। তাঁহার পিতামাতা পাশের ঘরে রহিলেন।

রোগিণীর আরোগ্যলাভের কালে আমি শয্যার নিকটে বসিয়া পরীক্ষার পাঠ অভ্যাস করিতাম। তাঁহার নিরাময় হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগিয়াছিল।

এবার মাঘোৎসবে আগাগোড়া যোগ দেওয়া সম্ভবপর হইল না। প্রধান প্রধান দিন উপস্থিত থাকিলাম।

বি. এ. পরীক্ষা

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে শরীর মাঝে মাঝে অসুস্থ হইল; অশান্তি উপদ্রবও বিলক্ষণ ঘটিল। চৌধুরীমহাশয় একজনের দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি আর ছুটী পাইবেন না, অতএব কলিকাতায় থাকিয়া আমার বি. এ. পরীক্ষার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন। আমি কোথায় পরীক্ষা দিতে সেনেট হাউসে যাইব, না তদগ্রে ব্রহ্মমন্দিরে বিবাহের মঞ্চে যাইয়া বসিব, এই দৃশ্য কল্পনা করিয়া আমার মন একেবারে বিদ্রোহী হইল। পণ্ডিত মহাশয় তখন মাখনের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহাকে আমার অমত জানাইলাম, তিনিও অমত প্রকাশ করিলেন। চৌধুরীমহাশয় সিমলায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আর দেখা হয় নাই।

দুই বৎসর আধখানা মন দিয়া পড়িয়া পরীক্ষা দিতে চলিলাম। ২৯এ ফেব্রুয়ারী পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথম দুই দিন ইংরেজী অনার্স; প্রথম প্রশ্নপত্র অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল; শুনিলাম সেনেট হাউসে

কেহই এক শত নম্বরের মধ্যে ষাটের বেশী উত্তর লিখিতে পারে নাই। চতুর্থ প্রশ্নপত্রে ছিল, History of English Literature, 25, Philology, 25, Essay 50. প্রথমটী খুব খারাপ হইল, বইখানা মোটে দুইবার পড়িয়াছিলাম। Philology সিটী কলেজে মোটেই পড়ান হয় নাই, আমিও পড়ি নাই। বোধ হয় ½ নম্বরের একটী উত্তর লিখিয়াছিলাম—tea was pronounced tay. বসিয়া বসিয়া Essay একটু ভাল করিয়া লিখিয়াছিলাম। আমার বিষয় ছিল, self-knowledge, self-reverence. Philosophyতে প্রথম প্রশ্নপত্র পাইলাম সাদা আর্দ্র কাগজে ছাপা, বোধ হয় পূর্ব্ব রাত্রিতে মুদ্রিত হইয়াছিল। দর্শনের পরীক্ষা নেহাৎ মন্দ হইল না। শেষ দিন ইতিহাস। প্রথম প্রশ্নপত্র Green's History, 70, History of India, 30. প্রশ্ন পড়িয়া একেবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, বলিতে গেলে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটা প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর জানা নাই। আধ ঘণ্টা ধরিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য শরীরের এক রকম ঝাঁকুনি চলিতে লাগিল। পরিশেষে মন স্থির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লিখিব কি ; যে প্রশ্নটা প্রায় প্রতিবৎসর থাকিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতেই সব চেয়ে বেশী, ১৬ নম্বর দেওয়া হইয়াছে। গ্রীনের ইতিহাসে কোন রকমে ১০।১২ নম্বরের উত্তর লিখিলাম। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে রমেশ দত্তের ইতিহাস পড়িয়া যেটুকু হইবার তাহাই হইল।

জলপানের ছুটীতে গোলদিঘীতে যাইয়া বিজয় বাবুকে বলিলাম, আর পরীক্ষা দিব না। তিনি খুব আশ্বাস ও সাহস দিয়া পরীক্ষা মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। এ বেলায় Political Economy, 60,

History of India, 30. প্রথমোক্ত বিষয়টা একটু মন দিয়া পড়িয়াছিলাম, খুব খারাপ লিখিলাম না। ভারতের ইতিহাসে সকাল বেলার মতই উত্তর দিলাম।

পরীক্ষা শেষ হইলে সেনেট হাউস হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমার চৈতন্য হইল যে, আমি ভ্রমে পড়িয়া ইংরেজী অনার্স পরীক্ষা দিয়াছি। অনার্সে ৪০০ নম্বরের মধ্যে পাসের জন্য অন্ততঃ ১০০ রাখিতে হয়; পাস কোর্সে দর্শনে এবং ইতিহাসে প্রত্যেকটীতে ২০০ মধ্যে ৬০ আবশ্যক। আমার ধারণা ছিল, আমি যদি অনার্স নাও পাই, পাসের ১০০, এবং অন্য দুই বিষয়ে ৬০+৬০=১২০, মোট ২২০ নম্বর থাকিবে, এবং তাহা হইলে আমি পাস করিয়া যাইব। এক বন্ধু বলিলেন, অনার্স না থাকিলে পরীক্ষার্থী ইংরাজীতে (বা অন্য বিষয়ে) যে নম্বর পাইবে, তাহার শতকরা ৬০ নম্বর মোট নম্বরের (aggregate) সহিত যোগ করা হইবে। আমি শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম; রেজিষ্ট্রারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনিও তাহাই বলিলেন।

কিন্তু আমার অজ্ঞানতা হইতে ভগবান্ আমার কল্যাণই করিলেন। পূর্ব্বে ঐ নিয়ম জানা থাকিলে আমি অনার্সে পরীক্ষা দিতাম না।

ইতিহাসে উত্তীর্ণ হইবার আশা এত ক্ষীণ বোধ হইল যে, ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে ঘোর সমস্যায় পড়িলাম। একবার ভাবিতেছি, বি. এ. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে আর পড়িব না। পাঁচ বৎসর সংগ্রামের পরে মিলনের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে; বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইবার পরে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবকদিগের মতেও যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ বি. এ. ফেল্ যুবকের সম্মুখে আশা ভরসাই

বা কি আছে? এ অবস্থায় সংসারী হইবার কল্পনাতেও গা শিহরিয়া উঠিতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দাদাকে পত্র লিখিয়াছিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি যদি আবার বি. এ. পড়ি তবে তিনি আমার পড়ার খরচ দিবেন কি না? উত্তরে তিনি লিখিলেন, "বিবাহ না করিলে তিনি পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।" এদিকে আমি চারি স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আবেদন পাঠাইলাম, এবং বাঁকুড়া জেলায় এক গ্রাম্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্ম পাইলাম।

বরিশালের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত কলিকাতায় আছেন, এই সংবাদ পাইয়া শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে একটা কাজ পাইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। অশ্বিনীবাবু বাড়ী ছিলেন না, এজন্য দেখা হইল না। নয় বৎসর পরে বরিশালে তাঁহার দর্শন পাই।

রোগভোগ

১লা ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসাধনাশ্রম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী নিদারুণ শোকের আঘাতে বিষয়কর্ম্মের প্রতি বিরাগী হইয়াছিলেন। তিনি সাধনাশ্রমের পরিচারক হইবার অভিপ্রায়ে ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন, এবং সমাজপাড়ায় তাঁহার শাশুড়ীর গৃহে উঠিলেন। সে দিন মধ্যাহ্নে আমিও সেখানে আহার করিলাম। আহারান্তে দেখিলাম আমার কাঁধে দুইটী জলবসন্তের গুটী দেখা দিয়াছে। আমাদের ছাত্রাবাসে পৌষ

মাসে ইন্দুভূষণ সেনের প্রথম জলবসন্ত হয়। সতীশ তাহার শুশ্রূষা করিত, তুই এক দিন পরীক্ষা দিয়া সতীশও ঐ রোগে আক্রান্ত হইল, তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। সে আর আমি এক ঘরেই থাকিতাম। তারপর আমি পড়িলাম। জুন মাস পর্য্যন্ত আমাদের বাসায় জলবসন্তের বহর চলিয়াছিল।

তৃতীয় দিন আমার প্রবল জ্বর আরম্ভ হইল। সারাদিন যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বকুনিও চলিল। সন্ধ্যার পরে গুরুদাসবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও স্বর্ণলতা দেখিতে আসিলেন। দিনের বেলায় তেতলার ঘরে গরমে অসহ্য কষ্ট হইত, এজন্য সমস্ত দিন একতলার আমাদের প্রথম বাসের ঘরে থাকিতাম, হাওয়ার খাতিরে রাত্রিতে নিজের কক্ষে শয়ন করিতাম। সতীশ বিছানা বালিশ বহিয়া নীচে লইয়া যাইত, আবার উপরে লইয়া আসিত। সে প্রায় তিন সপ্তাহকাল আমার যেরূপ অক্লান্ত সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিল, তাহার তুলনা বিরল। ক্রমশঃ জলবসন্তের গুটী সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। প্রথমে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে ডাকা হইল; তিনি দেখিয়া বলিলেন, "মাঝে মাঝে আসল বসন্ত আছে।" তারপরে ক্যাম্বেল স্কুলের প্রসিদ্ধ ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় আসিলেন; তিনি বলিলেন, 'virulent type of chicken pox হইয়াছে।' তাঁহার চিকিৎসাতেই আরোগ্যলাভ করিলাম।

পরীক্ষার ফল

সেকালে পরীক্ষার্থীদিগের নাম "উত্তীর্ণ" ও "অনুত্তীর্ণ" চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া কলেজে কলেজে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। ২৬এ এপ্রিল এইরূপে ফল প্রকাশিত হইবার সংবাদ পাওয়া গেল।

পূর্ব্ব রাত্রিতে বিবাহের প্রসঙ্গে বিজয়বাবু বলিলেন, "এখন বোধ হয় বিবাহ করিবার সুবিধা হইবে না।" আমি উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" তিনি বলিলেন, দশ এগার দিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড্ক্লার্ক গগনবাবুকে জানাইয়াছেন, সিটী কলেজ হইতে রজনী গুহ কি অন্য কোন ছাত্রই ইতিহাসে উত্তীর্ণ হয় নাই। সমস্ত রাত্রি মনের অকথ্য যন্ত্রণায় নিদ্রা হইল না। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পরেই গগনবাবুকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কথাটা সত্য কি না? তিনি গোপনীয় সংবাদ প্রকাশের জন্য বিজয়বাবুকে গালাগালি করিলেন। বিবাহের কথা তুলিতেই বলিলেন, "এখন বিবাহ কি? বি. এ. পাস না করিলে তো কেহ gentleman (ভদ্রলোক)ই হয় না।" সেখান হইতে বাহির হইয়া গুরুদাসবাবুকে আমার ফেলের খবর দিলাম, তিনি কথাটা কাণে তুলিলেন না। পরিশেষে সমাজপাড়ায় যাইয়া স্বর্ণলতা ও তাঁহার মাতাকে এই দুঃসংবাদ জানাইলাম। মাতা আশ্বাস দিয়া দুপুরে সেখানেই আহার করিতে অনুরোধ করিলেন; আমি রহিয়া গেলাম; এবং আকুলচিত্তে প্রাণ ভরিয়া গাহিলাম, "জানি তুমি মঙ্গলময়।" দুইটার সময় নরেন্দ্রকে পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সিটী কলেজে পাঠাইলাম; বলিয়া-দিলাম, যদি ফেল হইয়া থাকি, আমাকে গোপনে বলিবে, এবং আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে সংবাদটা প্রকাশ করিবে। সে এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া, আমাকে দরজার কাছে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মুখ কালো করিয়া বলিল, "যা ভাবিয়াছিলাম, তাই; আপনি ফেল হইয়াছেন, শ্রীরঙ্গবাবু, সতীশ রায়, সুরেশবাবু, হেম দিদি, সকলেই ফেল হইয়াছেন, একা ললিতবাবু পাস করিয়াছেন।" আমি পলাইব কি, দুই পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, অবশ হইয়া

বসিয়া পড়িলাম। একটু পরে শুনি, নরেন বলিতেছে, "Second Divisionএ পাশ করিয়াছেন।" কিন্তু আমার প্রত্যয় হইল না, "কৃষ্ণবাবুর নিকট হইতে লিখিত চিঠি লইয়া এস"—এইরূপ বলিয়া তাহাকে বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে আবার সিটী কলেজে পাঠাইলাম। কৃষ্ণবাবু লিখিলেন, "Yes, you have passed with Honours, and been placed in the Second Division." তখন স্বর্ণলতা ও আমি একত্র প্রার্থনা করিলাম। "নিরাশার গভীর গর্ত্ত হইতে তিনি কেমন আশ্চর্য্যরূপে আমায় সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুলিয়াছেন! আমার যাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় নাই, তাহাই হইয়াছে। ধন্য তাঁর করুণা, ধন্য তাঁর করুণা।" (ডাএরী)

বিবাহের উদ্যোগ

সায়ংকালে দাদাকে তার করিলাম—Passed with Honours. Permit notice. (অনার্সসহ পাস করিয়াছি, বিবাহের নোটীস দিবার অনুমতি দিন)। এক সপ্তাহের মধ্যে কোনও উত্তর আসিল না। বরকন্যার হিতৈষিবর্গ আর অপেক্ষা করা উচিত বোধ করিলেন না। ২রা মে সোমবার (২১এ বৈশাখ) পূর্ব্বাহ্নে ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে চৌধুরীপরিবারের বাসভবনে উপাসনান্তে নোটীস দেওয়া হইল। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তিনি নিজের হাতে একখানা অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন, আমরা দুই জন তাহা স্বাক্ষর করিলাম। উহার মর্ম্ম এই—বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটিলে অদ্য হইতে তিন মাসের মধ্যে আমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইব।

সেই দিনই দাদাকে আবার তার করিলাম—Notice given. Permit your name in invitation letter (নোটীস দেওয়া হইয়াছে। নিমন্ত্রণপত্রে আপনার নাম দিতে অনুমতি দিন।) বিবাহে কি অর্থসাহায্য করিবেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি নিমন্ত্রণপত্রে তাঁহার নাম দিতে অনুমতি দিলেন, এবং জানাইলেন, দুই বারে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইবেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬এ মে, বৃহস্পতিবার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কন্যার বিবাহে আসিতে পারিবেন না; সুতরাং কন্যাপক্ষের যাবতীয় কর্ত্তব্যের ভার গুরুদাস বাবুর উপরে পড়িল। পিতা সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলেন—যাহা না করিলে নয়, তাহারই উদ্যোগ চলিতে লাগিল। প্রীতিভোজন হইবে না, সুতরাং হাঙ্গামা অনেক কমিয়া গেল। বরপক্ষে করণীয় অত্যল্প, নিমন্ত্রণপত্র ছাপাইয়া বিলি করা—এইটীই প্রধান কাজ। আমাকে সাহায্য করিবার জন্য ভাই সতীশচন্দ্র গৌহাটী হইতে আসিলেন।

বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার তিনটী আকিঞ্চণ ছিল—প্রথম, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিবেন; দ্বিতীয়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত রেজিষ্ট্রার থাকিবেন; তৃতীয়—ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। একটা দুর্ঘটনার জন্য তৃতীয় অপূর্ণ রহিল।

মার্চ্চ মাসে সাধনাশ্রম ৪৫।৩ বেনেটোলা লেনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাটীতে আমাদের আবাসের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; গুরুদাসবাবু সেখানে বাস করিতেন। ঐ বাড়ীর প্রায় সংলগ্ন ৪৫নং বাড়ীর দ্বিতলে গগনবাবুদিগের মেস ছিল। তাহার বৃহৎ কক্ষটী (Hall) বিবাহের জন্য চাহিয়া লওয়া হইল।

বিবাহ

প্রথমে ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দের আত্মচরিত হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার পরম স্নেহাষ্পদ ছাত্র শ্রীমান্ গগনচন্দ্র হোম ও শ্রীমান্ রজনীকান্ত গুহের শুভ বিবাহ উপলক্ষে আমি কলিকাতায় আহূত হইলাম। যদিও নানারূপ বাধা ছিল, তথাপি উহাদের স্নেহের আকর্ষণ কাটাইতে পারিলাম না। বাবু কেদারনাথ চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতার সহিত রজনীকান্তের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কন্যাটী ২।৩ বৎসর আমাদের পল্লীতে ছিলেন, আমি ইঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম এবং ইঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য যত্ন করিতাম। বস্তুতঃ এই পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ আমাকে অতিশয় ভালবাসিত; আমার প্রতি অনেক নির্ভর করিত। ওদিকে শ্রীমান্ রজনীকান্ত আমার প্রিয় ছাত্র ও প্রেমানুগত; তাই উভয়ের সম্মিলন আমার আনন্দের বিষয় হইয়াছিল।" (৩৩৯ পৃঃ) পণ্ডিত মহাশয়ের আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ কালীনাথ দত্তের কন্যার সহিত গগনবাবুর বিবাহোপলক্ষে আমরা এক বৃহৎ বরযাত্রীর দল মজিলপুর গ্রামে গমন করি। রাত্রি বারটার পর শুভলগ্নে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় দুইটার সময় প্রীতিভোজন করিয়া ঘণ্টা তিন ঘুমাইয়া আমরা কয়েক জন প্রভাত কালেই কলিকাতায় যাত্রা করি। তখন জয়নগর মজিলপুর পর্য্যন্ত রেলপথ হয় নাই; মগ্‌রা হইতে শালতীতে যাতায়াত করিতে হইত।

বৃহস্পতিবার। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

"অপ্রস্তুত ও সঙ্গতিহীন অবস্থায় বিবাহ হইতেছে; মন ভারাক্রান্ত; পূর্ব্ব রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না। সকালে উপাসনা ও গীতা পাঠ করিলাম। একজন বন্ধু আজিকার দিন বিশেষ ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইতে বলিলেন। তেমন ভাবে তাহা পারিলাম না। নিজেকে অনেক কাজ কর্ম্ম দেখিতে হইল। বিবাহের সময় অনেক বিশৃঙ্খলা হইবে বলিয়া ভয় ছিল; তাঁহার করুণায় শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যার সময় আমাদের বাসায় শ্রীনাথবাবু উপাসনা করেন। তারপর ৪৫।৩নং বাটীতে যাই, সেখানে রেজিষ্ট্রীর কাজ হইয়া গেলে ৪৫নং বাড়ীতে বিবাহের আসরে গমন করি। হলটী ঝাড় দেওয়ালগির প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। উপস্থিত নরনারীর সংখ্যা অনুমান ২৫০ ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা বেশ লাগিয়াছিল।" (ডাএরী) আমাদিগের মিলিত প্রার্থনায় একটু বিশেষত্ব ছিল, এজন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বরকন্যার মিলিত প্রার্থনা।

হে সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর, অদ্য আমরা তোমার পবিত্রসন্নিধানে পরস্পরের সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম। তুমি যেমন কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে পবিত্র প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিলে, কত বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া আনয়ন করিয়া আমাদিগকে সম্মিলিত করিলে এবং আজ আমাদিগের মস্তকে গুরুতর কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিলে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এই বিপৎসঙ্কুল সংসারে তোমার কৃপায় এই ভার সমুচিতরূপে বহন করিতে সমর্থ হই। তোমার প্রীতির জন্য

ও জগতের হিতের জন্য যেন আমাদের জীবন যাপিত হয়। অদ্য আমরা বিশেষভাবে তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি তুমি আমাদের জীবন-পথের রক্ষক ও সহায় হও।

"শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অত্যন্ত সারবান্ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অনেকের মত, এরূপ জ্বলন্ত উপদেশ খুব অল্প বিবাহেই প্রদত্ত হইয়াছে।" উহা সংক্ষিপ্তাকারে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিবাহক্রিয়া শেষ হইলে নিমন্ত্রিতগণ জলযোগ করেন। আমরা ৪৫।৩ নং বাড়ীতে আহার করি। স্বর্ণলতার মাতা ঐখানে আসিয়াই ভেদবমিতে পীড়িত হইয়া বাসভবনে ফিরিয়া যান; শ্রীমতী জয়াবতী চক্রবর্ত্তী স্বর্ণলতার মায়ের কাজ করেন। আহারান্তে বরকন্যা এক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ঝি সঙ্গে করিয়া ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাটীতে গমন করেন। দরজা হইতে ঝি বিদায় লইল; তাঁহারা দুই জন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া তেতালায় উঠিয়া দেখিলেন, বাড়ীর সকলে নিদ্রায় অচেতন; তখন নিঃশব্দে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভূমিতে একখানা নূতন ও একখানা পুরাতন তোষকের শয্যা প্রস্তুত আছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

"এই বিবাহে গুরুদাস বাবু খুব খাটিয়াছেন। তিনি এসময়ে অগ্রসর ও উদ্যোগী না হইলে বিবাহ হওয়া কঠিন হইত। পণ্ডিত মহাশয় নিজের স্নেহের আকর্ষণে ময়মনসিংহ হইতে আসিয়া আমাদের কত উপকার করিয়াছেন; তাঁহাকে অনেক খাটিতে হইয়াছে। বিবাহের পরে তিনি আমাদিগকে লইয়া তিন দিন উপাসনা করিয়াছেন, পূর্ব্বেও করিয়াছেন। তিনি না আসিলে অনেক অসুবিধা হইত। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় অনেকগুলি টাকার কাজ

চালাইয়া দিয়াছেন। নবদ্বীপ বাবু অযাচিতভাবে খুব স্নেহ দেখাইয়াছেন। সতীশের কথা আর বলিব কি? সে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও বিবাহের সময়ে উপদেশটী যথাসাধ্য লিখিয়া লইয়াছিল। বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, নিবারণচন্দ্র রায় প্রভৃতিও সাহায্য করিয়াছেন।" (ডাএরী)

বিবাহের ব্যয় বাবদে দাদার নিকটে পঞ্চাশ টাকা পাইলাম। মধ্যম দাদা বাড়ী হইতে "কষ্টেসৃষ্টে" দশ টাকা পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দশ টাকা ধার দিলেন। বৃত্তির কয়েকটা টাকা ছিল। আমার আন্দাজ আশী টাকা লাগিয়াছিল।

অপর পক্ষে বোধ হয় এতশত টাকা ব্যয় হইয়াছিল। স্বর্ণলতার একজোড়া সোণার বালা ও ইয়ার-রিং ছিল, তাহাই কন্যার আভরণ হইল। আশীর্ব্বাদী টাকা দিয়া তিনি একটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক কিনিলেন ও আমাকে একটা ঘড়ী (watch) উপহার দিলেন।

"Coming events cast their shadows before—আসন্ন ঘটনা সম্মুখে ছায়াপাত করে।

বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের উভয়ের মনে ভাবী বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছিল। মিলনোৎসবের পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে আমার মনে হর্ষ ও বিষাদ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক (বি. এ.) কে প্রধান শিক্ষক ও আমাকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। বেতন যথাক্রমে চল্লিশ

ও ত্রিশ টাকা। স্থির থাকিল যে আমি বিবাহের পরে কর্ম্মে যোগ দিবার অধিকারী হইব।

শুভকর্ম্মের পরে আমরা চারি দিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিয়া কয়েক দিন বেনেটোলায় গুরুদাস বাবুদের আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তারপর শাশুড়ী ঠাকুরাণী রামকৃষ্ণ দাসের লেনে উঠিয়া গেলে তাঁহার নিকটে প্রায় তিন সপ্তাহ কাটাইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংসারে প্রবেশ ও অধ্যয়ন

জুন মাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১০।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শঙ্কর ঘোষের লেনে) এক বৃহৎ বাটী সাধনাশ্রমের জন্য ভাড়া করিলেন। স্থির হইল, তাহাতে আশ্রমের পরিচারকগণ সপরিবারে বাস করিবেন। শ্রীরঙ্গবিহারী লাল, সতীশ ও আমি সহায়শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলাম; আমরাও থাকিব। ঐ মাসের মধ্যভাগে একই দিনে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও কাশীচন্দ্র ঘোষাল স্ত্রীপুত্র লইয়া নব গৃহে উপস্থিত হইলেন, আমিও স্বর্ণলতার সহিত আসিয়া নূতন সংসার তাঁহাদিগের সহিত আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক বিক্রমপুরের এক সাধনানুরাগী ব্রাহ্মও সপরিবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভিতর বাড়ীর দোতালার ঘর কয়টীতে এই চারি পরিবার থাকিতেন, বাহিরের দ্বিতল গ্যালারী ঘরে শ্রীরঙ্গ ও সতীশ থাকিতেন, শাস্ত্রী মহাশয়ও মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রি যাপন করিতেন। দুই বেলার আহার সকলের একত্র নির্ব্বাহিত হইত; কাশী বাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে গৃহস্বামী একটী নূতন উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, প্রতিদিন প্রাঃতকালে তথায় উপাসনা, এবং সায়ংকালে কীর্ত্তন আলোচনা প্রভৃতি হইত; শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যহই আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আমি প্রাতঃকালে সপ্তাহে একদিন উপস্থিত থাকিতাম।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় খুলিবার দিন কৃষ্ণ-প্রসাদ বাবু ও আমি যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলাম। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়া সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলেন, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী তাঁহার স্থলে নিয়োজিত হইলেন।

১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় এবং সাধনাশ্রমের মধ্যে ব্যবধান খুব অল্প; সুতরাং স্কুলের কাজ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না। আমাদের ঘরটী পূর্ব্বপশ্চিমে খোলা, আলো বাতাসে আরামদায়ক ছিল; ভাড়া দিতে হইত মাসে দশ টাকা। সতীশের ও আমাদের হিসাব একসঙ্গে থাকিত। তিন জনের খাওয়া খরচ বাবদ লাগিত মাসিক বার টাকা, সতীশকেও ঘরভাড়ার জন্য কিছু দিতে হইত। স্কুল হইতে পাইতাম মাসে ত্রিশ টাকা, সতীশ আমার হাতে দিত সাত আট টাকা, ইহাতে সংসার চলিয়া যাইত।

জুন মাসের গোড়া হইতে আমি এম্. এ. পরীক্ষার পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম জুলাই মাস হইতে কিছুদিন General Assembly's Institutionএ এডোয়ার্ড সাহেবের নিকটে Anglo-saxon পড়িয়া-ছিলাম, স্কুলের কাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল। পঠিতব্য গ্রন্থ যে কয়খানা সংগ্রহ করিতে পারিলাম, করিলাম, বাকি সমস্তই কয়েক মাস একটী ছেলে পড়াইয়া কিনিয়াছিলাম।

গৃহে গমন

মাতাঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, আমি হিন্দুসমাজে বিবাহ করি। কিন্তু যখন দেখিলেন, আমি তাহাতে কোনক্রমেই সম্মত হইলাম না, এবং পরিশেষে যখন স্বর্ণলতার সহিত বিবাহের জন্য তাঁহার অনুমতি

প্রার্থনা করিলাম, তখন তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন, এবং বিবাহ হইয়া গেলে পূজার অবকাশে বধূসহ বাড়ী যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। এই সময়ে আমার মাসতুতো ভাই শ্রীমান্ কৃষ্ণলাল চৌধুরী সিটী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিত। সে বাল্যকাল হইতেই আমার প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং আমাদের নিকটে প্রায়শঃই আসিত। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, আমরা টাঙ্গাইল হইয়া বাড়ী যাইব। ২৫এ সেপ্টেম্বর রাত্রির গাড়ীতে উঠিয়া আমরা পরদিন প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ পঁহুছিলাম, এবং ধলেশ্বরী সার্ভিসের ষ্টীমার ধরিয়া দুপ্রহরে এলাসিন গ্রামে উপনীত হইয়া টাঙ্গাইল হইতে মেশোমহাশয় যে নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আরোহণ করিলাম। সেখানে যাইতে রাত্রি প্রায় ৯টা হইল। মাসীমারা আমাদের যথেষ্ট যত্ন করিলেন। তাঁহাদের গৃহে রাত্রি ও পরদিন অপরাহ্নে প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত পীতাম্বর ও রাধানাথ ঘোষ মহাশয়গণের পরিবারবর্গের সাদর নিমন্ত্রণে তাঁহাদিগের বাড়ীতে প্রায় দুই ঘণ্টা কথাবার্ত্তায় যাপন করিলাম; সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বাড়ীপানে নৌকা ছাড়িল, কিন্তু বৃষ্টির জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এলেঙ্গার দক্ষিণে এক নির্জ্জন মাঠের ধারে মাঝিরা রাত্রিতে নৌকা বাঁধিল। তাহারা দুই জন; বিপদের আশঙ্কায় মন আন্দোলিত হইয়াছিল; সঙ্গে ছিল একখানা বড় ছুরী। ভগবানের কৃপায় রাত্রি নিরাপদে কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে লৌহজঙ্গ নদী ছাড়িয়া পালিমার খাল ধরিয়া নৌকা মাঠে পড়িল; খাল বিল মাঠ জলে একাকার, প্রায় সরল পথে আমরা জামুরিয়ার দিকে চলিলাম। এক জেলের নিকটে যথেষ্ট মাছ পাওয়া গেল; স্বর্ণলতা রান্না করিলেন, মাধ্যাহ্নিক আহার পরিপাটী

হইল। প্রায় চারিটার সময় নৌকা কালীবাড়ীর ঘাটে লাগিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে মূষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, তখন একটু কমিয়াছে, কিন্তু থামে নাই; দেখি মা দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘাটের দিকে আসিতেছেন; কি করিয়া আমাদের আগমনের সংবাদ পাইলেন, বুঝিতে পারিলাম না। মা পরম সমাদরে নবদম্পতীকে গৃহে তুলিয়া লইলেন। তারপরে আর যাও কোথায়? সেদিন নবমী পূজা, পশ্চিম বাড়ীতে বহু লোক জড় হইয়াছে। দলে দলে ইতরভদ্র নরনারী কলিকাতার নূতন বৌ দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। একদল গেল, স্বর্ণলতা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দর্শন দিয়া ঘরে আসিয়া সবে বসিয়াছেন, অমনি আর একদল আসিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ, মালী মাঝি, পুরুষ স্ত্রীলোক, বালক যুবক বৃদ্ধ—কয়েক দিন ধরিয়া সকলেই আসিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া গেলেন। ভিন্ন গ্রাম হইতে কিশোরবয়স্ক ছাত্রেরাও বর্ষার পথক্লেশ গ্রাহ্য করিল না।

বাড়ীতে মধ্যম দাদার নবপরিণীতা পত্নীকে দেখিলাম; বালিকা, বয়স বার বৎসর, আষাঢ় মাসে বিবাহ হইয়াছিল। আমার সম্মুখে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন। ছোট দিদি পুত্রকন্যা লইয়া আসিলেন; বড় দিদি কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। অনুগত কনিষ্ঠ সহোদর রমণীও ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে। মা এবং ভাইবোনদিগের আদরযত্নে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অনাবিল আনন্দে কাটিয়া গেল।

স্নেহের আতিশয্যে মা লৌকিক আচার ভুলিলেন না। আমরা স্বামীস্ত্রী দুইজন শয়ন ঘরে স্বতন্ত্র আহার করিতাম; এক মালিনী উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিত ও থালাবাটী ধুইয়া দিত। মধ্যম দাদা ও রমণী

পাকঘরে খাইতেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে কদাপি দুই ব্রাহ্ম পুত্রের সঙ্গে এক ঘরে খাইতে দেন নাই।

অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এক শুক্রবার আমরা পূর্ব্বাহ্নে আহার করিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম। যাত্রার সময়ে মা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ জ্যেঠামহাশয়ের নির্বাক গভীর স্নেহের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। সকাল বেলায় গৃহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগের মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল উঠানে বসিয়া রহিলেন; নৌকায় উঠিবার কালে ঘাটের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এইবার তাঁহার শেষ দর্শন পাইলাম। তিন বৎসর পরে তিনি পরলোক গমন করেন।

ছোট দিদি ও মধ্যম দাদা আমাদিগের সহিত শিয়ালখোল পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে নিকলা গেলেন। ডুলীতে উঠিবার পূর্ব্বে দিদি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ কিরূপ আত্মহারা হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভুলিতে পারি নাই। রমণী আমাদিগকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা নদীর চড়ায় ঠেকিয়া গেল; জল কমিয়া গিয়াছিল, দুই মাঝি ও আমরা দুই ভাই প্রাণপণে টানাটানি করিয়াও নৌকা অগ্রসর করিতে পারিলাম না, অগত্যা ঘুরিয়া অন্য নদীতে যাইতে হইল। পথে এক স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের নৌকা বিশাল যমুনা নদীতে পড়িল। সুবর্ণ-খালীর ষ্টীমারঘাটে যাইতে হইলে কিয়দ্দূর প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে হয়; এই সময়ে মাঝিদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, এবং অকস্মাৎ নৌকাডুবির বিপদও স্বর্ণলতাকে ভীত

করিয়াছিল। প্রায় এগারটার সময় আমরা ষ্টীমার পাইলাম। রমণী হাঁটিয়া শিয়ালখোল যাইয়া হাটের নৌকায় সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যূষে শিয়ালদহ পৌঁছিয়া দেখি, সতীশ উপস্থিত। আমরা তাহাকে সংবাদ দিতে পারি নাই।

বাড়ীতে যাতায়াতে ২৭৲ সাতাইশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৩৲ তের টাকা বাড়ী হইতে পাইয়াছিলাম।

আমি ইংরেজী অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ষষ্ঠ হইয়াছিলাম। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় নূতন নিয়ম করিলেন, পরীক্ষার্থী দুই টাকা দিলে প্রত্যেক বিষয়ের নম্বর জানিতে পারিবে। বাড়ী হইতে আসিয়া নম্বর আনাইয়া দেখিলাম, আমি যদি শব্দতত্ত্ব (Philology) একেবারে উপেক্ষা না করিতাম, এবং ইংরেজীসাহিত্যের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িতাম, তবে নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইতাম। এখন হইতে তিন মাস ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, যাহাতে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এম্. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, এরূপ একটা উপায় হয় কি না।

নবেম্বর মাস হইতে আমরা পরিচারকগণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সংসার আরম্ভ করিলাম ; সতীশ আমাদের সঙ্গে রহিলেন। রন্ধনাদি সকল প্রকার শারীরিক শ্রমের কার্য্য স্বর্ণলতাকে একাকী করিতে হইত, তিনি প্রফুল্লচিত্তে সমস্ত করিতেন।

১লা ডিসেম্বর সাধনাশ্রমের উৎসব। প্রাতঃকালে উপাসনা, ও আলোচনা, এবং বৈকালে বিডন স্কোয়ারে প্রচার হইল। সন্ধ্যার পর খুব জমাট উপাসনা হইল, পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল প্রার্থনা উত্থিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল পরিচারক হইবার

সংকল্প প্রকাশ করিয়া আবেগপূর্ণ প্রার্থনা করিলেন। পাঞ্জাব হইতে আগত ভাই প্রকাশ দেব ও সুন্দর সিংহ এবং একটী বাঙ্গালী যুবক সংকল্পাধীন পরিচারকরূপে গৃহীত হইলেন। আমি প্রার্থনা পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলাম, একজন পরিচারকের আহারের ব্যয়ভার বহন করিব। সেই রাত্রিতেই কর্ম্মাধ্যক্ষের হাতে চারিটী টাকা দিলাম। ১৮৯৫ সনে নিজের ও পুত্রের গুরুতর পীড়ার দরুণ ঋণের দায় বাড়িয়া যাওয়াতে এই সংকল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

একদিন গুরুদাসবাবু ও কাশীবাবু প্রভৃতির সহিত পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে গেলাম। গুরুদাস বাবু আমার পরিচয় দিলেন, আমি আশ্রমের সহায়। তৎক্ষণাৎ মহর্ষি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তবে আশ্রমের সাধকদিগের সাধনে সহায়তা কর?" আমার মুখ দিয়া কথা সরিল না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নীরব রহিলাম। তখন গুরুদাসবাবু কি একটা বলিয়া আমাকে বাঁচাইলেন।

এই বৎসরের (১৮৯৩) মাঘোৎসবের স্মরণীয় ঘটনা ১২ই মাঘ সাধনাশ্রমের উৎসব। সে রকম দৃশ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে পূর্ব্বে বা পরে আর দেখা যায় নাই। সাধনাশ্রমের স্থাপনাবধি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে একটা মতবৈষম্য চলিয়া আসিতেছিল। অনেকে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি একনায়কত্বের ভিত্তিতে একটা কিছু করিতে যাইতেছেন। সমাজের কর্তৃপক্ষ সাধনাশ্রমের অনুরূপ সেবকমণ্ডলী নামে প্রতিদ্বন্দ্বী পরিচারকদলও গঠন করিয়াছিলেন। বহুল আলোচনার পরে একটা নিষ্পত্তি দাঁড়াইল। সাধনাশ্রম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইল; প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, একনিষ্ঠ সেবক

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাধনাশ্রমে পরিচারকরূপে যোগ দিলেন। নির্দ্ধারিত হইল যে, ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা অর্থাৎ উদ্বোধন ও আরাধনার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, নবদ্বীপবাবু, আদিনাথবাবু, কাশীবাবু, গুরুদাস বাবু ও ভাই প্রকাশ দেব এই ছয় জনকে পরিচারক পদে অভিষিক্ত করিবেন।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বেদির সম্মুখে অনুচ্চ মঞ্চের উপরে মহর্ষির জন্য একখানা কেদারা ও পরিচারকগণের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা শেষ করিয়া বেদি হইতে নামিয়া আসিলেন, ক্ষণকাল পরেই মহর্ষি আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি একে একে শাস্ত্রী মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পরিচারককে নাম ধরিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক মস্তকে হস্ত রাখিয়া পরিচারক-পদে বরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন শাস্ত্রী মহাশয় পুনশ্চ বেদিতে উঠিয়া এক জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী উপদেশ দিলেন। উপদেশ শেষ হইবামাত্র এক মহিলা নিজের অনন্ত খুলিয়া আচার্য্যের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে মাথায় রাখিয়া উপাসকবৃন্দকে দানের কথা জানাইয়া দিলেন। তৎপরে বালা, চুড়ি, হার প্রভৃতি অলঙ্কার এবং শাল, আলোয়ান, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত হইতে লাগিল। শাস্ত্রী মহাশয় বেদি হইতে অবতরণ করিলেন, বেদির সম্মুখে প্রমত্ত কীর্ত্তন ও আকুল প্রার্থনা চলিতে লাগিল; দানের বস্ত্রগুলি স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল, সুন্দর সিংহজী সেগুলি মাথায় লইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও ভাবাবেশে আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না, প্রথমে মোজা ও

পরে উপহারপ্রাপ্ত আলোয়ানখানা কীর্ত্তনদলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম। হঠাৎ প্রকাশ দেবজী আমাকে ধরিয়া মাঝখানে লইয়া গিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর আপকো চাহতে হ্যাঁয়।" আমি চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঝাঁপ দিতেও সাহস হইল না। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও কেহ কেহ সাধনাশ্রমের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। প্রায় বারটার সময়ে এই অভিনব দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইল।

ফেব্রুয়ারী মাসে সাধনাশ্রম ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট প্রচারাশ্রমে স্থানান্তরিত হইল। গুরুদাসবাবু কোনও কারণে তাঁহার পরিবার সেখানে রাখিতে চাহিলেন না; তিনি ও আমি ১০৮, আপার সার্কুলার রোডের বাড়ী ভাড়া করিলাম। বাড়ীটী দুই খণ্ডে বিভক্ত, নম্বর এক হইলেও বস্তুতঃ দুইটী স্বতন্ত্র বাড়ী, বেশ খোলামেলা, সম্মুখে প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ভাড়া মাসে চল্লিশ টাকা, পশ্চিমের খণ্ড আমরা রাখিলাম, পূর্ব্বের খণ্ডে স্বর্ণলতার মাতা পুত্রকন্যাসহ রহিলেন। ভাড়া যথাক্রমে ২২৲ ও ১৮৲ ধার্য্য হইল। আমাদের সঙ্গে একতলার বাহিরের ঘরে বাবু মহেশচন্দ্র ভৌমিক ও তাঁহাদের কাঠের দোকানের একটী কর্ম্মকারক বাস করিতেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে পড়াশুনা বিষয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত না হইলেই নয়। অনন্যকর্ম্মা হইয়া পড়িতে পারিলে আট নয় মাস সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া সুফল লাভ করিতে পারিব, অন্তরে এই আশা জাগিয়াছে; কিন্তু দিন চলিবার উপায় কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া দাদাকে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ১৩ই কি ১৪ই তারিখ পত্র লিখিলাম। এই সময়ে আমি লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে মাসিক দশ টাকা বেতনে এক

ঘণ্টা ইংরেজী পড়াইতাম। দাদাকে তাই বলিলাম, আমাকে মাসে পঁচিশ টাকা দিলে আমাদের সংসার চলিয়া যাইবে। পূজনীয় হেরম্ববাবুও আমার হইয়া দাদাকে পত্র লিখিলেন, বলিলেন, রজনী ভাল করিয়া পড়িতে পারিলে উত্তম ফল লাভ করিবে। দাদা কোন পত্রেরই উত্তর দিলেন না। এ দিকে রাখালবাবুর কন্যাটী এক মাস পূর্ণ না হইতেই বিবাহের জন্য বরিশালে চলিয়া গেল। চাকুরী ছাড়িলে এক পয়সাও সম্বল থাকে না, অথচ কর্ম্মত্যাগের নোটীশ দিবার সময়ও চলিয়া যাইতেছে। কিছুদিন দাদার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাঁহাকে তার করিলাম, বোধ হয় prepaid করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, "Come deck with books; buy others after arrival"—"পুস্তক লইয়া জাহাজের ডেকে চড়িয়া এখানে এস, বাকী বই আসিয়া কিনিবে।" কলিকাতা ছাড়িয়া সুদূর বহরমপুরে থাকিয়া আমার এম্. এ. পড়ার সুবিধা হইবে, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হইল না; স্বর্ণলতা কোথায় থাকিবেন, তৎসম্বন্ধেও কোন আলোক পাইলাম না। আমি যথারীতি নোটীশ দিয়া ১৮ই মার্চ্চ হইতে কাজ ছাড়িয়া দিলাম।

"কাজ ছাড়িলাম, খাওয়ার সংস্থান কিছু দেখিতেছি না। ...... ভয় হয় বটে, কিন্তু কখনও কি উপবাসে দিন কাটিয়া গিয়াছে? গত জীবন স্মরণ করিলে আর নিরাশ হইতে পারি না। যখন যাহার দরকার পাইয়াছি। কখনই মারা পড়িব না। জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন। তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। অন্নজল তিনি দিতেছেন —দিবেন। যখন টাকার দরকার হইয়াছে, পাইয়াছি। এখন পাইব না? **নিশ্চয় পাইব**। করুণাময়ী মা আমাকে অটল বিশ্বাস দিন।"

"... সংসারে কে আত্মীয়? একমাত্র তিনি। কাহার ভরসা করিব? একমাত্র তাঁহার। কে আহার দিবে? একমাত্র তিনি। তবে আর দুঃখ কি, ভয়ই বা কি? হৃদয়ে অদম্য সাহস আসুক—The Lord is my shepherd, I shall not want."

ডাএরী, ২৫এ মার্চ্চ ১৮৯৩

অকস্মাৎ চৌধুরী পরিবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। ২৮এ ফেব্রুয়ারী পূজ্যপাদ কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় অফিসে যাইবার মানসে পোষাক পরিতে পরিতে সহসা হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি কয়েক শত টাকা ঋণ রাখিয়া গেলেন; বৃহৎ পরিবারের জন্য সম্বল রহিল জীবন বিমার দুই হাজার টাকা। অত্যাবশ্যক ব্যয় বাদে যে হাজার দেড়েক টাকা থাকিল, চৌধুরী মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহা পত্নী, ছয় পুত্র ও চারি কন্যার মধ্যে বিভক্ত হইল। বিবাহিতা দুই কন্যা তাঁহাদের অংশ জননীকে দিলেন, তিনি আমাকে দেড় শত টাকা ঋণ দান করিলেন।

শ্রীমান্ কৃষ্ণলালকে গ্রীষ্মের অবকাশে বাড়ী যাইবার সময়ে বলিয়া দিলাম, মাসীমা যদি আমার এম্. এ. পড়িবার সাহায্যার্থে কিছু টাকা ধার দেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হইব। তিনি পঞ্চাশ টাকা দিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরেজী পড়িবার পথ পাইয়াছিলাম, পড়া সমাপ্ত করিবার কালেও তাঁহার স্নেহানুকূল্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলাম। ১৫ই বৈশাখের (২৭এ এপ্রিল) দৈনন্দিনলিপি হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"মার করুণার পরিচয় পাইতেছি। দেখিতে দেখিতে সকল ভাবনা দূর হইতেছে। টাকার জোগাড় হইয়াছে। কয়েক মাসের জন্য আর ভাবনা নাই। এত করুণা পাইয়াও বিশ্বাসী হইতে

পারিতেছি না। সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে আর ভাবনা কি? বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। চিরদিনের জন্য যেন অটল বিশ্বাস লাভ করিতে পারি।

"সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, সত্য, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌"

এদিকে আমার চোখের অসুখ বাড়িয়া গেল। ১৯এ এপ্রিল হইতে যশস্বী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালীর দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। তিনি ঔষধ সেবন ও পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা দিলেন এবং রাত্রিতে এক ঘণ্টার অধিক পড়িতে নিষেধ করিলেন; আমি মোমবাতি ব্যবহার করিতাম, তাহাই বহাল রহিল। ডাক্তার কালীর ব্যবস্থা পালন করিয়া আমার এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়া সাধ্যায়ত্ত হইয়াছিল। তবে পুষ্টিকর খাদ্য বেশী কিছু জোটে নাই।

বহরমপুর কলেজের গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হইলে দুই বৎসর থাকিবার সর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দাদা অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কটক পর্য্যন্ত বরাবর গোরুর গাড়ীতে আসিয়া চাঁদবালীর ষ্টীমারে কলিকাতায় পঁহুছিয়া আমাদের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিছুদিন পরে গুরুদাসবাবু স্ত্রীপুত্রদিগকে সাধনাশ্রমে লইয়া গেলেন, দোতলার তিন ঘরে আমরা দুই পরিবার রহিলাম।

পড়াশুনার কথা

প্রথম প্রথম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির কাজটা মন্থরগতিতে চলিতেছিল। Taine's History of English Literature, Vol. 1 গত বৎসর ২রা জুন আরম্ভ করিয়া এক মাসে শেষ করিয়াছিলাম;

দ্বিতীয় খণ্ড পড়িলাম নবেম্বর মাসে বার দিনে। ক্রমশঃ গতিবেগ একটু বাড়িল। পাঠ্য ও তদানুষঙ্গিক পুস্তক ব্যতীত শেক্‌সপীয়ারের নাটকগুলি সমস্ত পড়িলাম, ২রা জুন (১৮৯২) হইতে বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট পর্য্যন্ত। স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিবার পরে চক্ষুর বেদনা সত্ত্বেও পাঠ অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের পরে কয়েক মাস প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা ও আহারান্তে ১২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পড়িতাম, রাত্রিতে একঘণ্টার বেশী নয়। অন্নজলের দুশ্চিন্তা থাকিলেও মানসিক উপদ্রব অধিক ছিল না, গৃহিণী কদাপি পাঠে ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতেন না। দুই বার সামান্য জ্বরে ভুগিলাম, কিন্তু স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই ছিল।

পরীক্ষার ফি

আগষ্ট মাসে পরীক্ষার ফি পঞ্চাশ টাকা দাখিল করিলাম; টাকাটা বাড়ী হইতে পাইয়াছিলাম।

পরীক্ষা সম্পর্কে আমি ৫৪ খানা পুস্তক এক বার, ২৪ খানা দুই বার, ২১ খানা তিন বার, ৯ খানা চারি বার এবং ৬ খানা পাঁচ বার পড়িয়াছিলাম। শেষ বারের পাঠ শেষ হইল ১৬ই অক্টোবর, ইহার পরেই, পরীক্ষার ঠিক এক মাস পূর্ব্বে, পাঠের গুরুতর প্রতিবন্ধক ঘটিল।

১৯এ অক্টোবর বৃহস্পতিবার (১৩০০ সাল, ৩রা কার্ত্তিক) আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রত (ডাক নাম মান্তু) ভূমিষ্ঠ হইল। দুই দিন প্রসূতি প্রসববেদনা ভোগ করিলেন, তারপরে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ক্যাম্বেল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণা এক ভদ্র মহিলা ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্বর আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিলে ডাক্তার

সুন্দরীমোহন দাসের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। প্রসূতির শুশ্রূষার জন্য তাঁহার মা, দিদি এবং বড় জা (বৌদিদি) উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু রাত্রিতে আমি ঘরে থাকিতাম, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ঔষধ খাওয়াইতাম। দশ দিন পরে জ্বরত্যাগ হইল। উদ্বেগে ও সমুচিত নিদ্রার অভাবে প্রায় দুই সপ্তাহকাল আমার পড়াশুনা বলিতে গেলে কিছুই হইল না। পরম জননীর কৃপায় স্বর্ণলতা সুস্থ হইয়া উঠিলে আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

২০এ নবেম্বর সোমবার এম. এ. পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সেকালে পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা এক এক প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিতে হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন, নাটক ও কাব্যে একরকম ভালই লিখিলাম। তৃতীয় দিন (Science of Language and Anglo-Saxon) পরীক্ষা দিয়া মন এত খারাপ হইল, যে রাত্রিতে আর বই স্পর্শ করিলাম না। চতুর্থ দিন (গদ্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ) উত্তর লিখিয়া মন আবার প্রফুল্ল হইল। পঞ্চম পত্র (গদ্যসাহিত্য) ও ষষ্ঠ পত্র (রচনা) আশানুরূপ লিখিলাম।

প্রত্যেক প্রশ্নের নম্বর ধরিয়া দেখিলাম, পরীক্ষক ত্রিতয় খুব কঠোরভাবে কাগজ পরীক্ষা করিলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার আশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা একটু ঔদার্য্য দেখাইলে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাওয়াও অসম্ভব নয়।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে সেনেট হলের বারাণ্ডায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের নাম প্রকাশিত হইবার দিন বৈকালে দাদা ও আমি শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মছাত্রাবাসে যাইয়া এক ঘরে বসিলাম। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস দর্শনে পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিও সেখানে ছিলেন; স্নেহাস্পদ

নিবারণ চন্দ্র রায় ফল জানিতে গিয়াছিল। কিছুকাল পরে নিবারণ বারাণ্ডা হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "ললিতবাবু, খাওয়াইয়া দিন, আপনি পাশ করিয়াছেন।" তারপর ঘরে ঢুকিয়া আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "আপনি প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হইয়াছেন।" আমরা দুই ভাই তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া সেনেট হাউসে গেলাম, এবং দেখিলাম সংবাদটা সত্য। আমি বারাণ্ডার নীচে বাগানে বসিয়া জীবনদেবতাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলাম। তৎপরে দুইজন গৃহে ফিরিয়া গেলাম। সায়ংকালে বন্ধুরা আসিয়া অভিনন্দন করিলেন।

আমার এই অপ্রত্যাশিত কৃতকার্য্যতায় ব্রাহ্মসমাজে একটু সারা পড়িয়া গিয়াছিল। সমাজের মুখপত্র Indian Messenger সম্পাদকীয় মন্তব্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কোন কোনও বন্ধুর গৃহে ভোজনের দ্বারা অভ্যর্থিত হইলাম, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইতোমধ্যে পরীক্ষার নম্বর আনাইয়া দেখিলাম, তৃতীয় প্রশ্নপত্র লিখিয়া যে হতাশ্বাস হইয়া শয্যা লইয়াছিলাম, তাহাতে পরীক্ষক দিয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীর নম্বর হইতে ১ কম; আর পরদিন চতুর্থ পত্রের উত্তর দিয়া যে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম সেই পত্রে তাঁহার নিকটে পাইয়াছিলাম, আমার সর্ব্বনিম্ন নম্বর ৫০। পরীক্ষার্থীর আত্মজ্ঞান এই প্রকারই বটে।

একদিন শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সমাদর করিয়া তাঁহার কর্ম্মকক্ষে বসাইলেন; আমার পরীক্ষার নম্বরগুলি দেখিয়া প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করিলেন; কাজকর্ম্ম বিষয়ে হিতকথা বলিলেন, এবং পরিশেষে দর্শনে এম.এ. পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাইলাম।

৩১এ ডিসেম্বর আমরা বার চৌদ্দটী যুবক শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত বেলঘরিয়ার এক বাগানবাড়ীতে গেলাম। রাত্রিতে ও পরদিন প্রাতঃকালে উপাসনাদি হইল। অপরাহ্নে ১লা জানুয়ারী, ১৮৯৪, সকলে নিমতা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

জীবন-সংগ্রাম

১৮৯৪—৯৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তো সমাপ্ত হইল ; এখন অন্নজলের সংস্থান করিবার প্রয়োজন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী ব্রাহ্মবালকনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা এই সময়ে সমাজ পাড়ায় ২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল; গুরুদাসবাবু অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে তাঁহার নিকট হইতে আমি ঐকর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া ২১০।২ নং বাড়ীর একটী ঘর লইয়া স্ত্রীপুত্রসহ সেখানে উঠিয়া গেলাম। আমার পারিশ্রমিক ছিল দুই বেলা আহার ও মাসিক পনর, পরে কুড়ি টাকা।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর কলেজ

কয়েক দিন পরে ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজে একজন ইংরেজীর অধ্যাপকের প্রয়োজন, এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত লইয়া অধ্যক্ষ বেগ (A. P. Begg) সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন, কোনও সুপরিচিত ভদ্রলোকের সার্টিফিকেট দেখাইতে পারিলে দরখাস্ত বিবেচনা করিবেন। আমি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর নাম করিলাম ; তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন, যে তাঁহার সার্টিফিকেট হইলেই চলিবে। তারপরেই সমাজ-পাড়ায় বসুমহাশয় ও শাস্ত্রীমহাশয়কে এক সঙ্গেই পাইলাম। সার্টিফিকেটের কথা

উত্থাপন করিলে মিঃ বসু শাস্ত্রীমহাশয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি যে সার্টিফিকেট দিবেন, তাহা দেখিয়া আমি সার্টিফিকেট দিব।" পরদিন শাস্ত্রীমহাশয়ের সার্টিফিকেট লইয়া বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমার আবেদন অনুমোদন পূর্ব্বক বেগ সাহেবকে একখানা উচ্চপ্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় পত্রখানি পড়িয়াই, আমাকে কর্ম্ম দিবেন, এই অভিপ্রায় জানাইলেন। ইহাও বলিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাসকেও পরখ করিয়া দেখিবেন। ভূষণবাবুর নাম শুনিয়া আমার বড়ই ভয় হইল। ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম এবং এম.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এ প্রকার প্রতিভাবান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিযোগিতায় আমি দাঁড়াইতে পরিব, আমার সে ভরসা অতি অল্পই ছিল।

কয়েক দিন পরে অধ্যক্ষ মহাশয় আমার কার্য্যের ব্যবস্থা (routine) পাঠাইয়া দিলেন; লিখিলেন, আমাকে মনে রাখিতে হইবে যে আমার নিয়োগ পরীক্ষাসাপেক্ষ; বেতন আপাততঃ মাসে পঞ্চাশ টাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

২৯এ ডিসেম্বর এম্. এ. পরীক্ষার ফল ইণ্ডিয়া গেজেটে বাহির হইল, এক মাস অতীত হইবার পুর্ব্বেই আমি অধ্যাপকের পদ পাইলাম। আমার মত অখ্যাত যুবকের পক্ষে সচরাচর এরূপ ঘটে না; সুতরাং আমি এই অভাবনীয় সৌভাগ্যলাভে পুলকিত হইয়াছিলাম। তখন জানিতাম না, আমার সম্মুখে কি কঠোর সংগ্রাম অপেক্ষা করিতেছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কর্ম্মে উপস্থিত হইলাম। আমাকে তৃতীয় বার্ষিক, প্রথম বার্ষিক ও স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতে হইত;

সপ্তাহে মোট দশ বার ঘণ্টা। বি. এ. ক্লাসে পাশ ও অনার্স দুই-ই পড়াইতাম। চতুর্থ ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী সে সময় পরীক্ষার জন্য ছুটী পাইয়াছিল।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গুটি দশেক ছাত্র ছিল; প্রথম বার্ষিকে সত্তর আশী হইবে। এই শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বেগ পাইতে হয় নাই। এণ্ট্রান্স ক্লাসে ঢুকিয়াই বুঝিলাম, যে উহাতে কয়েকটী দুরন্ত বালক আছে। আট দশ দিন পরে অধ্যক্ষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কেমন চলিতেছে?" আমি উত্তর দিলাম "প্রথম শ্রেণীতে নিয়মানুগত্যের বড়ই অভাব" (a perfect lack of discipline)। তিনি বলিলেন, "তুমি নূতন আসিয়াছ, ছেলেরা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কয়েকটী ছাত্র তোমার সুখ্যাতি করিয়াছে। আমি হেড্ মাষ্টার নন্দবাবুকে বলিয়া দিব।" কতকগুলি অনাবিষ্ট ছাত্র কিছুতেই ঠাণ্ডা হইল না; কেহ কেহ তিন চারি বৎসর ঐ একই শ্রেণীতে পড়িয়াছিল। মাস দুই পরেও যখন তাহারা কিছুতেই সায়েস্তা হইল না, তখন অধ্যক্ষ এক এক জনের আট আনা জরিমানা করিলেন; তারপরে তাহাদের কাকুতিমিনতি দেখে কে?

মার্চ্চ মাসে এক দিন মিঃ বেগ আমাকে তাঁহার বাসভবনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমরা স্থির করিয়াছি তুমি ও ভূষণ বাবু, দুই জনকেই রাখিব। এ মাসেও তুমি পঞ্চাশ টাকা পাইবে, এপ্রিল, মে, ও জুন তোমাকে পঁচাত্তর টাকা দিব, জুলাই হইতে বেতন এক শত টাকা হইবে। ভূষণবাবুও এই প্রকার বেতন পাইবেন।" (বিজ্ঞাপনে ছিল, অধ্যাপকের বেতন গুণানুসারে এক শত হইতে দেড় শত টাকা।) ধর্ম্মাচার্য্য বেগ সাহেব ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল।

মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে আমরা ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে ৪০নং বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। এই বাড়ীতে পূর্ব্বে ও পরে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। বাড়ীটী এক তলা অনেকগুলি ঘর, দক্ষিণে পুকুর ও ফলের বাগান, উত্তরের আঙ্গিনায় গোলাপ, গন্ধরাজ, বেল প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পোদ্যান। এই বাড়ী আমাদের খুব পছন্দ হইয়াছিল, এজন্য ভাড়া আমার আয়ের পক্ষে একটু বেশী হইলেও পশ্চাৎপদ হইলাম না।

আমাদের বংশে সাত পুরুষের মধ্যে কেহ পৌত্রের মুখ দেখেন নাই। বংশপ্রদীপ প্রথম নাতির মুখ দেখিবার জন্য মা মধ্যম দাদার সহিত ছুটিয়া আসিলেন। এই বাড়ীতে তিনি বড়ই আরামে ছিলেন। তিনি পুকুরে স্নান করিতেন, বাহির বাড়ীতে এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে পানীয় জলের কল ছিল, তাহা ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না; স্বর্ণলতা দধি কিংবা ফল কাটিয়া দিলে, নিঃসঙ্কোচে তাহা খাইতেন; আদরের নাতিটিকে কোলে করিয়া বেড়াইতেন।

প্রথম দিনের একটী ব্যাপার কৌতুকজনক। মা ও মধ্যম দাদা প্রাতঃকালে কলিকাতায় পঁহুছিয়া দাদার গৃহে উঠিয়াছেন, অপরাহ্নে এই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাদিগকে লইয়া আসিলাম। মধ্যাহ্নে মধ্যম দাদা মার স্বপাকান্ন আহার করিয়াছিলেন। স্বর্ণলতার দিদি তখন আমাদের নিকটে কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছিলেন, রাত্রিতে তিনিই রন্ধন করিলেন। আহারের স্থান প্রস্তুত হইলে মধ্যম দাদাকে আহ্বান করিলাম। তিনি মাতার অনুমতি চাহিলেন, বলিলেন "মা, কেমন বা করি?" মার ইচ্ছা নয়, হিন্দু পুত্র ব্রাহ্মের অন্ন গ্রহণ করেন; তিনি উত্তর দিলেন, "যদি খিদা না পাইয়া থাকে, না খাইলা।" মধ্যম দাদা, "খিদা ব্যান্ পাইছে" (ক্ষুধা তো পাইয়াছে)। মা

নীরব। মধ্যম দাদার পুনশ্চ ঐ প্রশ্ন, এবং মার ঐ উত্তর। মধ্যম দাদা যখন কিছুতেই ক্ষুধার জ্বালা অস্বীকার করিলেন না, তখন মা আহারের অনুমতি দিলেন। প্রশ্নোত্তর এক দিনেই শেষ হইল।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হেরম্ববাবুর এক পত্র পাইলাম; তাহাতে আমাকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন, "তোমার সহিত আমার একটা গুরুতর বিষয়ে কথা আছে" (I have something important to talk to you about)। আমি যথাসময়ে তাঁহার গৃহে গেলাম। আহারের পরে তিনি বলিলেন, সিটী কলেজের কর্তৃপক্ষকে তিনি ইংরাজীর একজন তৃতীয় অধ্যাপক নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি ও রামানন্দবাবু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাক্ষিক বা মাসিক পরীক্ষার কাগজ দেখিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না; তৃতীয় অধ্যাপক এই কাজটী করিবেন, এবং দশ বার ঘণ্টা পড়াইবেন। তাঁহার ইচ্ছা, আমি এই পদ গ্রহণ করি; বেতন এক শত টাকাই পাইব।

আমি বিবেচনা করিবার জন্য সময় লইলাম, আমার চির শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র খুব উৎসাহ দিলেন; দাদারও মত হইল। মা বলিলেন, "এখানে একশত টাকা, ওখানেও একশত টাকা, তবে কলিকাতায় যাইবার দরকার কি?" এল.এম.এস. একটা ছোট কলেজ; সিটী কলেজের মত বড় ও বিখ্যাত, বিশেষতঃ নিজের কলেজে অধ্যাপক হইবার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমি হেরম্ববাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। একদিন তিনি আমাকে সঞ্জীবনী অফিসে লইয়া গেলেন, সেখানে অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত, মৈত্র মহাশয় ও কৃষ্ণবাবু পরামর্শ করিয়া জানাইলেন, আমাকেই নির্ব্বাচন করা হইল। কয়েক দিন পরে নিয়োগপত্র পাইয়া, ১৮ই

মে, আমি এল. এম. এস. কলেজের অধ্যক্ষের নিকট ১৮ই জুন হইতে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলাম, এবং হেরম্ববাবুর উপদেশানুযায়ী বেগ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিলাম ; তাহাতে বলিলাম, আমরা তিন ভাই সিটী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে নানাপ্রকারে ঋণী। অধিকন্তু উহার অধ্যাপকগণ অনেকেই আমার শিক্ষক ও বন্ধু ; তাঁহাদিগের সহিত একত্র কাজ করা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয় হইবে।

আমি ছুটী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মে মাসের বেতন পাইয়াছিলাম, এজন্য মিঃ বেগকে জানাইলাম, আমি জুন মাসের বেতন চাহি না। আমার অনুরোধে উমেশবাবু ১লা জুন হইতে আমাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন, এবং আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে মাসের জন্য ৭৫৲ বেতন লইতে স্বীকার করিলাম।

ইহার পরেই সেই আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে দাদা, মহেশবাবু এবং আমরা, এই তিন পরিবার একত্র বাস আরম্ভ করিলাম।

এখানে আসিয়া মা নিরতিশয় ক্লেশে পতিত হইলেন। এ বাড়ীতে পানীয় জলের কল কয়েক হাত জমির উপরে ছিল, সেখানে উচ্ছিষ্ট ভাত ইত্যাদি ফেলা হইত, তাহা দেখিয়াই তিনি কলের জলের ব্যবহার ত্যাগ করিলেন। একদিন রাস্তার কল হইতে জল আনিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যাইতেছি, একটু দূরে থাকিতেই দেখিলাম, একটী মুসলমান কলে মুখ দিয়া জল পান করিতেছে, দেখিয়াই মা বাড়ী পানে ছুটিলেন। তাঁহাকে কিছুতেই ডাকিয়া ফিরাইতে পারিলাম না। আমাদের বাড়ীটা সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে; কিন্তু তাহাতে যাইতে হইত থানার ভিতর দিয়া; দুই এক দিন মা সেই পুকুর হইতে জল আনিতেন, কিন্তু পুলিশের লোক আপত্তি

করিত, কাজেই তাহাও বন্ধ হইল। কদাচিৎ তাঁহাকে লইয়া গঙ্গায় যাইতাম, কিন্তু নদী এত দূরে, যে সেখান হইতে জল আনয়ন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইত না। বাধ্য হইয়া নিকটের পানায় ভরা পচা পুকুরের জল ব্যবহার করিতেন। একবার তাঁহার জ্বর হইল; দাদা সাগু রাঁধিবার জন্য এক ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিলেন। মা কলিকাতার বামুনের ছোঁয়া জল খাইতে অস্বীকার করিলেন এবং যতদিন নিজে না পথ্য প্রস্তুত করিতে পারিলেন, ততদিন উপবাসী রহিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভবানীপুরের বাড়ীর জন্য দুঃখ করিতেন। ফলতঃ সেখানকার চাকুরী ছাড়িয়া আসা তাঁহার ও আমার কাহারও পক্ষেই প্রীতিপ্রদ হইল না। মা পূজার ছুটীতে দাদা ও বৌদিদির সহিত বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

সিটী কলেজ

এখন সিটী কলেজে অধ্যাপনার কথা বলি। আমি এল্. এম্. এস. কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শেক্সপীয়ারের King John পড়াইয়া Morley's Burke এবং অনার্স ক্লাসে Gray's Poems পড়াইতেছিলাম, প্রথম বার্ষিকে Helps' Essays. এখানে আমাকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অনার্সে শুধু ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস দেওয়া হইল, পাস কোর্সের কোনও পুস্তক পাইলাম না। দ্বিতীয় ও প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে হেরম্ববাবু ও রামানন্দবাবু যে যে বই নিজেদের জন্য রাখিলেন, তাহা বাদে আমার জন্য রহিল Goldsmith's Deserted Village, ৪১০ পংক্তি, সহজবোধ্য। আমার অধ্যাপকজীবনের উষাকালে এই যে আমার প্রতি আস্থার অভাব প্রকাশ পাইল, ইহার কুফল এড়াইতে আমার অনেক দিন লাগিয়া-

ছিল। বড় বড় ক্লাস, এমন ছাত্রও ছিল, যাহাদিগের সহিত একত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়াছি, নিজে নব অনভিজ্ঞ অধ্যাপক, পড়াইবার সময়ে শৃঙ্খলারক্ষার কাজে কড়া নজর রাখিতে হইত। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে তর্কশাস্ত্র (Dr. P. K. Ray's Logic)—সেটী আমার অধ্যেতব্য বিষয় নয়, সুতরাং শিষ্যেরা সন্তুষ্ট থাকিবে, ইহা কিছুতেই আসা করা যাইতে পারে না। দুই এক মাসের মধ্যে Deserted Village সমাপ্ত হইল, তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে Grant's Xenophon এবং দ্বিতীয় বার্ষিকে অধ্যাপক মৈত্রের সহিত Helps' Essays পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। প্রবীণ ও খ্যাতনামা অধ্যাপকের সহিত একই পুস্তকের পাঠনা আমার অনুকূল হইয়াছিল, এমত কেহই বলিবে না। গ্রীষ্মের ছুটীর কিছু পূর্ব্বে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর অনার্স ক্লাসে Spenser's Fairie Queen ধরিলাম। ইহা অবশ্যই উন্নতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। প্রধান অধ্যাপকরূপে হেরম্ববাবুই ইংরেজী বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু আমাকে কি পুস্তক পড়াইতে দিবেন না দিবেন, সে বিষয়ে তিনি কোন কোনও সহযোগীর পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। সুতরাং আমার বিশেষ কার্য্য হইল, প্রতি মাসে শত শত পরীক্ষার কাগজ দেখা ; সপ্তাহে বার ঘণ্টা পড়াইতাম বটে, কিন্তু তাহাতে দুই জনের ছায়ায় থাকিয়া বিকশিত হইবার অবসর বেশী পাইলাম না।

পুত্রের পীড়া

তিন মাস বয়স হইলে মান্তুর আমাশয় হইল। ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ এবং ডি. এন. রায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়া আপাততঃ

রোগমুক্ত করিলেন; কিন্তু ভবানীপুর যাইবার পরেও দেখা গেল, সে দুধ ভালরূপ হজম করিতে পারিতেছে না, যকৃৎ বিকল হইয়াছে। বর্ষাকালে শিশু আবার উদরাময় ও আমাশয়ে পীড়িত হইয়া পড়িল। কিছুদিন অন্যতম প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডি. এন. রায় চিকিৎসা করিলেন, শেষে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলাম। যকৃতের অবস্থা ভাল হইলে তিনি রোগীকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে উপদেশ দিলেন। গুরুদাসবাবু, প্রকাশ দেবজী, সতীশ প্রভৃতি ইতঃপূর্ব্বে আরা সহরে ব্রাহ্মসাধনাশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন, আমরা পূজার ছুটীতে সেইখানে গেলাম। আশ্রমটী সহরের একপ্রান্তে, উত্তরে প্রকাণ্ড মাঠ, বাংলা বাড়ী চারিদিক্ খোলা; এখানে মাস দুই থাকিলে রুগ্ন শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, এই প্রকার আশা হইল।

এই সময়ে শাশুড়ী ঠাকুরাণী আড়াই বৎসরের কনিষ্ঠা কন্যা লইয়া কাশীতে বাস করিতেছিলেন। একদিন তাঁহাকে আরায় আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে সেই ভুবনবিদিত তীর্থক্ষেত্রে গেলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার আবাসে পঁহুছিয়া এবং তথায় আহার করিয়া নিকটে ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের কক্ষে রাত্রি যাপন করিলাম। তিনি তক্তপোষখানা আমাকে দিয়া স্বয়ং ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন, আমার আপত্তি শুনিলেন না। পরদিন দশাশ্বমেধ ঘাট, বিশ্বেশ্বর মন্দির, মানমন্দির, বারাণসী গবর্ণমেণ্ট কলেজ প্রভৃতি দেখিলাম, এবং সায়ংকালে স্বর্ণলতার মাতা ও ভগিনীকে লইয়া আরায় যাত্রা করিলাম। সেদিন দেওয়ালী বা দীপান্বিতা ছিল; রাজঘাট ষ্টেসন হইতে কাশীর আলোকমালা দেখিতে পাইলাম।

সাধনাশ্রমে পদার্পণ করিয়াই শুনিলাম, হিন্দুস্থানী চাকরটী আমাদের শয়নগৃহের পার্শ্বের বারাণ্ডায় ওলাওঠা রোগে মরিয়াছে।

পুত্রের পীড়ার সংবাদ জানাইয়া অধ্যক্ষ দত্তমহাশয়ের নিকটে কলেজ খুলিবার পরে কয়েক দিনের ছুটী প্রার্থনা করিলাম; তিনি ছুটী দিলেন, কিন্তু আমার পত্রে যেই জানিতে পারিলেন, আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ষাণ্মাসিক পরীক্ষার কাগজ কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়াছি, অমনি ছুটী নাকচ করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। আমি ১৩ই নবেম্বর বৈকালে আরা ছাড়িয়া পরদিন প্রাতঃকালে কলিকাতায় পঁহুছিলাম।

স্বল্পবিরাম জ্বর

সে যুগে রেলপথে মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পায়খানা ছিল না। দুপ্রহর রাত্রি হইতে প্রায় ছয় ঘণ্টা আমি পেটের বেদনায় উৎকট কষ্ট পাইয়াছিলাম; গাড়ীর মেজের উপরেও যাত্রীরা শুইয়াছিল, বিষম সঙ্কটে পড়িয়া প্রতীকারের উপায় দেখিলাম না। বোধ হয় দীর্ঘকাল কোষ্ঠবেগ ধারণ করিবার জন্যই ১৭ই তারিখ আমি জ্বরে শয্যা লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে উৎকট মাথার যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। দুই এক দিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিল, তারপর বুকে বেদনা দেখা দিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস আহূত হইলেন। তাঁহার চিকিৎসায় চৌদ্দদিনে জ্বরের বিরাম হইল।

আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া স্বর্ণলতা আসিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন দুইবার ষ্টেশনে যাইবার জন্য গাড়ী ডাকা হইল, গুরুদাসবাবুরা তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া গাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। আমি খোকার দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আসিতে নিষেধ

করিয়া পাঠাইলাম। দাদা অভিভাবকের যাবতীয় কর্ত্তব্য করিতেন, বৌদিদি পথ্যাদি দিতেন। সুকুমারী (শ্যালিকা) ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাসে ছিল; কতকগুলি টাকা বাকী পড়ার দরুণ তত্ত্বাবধায়িকা বিছানা বাক্স সহিত আমাকে কিছু না জানাইয়াই তাহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি সে দুই বৎসর আমাদের সঙ্গেই ছিল। সুকুমারী আমার খুব শুশ্রূষা করিত। দাদা দুইটী বন্ধুকে এক রাত্রি আমার ঘরে রাখিয়াছিলেন। আমার মাথার যন্ত্রণায় সারারাত্রি ঘুম হইত না; তাঁহারা নিদ্রায় অচেতন, একবারও আমাকে ঔষধ খাওয়াইলেন না; এবং দাদা শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন।

আরায় থাকিয়া খোকার শরীর সুস্থ হইল; মাতা ও সন্তান গুরুদাসবাবুদিগের সহিত ২৫এ ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৯৫ সনের শীতকালে কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইল, অনেক লোক মরিল, স্কুল কলেজ মার্চ্চ মাসে বন্ধ হইয়া গেল। ফেব্রুয়ারী মাসে আমার আবার জ্বর হইল, বসন্তের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, সুন্দরীবাবুর চিকিৎসায় এক সপ্তাহ ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করিলাম।

পুত্রের পীড়া

ফেব্রুয়ারী মাসের এক প্রাতঃকালে মান্তুর নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। পুত্রের নাম রাখিলাম সত্যব্রত; এবং বংশধারা রক্ষার জন্য দেবপ্রসাদ। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অল্পই ছিল, শেষে সন্দেশ দ্বারা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করা হইল।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই পুত্রটী আবার প্রবল জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হইল। জ্বরের প্রথম কয়দিন তাহার মা তাহাকে সারারাত্রি কোলে করিয়া পায়চারি করিতেন, একটু বসিলেই 'ওঠ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিত। আমার কোলে আসিত না, জ্যাঠাইমার কাছেও যাইত না। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ডাকিলাম। সপ্তাহকাল চিকিৎসার পরে একদিন মজুমদার মহাশয় রোগীকে দেখিয়া ভাত খাইবার ব্যবস্থা দিয়া গেলেন। ভাত খাইয়া সেই দিনই বৈকালে ১০৪° জ্বর হইল। তখন দাদার সহাধ্যায়ী কবিরাজ রামচন্দ্র ঘোষের হস্তে চিকিৎসার ভার দিলাম। তিনি প্রায় দুই মাস চিকিৎসা করিলেন, অবস্থা কখনও ভাল দেখা যায়, আবার খারাপ হয়। প্রত্যেক মাসে জ্বর হইয়া অবিচ্ছেদে সাত দিন থাকিত। যে ছেলে আমার সহিত আপার সার্কুলার রোড হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মমন্দির পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিল, সে আবার হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল। যকৃৎ আবার বৃদ্ধি পাইল। কবিরাজী চিকিৎসা নিস্ফল হইল দেখিয়া অবশেষে সুন্দরীবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার চিকিৎসায় মান্তু ধীরে ধীরে দীর্ঘকালে রোগমুক্ত হইল। তাহার শৈশবাবধি প্রায় পঁচিশ বৎসর নানা রোগে তাহাকে লইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছি।

লাটিন পাঠ

দর্শনে এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য একখানা পুস্তকের কিয়দংশ পড়িয়াই ছাড়িয়া দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে দেখিলাম, আজ পর্য্যন্ত একজন বাঙ্গালীও লাটিন ভাষায় এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হন নাই। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা হইল, আমি লাটিনে প্রথম বাঙ্গালী এম.এ. হইব। কলেজে অধ্যাপনার কাজ লইবার অল্পকাল পরেই লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিলাম। Principia Latina প্রথম ভাগ পড়া ছিল। দ্বিতীয় ভাগের কতকগুলি পাঠ সমাপ্ত করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্য হইতে সুরু করিয়া বি.এ. পরীক্ষার পাশ ও অনার্স কোর্সের পুস্তক শেষ করিলাম। এই সকল পরীক্ষার চারি পাঁচ বৎসরের পাঠ্যপুস্তক সুবিধামত বাছিয়া লইয়াছিলাম। পরিশেষে ১৮৯৫, ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সনের (এই তিন বৎসর পাঠ্যগ্রন্থের তালিকা একই ছিল) এম্. এ. পরীক্ষার গ্রন্থগুলি পড়িলাম। চব্বিশখানি পুস্তকের মধ্যে চারিখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বাকি সমস্ত অন্ততঃ একবার পড়া হইয়াছিল। ১৮৯৪ সন হইতে দুই বৎসর কাল আমি এম্. এ. পরীক্ষা দিবার মানসে একনিষ্ঠভাবে লাটিন পাঠে নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৯৬ সনের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের তালিকায় দেখা গেল, হরিনাথ দে নামক একটী ছাত্র লাটিনে একাকী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে যে আশায় আমি লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা চূর্ণ হইল, এবং বাঁকিপুর যাইবার পরে অবসরের অভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগও পাইলাম না; কাজেই আমার এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু লাটিন শিক্ষা করিবার জন্য আমার অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনার সাহায্য হইয়াছিল, এবং বাঁকিপুরে থাকিতে দুইটী ছাত্রকে লাটিন পড়াইয়া কিছু অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছিলাম।

১৮৯৫ সনের গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বে একদিন অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে বলিলেন, "যদি অন্যত্র চাকুরীর সুবিধা হয়, তবে সে সুযোগ হারাইও না।" হেরম্ববাবু কথাটা শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

কৃষ্ণবাবু কিছুদিন পরে সংবাদ দিলেন, "উমেশবাবু তোমাকে কি বলিয়াছিলেন, সে-গোলযোগ চুকিয়া গিয়াছে।"

আগষ্ট মাসে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উচ্চতর বেতনে এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া চলিয়া গেলেন। অধ্যাপক মৈত্র মহাশয় সামান্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া রামানন্দবাবুকে রাখিবার জন্য মিঃ বসুকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি ও উমেশবাবু সম্মত হইলেন না। ৩১এ আগষ্ট আমি রামানন্দবাবুর পদে উন্নয়নের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিলাম, তাহাও নিস্ফল হইল। কর্ত্তৃপক্ষ অপর বিদ্যালয়ের দুই জন শিক্ষককে অর্দ্ধ সময়ের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। আমি তৃতীয় বার্ষিকের অনার্স ক্লাসে Sydney's Apology for Poetry পড়াইবার ভার পাইলাম, পাস ক্লাসে একদিন Landor পড়াইতে গিয়াছিলাম। ছাত্রেরা ভাল ব্যবহার করে নাই, হেরম্ববাবুও বলিলেন, সে ক্লাসের জন্য আমার প্রয়োজনও নাই। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তখনও তাহা বোধগম্য হয় নাই।

প্রথমা কন্যা

১৪ই অক্টোবর, ১৮৯৫, (২৮এ আশ্বিন, ১৩০২) সোমবার রাত্রি ১১.৪৫ মিনিটের সময় আমাদের প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। প্রসবের কালে শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও আমাদের বাসার ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সাহায্য করিবার লোকের অভাবে সূতিকাগারে আমাকেও থাকিতে হইয়াছিল। আমরা কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। সতীশ আদর করিয়া তাহাকে অলি নাম দিয়াছিলেন, সে এই নামেই পরিচিত ছিল।

১৮৯৬ সনের মাঘোৎসবের পরে ভাই প্রকাশ দেব একদিন আমার মনে আবার একটা ঝাঁকুনি দিলেন, বলিলেন, "আপনি কবে সাধনাশ্রমে যোগ দিবেন?" তিনি আপদে বিপদে দূর দেশ হইতে আমার সংবাদ লইতেন ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ছিল; তাঁহার কথায় আমার চিত্তে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল, এবং তাহা জানিতে পারিয়া পত্নী অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

বহিষ্কার

১লা এপ্রিল (১৮৯৬) ক্লাসে পড়াইতেছি, এমন সময়ে কলেজের ভৃত্য আমার সহি লইয়া একখানা পত্র দিল। তাহা এই—

"Babu Rajanikanta Guha, M. A. is hereby informed that his services at the College will not be required after the 31st of May, 1896.

(Sd) Umeschandra Dutt
Secy. College Council."

পত্রখানি পড়িয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইলাম, এবং ছাত্রগণের সম্মুখে উহা দেওয়াতে মনে বড়ই দুঃখ হইল। বাড়ী যাইবার পথে শাস্ত্রী মহাশয়কে এই সংবাদ দিলাম, তিনি কলেজ কৌন্সিলের সভ্য ছিলেন; তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; বলিলেন, আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রথম দুই এক বৎসর পুনঃ পুনঃ হেরম্ববাবুকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দাদাকে পত্রখানা দেখাইলাম, তিনিও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং কয়েকদিন পরে উমেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি

জানিয়া আসিলেন। চারি দফার মধ্যে দুইটী এখানে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়, দুইটী গুরুতর—(১) I do my works grudgingly; (২) I have not been giving satisfaction to the boys.

এ স্থলে বলা উচিত, ৩১এ মে গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যে পড়িয়াছিল; আমি পূরা সেসন কাজ করিলেও ছুটীর মধ্যে পদচ্যুত হইলাম।

দশ বার দিন পরে আমি সম্পাদকের পত্রের বিরুদ্ধে কৌন্সিলের নিকট আপিল করিলাম।

আমি গত বৎসর অনেক আপত্তি জানাইয়া লজিক পড়াইয়াছিলাম, এবং এ বৎসর উহা পড়াইতে মোটেই সম্মত হই নাই; অপিচ এ বৎসর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে Landor পড়াইতেও অস্বীকার করিয়াছি, এই দুই অভিযোগের উত্তর দিয়া "আমি আমার কার্য্য অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকি", এই অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলিলাম, যে আমি কয়েক হাজার পাক্ষিক পরীক্ষার কাগজ দেখিয়াছি, এবং তদুপরি বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এবং স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একবার লজিক এবং তিনবার ইংরেজীর ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিয়াছি। ইহাতে আমার দৃষ্টিশক্তির বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আমি অধ্যক্ষ মহাশয়কে এই গুরুভার একটু লঘু করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, সত্য, কিন্তু যদি জানিতাম, এই অনুরোধ কর্ত্তব্যে শিথিলতা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তবে নীরব থাকিতাম। আমার এমন একটী দৃষ্টান্তও মনে পড়িতেছে না, যে স্থলে আমি আমার নিজের কলেজের হিতাহিতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছি। বরং নানা জনের মুখে এই কথাই শুনিয়াছি যে, ছাত্রেরা বলে, আমি তাহাদিগের জ্ঞানের উন্নতির জন্য বিলক্ষণ যত্ন করি।

পরিশেষে, আমি ছাত্রগণকে সন্তোষ প্রদান করিতে পারিতেছি না, এই অভিযোগের উত্তরে লিখিলাম, "এল. এম. কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ দুই মাস আমার অধ্যাপনা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষের প্রশংসাপত্র তাহার প্রমাণ। আমার শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি সে কাজ ত্যাগ করিয়া সিটী কলেজে আসিয়াছি। আমি এখানে পরীক্ষাসাপেক্ষ কর্ম্ম গ্রহণ করি নাই। আমাকে একবারও বলা হয় নাই, যে কতকগুলি ছাত্র যদি আমার নিন্দা করে, তবেই আমি পদচ্যুত হইব। কর্ত্তৃপক্ষের আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার প্রচুর সুযোগ ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা আমাকে একটা স্থায়ী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া এই কলেজে আসিতে প্ররোচিত করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা অকূলে ভাসাইয়া দিলেন—ইহা একান্তই নিষ্ঠুর।"

আমি সিটী কলেজে অভিজ্ঞ শিক্ষকরূপে কাজ আরম্ভ করি নাই। আমার আশা ছিল, "আমার শিক্ষক ও সুহৃদ্‌দিগের" সহিত কর্ম্ম করিবার কালে তাঁহারা আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, এবং শিক্ষাদানের সঙ্কেত বলিয়া দিবেন। অধ্যক্ষ বেগ এক মাসের পরিচয়ের পরেই আমাকে অধ্যাপনা বিষয়ে কতকগুলি মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি কি আমার শিক্ষকদিগের, শুধু শিক্ষক নয়, আমার নিজের ধর্ম্মমণ্ডলীর সভ্যগণের নিকট হইতে সে প্রকার উপদেশ পাইবার আশা করিতে পারিতাম না? কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ আমি একটীও পাই নাই। উপদেশ পাওয়া দূরে থাকুক, সমগ্র বৎসর ধরিয়া একবারও আমার অধ্যাপনাপ্রণালীর ত্রুটি সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সত্য সত্যই কি এই কলেজে আমার দুর্নাম এত অধিক, যাহাতে আমার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? আমি জানি না। অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র আমাকে অন্য প্রকার বলিয়াছিলেন। সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং সেণ্ট্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ মিঃ ডি. এন্. দাস, রিপণ কলেজের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বসু, সিটী স্কুলের শোভাবাজার শাখার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরসিংহ ঘোষ, এম্. এ., শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, বি. এ. স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ছাত্রেরা আমার সুখ্যাতি করে।

উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া আমি পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিলাম।

কৌন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধি অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কলেজ ও স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আমার পক্ষে ছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মনের ভাবও আমার প্রতি অনুকূল ছিল। কিন্তু উমেশবাবু আমার চারি বৎসরের অগ্রবর্ত্তী সুখ্যাত এক অধ্যাপকের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া আমাকে বহিষ্কারপত্র দিয়াছিলেন, সুতরাং সুবিচারের আশা ছিল না বলিলেই হয়।

কৌন্সিলের অধিবেশনের দিন আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে কোন্নগর হইতে আনিতে গেলাম। গ্রামের পথে দেখিলাম, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন বলিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছেন। আমি নির্ব্বন্ধ করিয়াও তাঁহাকে রেলভাড়াটা লইতে রাজি করিতে পারি নাই।

পুনর্বিচারের এইটুকু ফল হইল, যে সম্পাদক উমেশবাবু তাঁহার পত্রখানা ফেরৎ লইলেন, এবং আমি গ্রীষ্মাবকাশের পর দিন হইতে কলেজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলাম।

২রা মে হেরম্ববাবু আমাকে একখানা প্রশংসাপূর্ণ সার্টিফিকেট দিলেন; ২৫এ অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতেও একখানি পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিলেন, "His Knowledge of English is deep and he has by his teaching given satisfaction to the Honour Class students, even of the 4th year Class." এই সার্টিফিকেটে সিটী কলেজের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ. এম্. বসুও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

১০ই জুন এলবার্ট কলেজের ইংরেজী ও লজিকের অধ্যাপকের পদ প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিলাম, এবং মাসিক আশী টাকা বেতনে নিয়োগপত্র পাইয়া ১৫ই তারিখ কার্য্যে যোগ দিলাম। এই কলেজে চাকুরী পাইবার পরে উমেশবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন আমি যদি সিটী কলেজের পাক্ষিক পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া দিই, তবে আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারেন। তাঁহাকে বলিলাম, "আমি এলবার্ট কলেজে কাজ পাইয়াছি।"

কলেজটী দ্বিতীয় শ্রেণীর, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আট দশটী ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ষাট সত্তরটী ছাত্র ছিল। আমি কলেজে ইংরেজী, লজিক ও ইতিহাস এবং স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী ব্যাকরণ ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একটী ছাত্র পড়াইয়া মাসে পঁচিশ টাকা পাইতাম।

জুলাই মাসে বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজের সম্পাদক একটী বন্ধুসহ

আমার বাসায় যাইয়া বিস্তর আলোচনার পরে আমাকে ১৪০৲ টাকা বেতনে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে কি একটা বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াতে আমি বরিশাল যাইতে স্বীকৃত হই নাই।

আগষ্ট মাসের শেষ শনিবার স্কুলের এক শিক্ষক বাড়ী ফিরিবার পথে আমাকে গোপনে সংবাদ দিলেন যে, সোমবার (বোধ হয় ১লা সেপ্টেম্বর) একটী উপাধিবিহীন ভদ্রলোক আমার স্থলে পড়াইতে আসিবেন, কর্ত্তৃপক্ষ এইপ্রকার স্থির করিয়াছেন। অধ্যক্ষ ধনবল্লভ শেঠ আমাকে কিছুই বলেন নাই। সোমবার যথাসময়ে কলেজে যাইয়া দেখি, মহা গোলযোগ। আমার যায়গায় নূতন লোক পড়াইতে যাইতেই ক্লাসের ছেলেরা বাহির হইয়া আসিয়াছে, পড়াশুনা বন্ধ, ভদ্রলোকটী অধ্যক্ষের সম্মুখে বসিয়া আছেন। আমি আমার প্রতি এবম্প্রকার অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য শেঠ মহাশয়কে বেশ দুই কথা শুনাইলাম, তিনি এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার কোনই দোষ নাই, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া সম্পাদক প্রমথলাল সেনের সহিত দেখা করিলাম, এবং আমাকে নোটীশ না দিয়া কেন ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে জানিতে চাহিলাম। তিনি সে সময়ে বিলাত যাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন; বলিলেন, আচ্ছা, "আপনাকে এক মাস সময় দেওয়া হইবে। কলেজের গুরুতর অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে, আপনাকে রাখিতে পারা যাইতেছে না।" দুই এক দিনের মধ্যেই নূতন সম্পাদকের নিকট হইতে যথারীতি নোটীশ পাইলাম।

তারপর ছাত্রেরা কলেজের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত কালীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপে আমাকে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আবেদন করিল। তিনি আমাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতেই বিষয়টী পরিব্যক্ত হইবে, এ জন্য উহা উদ্ধৃত হইল।

Albert College.
3rd October, 1896.

I deeply regret that our funds did not allow us to continue the services of Babu Rajanikanta Guha, M. A., whom we had selected from a number of applicants, to reinforce the staff of the Albert College in the subjects of English Literature and Logic. Within the brief period that he was connected with the College, he became very popular with the students, for his efficient teaching and healthy influence, as evidenced by a strong representation they made to me, to which I am sincerely sorry not to have been in a position to give effect.

Sd/ Kalicharan Banurji,
Director, Albert College.

খৃষ্টীয় এবং ব্রাহ্ম, সাধারণ ও নববিধান, তিন ধর্ম্মসমাজের কলেজে অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আমার নিজ সমাজের প্রধান পুরুষেরা নির্ম্মম ব্যবহার দ্বারা আমার জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া দিলেন। এলবার্ট কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ দূর-দৃষ্টির অভাবে সেসনের মাঝখানে আমাকে বিদায় দিতে বাধ্য

হইলেন, ফলে আমি রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হইবার সুযোগ হারাইলাম, আগামী জুন মাসের পূর্ব্বে অন্য কলেজে কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও রহিল না।

আঘাতের পর আঘাতে মন দমিয়া গেল, বিষয়কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদ জন্মিল। আমি সাধনাশ্রমে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রাহ্মসাধনাশ্রম
ও
রামমোহন রায় সেমিনারী, বাঁকিপুর

১
সাধনাশ্রমে প্রবেশ

১লা জুন (১৮৯৬) সকালে উপাসনার সময় এই ভাব মনে হইল—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মসমাজের সেবা, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার, এই আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে। শুধু অর্থোপার্জ্জন ও ভোগ-বিলাসে বদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না।" (ডায়েরী)

অচিরেই ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া গেলাম। "কোথায় আদর্শ, কোথায় জীবন!"

ধর্ম্মজীবনের ম্লানতার সঙ্গে সংসারের প্রতি বিরক্তি যুক্ত হইল।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মসাধনাশ্রম আরা হইতে বাঁকিপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাহাতে ভাই প্রকাশ দেব, সতীশ, এবং সপরিবারে গুরুদাসবাবু ও সুন্দর সিংহজী বাস করিতেন। সতীশকে লিখিলাম, আমি বাঁকিপুরে যাইয়া সাধনাশ্রমে যোগ দিতে চাই। তিনি খুব উৎসাহ দিলেন, এবং গুরুদাসবাবুও সাদরে আহ্বান করিলেন। সংকল্পাধীন পরিচারক শ্রীরঙ্গবিহারী লাল এম্.এ. পরীক্ষার জন্য আমাদের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন, তিনিও সহানুভূতি

দেখাইলেন এবং দোকানবাকী দেনার ভার লইলেন। আমি ৯ই অক্টোবর শুক্রবার স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে গুরুদাসবাবু ও সতীশ ষ্টেসন হইতে আমাদিগকে সাধনাশ্রমে লইয়া গেলেন।

১৯এ অক্টোবর সোমবার (৩রা কার্ত্তিক) আমার ২৯শ জন্মদিন উপলক্ষে প্রাতঃকালে উপাসনা হইল। গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, এবং আবেগপূর্ণ উপদেশ দিলেন। তাঁহার প্রার্থনার পরে স্বর্ণলতা, সতীশ এবং শ্রীযুক্তা জয়াবতী প্রার্থনা করেন; পরিশেষে আমি প্রার্থনা করিলাম। সকলের প্রার্থনার মধ্যেই এই ভাব ছিল, যে আমার শুভ সংকল্পে যেন তিনি সহায় হন। সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। পত্নীর প্রার্থনার ভাব এই—"ইঁহার শুভ সংকল্পে আমি যেন বাধা না দেই, আমি যেন ইঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের যে কলঙ্ক, যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মে বিঘ্ন, তাহা যেন আমাকে বহন করিতে না হয়।"

আমার প্রার্থনার মর্ম্ম—

"হে প্রভু, তুমি জান, আমাকে কিরূপ গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া এখানে আনিয়াছ, কিরূপ নরকের ভিতর দিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। ধন্য তোমার দয়া। যে মরিতে চায়, তাহাকে তুমি মরিতে দেও না। আমি ত মরিতে গিয়াছিলাম, তুমি আমাকে চুলে ধরিয়া এখানে আনিলে। ধন্য তোমার করুণা। আজ এই সংকল্প করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। যেখানে রাখ থাকিব, যেভাবে তোমার রাখা ইচ্ছা থাকিব।"

আজ শ্রীমান্ সত্যব্রতের তিন বৎসর পূর্ণ হইল। ২॥ টার পরে

উপাসনা হইল। সতীশ আচার্য্যের কার্য্য এবং শিশুর মাতা, বড় মাসীমা ও মাতামহী প্রার্থনা করেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরুদাসবাবু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ, সুন্দর সিংহজী ও সতীশের সহিত আমি কি করিব সে বিষয়ে আলোচনা হইল।

সন্ধ্যার পর শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষের জন্মদিনোপলক্ষে উপাসনা হইল—তিনি অন্যত্র ছিলেন। কুঞ্জবাবু উপাসনা এবং শ্রীমতী জয়াবতী, সুন্দর সিংহজী ও সতীশ প্রার্থনা করেন। রাত্রিতে প্রীতিভোজন হইল।

২০এ অক্টোবর আমরা নিকটেই খোদাবক্স লেনে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্রের বড় বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম।

নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শাস্ত্রী মহাশয় ঐ বাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। একদিন প্রাতঃকালে উপাসনা পূর্ব্বক তিনি আমাকে সংকল্পাধীন পরিচারকদলে স্থান দিলেন।

২
ভ্রমণ

২৪এ নবেম্বর গুরুদাসবাবুর সহিত ক্ষুদ্র ভ্রমণে বাহির হইলাম। বৈকালে মোকামায় পঁহুছিয়া শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের বাসায় বৈকালিক জলযোগ ও রাত্রিতে আহার করিয়া আমরা গভীর রজনীতে ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মিত্রের গৃহে উপনীত হইয়া সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া স্থানীয় ব্রাহ্ম-দিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করা গেল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণ নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেন, এবং পাথেয় বাবদ অর্থসাহায্যও করিলেন। সেই কালেই বেহারকে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার আলোচনা উপস্থিত

হইয়াছিল; দেখিলাম, বিহারী ব্রাহ্ম ব্রহ্মদেববাবু এই প্রস্তাবের একান্ত পক্ষপাতী।

ভাগলপুর হইতে আমরা মুঙ্গেরে যাইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে অতিথি হইলাম। ইঁহারা স্বামীস্ত্রী দুই জনই আমাদিগের যথোচিত যত্ন করিলেন। বাসভবনটী মির কাসিমের ফোর্টের মধ্যে, গঙ্গার উপরে, অতি মনোহর ও স্বাস্থ্যকর প্রশস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে। সন্ধ্যার পরে দুই তিন দিন এক এক ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা ও আলোচনা হইল। দেখিবার মধ্যে আমরা সীতা-কুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণ ও পীর পাহাড় দেখিলাম। পাহাড়ের চূড়ায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ ও একটী সুগভীর কূপ আছে।

মুঙ্গেরে পরমানন্দে তিন চারিদিন কাটাইয়া আমরা নবেম্বরের শেষে বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

৩

রামমোহন রায় সেমিনারী

দুই এক দিন পরেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকিপুরে আসিলেন। আমরা তাঁহাকে ষ্টেসনে আনিতে গেলাম। গৃহে আসিবার পথে গুরুদাসবাবু তাঁহাকে বলিলেন, আশ্রমে তিন চারিজন এম্. এ. আসিয়া জুটিল, বাঁকিপুরে একটা স্কুল করিলে হয়। (১৮৯৫ সনে সতীশ দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে, এবং ১৮৯৬ সনে হেমচন্দ্র সরকার দর্শনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও শ্রীরঙ্গবিহারী লাল ইংরেজীতে এম্. এ. পাশ করিয়াছিলেন।) তখন আর বেশী কথা হইল না। বাটী পঁহুছিবার পর, শাস্ত্রী মহাশয় এখন বিশ্রাম করিবেন, এই ভাবিয়া আমি নিজের ঘরে গেলাম। আধঘণ্টা পরে যাইয়া দেখি, শাস্ত্রীমহাশয় "রামমোহন

রায় সেমিনারী” নাম দিয়া প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক চমৎকার প্রস্পেক্‌টাস লিখিয়া ফেলিয়াছেন। অচিরে উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অনুষ্ঠানপত্রে রজনীকান্ত গুহ প্রধান শিক্ষক এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেমচন্দ্র সরকার ও শ্রীরঙ্গ বিহারীলাল যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষকরূপে বিজ্ঞাপিত হইলেন। সে কালে বিহারের কোনও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে চারিটী এম্. এ. উপাধিধারী শিক্ষক ছিল না। শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় যাইয়াই আস্‌বাব প্রভৃতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী তত্ত্বাবধায়ক (superintendent) পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেন। জানুয়ারী মাসে চৌহাট্টাতে একটী ছোট বাংলা বাড়ীতে স্কুল খোলা হইল, ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সাত আটটী ইংরেজীর শিক্ষক, একটী কাব্যতীর্থ বিহারী পণ্ডিত ও একটী মৌলবী লইয়া রীতিমত পাঠনা চলিতে লাগিল। সে দিন শাস্ত্রী মহাশয় নিজে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বৎসর প্রায় প্রত্যেক মাসে তিনি একবার করিয়া বাঁকিপুরে যাইতেন, এবং বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া, আমাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া ও টাকা তুলিয়া উহার জীবনরক্ষা ও উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। কয়েক বৎসর পরে, স্কুলটী একটু দাঁড়াইলে গুরুদাসবাবুর হাতে উহা সমর্পণ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

প্রতিদিন ব্রাহ্মশিক্ষকেরা একত্র প্রার্থনাপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই উহা শিক্ষাদানে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। প্রথম হইতে অষ্টমশ্রেণী পর্য্যন্ত এম্. এ. উপাধিধারী শিক্ষকেরা ইংরেজী পড়াইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের স্কুল বলিয়া উহার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের একটা প্রবল প্রতিকূল ভাব ছিল। আমরা

মুসলমান ছাত্র বরং পাইতাম, হিন্দু ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে অল্পই আসিত। এজন্য প্রথম আট দশ বৎসর রামমোহন রায় সেমিনারীকে গুরুতর সঙ্কটের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

ভ্রাতা সতীশচন্দ্র গুরুতর মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য এক বৎসর স্কুলের কাজে যোগ দিতে পারেন নাই।

এই বৎসর তিনি Manchester College-এর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বিলাতে যান। সতীশ তাঁহাকে লিখিলেন, "ভাই প্রকাশদেবজীর শরীর ভগ্ন; আর রজনী-বাবু নূতন সাধনাশ্রমে আসিয়াছেন, অনেক পরীক্ষায় তিনি পড়িয়াছেন; এসময়ে তাঁহার নিকটে আমার থাকা উচিত। অতএব আমার শরীর ভাল হইলেও আমি বিলাত যাইব না।" বাড়ী যাইবার পথে কলিকাতায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি পত্রখানির অনেক স্থল আমাকে পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগের বন্ধুতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।"

৪
মাঘোৎসব

১৮৯৭ সনের মাঘোৎসব, নববিধান ও সাধারণ, দুই সমাজে মিলিতভাবে সম্পন্ন হইল। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সায়ংকালে, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এই দুই বেলার উপাসনা ও মহিলাসমিতি প্রভৃতি আরও কয়েকটী অনুষ্ঠানের স্থান ছিল সাধনাশ্রম অর্থাৎ আমাদিগের বাসভবনের বৃহৎ কক্ষ (Hall), অবশিষ্টগুলি নববিধান সমাজের ব্রাহ্মমন্দিরে সম্পাদিত হইল। শেষ দিন, ২৬এ জানুয়ারী রবিবার

অপরাহ্নে বিহার ন্যাশনেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ও আমি "The New gospel" বিষয়ে পাটনা কলেজের হলে বক্তৃতা করিলাম। এইটী আমার প্রথম বক্তৃতা, তাহাও ইংরেজীতে উহা প্রায় শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। পাণ্ডুলিপি হাতে ছিল বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি ব্যতীত সমস্তই মুখে বলিয়াছিলাম। বক্তৃতাটী সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কয়েকদিন পরে শাস্ত্রী মহাশয় স্কুল সম্বন্ধে কথা বলিবার জন্য আমাদিগকে লইয়া পরেশবাবুর বাড়ী গেলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইহাদিগের তো গালে চড় মারিলেও মুখ হইতে কথা বাহির হইবে না, এজন্য একটা স্কুল করিয়া দিলাম।" পরেশ বাবু বলিলেন, "ইনি তো বেশ বলিতে পারেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা ছিল, সতীশ, হেমচন্দ্র, শ্রীরঙ্গ, আমি, আমরা কেহই বক্তৃতা করিতে পারিব না।

৫
বাড়ী-পরিবর্ত্তন

মাঘোৎসবের পরে আমরা বড় বাড়ীটীর সংলগ্ন শ্যামাচরণবাবুর ছোট বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। উহাতে উন্মুক্ত আকাশতলে বসিবার স্থান ছিল না বলিলেই হয়, ছাদে যাইবার সিঁড়িও ছিল না। ডাক্তার পরেশবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, এ বাড়ীতে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে না। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

৬
স্বগ্রামে গমন

৪ঠা মে কলিকাতা হইতে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পত্রে জানিতে পারিলাম, দাদা মাতাঠাকুরাণীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া বাড়ী

গিয়াছেন। আমি সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইলাম। পর দিন সকালে কলিকাতায় পঁহুছিয়া আশ্রমে উঠিলাম এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি পীড়িতা মাতাকে দেখিতে যাইবার জন্য দেশে যাইতেছ? যাতায়াতের এই পাথেয় নেও। আর খালিহাতে মাকে কি করিয়া দেখিতে যাইবে? তাঁহাদিগকে তো কিছু দিতে হইবে! তারজন্য এই কয়েকটী টাকা লইয়া যাও।" আমি অবাক্ হইয়া গেলাম।

দিনের বেলায় শাশুড়ীঠাকুরাণী, বৌদিদি প্রভৃতির সহিত দেখা করিয়া রাত্রির গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাত্রা করিলাম, এবং ৬ই সকালে তথায় ষ্টীমার ধরিয়া ১॥ টার সময় পোড়াবাড়ী ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। তখনও অনেক বেলা ছিল, ভাবিলাম আজই হাঁটিয়া বাড়ী যাইতে পারিব। এই মানসে মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সোজা বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। খানিকক্ষণ চলিবার পরে উদর বিকল হইল, শরীর দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলাম; তখন অগত্যা পূর্ব্ব সংকল্প ছাড়িয়া দিয়া টাঙ্গাইলে রাত্রি যাপন করাই স্থির করিলাম। লাভ হইল এই, যে আমি ত্রিভুজের এক বাহুর পথে না যাইয়া দুই বাহু ঘুরিয়া আলিসাকান্দা ও সাকরাইলের মধ্য দিয়া শ্রান্তক্লান্ত দেহে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ লইয়া সন্ধ্যার সময় মাসীমার গৃহে উপনীত হইলাম। পরদিন (৭ই মে) প্রাতঃকালে বাহির হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া আর্দ্রবস্ত্রে দীর্ঘকাল কাটাইয়া পদব্রজে পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দুপ্রহরে বাড়ী যাইয়া উপনীত হইলাম। দেখিলাম, মা ভাল আছেন, জ্বর ও কাসি হইয়াছিল, দাদাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য মধ্যম দাদা পীড়ার সংবাদটা বাড়াইয়া লিখিয়াছিলেন।

বাড়ীতে পা' দিয়াই দেখিতে পাইলাম, ঘরে ঘরে জ্বর, গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়ার বিষম প্রাতুর্ভাব। ১৮৯২ সনে যাহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুরুষ দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহারা ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালসার হইয়াছে। আমাদের বাড়ীতেও ভ্রাতাভগিনীরা জ্বরে পড়িলেন। দাদা ও আমি প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কুইনাইন সেবন করিতাম, ও প্রাতঃ-কালে তুধ ও চিনি বিনা চা খাইতাম। আমি আপাততঃ জ্বরের আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া গেলাম বটে, কিন্তু বৎসর শেষ না হইতেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত গ্রামে প্রায় ছয় সপ্তাহ বাসের বিষম প্রতিফল ভোগ করিতে হইল।

সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে চারি ভাই মিলিত হইলাম; বড় দিদি বাড়ীতেই ছিলেন, কিছুদিন পরে ছোট দিদিও আসিলেন। মাতার নিকটে সমস্ত ভ্রাতাভগিনীর মিলিত হইবার প্রয়োজন আমাদের আর একবার হইয়াছিল তাঁহার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে।

মেজ বৌদিদি এখন দীর্ঘাঙ্গী, কর্ম্মিষ্ঠা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছেন; রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী, যত্নের সীমা নাই; আমার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। বাড়ী হইতে যাইবার নাম করিতেই মা, দাদারা, বৌদিদি সকলেই ঘোর বিরোধী হইতেন। মা নিজে আমাদের উপাদেয় আহারের ব্যবস্থা করিতেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অশান্তির আগুন জ্বলিতেছিল। কনিষ্ঠ সহোদর রমণী এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পনর টাকার বৃত্তি পাইয়াও এবৎসর এফ্. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল। মা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেও তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। বাঁকিপুরে থাকিতেই এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। বিবাহের

প্রস্তাবে দাদার অমত ছিল, বাড়ী আসিয়া আমিও প্রতিবাদ করিলাম। ইহাতে মা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে রুক্ষ ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন ; আমার অপেক্ষা বার বৎসরের ছোট মেজবৌদিদি সদ্যঃ প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়তার যোগ ভুলিয়া গিয়া বাক্‌শল্যে হৃদয় দগ্ধ করিলেন। অথচ আমি বাড়ী হইতে যাইতে চাহিলে মা কিছুতেই ছাড়িতেন না, দাদা, মধ্যমদাদা, বৌদিদি সকলেই অমত প্রকাশ করিতেন। কয়েকদিন পরেই রমণীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল, অশান্তিও থামিয়া গেল।

শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন, সুন্দরসিংহজী কলিকাতায় আসিলেই আমরা দুইজনে মিলিত হইয়া পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে সেমিনারীর সাহায্যার্থে টাকা তুলিতে বাহির হইব। এজন্য প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, এবার বাড়ীতে বেশী দিন থাকা হইবে না। এদিকে মা ও ভাইবোনেরা আমাকে ছাড়িলেন না, সুন্দরসিংহজীরও কোনও সংবাদ পাইলাম না। কাজেই আমি দীর্ঘকাল বাড়ীতে রহিয়া গেলাম। অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাবটী কেন পরিত্যক্ত হইয়াছিল জানি না।

এই সময়ে বাঁকিপুর সাধনাশ্রমে অর্থাভাবের দরুণ আশ্রমবাসীদিগের গুরুতর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। বাটীতে আমি পরাধীন, প্রতিকার করিবার সাধ্য ছিল না, অথচ আমি প্রত্যহ উদর পূরিয়া উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন আহার করিতেছি, ইহাতে অন্তরে বড়ই বেদনা বোধ করিতাম।

ভূমিকম্প

১২ই জুন শনিবার অপরাহ্ণে পূর্ব্বভারতে ভূমিকম্প হইল। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং আসামে উহার প্রকোপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ

করিয়াছিল। আমরা কয়েকজন তখন পশ্চিম বাড়ীতে গল্প করিতে-ছিলাম, কম্পন আরম্ভ হইতেই দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইলাম। আমি একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর সকলে বসিয়া পড়িলেন। বড় বড় গাছগুলি বায়ুবেগে বেতস লতার মত দুলিতে লাগিল, যেন মাথার উপরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অন্তঃসত্ত্বা মেজবৌদিদি উঠানে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, মধ্যম দাদা তখন মাঠে চাষের কাজ দেখিতেছিলেন। কম্পন প্রায় তিন মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। আমাদের অঞ্চলে পাকাবাড়ী খুব কম, এজন্য সম্পত্তির ক্ষতি অল্পই হইয়াছিল, মৃত্যুর সংবাদও শুনা যায় নাই, কিন্তু উত্তর বঙ্গ ও আসামে লোকের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল। আমরা কলিকাতা ও বাঁকিপুরে আত্মীয়-পরিবারের অবস্থা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, কিন্তু সেই সেই স্থানে যাইবার পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই। পরদিনও বৈকালে মৃদু ভূমিকম্প হইয়াছিল।

১৪ই জুন সোমবার দুপ্রহরের আহারান্তে দাদা, রমণী ও আমি প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বাহির হইলাম। সুবর্ণখালীতে এক ভদ্রলোকের গৃহে আরামে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন সকালে পিংনার নিকটে ষ্টীমারে উঠিয়া আন্দাজ দুইটার সময় গোয়ালন্দ উপস্থিত হইলাম, এবং রাত্রির গাড়ী ধরিয়া ১৬ই প্রাতঃকালে কলিকাতায় ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে পঁহুছিয়া দেখিলাম, বৌদিদি ও অপর সকলে ভাল আছেন, বাড়ীর একটুকুও ক্ষতি হয় নাই। আমি সেই দিনই কলিকাতা ছাড়িয়া পরদিন দুপ্রহরে সাধনাশ্রমে উপনীত হইলাম। বাঁকিপুরে কদাচিৎ দুই চারিজন কম্পন অনুভব করিয়াছিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্র

গ্রীষ্মের ছুটীর পরে যথারীতি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উপাসনা ও নৈমিত্তিক আলোচনায় যোগদান, স্কুলের অধ্যাপনা ও নিজের পাঠ চলিতে লাগিল। ২৪এ জুলাই বেহার ন্যাশনাল কলেজের হলে 'Now or Never' নামক একটী (আমার ২য়) বক্তৃতা করিলাম। নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় সভাপতি ছিলেন। উপস্থিত যুবকদল বক্তৃতাটী মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিল।

এবৎসর আমার প্রধান পাঠ্যগ্রন্থ ছিল উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় লিখিত "আচার্য্য কেশবচন্দ্র"। আমাদের সায়ংকালীন আলোচনা যে দিন রাত্রি ১২ টায় শেষ হইত, সে দিনও আমি তৎপরে অন্ততঃ এক ঘণ্টা উহা পড়িতাম। কয়েক বৎসরে এই বিপুলায়তন গ্রন্থখানির প্রকাশ সমাপ্ত হয়। আমি উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলাম।

১লা ভাদ্র ১৩০৪ (১৭ই আগষ্ট ১৮৯৭) রাত্রি ১২।৫০ সময়ে আমাদের দ্বিতীয় পুত্র (ডাকনাম খোকা) জন্মগ্রহণ করে। প্রসূতি এবারও কয়েকদিন জ্বরে ভুগিলেন। তাঁহার সুস্থ ও সবল হইবার পক্ষে এই একটা প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল যে, তখন আশ্রমের বাটীতে মৎস্য মাংস রন্ধন নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং প্রসূতির জন্য স্কুলের বাড়ী হইতে দারোয়ানের দ্বারা মাছ রাঁধাইয়া আনাইতে হইত; সে নিজেদের দস্তুর মত ঝোলে খুব লঙ্কা দিত।

দুই তিন মাস বয়সে শিশুটীর মস্তকের পশ্চাতে দুরন্ত বিসর্প (erysipelas) রোগ হইল। জননী সমস্ত রাত্রি তাহাকে নিজের

বুকের উপরে শোয়াইয়া রাখিতেন। পরেশবাবুর চিকিৎসায় সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল।

২৭এ সেপ্টেম্বর আঙ্গলো-সংস্কৃত স্কুলে রামমোহন রায়ের স্মৃতি সভায় আমি অন্যতম বক্তা ছিলাম। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

৮

জীবনমরণের সন্ধিস্থলে

বাঁকিপুর আমার স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। সেখানে যাইবার কয়েকদিন পরেই জ্বরে ভুগিলাম। ১লা ফেব্রুয়ারী দুধসাগু খাইয়া পড়াইবার কাজ আরম্ভ করিলাম। শ্রাবণ মাসে চোখ উঠিল; সে এমন বিষম চক্ষুরোগ, যে পূর্ব্ব বা পরে জীবনে তেমন দুঃসহ অভিজ্ঞতা আর হয় নাই। তীব্র বিরামবিহীন বেদনায় মোটেই ঘুমাইতে পারিতাম না। এক একদিন সকাল হইতে সুরু করিয়া সারাদিন সারারাত্রি একক্রমে যন্ত্রণা চলিত; কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও বসিয়া, কখনও শুইয়া চীৎকার ও ছটফট করিতেছি। প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইল; তাহাতে আরাম না হওয়াতে খাঁ বাহাদুর আসদার আলী খাঁ আসিলেন। এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া ধীরে ধীরে প্রায় তিন সপ্তাহে নিরাময় হইলাম।

শারদীয় অবকাশে কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া উঠিলাম। তারপর ৯ই ডিসেম্বর যে জ্বর হইল, তাহা একেবারে যমের দুয়ার দেখাইয়া দিল। দুই তিনদিন পূর্ব্ব হইতেই শরীর খারাপ বোধ হইতেছিল, কিন্তু সাবধান হই নাই; পূর্ব্বদিনও ব্যারিষ্টার মিঃ উপেন্দ্রমোহন

দাসের পুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে পড়াইয়া আসিলাম। প্রথম হইতেই জ্বরের গতি আশঙ্কাজনক দেখা গেল। আজ জ্বর যত ডিগ্রী উঠিল, কাল তার চেয়ে আধ ডিগ্রী বেশী, আজ যতখানি নামিল, পরদিন তদপেক্ষা আধ ডিগ্রী কম, ঠিক এই নিয়মে দিনের পর দিন জ্বরের বেগ বাড়িয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকট শিরোবেদনা ও উদরাময় এবং অন্যান্য উপসর্গ ছিল। নিদ্রা হইত না বলিলেই হয়। ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় (L. M. S.) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিলেন, ২১ দিনে জ্বর ছাড়িল। প্রথম অন্নপথ্যের দিন ঘরগুলির চূণকাম হইল, আমি আর্দ্র ঘরেই রাত্রি কাটাইলাম, আমার বা অপর কাহারও খেয়াল হয় নাই, যে কাজটা অত্যন্ত অসঙ্গত হইতেছে। পরদিন ভাত খাইবার পরে বৈকালে আবার জ্বর আসিল ; দুই একদিন পরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আসদার আলী আহূত হইলেন। দ্বিতীয় বারের জ্বরের আক্রমণে আনুষঙ্গিক উপদ্রব এবং দেহের যন্ত্রণা বাড়িল, প্লীহা বৃদ্ধি, গলা দিয়া রক্তস্রাব, renal dropsy এবং অতিসার দেখা দিল। ক্রমশঃ উঠিয়া বসিবার শক্তি লোপ পাইল। ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে বিহারে ভীষণ শীত। ডাক্তার আসদার আলী আমাদের গলিতেই বাস করিতেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে রোগী দেখিতে বাহির হইয়াই প্রথমে আমাকে দেখিতেন; দুপ্রহরে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে আবার আসিতেন, এবং রাত্রিতে আর একবার দেখিয়া যাইতেন। ৯ই ডিসেম্বর জ্বরের আরম্ভ হইতে পঁয়ত্রিশ দিনের দিন প্রাতঃকালে ও দুপ্রহরে পরীক্ষা করিয়া আশঙ্কাজনক কিছুই পাইলেন না ; রাত্রিতে অকস্মাৎ দেখিলেন, double pneumonia at an advanced stage. দুই দিকেই ফুস্‌ফুসের প্রদাহ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। ডাক্তার সাহেব পরে বলিয়াছিলেন,

হঠাৎ রোগীর এই অবস্থা দেখিয়া এত শীতের মধ্যেও তাঁহার গায়ের জামা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল।

আমার গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া একে একে রমণী, দাদা, শাশুড়ীঠাকুরাণী ও সতীশ আসিলেন। তখন উত্তর ভারতে প্লেগ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য রেলপথের অনেক স্থানে যাত্রীদিগের আটক-খানা ছিল। সতীশ লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া কোথাও নদীর দক্ষিণ তীর হইতে উত্তর তীরে যাইয়া, আবার কোথাও বা উত্তর তীর হইতে দক্ষিণ তীরে আসিয়া বহুকষ্টে বাঁকিপুরে উপনীত হইয়াছিলেন।

আমার যে নিমোনিয়া হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম আরোগ্যলাভের পরে। আমার দুর্ভাবনা হইয়াছিল প্লীহার জন্য, তবে নানা আয়োজন দেখিয়া বুঝিলাম, গুরুতর একটা কিছু হইয়াছে। তখনই বাজার হইতে ফ্লানেলের জামা আনাইয়া আমাকে পরাইয়া দেওয়া হইল; বুকে স্পঞ্জিয়া (spongia) জড়াইয়া তার উপরে ফ্লানেল কয়েক ভাঁজে বাঁধা গেল; বিছানার চাদরের নীচে কম্বল রহিল। পরে শুনিয়াছিলাম, গুরুদাসবাবু নিমোনিয়ার কথা শুনিয়াই হতাশ হইয়া "রজনীকে আর বাঁচান গেল না," এই বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন; দাদা সারা রাত্রি আমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জ্বরের গোড়ার দিকে শাস্ত্রী মহাশয় আশ্রমে ছিলেন; তিনি নিঃশব্দে আমার ঘরে আসিতেন, নিঃশব্দে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাহির হইয়া যাইতেন। সতীশ ঘরে ঢুকিলেই মনে হইত, চারিদিকে আলোক ছড়াইয়া পড়িল।

এই জীবনমরণের সংগ্রামের কালে একটা অলৌকিক বাণী শুনিলাম। গভীর রাত্রিতে একাকী বিছানায় পড়িয়া আছি, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, হঠাৎ শুনিলাম, কে বলিল, "তুই ভাল হবি।"

কোনও মানুষ দেখি নাই, কিন্তু কথাটা শুনিয়াই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছয় বৎসর পরে পত্নীর পীড়ার মধ্যে আবার বাণী শুনিয়াছিলাম; দুইটীই সত্য হইয়াছিল।

জ্বর কখনও বাড়ে, কখনও কমে। মাঘোৎসবে হেমচন্দ্র কলিকাতায় গেলেন; গৃহিণী তাঁহার হাতে দুইটী টাকা দিয়া আমার জন্য একজোড়া চটী জুতা আনিতে অনুরোধ করিলেন। হেম সেখানে শুনিলেন, আমার জ্বর আবার বাড়িয়াছে, তিনি আসিয়া টাকা দুটী ফেরৎ দিলেন, চটী জুতার আর প্রয়োজন হইবে না।

একদিন অর্দ্ধচেতনার মধ্যে, "স্বর্গলোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি" এই শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলাম। আর একদিন জাগ্রত অবস্থায় অন্তরে অনুভব করিলাম, ঈশ্বর আমাকে বলিতেছেন, ভয় নাই, আমি তোমার সঙ্গে আছি।" প্রথম আক্রমণ হইতে উনপঞ্চাশ দিনে জ্বর ত্যাগ হইল।

মাঘ মাসে (জানুয়ারী, ১৮৯৮) সূর্য্যগ্রহণ হইল; উত্তর ভারতে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল; এজন্য দিগ্‌দিগন্ত হইতে বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া বক্সারে সমবেত হইয়াছিলেন। সতীশের যত্নে আমি বিছানায় শুইয়াই আয়নার সাহায্যে গ্রহণ দেখিয়াছিলাম।

শয্যাগত থাকিয়াই অন্নপথ্য পাইলাম। আমার জন্য চিকিৎসক জ্বরের মধ্যে মাংসের যূষ ও পরে মাছ খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সুতরাং পূর্ব্বেকার নিষেধবিধি শিথিল করা হইয়াছিল। আস্তে আস্তে একটু একটু হাঁটিতে সুরু করিলাম। বাটীর বাহিরে যাইবার মত বল লাভ করিতে মার্চ্চ মাস শেষ হইল।

আমার আরোগ্যোপলক্ষে একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমে উপাসনা হইল; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

প্রায় দুই মাসব্যাপী রোগভোগ ও তৎপরে মাসাধিককালস্থায়ী শারীরিক দৌর্ব্বল্যের মধ্যে পত্নী যেরূপ ঐকান্তিকচিত্তে আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার সাধ্য নাই। আশ্রমের আত্মীয়বন্ধু পুরুষ স্ত্রীলোক, রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের যুবকগণ, অগ্রজ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সকলের নিকটেই আমি ঋণী। সতীশচন্দ্র আমার চিকিৎসার সাহায্যার্থ দশ টাকা ধার করিয়া তাহার দশ টাকা সুদ দিয়াছিলেন, একথা দুই বৎসর পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। ডাক্তার আস্‌দার আলী প্রতিদিন তিনবার দেখিয়া একবার দুই টাকা দর্শনী লইতেন, তাহাতেও তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরে প্রায় দশ বৎসর তিনি আমার ও আমার পরিবারস্থ সকলের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমাকে তিনি অকৃত্রিম প্রীতি করিতেন, ১৯২৭ সনেও তাহার পরিচয় পাইয়াছি। প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন।

চিকিৎসার ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইল, তাহা গুরুদাসবাবুই জানিতেন।

বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার প্রশ্ন উপস্থিত হইল। কাকিনার রাজার অনুগ্রহে আমি দার্জ্জিলিংএ লাউইস জুবিলি স্যানিটেরিয়ামে দুই মাসের জন্য তাঁহার একটী ফ্রি বেড্‌ প্রাপ্ত হইলাম। ভাই প্রকাশদেব পূর্ব্ববৎসর বহুমূত্রে আক্রান্ত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন; তিনি এবারও একটী ফ্রি বেড্‌ পাইলেন। স্থির হইল, আমরা দুইজন এপ্রিল মাসে দার্জ্জিলিং যাইব। তৎপূর্ব্বে বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের পুত্রকন্যার নামকরণের নিমন্ত্রণ পাইয়া ভাই শ্রীরঙ্গবিহারী ও আমি সপরিবারে দুই রাত্রির জন্য ডুমরাও গেলাম। তার কয়েকদিন পরে, শ্রীরঙ্গের বিবাহ উপলক্ষে আমরা কলিকাতায়

প্রায় এক সপ্তাহ থাকিলাম। চৈত্র মাসে, গুড্‌ফ্রাইডের দিন, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষের ভগিনী শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত ব্রহ্ম-মন্দিরে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হইল, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যরূপে বিবাহ দিলেন।

একদিন আমি ডাক্তার নীলরতন সরকারের নিকটে গেলাম; তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, প্লীহাবৃদ্ধি সারিয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিং বাসের উপযোগী শীতবস্ত্র ফ্লানেলের সার্ট, আলোয়ান, পট্টুর কোট ও পায়জামা প্রভৃতি—প্রায় সমস্তই শ্রীরঙ্গ ধার দিলেন।

৯
দার্জ্জিলিং-দর্শন

১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বৈকালে ৩৫৭ মিনিটের মেলগাড়ীতে উঠিয়া ভাই প্রকাশদেব ও আমি পরদিন অপরাহ্ণে দার্জ্জিলিংএ উপনীত হইলাম। দামুকদিয়া-সারাঘাটে ষ্টীমারে পদ্মা পার হইতে হইল। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং রেলপথনির্ম্মাণে এঞ্জিনিয়ারের কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পথের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর, কিন্তু বৃষ্টির জন্য অধিক দেখিতে পারি নাই। প্রকাশদেবজী স্বাস্থ্য-নিবাসের পরিচিত যাত্রী, তিনি সঙ্গে থাকিতে আমাকে কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। আমরা দুইজন একটী তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষ পাইলাম। স্যানিটেরিয়ামে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহাতে বঞ্চিত থাকিতে হইল।

স্বর্ণলতা ১৮ই তারিখ বাঁকিপুরে ফিরিয়া গেলেন; তাঁহাকে দেখিবার শুনিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় পরিচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তকে রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

দার্জ্জিলিংএ পঁহুছিয়া মনটা প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনায় বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছিল, পরদিন হইতে ক্রমশঃ প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল।

এই স্যানিটেরিয়াম স্বাস্থ্যকামী বাঙ্গালীদিগের একমাত্র শৈল-নিবাস। ইহার সমুদায় বিধিব্যবস্থা পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিতেছে; এতদপেক্ষা সুপরিচালিত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বঙ্গ ও আসামের আর কোনও পাহাড়ে নাই। স্বাস্থ্যনিবাসের দুইটী বিভাগ—সাধারণ ও গোঁড়া (General & Orthodox)। উভয় বিভাগেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটী শ্রেণী। তিনটীর মধ্যে দৈনন্দিন দেয় অর্থের তারতম্য, সুতরাং বাসগৃহ ও আহারেরও তার-তম্য আছে। আমরা তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত ছিলাম। আমাদের কয়টীর একাংশে একটু আলোকের অভাব ছিল, কিন্তু মোটের উপরে মন্দ ছিল না। আহার্য্য মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে যথেষ্ট পাইতাম, রান্নাও উৎকৃষ্ট হইত। ঘড়ি ধরিয়া আহার করিতাম। সকালে হালুয়া ও বৈকালে ৪টার সময় চারিখানা লুচি—আমার পক্ষে অপ্রচুর, বলাই বাহুল্য। দুপ্রহরে নিরামিষ খাদ্য, ডাল, ডালনা প্রভৃতি চারি পাঁচ পদ এবং এক এক পোয়া দুধ; রাত্রিতে ডাল, ডালনা এবং মাংস। আমি দুইদিন পর একদিন নিজের রুচিমত মাছ খাইতাম। প্রকাশ দেবজী বহুমূত্র রোগী ও নিরামিশী, তাঁহার জন্য মাখন ও দুধের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল; সাধারণ বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা চারিজন ছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ এক এক জনের জন্য রোজ এক টাকা পাইতেন, কিন্তু কোন কোন রোগীর ঔষধপথ্যে পাঁচ ছয় টাকা ব্যয় হইত। বাসের কক্ষ, আহার, ঔষধ পথ্য—যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই দৈনন্দিন দেয় টাকার অন্তর্ভূত ছিল।

দার্জ্জিলিং প্রবাসীর প্রধান কাজ, খাও আর বেড়াও, আর খাও।

সেখানে যাইয়াই প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইয়াছিল। "দার্জ্জিলিঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য মধুর, মধুর, মধুর ; চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার।" (পত্র)

আমরা দুইজন সকালে বৈকালে খুব বেড়াইতাম। ভাইজী পথপ্রদর্শকের কাজ করিতেন। কখন কখনও আরও দুই একটী সঙ্গী জুটিত। দর্শনীয় সমস্তই দেখিলাম, একদিন ভাই প্রকাশদেব ও আমি সহরের উত্তর প্রান্তে St. Joseph's College দেখিলাম। সুবৃহৎ বাটী, পরিপাটী বন্দোবস্ত ; অধ্যক্ষ আমাদিগকে যত্নপূৰ্ব্বক পাঠাগার, ভোজনাগার, শয়নকক্ষ, স্নানের ঘর, ব্যায়ামশালা, রোগী থাকিবার ঘর, সমস্তই দেখাইলেন। কলেজটী রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত জেসুইট ফাদারদিগের ; বাটী নির্ম্মাণের অধিকাংশ অর্থ এদেশের রাজামহারাজা ধনীরা দিয়াছেন। আর একদিন আমরা বাঙ্গালী, মারাঠী প্রভৃতির একটী নাতিবৃহৎ দল প্রত্যূষে রেলে ঘুম-ষ্টেসনে যাইয়া হাঁটিয়া সিঞ্চল গেলাম, আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেখান হইতে এভারেষ্ট (Mt. Everest) দেখিব ; কিন্তু আমরা তথায় পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই শিখরদেশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, আমরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমি পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা কবিতা লিখিলাম, দার্জ্জিলিংএ আরও দুই একটী লিখিয়াছিলাম।

ভাই প্রকাশদেব ও আমি প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্ন ৩ টার সময় একত্র বসিতাম ; তিনি প্রার্থনা করিতেন, আমি কোন কোন দিন বাইবেল হইতে একটু পড়িতাম ও সঙ্গীত করিতাম। এই তেজস্বী, বিশ্বাসী, ভক্ত ও সেবাপরায়ণ পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মাসাধিক কাল বাস করিয়া আমি সাতিশয় উপকৃত হইলাম। তিনি সরস সদালাপী লোক ছিলেন।

২০এ বৈশাখ (২রা মে) সোমবার স্বর্ণলতার ষড়্বিংশ জন্মদিনোপলক্ষে সকালে সাড়ে পাঁচটার সময় উপাসনা হইল। ভাই প্রকাশদেব আরাধনার পরে একটা চমৎকার প্রার্থনা করিলেন, আমিও প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে তিনি উর্দ্দু ভাষায় প্রার্থনাটী বলিয়া গেলেন, আমি বাংলা অক্ষরে লিখিয়া লইলাম। প্রার্থনা দুইটী ও জন্মদিনের উপহারস্বরূপ একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা পত্নীকে পাঠাইয়া দিলাম।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে সংবাদ পাইতেছিলাম, বাঁকিপুর সাধনাশ্রমে অত্যন্ত অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে। আমার স্ত্রীর হাতে পোষ্টকার্ড কিনিবার একটা পয়সা নাই, তাঁহার ও শিশুদিগের রোগে ঔষধ জুটিতেছে না, আশ্রমবাসীরা দুইবেলা উদর পূরিয়া আহার করিতে পারিতেছেন না। এই দারুণ ক্লেশের বার্ত্তা অবগত হইয়া আমার দার্জ্জিলিং বাসের স্ফূর্ত্তি চলিয়া গেল। আমরা অর্থসংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম, এবং হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া উকীল, হাকিম, শিক্ষক প্রভৃতি ভদ্রলোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া যাহা পাইলাম, বাঁকিপুরে পাঠাইয়া দিলাম। যেটুকু হইবার প্রকাশদেবজীর জন্যই হইল, আমাকে কেবা চিনিত, কেবা টাকা দিত। ৯ই মে আমরা বর্দ্ধমান-রাজের ম্যানেজার রাজা বনবিহারী কাপুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। প্রকাশদেবজী পঞ্জাবী জানিয়া "আমিও পঞ্জাবী" বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি খুব হৃদ্যতা প্রকাশ করিলেন। ভাইজী আশ্রম ও স্কুলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি লিখিত আবেদনপত্র দিতে বলিলেন। সেই দিনই বৈকালে উহা লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। পরে স্কুলের জন্য একশত টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

তারপর স্ত্রী ও পুত্রকন্যার গুরুতর পীড়ার খবর আসিতে লাগিল।

১২ই তারিখের পত্রে অবগত হইলাম, ৯ই মে পত্নী অজ্ঞানের মত হইয়াছিলেন। পরদিন তাঁহার পত্রে সংবাদ পাইলাম, খোকা (২য় পুত্র) নিমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, জ্বর, প্লীহাবৃদ্ধি ও যকৃতের পীড়ায় ভুগিতেছে, অলির ১০৫'৪ জ্বর হইয়াছে। তখনই গুরুদাসবাবুকে তার করিলাম, "সন্তানদিগের জন্য ভয় হইতেছে, এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাকুন; আমার যাওয়া আবশ্যক কিনা, তার করিয়া জানাইবেন।" রাত্রি আটটার পরে পুরুলিয়া হইতে সতীশের এক টেলিগ্রাম পাইলাম; তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বাঁকিপুর হইতে সেখানে গিয়াছিলেন। "আমি খোকার পীড়ার জন্য বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইতেছি, তুমি দার্জ্জিলিংএই থাক।" আমার অনুপস্থিতিকালে তিনি পত্নী ও সন্তান-দিগের সবিশেষ তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। পরদিন তারে গুরুদাস-বাবুর উত্তর পাইলাম, "অলির জ্বর নাই; খোকা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল; অপেক্ষা কর, সমস্ত বিবরণ পাঠাইতেছি।" আমি আপাততঃ ভাল খবরের প্রত্যাশায় রহিয়া গেলাম।

দার্জ্জিলিংএ থাকিয়া এক মাসের মধ্যেই আমার শরীরের বেশ উন্নতি হইয়াছিল, ওজন বার সের বাড়িয়াছিল। কিন্তু শিশু দুটীর রোগ সারিল না; সুতরাং আমি ১৮ই মে বুধবার সকাল ১০।৫০ মিনিটের গাড়ীতে দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিলাম। পার্ব্বতীপুর পর্য্যন্ত একরকম কাটিয়া গেল, যদিও রাত্রিতে সামান্য আহারই জুটিল। পার্ব্বতীপুরে অত্যধিক ভিড়ের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ঢুকিতে না পারিয়া মণিহারিঘাট পর্য্যন্ত মধ্যম শ্রেণীর টিকেট করিলাম। পরদিন দুপ্রহরে সাহেবগঞ্জ পঁহুছিয়া এক হোটেলে থালাবাটীতে ভাত ডাল তরকারী খাইয়া আবার রওনা হইলাম। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি লোকে পরিপূর্ণ; কায়ক্লেশে বসিবার স্থান পাইলাম। তদুপরি জ্যৈষ্ঠের

ভীষণ উত্তাপ ; সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গরমে, পিপাসায়, শিরোবেদনায় যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, চল্লিশ বৎসরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই ; এক এক বার মনে হইল, অচেতন হইয়া পড়িব। সন্ধ্যার পরে ক্লেশের কিঞ্চিৎ উপশম হইল। মোকামায় এক হোটেলে ভাত খাইয়া মধ্যম শ্রেণীতে টিকেট বদলাইয়া রাত্রি দুপ্রহরে, প্রায় ৩৭ ঘণ্টা রেলগাড়ীতে কাটাইয়া সাধনাশ্রমে উপনীত হইলাম, এবং পরম পিতার কৃপায় আবার প্রিয়জনদিগের সহিত মিলনের আনন্দলাভ করিলাম।

আমি অসময়ে পুত্রকন্যাদিগের পীড়ার জন্য ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু কিছুদিন তাহাদিগের পরিচর্য্যা কিছুই করিতে পারিলাম না। আমাদের বাড়ীটী প্রখর গ্রীষ্মের সময় বড়ই কষ্টদায়ক ; এজন্য ২৬এ মে গুরুদাসবাবু সপরিবারে স্কুলের বাটীতে চলিয়া গেলেন, এবং দুই একদিন পরে তাঁহার আহ্বানে আমরাও সেখানে গেলাম। যাইবার পরেই ২৯এ তারিখ, আমার চোখ উঠিল। পীড়া গত বারের মত তীব্র না হইলেও সারারাত্রি যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারিলাম না। অনিদ্রার মধ্যে আমার প্রথম সঙ্গীত "মাগো কেন করি মুখ ম্লান," এই গানটী রচিত হয়। রাত্রি ১২টার সময় স্বর্ণলতা ও সুকুমারী উহা লিখিয়া রাখেন। পরদিন একটা দেশীয় ঔষধের চূর্ণ চোখের পাতার উপরে দিয়া সুনিদ্রা হইল। তৎপরে ডাক্তার আসদার আলীর চিকিৎসায় ব্যারাম সারিয়া গেল।

১০

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন

সন্তানগণের পীড়া—বাড়ী-পরিবর্ত্তন

২০এ জুন, গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে, ছয় মাস পরে, স্কুলের কার্য্যে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে খোকাকে লইয়া বিব্রত থাকিতে

হইল। সেই যে মে মাসের গোড়ায় তাহার জ্বর আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি কমিয়া বা সারিয়া গেলেও জ্বর ছাড়িল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মাসাধিক কালেও ফল না দেখিয়া ডাক্তার আসদার আলীর হাতে রোগীর ভার দিলাম। তিনি দুই মাস ধরিয়া ঔষধ দিয়া দিয়া হয়রান হইয়া পরিশেষে ঔষধ বন্ধ করিয়া বাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। আমরা ৩১এ জুলাই মোরাদপুরে একটী উৎকৃষ্ট দোতলা বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। বাড়ীটী বৃহৎ, সম্মুখে বড় আঙ্গিনা, পশ্চাতে আঙ্গিনা ও বাগান, একতলায় অনেকগুলি ঘর, আমাদের পক্ষে দোতলার খোলার চালার তিনটী ঘরই যথেষ্ট হইল। সব কয়টীরই পূর্ব্বপশ্চিমে উন্মুক্ত বারাণ্ডা, আলো-বাতাসে মনোরম; বিহারে এইপ্রকার বাড়ীই স্বাস্থ্যকর ও আরাম-দায়ক। এখানে যাইবার কয়েকদিন পরেই খোকার জ্বরত্যাগ হইল।

২০এ আগষ্ট সায়ংকালে পাটনা কলেজের ল্যাবরেটরীতে 'শিক্ষা' (Education) বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। লোক মন্দ হয় নাই, কতিপয় অধ্যাপক ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার অপ্রশংসা শুনি নাই।

এই বক্তৃতার সম্পর্কে একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ এ. সি. এডোয়ার্ডস্ ল্যাবরেটরীতে বক্তৃতা করিবার অনুমতি দিবার সময়ে বলিয়া দিয়াছিলেন, উহাতে যেন দীপ আনয়ন করা না হয়। বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইল, অন্ধকারে আমার লিখিত চুম্বক পড়িতে পারিলাম না, তখন একটী মোমবাতি জ্বালিয়া আমার সম্মুখে রাখা হইল। পাটনা কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন, তিনি আপত্তি করেন নাই। পরদিন অধ্যক্ষ মহাশয় এই সংবাদ শুনিয়া একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্কুলে আমাদিগকে রূঢ় ভাষায়

লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধে তিনি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন, যেন সরকারী বৃত্তিধারী কোনও ছাত্র রামমোহন রায় সেমিনারীতে পড়িতে না পারে, অথবা উহার কোনও ছাত্রকে সরকারী বৃত্তি দেওয়া না হয়। প্রত্যুত্তরে আমরা বলিলাম, বক্তৃতার সহিত স্কুলটির কোনই সম্বন্ধ নাই। তখন তিনি লিখিলেন, "আচ্ছা, আমি এবার ক্ষান্ত হইলাম, যদিচ রামমোহন রায় সেমিনারীর সেক্রেটারী বক্তৃতার ব্যবস্থা এবং হেড্‌মাষ্টার বক্তৃতা করিয়াছিলেন।" সাহেবী মেজাজ বটে !

২৭এ সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলাম। এঙ্গ্‌লো-সংস্কৃত স্কুলে সভা হইল, উকীল গজাধর প্রসাদ সভাপতির কার্য্য করিলেন। পাঁচ ছয় জন বক্তার মধ্যে আমিই প্রধান বক্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম. পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বক্তৃতা শেষ হইল। ভাষা ও তথ্যসংগ্রহের যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনিলাম, কিন্তু আমার উচ্চারণের নিন্দাও অনেকেই করিলেন।

ইতোমধ্যে ভ্রাতা হেমচন্দ্র সরকার ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের বৃত্তি পাইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে বিদায়পত্র দিল, আমি উহা লিখিয়া দিয়াছিলাম।

মোরাদপুরের বাড়ীটি এক মুন্সেফ বদলী হইবার পরে আমাদিগকে ভাড়া দিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া আমরা ১লা অক্টোবর মাখনিয়া কূয়ায় এক ছোট পাকা দোতলা বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। এখানে আমরা ছয়মাস ছিলাম, এবং সকলে মোটের উপরে ভালই ছিলাম। এই বাড়ীতেই আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু সতীশচন্দ্র রায় কিছুদিন সপরিবারে আমাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন।

১৯এ অক্টোবর (৩রা কার্ত্তিক) বুধবার আমার ৩১শ ও সত্যব্রতের ৫ম বার্ষিক জন্মদিনে প্রাতঃকালে আমাদের গৃহে উপাসনা হইল, গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, সতীশ ও আমি প্রার্থনা করিলাম। এই উপলক্ষে আমার একটী নূতন গান গাহিলাম।

১১
আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা

রামমোহন রায় সেমিনারী হইতে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া নিদ্ধারিত হইয়াছিল। শীতঋতুর প্রাক্কালে শাস্ত্রী মহাশয় বাঁকিপুরে আসিয়া আয়ব্যয়ের একটা ব্যবস্থা বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। জুলাই কি আগষ্ট মাস হইতে আমি দুইটী ছাত্র পড়াইতাম। একটী বিহারের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র সারদাপ্রসাদ; সারদাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইবার মানস করিয়া প্রারম্ভিক প্রস্তুতির জন্য সেন মহাশয় কয়েকজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি পড়াইতাম লাটিন, ইংরেজী ও ইতিহাস, মাসে ত্রিশ টাকা পাইতাম। দ্বিতীয়টী জমিদার হরবংশ সহায়ের পুত্র জগতানন্দ, চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; তাহাকে ইংরেজী পড়াইয়া ত্রিশ টাকা ও গাড়ীভাড়া পাইতাম। শাস্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা করিলেন, আমি বাড়ীভাড়া (১২৲), তিনটী শিশুসহ পাঁচজনের আহারাদি, এবং ঝি (৩৷৹) ও জীবনবিমা (৬৷৴) বাবদে মোট পঞ্চাশ টাকা পাইব। স্কুল হইতে দশ টাকা দেওয়া হইবে, প্রতিমাসে কুড়ি টাকা ঋণ শোধ করিব। কিন্তু হিসাব হইতে কাপড়চোপড়, গাড়ীভাড়া বাদ পড়িল। এই সময়ে আমার ঋণের পরিমাণ ছিল তিনশত ত্রিশ টাকার উপরে। ছাত্র

পড়াইয়া যে আয় হইবে, তদনুপাতে স্কুলের বৃত্তি বাড়িবে বা কমিবে। বাঁকিপুরে আসিবার সময়ে স্ত্রীর বালা বন্ধক দিয়া পঞ্চাশ টাকা ধার করিয়াছিলাম; তাহা উদ্ধার করিলাম, অল্পসল্প অপর কিছু ঋণও শোধ হইল। ১৮৯৯ সনে জগতানন্দের বি. এ. পরীক্ষা ও সারদার বিলাত যাত্রার পরে উক্ত আয়ের পথ বন্ধ হইল।

এই শিক্ষকতার ব্যাপারে আমাকে খুব খাটিতে হইত। স্কুলে তিন ঘণ্টা ও দুই বাড়ীতে দুই ঘণ্টার উপরে পড়াইতাম, গৃহে বিস্তর পুস্তক পড়িতাম। ইহাতে আমার খুব উপকার হইয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃকালে সাধনাশ্রমের উপাসনায় যোগ দিবার অবসর পাইতাম না।

মাঘোৎসবে (১৮৯৯) কলিকাতায় গেলাম। প্রথম প্রথম ভাল লাগে নাই। ১২ই মাঘ ১১ই অপেক্ষা ভাল বোধ হয়। ১৪ই শনি বার সকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করি। শত শত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। মাঝে মাঝে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কথা হয়। শনিবার রাত্রিতে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত মন্দিরের গ্যালারীতে সাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসুরূপে আলাপ করিলাম। তিনি তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করেন—

১। নামসাধন। কোনও সাধুর নিকট হইতে লইতে পারিলেই ভাল হয়, নতুবা নিজের যে নাম ভাল লাগে।

২। ইন্দ্রিয়সংযম। Those who are married should live as though they were unmarried.

৩। নিরামিষভোজন, অগত্যা মাংসবর্জ্জন।

কয়েকটী নবসংকল্প লইয়া ১৫ই মাঘ বাঁকিপুরে ফিরিলাম। প্রতি শনিবার সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে (চৌহাট্টা)

পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলাম। ব্যাখ্যা অবশ্যই ইংরেজীতে। কিছুদিন এই কাজটী চলিতেছিল।

৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার (১৮৯৯) ভোর ৪।২০ সময়ে ভ্রাতা শ্রীরঙ্গবিহারীলালের পত্নী কুমুদিনী প্রায় ২০ ঘণ্টা অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরে একটী মৃতপুত্র প্রসব করেন। লেডী ডাক্তার মিসেস কোনেলী সমস্ত রাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিয়া প্রসব করাইতে পারিলেন না, তখন ডাক্তার আসদার আলীকে আহ্বান করা হইল, আমাকেও একটী ছাত্র বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া গেল। প্রসূতিকে ক্লোরোফর্ম্ম করিবার পরে ডাক্তার প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ফর্সেপ্‌স্ দ্বারা শিশুকে বাহির করিলেন। ততক্ষণ তাহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়াছে। প্রসূতিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। ব্যর্থ মাতৃত্বের বজ্রাঘাতে বধূমাতার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমবেদনার সূত্র ধরিয়া ইঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

তার পরেই ফেব্রুয়ারীর (১৮৯৯) শেষ সপ্তাহে গুরুদাসবাবুর আট মাস বয়সের দ্বিতীয়া কন্যা সাধনা মারাত্মক মস্তিষ্কের জ্বরে আক্রান্ত হইল। ডাক্তার আসদার আলী দিবারাত্রি তাহার জন্য খাটিলেন, শেষে সিভিল সর্জ্জেন ডাক্তার কব্‌কে (Cobbe) ডাকিতে পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁহাকে আনিতে গেলাম, তিনি শুনিয়াই বলিলেন, "I don't like brain-fever." রোগী দেখিবার পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "আট টাকা"। টাকা লইয়া আসিবার পূর্ব্বে ডাক্তার আসদার আলী গুরুদাসবাবুর সম্বন্ধে এমন কিছু বলিলেন, যাহা শুনিয়া কব্ সাহেব অর্দ্ধেক দর্শনীও গ্রহণ করিলেন না। ৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার সময় শিশুটী চলিয়া

গেল। মাতার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন বর্ণনার অতীত। কিন্তু দেখিলাম, গুরুদাসবাবু ১৮৯১ সনে প্রথম সন্তানশোক পাইবার পরে ধর্ম্মজীবনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি বীরের মত এই দুর্দ্দমনীয় শোক ধীরচিত্তে বহন করিলেন। পরদিন সতীশ, আমি ও অপর কেহ কেহ শ্মশানে যাইয়া শবের সৎকার করিয়া আসিলাম।

৩০এ মার্চ্চ (১৮৯৯) হইতে সাধনাশ্রমের সন্নিকটে খোদাবক্সের বাটীতে আমরা চারি পরিবার একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। বাড়ীটি বৃহৎ এবং উচ্চ, দক্ষিণমুখী, সম্মুখে বারান্দা ও আঙ্গিনা। সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গবিহারী ও আমরা সম্মুখের ঘর দুটীতে রহিলাম, পশ্চাতের কক্ষ-গুলি শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ তিন কন্যা এবং শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায়ের পত্নী তিন পুত্রকন্যার সহিত অধিকার করিলেন। পাকা ঘরগুলি ছাড়া খোলার ঘরও কতকগুলি ছিল, তাহাতে রন্ধন প্রভৃতির কাজ চলিত। বিহারের দক্ষিণ-খোলা বাটী মোটেই আরামদায়ক নয়, এজন্য প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আমাদের বিপুলায়তন শয়নকক্ষে একটুও হাওয়া ঢুকিত না।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে শ্রীমান্ রমণী বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া পাটনা কলেজে পড়িতে আসিল। শ্রীরঙ্গবিহারীর স্ত্রী কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন, রমণী সেই ঘর দখল করিল। পর বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইল।

এবৎসরও পাটনা কলেজের হলে রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় অন্যতম বক্তা ছিলাম। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সি.আর. উইলসন।

১৪ই অক্টোবর অলির ৪র্থ বার্ষিক জন্মদিনে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় উপাসনা করেন। আরাধনা খুব সরস হইয়াছিল। তিনি ও আমি প্রার্থনা করি।

১২
দ্বিতীয়বার গয়ায় গমন

১৬ই অক্টোবর সোমবার পৌনে এগারটার গাড়ীতে ইন্দুবাবু ও রমণীর সহিত আমরা গয়া যাত্রা করি। ঠিক দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় বার সেখানে গেলাম। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দীর আবাসে আমরা উঠিলাম; তাঁহার স্ত্রী হাসপাতালের লেডী ডাক্তার ছিলেন, স্থানের খুবই সঙ্কীর্ণতা, বিশেষতঃ গোপালবাবু ও তাঁহার কন্যা হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন। প্রথমে বড়ই অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাঁহাদের যত্নে সে ভাব দূর হইল। মঙ্গলবার সকালে ইন্দুবাবু, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমণী, মান্ত ও আমি রামশীলায় আরোহণ করি, সেখানে একটী সঙ্গীত রচনা ও ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, কিছুকাল পরে চণ্ডীবাবু আরাধনা ও প্রার্থনা করেন। বৈকালে স্বর্ণলতা ও ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া ইন্দুবাবু ও রমণীর সহিত গাড়ীতে আকাশ-গঙ্গা ও ব্রহ্মযোনি দেখিতে যাই। বুধবার ৬॥ টার সময় সকলে বুদ্ধ-গয়ায় রওনা হই। সেখানে মন্দিরটী ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার পশ্চাতে যেখানে বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে সকলে বসিলাম। ইন্দুবাবু সরস প্রার্থনা করেন। আমি মনে মনে বুদ্ধের বৈরাগ্য ও সংযমের জন্য প্রার্থনা করি। তৎপরে একটী ছোট সামান্য ঘরে জাপান হইতে আনীত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মূর্ত্তিটী চমৎকার, উহাতে সংযম ও মঙ্গলভাব (Self-control and benignity) মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ফিরিবার পথে গদাধরের মন্দির ও বিষ্ণুপাদ দেখি। মন্দিরটী পাথরের, শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। বৈকালে ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাড়ী ও সাধু অঘোরনাথের

ভস্মরক্ষার স্থান দেখিলাম। বৃহস্পতিবার সকালে রামশীলার শিখরে আমার ও মান্তুর জন্মদিনের উপাসনা হইল। ইন্দুবাবু আরাধনা করিয়া উপাদেয় উপদেশ দিলেন, আমি প্রার্থনা করিলাম। ১১।৫০এর গাড়ীতে আমরা বাঁকিপুরে ফিরিয়া গেলাম। ইন্দুবাবুর সঙ্গ পাইয়া আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

১৩
খ্রীষ্টের উৎসব

২৫এ ডিসেম্বর সোমবার প্রাতঃকালে আশ্রমে বড় দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাতে সতীশ আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তৎপরে পৌনে দশটার সময় বাবু বিশ্বেশ্বর সিংহের বাঙ্গলায় উভয় সমাজের মিলিত উৎসব হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত দিননাথ মজুমদার; উপাসনা ও উপদেশ একটু দীর্ঘ হইলেও বেশ হইয়াছিল। পরে প্রীতিভোজন। ২৬এ মঙ্গলবার ১২টার পরে ঐ বাড়ীতেই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনা করেন; এক ঘণ্টার কিছু উপর; আরাধনা ও উপদেশ চমৎকার হইয়াছিল। তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"ঈশ্বরের সহানুভূতি আছে; তিনি আমাদিগের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী; তাহারই নিদর্শন ঈশা। তিনি হৃদয়ের বিনিময় শিখাইতে আসিয়াছিলেন। আমরাও সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত হৃদয় বিনিময় করি। তাঁহাকে শোক দিয়া শান্তি লই, পাপ তাঁহার চরণে রাখিয়া পুণ্যের মুকুট মাথায় পরি, রোগ দিয়া স্বাস্থ্যলাভ করি।"

১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মকালে হাইকোর্টের উকীল শালগ্রাম সিংহের পুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বরকে লাটিন ও ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করি। ছেলেটী কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে বাঁকিপুরে আসিয়া তাহার

জ্যেঠামহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বেহার ন্যাশনেল স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পুর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কাজটী ছিল, দক্ষিণা ছিল ত্রিশ টাকা।

১লা জানুয়ারী (১৯০০) সোমবার সাধনাশ্রমে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইল। প্রাতঃকালে গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। উপদেশের বিষয় ছিল পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তুইটার সময় প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত 'বৈরাগ্য ও প্রেম' এবং অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী 'নবনীতি' বিষয়ে পাঠ করেন। সতীশ শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা চারি পাঁচখানি পড়েন; বক্তব্য ঈশ্বরের প্রেম, হৃদয়ের মহত্ত্ব, সহানুভূতি ইত্যাদি; মোটের উপরে চিত্তাকর্ষক। সায়ংকালে আমাকেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইল। আজকার উৎসবটী বেশ লাগিয়াছিল।

১৪
মাঘোৎসব

৯ই মাঘ (২২এ জানুয়ারী) প্রাঃতকালে মহিলাসমিতি; প্রীতি-ভোজনের ব্যবস্থার ভার আমার উপরে ছিল। বৈকালে বালকবালিকা সম্মিলন।

১০ই মাঘ সায়ংকালে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা—বেশ হইয়াছিল।

১১ই সকালে গুরুদাসবাবু উপাসনা করেন। উত্তম হইল। উপ-দেশের বিষয়—ধর্ম্মজীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করা উচিত, সেই ভিত্তি দৈনিক উপাসনা।

মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন, তৎপরে আলোচনা।

সন্ধ্যার পরে সতীশ বেদি গ্রহণ করেন। আরাধনা খুব ভাল

হইয়াছিল। তারপরে তিনটি মহিলা ও একটি যুবক প্রার্থনা করেন। "আজ যথার্থ উৎসব হইল; হাওয়া ফিরিয়াছে।"

১২ই মাঘ পূর্ব্বাহ্নে সাধনাশ্রমের উৎসব, আচার্য্য গুরুদাসবাবু; উপাসনা বেশ হইয়াছিল; যথার্থ বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ হয়।

সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়া উৎসব শেষ হইল।

১৫

কলিকাতায় গমন—বাগানবাড়ীতে সাধনাশ্রমের উৎসব

১৬ই মাঘ (২৯এ জানুয়ারী) সোমবার গুরুদাসবাবু ও আমি সকালের গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি ৮টার সময় কলিকাতায় সাধনাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা দমদমার এক বাগানে গেলাম; সেখানে শাস্ত্রীমহাশয়প্রমুখ আশ্রমের সকলে পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। দশটার পরে উপাসনাতে শাস্ত্রীমহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয়—"আমরা যদি বাধা না দিই, তবে ঈশ্বরের শক্তি আমাদিগের মধ্যে অবাধে কাজ করিতে পারে। আমরা যেন তাঁহার সহিত প্রতিকূলতা না করি।"

মধ্যাহ্নে আলোচনা। "আলোচনাগুলি অনেক সময়েই বৃথা।"

সন্ধ্যার সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে বলি—"কিছুদিন হইতে আমার মনে এই ভাব আসিয়াছে, আমাকে একদিন direct spiritual work একটু করিতে হইবে। তার জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইব?"

শাস্ত্রী মহাশয়—"পারিবারিক উপাসনাটীকে ভাল করিয়া ধর। যাহা পড়িবে, পূর্ব্বেই দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিবে। বাঁকিপুর সমাজের কোন কোন কাজ করিতে পার। একটা কাজের ভার লইলে

মানুষ গড়ে। আমি সিন্দুরিয়াপটী সমাজের কাজের ভার পাইয়াছিলাম। সে জন্য খাটিতাম; এইরূপে আমি গড়িয়া উঠিয়াছি। ভাবটাকে ছাড়িও না। মেয়েদের লইয়া কিছু করিতে পার।”

আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঔদার্য্য ও সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়া মুগ্ধ হইলাম।

৩১এ জানুয়ারী বুধবার “সকালে একাকী একটা বড় বাগানে যাইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করি। ঐ ভাবটা জোরের সহিত মনে আসিতেছে। আমার যোগ্যতা কি? কিছুই না। কিছু কিছু কাজ না করিলেও জীবন গড়ে না।...পরিবারে নিয়মিত প্রার্থনা আরম্ভ হওয়া অবধি কত উপকার হইয়াছে। হে প্রভো, যে আলো দিয়াছ, তাহা আরও উজ্জ্বল হউক, যে বাণী শুনাইতেছ, তাহা আরও স্পষ্টরূপে শুনাও। তুমি যে কাজে নিযুক্ত করিবে, করিব।”

শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। উপদেশের মর্ম্ম, আমরা যেন ঈশ্বরের কাজের মধ্যে আপনাদিগকে না বসাই, আপনাদিগকে যেন সরাইয়া লইতে পারি।”

আহারের পর শাস্ত্রীমহাশয়কে বলি—“কাল যাহা বলিয়াছিলাম, সেই ভাবটা খুব জোরে মনে আসিতেছে। আমার অভিজ্ঞতা এই, যাহা কিছু পরিবর্ত্তন আমাদের জীবনে আসিয়াছে, তাহা প্রথমে অস্পষ্ট আলোকের ন্যায় হৃদয়ে আইসে। আমি হঠাৎ কিছু করি না। সেই আলো উজ্জ্বলতর হইলে, বাণী persistent হইলে, তবে বিশেষ চিন্তার পর তাহার অনুসরণ করি, এবং একবার অনুসরণ করিলে আর পশ্চাৎপদ হইতে হয় না। আমার মনে হয়, যে-আলোক হৃদয়ে আসিয়াছে তাহা persistent হইবে। বিশেষতঃ আমার বয়স হইয়া যাইতেছে, শক্তি সকল ক্রমে হ্রাস হইবে, সুযোগ চলিয়া যাইতেছে।

আমি যাহা করিতে পারি, এখন হইতেই করা উচিত। পড়াইবার কাজ আমার মন্দ লাগে না, তবে pressure কম হইলে ভাল হয়। আমি এক বৎসর সময় লইতেছি, চিন্তা ও প্রার্থনা করিব।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—"আলোককে অবহেলা করিও না। এক বৎসর অপেক্ষা কর, তারপর আগামী বৎসরের নূতন বন্দোবস্তের ২।৩ মাস পূর্ব্বে আমাকে লিখিও। তোমাদের যাহার যে শক্তি তাহা যাহাতে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে আমি তাহার সাহায্য করিব।"

সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় আশ্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মদিনোপলক্ষে শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করিলেন; শাস্ত্রী মহাশয় সুন্দর প্রার্থনা করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সাধনাশ্রমের উৎসব। সকালে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পাঁচজন সহায় হইলেন। বৈকালে আলোচনা। সায়ংকালীন উপাসনায় আচার্য্য ছিলেন আদিনাথবাবু।

২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ, সতীশ, শ্রীরঙ্গ, অবিনাশ, আমি ও আরও পাঁচজন সন্ধ্যার ট্রেণে বাঁকিপুরে যাত্রা করিলাম। হাওড়ার পথে গাড়ীর ছাদ হইতে শ্রীরঙ্গের শাল ও ধুতি চুরি গেল, ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে সতীশের জামার পকেট হইতে প্রায় ত্রিশ টাকা অন্তর্হিত হইল।

কলিকাতা হইতে (১) প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা, (২) কয়েক ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম্মের যোগ, (৩) সপ্তাহে একদিন মহিলাদের জন্য পাঠ, (৪) প্রকাশ্যে পাঠ ও ব্যাখ্যা, এবং (৫) ধর্ম্মগ্রন্থ বিশেষরূপে পাঠ, এই পাঁচটী সংকল্প লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

৯ই ফেব্রুয়ারী আমরা তিন পরিবার পুরন্দরপুরে শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেনের বাংলো বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলাম। বাড়ীটী তাঁহার বসত বাটীর বিস্তীর্ণ হাতার এক পার্শ্বে অবস্থিত, চারিদিক খোলা ; উহাতে আলোবাতাসের প্রাচুর্য্যই ছিল।

গ্রীক শিক্ষা

১৮৯৭ সনের ২৮এ সেপ্টেম্বর আমি Initia Graeca, Part I নামক প্রথম শিক্ষা পুস্তকের সাহায্যে গ্রীক লিখিতে আরম্ভ করি। অল্প দিন পরেই সুদীর্ঘ রোগ-ভোগের জন্য নূতন ভাষা শিক্ষার প্রয়াস স্থগিত রাখিতে হয়। প্রায় বৎসরান্তে পুনশ্চ গ্রীক পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৯৯ সনের ২৬এ মে ঐ পুস্তকখানি শেষ করি, এবং লাটিন শিক্ষায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, সেই পদ্ধতি অনুসারে প্রবেশিকা হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ এম্. এ. পরীক্ষার পাঠ্যাবলী পাঠ করিবার সংকল্প করি। কিন্তু নানা কাজের ঝঞ্চাটে সংকল্পটী কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, ফলতঃ ধারাবাহিকরূপে অবিচ্ছেদে গ্রীক শিক্ষার কার্য্যটী চলে নাই।

আমি বহু বৎসর ধরিয়া গ্রীক সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছি, এবং আমার সাহিত্যচর্চ্চা প্রধানতঃ তাহারই ফল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির জন্যই হউক, অথবা গ্রীক ভাষা লাটিন অপেক্ষা কঠিন, সে জন্যই হউক, কারণ যাহাই থাকুক না কেন, গ্রীক ভাষা লাটিন ভাষার মত আমার আয়ত্ত হয় নাই।

১৮৯৯ সনেই আমি একখানি ফরাসী ব্যাকরণ পড়ি। পরে ফরাসী ভাষায় দুই একখানি পুস্তকও পড়িয়াছিলাম। এখনও ফরাসী সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য বুঝিতে আমাকে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না।

১৭
সাহিত্যচর্চ্চার অস্ফুট উদ্যম

আমি যৌবনাবধি সাহিত্য সেবার সুখস্বপ্ন দেখিতাম। বাঁকিপুরে যাইবার পরেই, রামমোহন রায় সেমিনারী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, আমার আকাঙ্ক্ষা হইল, ভার্জ্জিলের ঈনিড্ নামক মহাকাব্য মূল লাটিন হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিব। তৎকালে সুবিদিত "নব্যভারত" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে প্রস্তাবটী জ্ঞাপন করিলে তিনি উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, সুতরাং আমার মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়া বিলীন হইল।

এই সময়ে সাহিত্যরথী শাস্ত্রী মহাশয় সমস্ত কল্পনা-জল্পনায় আমার পরামর্শদাতা ছিলেন। একবার তাঁহাকে বলিলাম, আমি ওয়াশিংটনের জীবনী লিখিব। ইনি কলিকাতায় যাইয়াই Irving's Life of Washington এবং Bancroft's History of the United States (Vol. I) পাঠাইয়া দিলেন। কাজে কিছুই হইল না। আর একবার কঠোপনিষেদের প্রথমা বল্লী, নচিকেতার উপাখ্যান, অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম, তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কিছুদিন পরে দ্বিতীয়া বল্লীর পদ্যানুবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ইহা চলিবে না," সুতরাং আমার অভিনব উদ্যম এই খানেই শেষ হইল। ১৮৯৮ সনের প্রারম্ভে নচিকেতার উপাখ্যানের শেষাংশ, পরলোকতত্ত্ব, দাসীপত্রিকার শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমারও জীবনপ্রদীপ শেষোন্মুখ।

শাস্ত্রী মহাশয় একদিন আমাকে ব্রাহ্মসমাজের স্থূল স্থূল ঘটনা সন তারিখসহ মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, আমি তাহা নোটবুকে

লিখিয়া লইলাম। তিনি আমাকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অনেকটা লিখিয়া রাখিয়াছি, তুমি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ কর।" তাঁহার History of the Brahmo Samaj ইহার অনেক বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। তিনি আমাকে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় একখানি পুস্তকের পরিকল্পনা বলিয়া দিয়াছিলেন। উহার অভাব আজিও পূরণ হয় নাই। ভবিষ্যতে কেহ কাজটী করিতে পারেন, এই আশায় নিম্নে অধ্যায় কয়টীর নাম প্রদত্ত হইল।

I. Historical Sketch.
II. Statement of Brahmo Doctrines.
III. Record of Reform Works.
IV. Record of Philanthropic Works.
V. Biographical Sketches of the Eminent Men of the Samaj.
VI. Hymnology ; Utsavas.
VII. Provincial Samajes.
VIII. Census ; List of Samajes.
IX. Workers.

১৮৯৯ সনের ২৬এ নবেম্বর "The Brahmo Samaj ; What it is, and what it is not," এই নামে কথোপকথনের আকারে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে অধ্যবসায় শ্লথ হইল ; অদ্যাপি উহা অসমাপ্তই আছে।

১৩০৬ সনের (১৯০০) ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "প্রদীপ" পত্রিকায় "প্রাচীন জর্ম্মণ জাতি" শীর্ষক আমার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

উহার মূলভাগে রোমক ঐতিহাসিক টাসিটাস (Tacitus) প্রণীত "জার্ম্মাণিয়া" (Germania) নামক পুস্তকের কতকগুলি অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ ও টীকার সাহায্যে প্রাচীন জর্ম্মণ জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রারম্ভে একটী উপক্রমণিকা ও শেষে উপসংহার আছে। বিগত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে "ভারতমহিলা" পত্রিকায় প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩০৮ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে, 'প্রবাসী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার "হিন্দু, গ্রীক ও রোমাণ" নামক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয় আমাকে উহার জন্য প্রতি পৃষ্ঠায় এক টাকা হিসাবে মোট আট টাকা দিয়াছিলেন।

১৮
রোগভোগ

২৭এ মার্চ্চ (১৯০০) আমার আবার স্বল্পবিরাম জ্বর হইল। ৯৮.৪ ডিগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন বাড়িতে বাড়িতে তাপ ২রা এপ্রিল ১০৩.৭° পর্য্যন্ত উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য মাথার বেদনা, গাত্রে জ্বালা প্রভৃতি ছিল। ৪ঠা এপ্রিল জ্বর ৯৮.২° নামিয়া আসিল, ১০ই (পঞ্চদশ দিনে) ছাড়িয়া গেল। ৭ই এপ্রিল (জ্বরের দ্বাদশ দিনে) অন্নপথ্য পাইলাম। এত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইব, আশা করি নাই।

ডাক্তার আসদার আলী দর্শনী বিনা যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেন। শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ ও তাঁহার কন্যাগণ ইন্দুবাবুর কন্যা সোহিনী, রমণী, সতীশ, রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের কয়েকটী যুবক এবং সুকুমারী শুশ্রূষার কার্য্য উত্তমরূপে চালাইলেন। পত্নীর কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিধাতার কৃপায় ইহার পরে ৩৮।৩৯ বৎসর আমি দীর্ঘকালব্যাপী জ্বরে ভুগি নাই।

১৯

বড় বৌদিদির পীড়া ও মৃত্যু

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় পক্ষে দাদা বৌদিদির সহিত আমাদিগের গৃহে দুই সপ্তাহ থাকিয়া দেরাদুনে চলিয়া গেলেন। রোগিণীর যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। সেখান হইতে তাঁহারা সমগ্র শীতকাল মুসুরী পাহাড়ে ছিলেন, তৎপরে উত্তরভারতের রেলপথে বরাবর দার্জ্জিলিং যাইয়া লাউয়িস জুবিলী স্যানিট্যারিয়ামে প্রায় এক বৎসর যাপন করেন। দাদা এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে একাকী পত্নীর যে প্রকার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা দুর্লভ। যখন আরোগ্যের আশা বিলুপ্ত হইল, তখন দাদা তাঁহাকে স্বগ্রামের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানেই ১৯০২ সনের গ্রীষ্মকালে বৌদিদি দেহরক্ষা করেন।

কন্যার পীড়া

এই বৎসর (১৯০০) বর্ষাকালে অলি দীর্ঘকাল জ্বর ও নিমোনিয়াতে ভুগিয়া উঠিল। বেচারী জীবন ভরিয়াই রোগ ভোগ করিয়াছে।

২০

একটা নূতন প্রস্তাব

১৯০০ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে আমি আর গৃহশিক্ষকতার কার্য্য পাইলাম না।

২৮এ আগষ্ট (১৯০০) বেহার ন্যাশনেল কলেজের অধ্যাপক

দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি মাসিক ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা বেতনে সপ্তাহে আঠার ঘণ্টা পড়াইতে প্রস্তুত আছি কি না? আমি গুরুদাসবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিলাম, পঞ্চাশ টাকা বেতন ও গাড়ী ভাড়ার জন্য কিছু পাইলে সপ্তাহে বার ঘণ্টা পড়াইতে পারি। রাত্রিতে অর্দ্ধ নিদ্রার অবস্থায় একটী বাণী শুনিলাম—"তুমি তো আর বিহার ন্যাশনেল কলেজে প্রফেসরী (অধ্যাপকতা) করিতে আইস নাই, ভগবানের সেবা করিতে আসিয়াছ।" জাগিয়া ভাবিলাম, আমাকে ঠিকই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পর দিন গুরুদাসবাবুর সহিত আবার পরামর্শ করিয়া দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলাম, আমি মাসে পঁচাত্তর টাকা পাইলে সপ্তাহে পনর ঘণ্টা পড়াইতে রাজী আছি। তিনি বলিলেন, স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার কথা হইয়াছে; পনর ঘণ্টা পড়াইলে আমার দ্বারা কাজ চলিতে পারে। ৫ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক সেন অধ্যক্ষের অভিপ্রায়বশে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ১০ই হইতে বার দিনের জন্য (অর্থাৎ শারদীয় অবকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) মাসিক পঁয়ষট্টি টাকায় সপ্তাহে পনর ঘণ্টা পড়াইতে সম্মত কি না। আমি গুরুদাসবাবুর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। দেবেন্দ্রবাবু একটু অর্থলোভ একটু ভয়, দুয়ের দ্বারাই আমাকে পথে আনিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু আমার "না" আর "হাঁ" হইল না। ফলে দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলিল।

২৭এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পাটনা কলেজের হলে রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হইল। উক্ত কলেজের বাটি আমাদের আবাস হইতে অল্প দূরে, কিন্তু সেখানে যাইবার কালে এমন মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, আমার কাপড় চোপড় একেবারে

ভিজিয়া গেল, জুতা মোজা খুলিয়া বসিয়া শীতে কাঁপিতে থাকিলাম। পাটনা বিভাগের কমিশনার সাহেবের সভাপতির কার্য্য করিবার কথা ছিল, তিনি অত্যধিক বৃষ্টির জন্য ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লেমেস্মুরিয়ারকে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দত্ত, এম্. এ. অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও আমি বক্তৃতা করিলাম, এবং অধ্যাপক নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ধন্যবাদ দিবার উপলক্ষে আমার অপেক্ষা অধিকতর সময় গ্রহণ করিলেন। যদুবাবুর বক্তৃতাটী খুব চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল, নলিনীবাবুর বক্তৃতাও আশাতিরিক্ত ভাল লাগিয়াছিল। গুরুদাসবাবুর মুখে শুনিলাম, সভাপতি তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "Rajani Babu speaks remarkably well." রামমোহনের মৃত্যুদিনে বাঁকিপুরে ইহাই আমার শেষ বক্তৃতা।

ভ্রাতা হেমচন্দ্র সরকারের প্রত্যাবর্ত্তন

ভ্রাতা হেমচন্দ্র সরকার দুই বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং ২৭এ সেপ্টেম্বর বাঁকিপুরে আসিয়া চারি দিন আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া গেলেন। সাধনাশ্রমে উপাসনা, আলোচনা, এবং স্থানীয় ব্রাহ্মগণের প্রীতিসম্মিলন, স্কুলে অভ্যর্থনা, ছাত্রাবাসে অভিনন্দন ও প্রীতিভোজন, প্রভৃতি নানারূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইল। কয়েকদিন তাঁহার মধুর সঙ্গ পাইয়া বন্ধুবর্গ পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

নামকরণ

১৪ই অক্টোবর (১৯০০) রবিবার আমাদের প্রথম কন্যা অলি ও দ্বিতীয় পুত্র খোকার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আমাদের সমাজের সকলে

এবং নববিধান সমাজের দুই তিনটী বন্ধু মোট প্রায় ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন। কন্যার নাম অমিয়া ও অলি, এবং পুত্রের নাম অমিতাভ ও জ্যোতিঃপ্রসাদ রাখিলাম। প্রীতিভোজনে মঙ্গলানুষ্ঠানটীর পরিসমাপ্তি হইল। ইহার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য আমরা শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ ও তাঁহার কন্যা প্রমীলা এবং শ্রীযুক্তা জয়াবতী চক্রবর্ত্তীর নিকটে বিশেষরূপে ঋণী।

অদ্য রাত্রি ৯॥ টার সময় শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন পরলোক গমন করিলেন।

২১
বাঁকিপুরে প্লেগ

শীতের প্রারম্ভে সহরে প্লেগ (bubonic plague) আরম্ভ হইল। আমরা সকলে যন্ত্রণাদায়ক টীকা লইলাম। জানুয়ারী মাসে (১৯০১) আমাদের বাড়ীর হাতার মধ্যেই এক যুবক প্লেগে মারা গেল। তখন গ্রামের বাড়ীতে যাইয়া কিছুদিন বাস করিবার সংকল্প করিয়া মধ্যম দাদাকে পাথেয় বাবদ টাকা পাঠাইবার জন্য গোপালপুর অফিসের যোগে তার করিলাম। রমণীর আত্মীয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ঘোষ সেই তার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আমরা মাঘোৎসবের প্রাক্কালে কলিকাতায় যাইয়া সমাজপাড়ায় বাস করিয়া উৎসবে যোগ দিলাম।

এবারও উৎসবের শেষ দিকে বহু ভক্তের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণ দর্শন করিলাম। তাঁহাকে নশ্বর দেহে আর দেখি নাই।

তারপরেই কয়েকদিন জ্বরে ভুগিলাম। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়াই মধ্যম দাদাকে

ষ্টীমার ঘাটে পাল্কী ও কুলি পাঠাইবার জন্য তার করিলাম, এবং রাত্রির গাড়ীতে বাড়ীপানে রওনা হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে গোয়ালন্দের ষ্টীমার মথুরা ষ্টেসনে পঁহুছিলে দেখিলাম, যে বন্ধুকে আমাদের জন্য ভাত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি আমার পত্র পান নাই; সুতরাং আমরা সারাদিন একপ্রকার অনাহারেই রহিলাম। রাত্রি প্রায় দশটার সময় ষ্টীমার সুবর্ণখালীর ঘাটে আসিল। বাড়ী হইতে একখানা পাল্কী ও দুইটী ভৃত্য আসিয়াছিল। আমার শরীর দুর্ব্বল ছিল, এজন্য আমি একখানা ডুলি চাহিলাম। কিন্তু আমার খদ্দরের কোট পায়জামায় আবৃত বিশাল বপুঃ দেখিয়া দুই বেহারা ও ডুলিওয়ালারা আমাকে বহন করিতে রাজি হইল না; অগত্যা আমার জন্যও পাল্কী ভাড়া করিতে হইল। আমরা সদলবলে নিশীথকালে গোপালপুরে দুর্গানাথবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; আমি কোট পায়জামা লইয়াই শুইয়া পড়িলাম, সে রাত্রিতে কিছুই আহার করিলাম না।

গোপালপুর হইতে আমাদের বাড়ী ৫।৬ মাইল দক্ষিণে। সকাল সকাল যাইব বলিয়া আমি আর পোষাক বদলাই নাই। কিন্তু কুটুম্বেরা কিছুতেই ছাড়িলেন না। লুচি তরকারী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া রওনা হইতে বেলা প্রায় দুপ্রহর হইল, এবং রৌদ্রে মোটা গরম কাপড় পরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অপরাহ্নে বেশ ক্লান্ত হইয়া বাড়ীতে পঁহুছিলাম। গৃহিণী ও ছোট শিশুটী পাল্কীতে গেলেন। অলির পথ চলিতে খুব কষ্ট হইয়াছিল, মাঝে মাঝে চাকরের কাঁধে বসিয়া একটু বিশ্রাম পাইয়াছিল।

চৌচালা দক্ষিণদ্বারী ঘরে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা সেই ঘরেই আহার করিতাম, মালিনী উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিত ও

বাসনগুলি ধুইয়া দিত; রাত্রির থালাবাটী সেখানেই পড়িয়া থাকিত। মেজ বৌদিদি ও বৌমা (রমণীর স্ত্রী) রান্না করিতেন; উদরপোষণের কাজটা বেশ চলিত, কিন্তু মধ্যাহ্ন ও রাত্রির ভোজনে খুব বিলম্ব হইত।

মাঘ মাসের শেষ দিকে তারযোগে সংবাদ পাইলাম, ১০ই ফেব্রুয়ারী শাশুড়ীঠাকুরাণী ও ১২ই ভাই সুন্দরসিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। শাশুড়ীঠাকুরাণী অনেকদিন ধরিয়া কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু আমরা ভাবিতে পারি নাই, বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। ভাই সুন্দরসিংহকে কলিকাতায় উৎসবের পরে জ্বরে পীড়িত দেখিয়া আসিয়াছিলাম, পরে শুনিলাম তাঁহার প্লেগ হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা দুইজন পূজনীয়া ভুবনমোহিনী চৌধুরীর আদ্যকৃত্য ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিলাম। তদুপলক্ষে কয়েক জন জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভোজন করান হইল। আসন্নপ্রসবা মেজদিদি প্রায় সমস্ত দিন পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিলেন। তাঁহার শ্রমপটুতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

তারপর পাড়াগাঁয়ে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে আমাদেরও তাহাই হইল। প্রথমে হঠাৎ একদিন খোকার ১০৫° ডিগ্রী জ্বর হইল। আমি সঙ্গে এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও একখানা ছোট চিকিৎসা পুস্তক আনিয়াছিলাম। আমার ঔষধেই সে ভাল হইল। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে অলি জ্বরে পড়িল, এবং তীব্র বেদনার সহিত কুঁচকি ফুলিয়া উঠিল। আমাদের আত্মীয় লালঙ্গজোড়ার শ্রীযুক্ত রজনীনাথ সোম, এল্. এম্. এস্. মহাশয়কে আহ্বান করিলাম। তিনি মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যাইতেন, বাহন ছিল পাল্কী কিম্বা ঘোড়া। ফোঁড়া পাকিলে তাঁহার নির্দ্দেশ মত অস্ত্রোপচারের জন্য ঘাটাইল হইতে এক

ডাক্তার আনা হইল; ফোঁড়া কাটিলে দেখা গেল, প্রকাণ্ড নালী ঘা হইয়াছে; বেচারী দীর্ঘকাল ভুগিয়াছিল।

ফাল্গুন মাসে মধ্যম দাদার তিন কন্যার পরে একটী পুত্রসন্তান হইল। একদিন বৈকালে আমরা তিন ভাই মাঠে বেড়াইতে গেলাম। পশ্চিম বাড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রকেও সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিলাম, সে বলিল, "আপনারা অগ্রসর হউন, আমি হাতমুখ ধুইয়া আসিতেছি।" আমরা কথা বলিতে বলিতে গ্রাম হইতে কিছু দূরে গিয়াছি, হঠাৎ মধ্যম দাদা শুনিতে পাইলেন, কে "আগুন," "আগুন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে ছুটিলেন, রমণীও ছুটিল। আমার পা কাঁপিতে লাগিল, আমি পিছনে পড়িয়া গেলাম। বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, বৌদিদি শিশুটীকে ও স্বর্ণলতা রোগশীর্ণা অলিকে কোলে লইয়া আতুর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বড় বাড়ীর এক পাগল ভ্রাতুষ্পুত্র নিজের রসুই ঘরের চালে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; তাহা দেখিয়াই কয়েকটি ছোট বালকবালিকা "আগুন দিল," "আগুন দিল" বলিয়া চেঁচাইতে থাকে। জ্ঞানেন্দ্র তখন সেই বাড়ীর পাতকূয়া হইতে সবে এক ঘটি জল তুলিয়াছে, শুনিয়াই ছুটিয়া গিয়া জল ছিটাইয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিল। ও দিকে মাও আগুন লাগিয়াছে শুনিয়া বাহিরের উঠান হইতে প্রাণপণে আমাদিগকে ডাকিতেছেন; তাঁহার কণ্ঠস্বরই মধ্যম দাদার কাণে গিয়াছিল। তিন বাড়ীতে চালে চালে সংলগ্ন প্রায় চল্লিশখানি ঘর; জ্ঞানেন্দ্র ছাড়া বয়স্ক পুরুষ মানুষ আর কেহই উপস্থিত ছিল না; সে যদি আমাদের সঙ্গে যাইত, তবে কি মহাকাণ্ড হইত, বলা কঠিন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত গুহদিগের বাড়ী কখনও আগুনে পুড়িয়া যায় নাই।

অলির অস্ত্রোপচার করিতে বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল, সেই সময়েই আমার আবার জ্বর হইল। কয়েকদিন ভুগিয়া উঠিয়াই বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখনও বালিকার ক্ষতে রোজ বড় লিণ্ট পূরিতে হয়, কিন্তু আর বিলম্ব করা চলে না, কারণ পত্নীও অন্তঃসত্ত্বা, কাল পূর্ণ হইতে বেশী দিন বাকি নাই। যাত্রার দিন অপরাহ্ণে গৃহিণী ও রুগ্না কন্যার জন্য একখানা পাল্কী আসিল, আমি নিজের জন্য জ্ঞানেন্দ্রের নিকট হইতে একটী ঠাণ্ডামেজাজের ঘোড়া চাহিয়া লইলাম, বাড়ীর দুইজন চাকর জিনিস পত্র লইয়া সঙ্গে চলিল, গোপালপুর হইয়া পনর যোল মাইল অতিক্রম করিয়া সুবর্ণখালী ষ্টেসনে পরদিন প্রাতঃকালে ষ্টীমার ধরিতে হইবে। মাইল দুই পথ যাইবার পরে দেখিলাম ঠাণ্ডামেজাজের ঘোড়াটী আনাড়ী আরোহীকে মোটেই গ্রাহ্য করে না, কাজেই তাহাকে ভৃত্যের হাতে সমর্পণ করিয়া আমি অবশিষ্ট পথ পদব্রজেই পার হইলাম। গোপালপুরে পঁহুছিতে রাত্রি হইল। সেখানে কুটুম্বগণের আদরযত্নে আপ্যায়িত হইয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম, এবং শেষ রাত্রিতে, পুনশ্চ আহারের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া রওনা হইয়া অরুণোদয়ের পরেই গন্তব্যস্থানে যাইয়া উপনীত হইলাম। ষ্টীমার পাইতে বিলম্ব হইল না। অপরাহ্ণে গোয়ালন্দে পঁহুছিলাম, এবং এক হোটেলে রাত্রির আহার নির্ব্বাহ করিয়া ট্রেণে ভোর চারিটার সময় নৈহাটীতে অবতরণ করিলাম। সেখানে অলির উদরাময় হইল; দুর্ভাবনার মধ্যে সকালে বাণ্ডেল ষ্টেসনে পশ্চিমের গাড়ীর অপেক্ষায় থাকিবার কালে যাত্রীদিগের বসিবার ঘরে ছাতা ও কম্বল আড়াল দিয়া মোমবাতির সাহায্যে অলির জন্য এরারুট প্রস্তুত করা হইল। তৎপরে আমরা নিরাপদে রাত্রি দুপ্রহরে সাধনাশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

২২

প্রত্যাবর্ত্তনের পরের সংবাদ

আসিবার পরেই কয়েকদিন মাথাধরা ও জ্বরভাবের দরুণ ঔষধ সেবন করিতে হইল। দুই তিন সপ্তাহ অন্তে একদিন মধ্যাহ্নে ইলিশ মাছের ঝোল খাইলাম; রান্না উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উদ্বৃত্ত মাছ রাত্রিতে ভোজনের জন্য গৃহিণী কাঁসার বাটীতে রাখিয়া দিলেন। দ্বিতীয় বার ইলিশ মাছের পেটী খাইবার সময় স্বাদে বুঝিলাম, তাহাতে কাঁসা উঠিয়াছে, কিন্তু লোভ সংবরণ করিবার মত সুবুদ্ধির উদয় হইল না। আহারের পরে ১১ টা পর্য্যন্ত পড়িয়া নিদ্রিত হইলাম। ঠিক একটার সময় দারুণ পেটের বেদনায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তারপর এমন প্রবল অতিসার আরম্ভ হইল, যেপ্রকার আমার জীবনে পূর্ব্বে বা পরে কখনও হয় নাই। প্রথমবার দাস্তের পরেই পত্নীকে জাগাইয়া ৬০ ফোঁটা Spirit of Camphor খাইলাম; এক শিশি ঘরেই ছিল, তাহার ছিপি খোলা হয় নাই। আবার ২টা, ৩টা ও ৪টার সময় একই প্রকার দাস্ত হইল, প্রতিবারেই ঐ ঔষধ খাইলাম। বাড়ীর সকলে সুষুপ্ত, পত্নী শ্রীরঙ্গবিহারীকে ডাক্তার ডাকিবার জন্য পাঠাইতে চাহি-লেন, আমি নিষেধ করিলাম। ৪টার পরে পূর্ব্বাকাশে আলোকের আভা প্রকাশ পাইলে স্বর্ণলতা শ্রীরঙ্গকে আমার অবস্থা বলিতেই তিনি পরেশবাবুকে সংবাদ দিতে গেলেন, তাঁহার বাড়ী গুরুপ্রসাদবাবুর বাড়ীর ঠিক সম্মুখে; ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় খবর পাইয়াই হাতমুখ না ধুইয়া গুরুপ্রসাদবাবুর বাড়ীর আঙ্গিনার উপর দিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, আমি যদি প্রথম দাস্তের পরেই spirit of camphor

না খাইতাম, তবে আমার ওলাউঠা হইত। আমার জীবন দেবতাই এই প্রেরণা দিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন। সমস্ত দিনরাত্রি নিরম্বু উপবাসে অতিবাহিত হইল। পীড়ার আক্রমণের চতুর্থ দিনে ভাত পাইলাম।

আমি প্রায় তিন মাস স্কুল হইতে অনুপস্থিত ছিলাম। কার্য্যে পুনরায় যোগ দিলে পরিচালক সমিতির সভায় আমার বৃত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল ; এই সময়ে আমি গ্রাসাচ্ছাদন বাবদে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাইতাম। সম্পাদক গুরুদাসবাবু বলিলেন, অন্যান্য বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী অনুপস্থিতির জন্য বৃত্তির টাকা কাটা হউক। অপর সভ্যেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম, কেন না, Subsistence allowance কর্ত্তনের অর্থ আমাকে স্ত্রীপুত্র সহিত উপবাস করিতে বলা। গুরুদাসবাবু পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাবই সমীচীন ছিল, তিনি টাকা তুলিয়া আমার কর্ত্তিত বৃত্তি পূরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার ইহা ভাল লাগিল না ; মনে সংশয় জাগিল, অতঃপর রামমোহন রায় সেমিনারীর সংস্রবে থাকা উচিত হইবে কি না ?

২৩
রামমোহন রায় সেমিনারীর কথা

প্রথম বৎসর (১৮৯৮) প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমরা তিনটী ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম, দুইটী উত্তীর্ণ হইল। এই স্কুল দেখিয়া প্রথম শ্রেণীতে কতকগুলি অনুত্তীর্ণ ছাত্র আসিল, কিন্তু অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য সুতরাং তাহাদের অনেককেই ১৮৯৯ সনের পরীক্ষায় প্রেরণ করিতে পারিলাম না। ইহাতে কয়েক রাত্রি সাধনাশ্রমের মধ্যে মলনিক্ষেপরূপ উপদ্রব চলিল ; রাজপুরুষদিগের তাড়া খাইয়া বিরোধীরা নিরস্ত

হইল। আমিও গোপনে সংবাদ পাইলাম, অসন্তুষ্ট ছাত্রেরা জোট বাঁধিয়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইবার ছলনায় প্রধান শিক্ষকের ঘরে আসিয়া আমাকে প্রহার করিবে। ষড়যন্ত্রটী অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইল। এবার সাতটী ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম, সর্ব্বোৎকৃষ্টটী পরীক্ষা দিতে পারিল না, যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া অচিরে মরিয়া গেল, বাকি ছয়টীর মধ্যে দুইটী প্রথম ও দুইটী দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিল। ১৯০০ সনে চারিটী কি পাঁচটীর মধ্যে দুইটী প্রথম ও একটী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। আমার শেষ বৎসর, ১৯০১ সনে, বারটীর মধ্যে আটটী, প্রথম বিভাগে ৪ ও অবশিষ্ট দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইল।

বিদ্যালয়টী ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ, শিক্ষাসচিব পেড্‌লার, স্কুল ইন্‌স্পেক্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। ১৯০০ সনের আগষ্ট হইতে সত্তর টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হইল। কিন্তু সাহায্য প্রাপ্তির নিয়মানুসারে শিক্ষকদিগকে নির্দ্দিষ্ট বেতন দিতে হইত, সুতরাং স্কুলের অর্থকষ্ট দূর হইল না, ছাত্রসংখ্যাও ১৫০ একশত পঞ্চাশের নীচেই রহিল। তদুপরি প্লেগের প্রকোপে অর্থাভাব বাড়িয়া গেল।

২৪

সাধনাশ্রম ত্যাগ

দারিদ্র্য ও রোগ একত্র মিলিত হইয়া আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বাঁকিপুর আমার পক্ষে অসহনীয় প্রতিপন্ন হইয়াছিল। বড় বড় পীড়ার বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে; ছোট খাট অসুখ বলিতে গেলে লাগিয়াই থাকিত; একটু ঠাণ্ডা লাগিল, কি সামান্য অনিয়ম

হইল, শরীরটী অমনি বিগড়াইল। সন্তানদের তো কথাই নাই, এক একবার এক একটী যায় আর কি। স্বর্ণলতা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন, কিন্তু তিনিও সময়ে সময়ে রোগে ভুগিতেন; ১৮৯৯ সনে তাঁহার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা খারাপ হইল, ডাক্তার আসদার আলী একদিন আমাকে বলিলেন "The heart may fail any moment" "যে কোন মুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে।" গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠিবার কালে স্বর্ণলতার সেই বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। রোগের আতিশয্যে ডিসপেনসারীর দেনা বাড়িয়া যাইতেছিল, এবং মালিকেরা দেনার উপরে সুদ আদায় করিবার ভয় দেখাইতেছিলেন। আমার জ্বরের মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমাকে যেন বাড়ী ভাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা না হয়, এই অনুগ্রহের জন্য ভাড়া জমিতে লাগিল, এবং তিনি চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত থাকাও সুকঠিন হইল। শেষ বৎসরটা এমন দাঁড়াইল যে, বিছানা, বিছানার চাদর, লেপ প্রভৃতি সব কয়টীরই অভাব, সতীশ এক দোকান হইতে কতকগুলি জিনিষ ধারে ক্রয় করিয়া অভাব মোচন করিলেন। প্রথম বার্ষিকী শ্রেণী হইতে আমি বরাবর রাত্রিতে মোমবাতি ব্যবহার করিতাম; এখন তাহা জুটিত না, রেড়ীর তৈলের প্রদীপে পড়িতাম। সর্ব্বাপেক্ষা এই অভাবটিই আমাকে পীড়া দিত যে, আমি ইচ্ছানুরূপ বই কিনিতে পারিতাম না। তবে এত অনাটনের মধ্যে স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করা অবধি ক্ষুধার জ্বালায় দুঃখ পাইতে হয় নাই, তাহার কারণ বাঁকিপুরে আহার্য্য সামগ্রী প্রায় সমস্তই সস্তা ছিল।

আমার দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান কালে নিতান্ত সম্বলহীন অবস্থায়

পড়িয়া স্বর্ণলতা আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানি হইতে (১লা মে, ১৮৯৮) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"চাকরী করা কি ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ ? আমি মনে করি, চাকরী করিয়া আশ্রমে সাহায্য করা সব চেয়ে ভাল কাজ হইত। এখানে মাহিনা লইয়া যদিও কাজ কর না, কিন্তু চাকরীর বাবা হইয়া যাইতেছে। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যত দূর বোধ হইতেছে, এখানে কাজকর্ম্ম করিয়া যতটুকু সময় পাও, তাহাতে উপাসনা, আলোচনা, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও অন্য পুস্তক পড়িবার সময় খুব কমই থাকে। ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা অনেক সময় ছিল। মনে করিও না যে, আমি তোমাকে এখান হইতে যাইতে বলিতেছি ; কিন্তু যখন সংসার পাতিয়াছ, শিশুসন্তান জন্মিয়াছে, তখন পেটে অন্ন গায়ে বস্ত্র বেরামের সময় ঔষধ দিতেই হইবে।"

পত্রখানিতে আমার আশ্রমের সহিত যুক্ত থাকিবার বিষয়ে পত্নীর মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তখন আমি ইঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই, ইনিও আমাকে আশ্রম ত্যাগ করিবার জন্য উৎ-পীড়ন করিয়া আমার জীবনকে ভারবহ করেন নাই। তিন বৎসর পরে আমার মতও পরিবর্ত্তিত হইল। রোগ ও দারিদ্র্যের কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু শুধু এই দুইটী বাহিরের কারণে পরিবর্ত্তন ঘটে নাই ; বাহ্য কারণযুগলের সহিত দুইটী আভ্যন্তরীণ কারণ যুক্ত হইল। প্রথমতঃ কিছু দিন হইতে আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে-ছিলাম, যে শিক্ষাক্ষেত্রে আমার শক্তির সমুচিত ব্যবহার হইতেছে না ; জ্ঞানার্জ্জনের ব্যাপকতর ও গভীরতর বিষয়গুলি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রগণের নিকটে তৃপ্তিদায়করূপে প্রকাশ করিতে পারিতাম না। বাঁকিপুরে থাকিবার কালে আমার জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়াছিল,

আমি গ্রীক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতিও অবসর পাইলেই পাঠ করিতাম, কিন্তু অর্জ্জিত তত্ত্ব ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল না, সে জন্য প্রয়োজন বোধ করিলাম কলেজে অধ্যাপনার। তৎপরে সাধনাশ্রমের অভিজ্ঞতা বলিতেছিল, স্থান বা কার্য্যের পরিবর্ত্তনেই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় না; আমি সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সংকল্পাধীন পরিচারক হইয়াও সংসারের সেবাই করিতেছি। এক এক সময়ে চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইত। ১৮৯৮ সনের ৩০এ অক্টোবরের রোজনামচা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"Without being a good householder none can hope to be a good missionary. I have not yet become a good householder—is it not wrong on my part —rather is it not putting the cart before the horse— to try to be a 'worker' while I have not yet succeeded in building a well-regulated family? Thus it seems as if I had been following the wrong track all the while"—"ভাল গৃহস্থ না হইলে কেহই ভাল প্রচারক হইবার আশা করিতে পারে না। আমি আজিও ভাল গৃহস্থ হইতে পারি নাই। তবে ইহা কি আমার পক্ষে অন্যায় নয়, অথবা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুড়িবার ন্যায় উল্‌টা কর্ম্ম নয়, যে আমি একটী সুপরিচালিত পরিবার সংগঠনের প্রয়াসে কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই 'ওয়ার্কার' অর্থাৎ আশ্রমের পরিচারক হইবার চেষ্টা করিতেছি? এ জন্য মনে হয়, আমি এত দিন ভুল পথে চলিতেছি।"

উপর্য্যুক্ত চারিটী কারণে মে মাসে (১৯০১) আমি স্থির করিলাম, সুযোগ ঘটিলে কোনও কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিব।

২৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জীবনদেবতার প্রেরণাধীন হইয়াই আমি সাধনাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবং সেখানকার শিক্ষা ও পরীক্ষা আমার জীবন গঠনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। বিষয়কর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবার পরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও সহোদর প্রতিম শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে প্রকার সমাদরের সহিত আমাকে বাঁকিপুরে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং আমার মত অপদার্থ ব্যক্তি সাধনাশ্রমে যোগ দিয়াছে শুনিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যে প্রীত হইয়াছিলেন, ইহা আমি কস্মিনকালেও ভুলিতে পারিব না। ভাই প্রকাশদেবজী, ভাই সুন্দর সিংহজী, ভ্রাতা শ্রীরঙ্গবিহারীলাল, ভ্রাতা হেমচন্দ্র সরকার—সহৃদয়তা ও সপ্রেম ব্যবহারের জন্য আমি ইহা-দিগের সকলের নিকটেই ঋণী। আমি যে পাঁচ বৎসরকাল সাধনা-শ্রমের সহিত যুক্ত ছিলাম, তাহাতে আমার পরম সৌভাগ্য ইহাই ঘটিয়াছিল, যে আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহার চরিত্রের যে-সকল গুণ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, আত্মশ্রাদ্ধের দিন স্মৃতিসভায় আমি তাহার আভাস দিয়াছি। ১৩২৬ সনে অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়; এই জীবন-স্মৃতিতে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাঁকিপুরে অবস্থানকালে আমি ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধনের হাওয়ার মধ্যে বাস করিতাম। সাধনাশ্রমে অনেকগুলি বিশ্বাসী, ব্যাকুলপ্রাণ, সেবাপরায়ণ, তদেকনিষ্ঠ নরনারী মিলিত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন আশ্রমের নিয়মিত উপাসনা, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, নির্দ্দিষ্ট ও নৈমিত্তিক সামাজিক উৎসব ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, বক্তৃতা ও প্রচার, দুর্ভিক্ষ ও

প্লেগের মহামারীতে জনসেবা—এই সমুদায় আশ্রমকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী শাখা বাঁকিপুরে গড়িয়া উঠে। পূর্ব্ব হইতেই সেখানে নববিধান সমাজের অন্তর্ভূত আট দশটী পরিবার বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের একটী মন্দির ছিল। স্নেহশীল প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার সহরে স্থায়ীভাবে বাস করিতেন ; ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের পরম সুহৃৎ ছিলেন, ভক্ত গৃহস্থসাধক প্রকাশচন্দ্র রায় উভয় সমাজের মিলনকেন্দ্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী ও অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আমার যথার্থ আত্মীয়তার যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। শেষ দুই এক বৎসর আমরা উভয় সমাজের কয়েকজন এক এক বাড়ীতে সপ্তাহে একদিন একত্র উপাসনা করিতাম। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাঁকিপুরে আসিলেই তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতাম। তিনি আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন।

১৩০৭ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ (২৫এ নবেম্বর, ১৯০০) শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় ; তদুপলক্ষে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র বাঁকিপুরে আগমন করেন। অনুষ্ঠান শেষে ইঁহাদিগের সহিত আমার পরিচয় হয়। তখন রায় মহাশয়ের সমন্বয় গীতাভাষ্য নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। আমার নাম জানিয়াই তিনি কান্তিবাবুকে বলিলেন, "ইহাকে এক খানা গীতা দিন।" তৎক্ষণাৎ গীতা এক খণ্ড আনা হইল। মূল্য চারি টাকা। অমি উহা হাতে লইয়া চুপি চুপি ব্রজগোপালবাবুকে বলিলাম, "আমার তো মূল্য দিবার শক্তি নাই।" কথাটা শুনিয়াই উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "তাহাতে কি ? এ বই তো তোমরাই

পড়িবে।” আমি এই অমূল্য গ্রন্থখানি উপহার স্বরূপ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বাঁকিপুর ছাড়িবার পরে আমি কলিকাতায় আসিলেই ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও গৌরগোবিন্দ বাবুর সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিতাম। দুই জনই আমাকে স্নেহ করিতেন।

আমাদের আহ্বানে এক দিন সেমিনারীতে উপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইল; আর একদিন সাধনাশ্রমে উপাসনা ও প্রীতিভোজনে উভয়েই উপস্থিত থাকিলেন এবং রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। বিদায় লইবার সময় আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে মতগত পার্থক্য কি?” গৌরবাবু বলিলেন, “মতগত পার্থক্য কিছুই নাই, যাহা আছে ব্যক্তিগত।” কান্তিবাবু ইহাতে সায় দিলেন।

“সহায়” শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী ও হেমেন্দ্রনাথ দত্তকে এক বৎসরকাল স্কুলে সহযোগীরূপে পাইয়াছিলাম।

সাধনাশ্রমসংসৃষ্ট আমরা তিনটী পরিবার দুই বৎসরের অধিক একসঙ্গে বাস করিলাম। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও অপ্রীতির ছায়াপাত হয় নাই, এমত বলিতে পারি না, কিন্তু আপদে বিপদে শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ, “খুড়ীমা” শ্রীযুক্তা সরোজ-বাসিনী রায় এবং তাঁহাদিগের পুত্রকন্যার একান্ত সাহায্য পাইয়াছি।

যাত্রার উদ্যোগ

বাঁকিপুর ছাড়িবার সংকল্প স্থির হইলে কর্ম্মখালির সন্ধানে থাকিলাম। বিজ্ঞাপন দেখিলাম, হেতমপুর কলেজে ছয় মাসের জন্য এক জন ইংরেজীর অধ্যাপক আবশ্যক, এবং ব্রজমোহন কলেজ হইতে আগত বেহার ন্যাশনেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র রায়ের মুখে একদিন একত্র মধ্যাহ্নে আহার করিবার কালে

শুনিলাম, ব্রজমোহন কলেজে এক জন ইংরেজীর অধ্যাপকের প্রয়োজন আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন মোটে একবার Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ২৩এ মে আমি উভয় স্থলেই দরখাস্ত পাঠাইলাম ; হেতমপুরে দুই শত ও বরিশালে দেড় শত টাকা বেতন চাহিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, চাকুরী পাইলে হেতমপুরেই যাইব, এবং ছয় মাসে দেনা অনেকটা শোধ করিয়া আবার বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিব ; বরিশালে যাইবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। হেতমপুর হইতে কোনও জবাব আসিল না ; ওদিকে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরামপুরে থাকিয়া আমার আবেদন পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, আমি বি. এ. পরীক্ষায় ইতিহাস পড়িয়াছি কি না, এবং ১২৫৲ একশত পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি কি না। প্রথম প্রশ্ন সহজেই চুকিয়া গেল ; বেতন সম্বন্ধে আমি একটু আপত্তি জানাইলাম ; কিন্তু অশ্বিনীবাবুর ন্যায় অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সহিত আমি কথায় পারিয়া উঠিব কেন ? তিনি লিখিলেন, "বি. এ. ক্লাসগুলির ভার কলেজের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছে, নূতন বাটী উদ্বৃত্ত অর্থ শোষণ করিতেছে, আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হইলেই আমি আহ্লাদের সহিত আপনার বেতন ১৫০৲ করিয়া দিব।" তিনি বরিশালে ফিরিয়া যাইয়াই বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব পাঠাইলেন, এবং অনুরোধ করিলেন, আমি সম্মত হইলে যেন তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া তাহা জানাই।

আমি যে যে কারণে বাঁকিপুর হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি, যথাসময়ে শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহা জানাইলাম। তিনি পূর্ব্বে একবার আমার অর্থাভাবের সংবাদ পাইয়া নিজের কয়েকখানি পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে দোকানে দোকানে বৃথাই

ঘুরিয়াছিলেন। এবার লিখিলেন, "আমার যদি টাকা থাকিত, আমি তোমার ঋণ শোধ করিয়া দিতাম; আমার কিছুই নাই। আমি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিতে চাহি না; তোমার যাহা ভাল বোধ হয় কর।" গুরুদাসবাবুকেও আমার অভিপ্রায় জানাইলাম এবং তাঁহার সম্মতি পাইলাম। তখন গ্রীষ্মের ছুটী; সতীশ ও শ্রীরঙ্গ অন্যত্র ছিলেন; তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার অবসর পাই নাই।

অশ্বিনীবাবুর পত্র পাইয়া আমি বড়ই বিচলিত হইলাম; মন একেবারে দমিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ গুরুদাসবাবুর নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, আমার মাসিক বৃত্তি আর দশটী টাকা বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর কি না। তিনি সে প্রকার আশা দিতে পারিলেন না। আমি একান্ত ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ব্রজমোহন কলেজের পদ গ্রহণ করিয়া অশ্বিনীবাবুকে টেলিগ্রাম করিলাম। তিনি স্বগ্রাম বাটাজোর হইতে প্রত্যুত্তরে টেলিগ্রাম করিলেন, "Thanks, college reopens 19th June, please join that day"—"কলেজ ১৯এ জুন খুলিবে, সেইদিন কার্য্যে যোগ দিবেন।" নাগাইদ ১০ই জুন আমার বরিশাল গমনের শেষ মীমাংসা হইল।

এই ব্যাপারের একটা নিগূঢ় কথা পরে অশ্বিনীবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের অবকাশে তিনি শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর গৃহে বাস করিতেছিলেন; সঙ্গে ছিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা দুইজন ব্রজমোহন কলেজে ইংরাজী পড়াইতেন। একজন নূতন অধ্যাপক নিয়োগ করিবার প্রস্তাব স্থির করিয়া Statesman পত্রিকায় অশ্বিনীবাবু বিজ্ঞাপন পাঠাইলেন; কিন্তু একবার প্রকাশিত হইবার পরেই উহা বন্ধ করিয়া দিলেন, ভাবিয়া

দেখিলেন, অর্থের যেরূপ অসচ্ছলতা, তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করাই কর্ত্তব্য। তাঁহারা দুই জনেই কাজ চালাইবেন। এই প্রকার স্থির করিবার পরেই আমার দরখাস্ত অশ্বিনীবাবুর হস্তগত হইল, উহা পড়িয়াই তিনি নরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "এই লোকটীকে আনিতেই হইবে।" নরেন্দ্রবাবুও আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। তখন গুরুশিষ্যে মন্ত্রণা হইল, আমার নিয়োগের দরুণ যদি অর্থের অভাব ঘটে, তবে অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। এই সর্ত্তে অশ্বিনীবাবু আমাকে ব্রজমোহন কলেজে লইয়া গেলেন। বস্তুতঃও আমি বরিশালে যাইবার কয়েক মাস পরেই নরেন্দ্র বাবু ময়মনসিংহে নবপ্রতিষ্ঠিত সিটী কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া বরিশাল ত্যাগ করিলেন। ৪ঠা জুন (১৯০১) মঙ্গলবার (২১এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটের সময় আমাদের দ্বিতীয়া কন্যা বীণা ভূমিষ্ঠ হইল। আমি দাই ডাকিতে গিয়াছিলাম ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিতেই চঞ্চলা দেবী আতুর ঘর হইতে সংবাদ দিলেন, "রজনী বাবুর এক পরমাসুন্দরী কন্যা হইয়াছে।"

তার পরেই প্রসূতি ও শিশুর জ্বর আরম্ভ হইল। আমি অশ্বিনী বাবুর নিকটে পারিবারিক অবস্থা জানাইয়া একটু সময় চাহিয়া পাঠাইলাম।

আমি সত্য সত্যই চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া গুরুদাসবাবু "অস্থির" (staggered) হইয়াছিলেন।

গ্রীষ্মের অবকাশে সেমিনারীর যে সকল ছাত্র সহরে উপস্থিত ছিল, তাহারা মিলিত হইয়া এক দিন অপরাহ্নে রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে আমাকে বিদায়পত্র ও একটী কাঠের কলমদান উপহার দিল। স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীকে তাহারা সভা-

পতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিল ; তিনি নিদারুণ মনের ক্লেশে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে অস্বীকৃত হইলেন। শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত সভাপতির কাজ করিলেন। অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত করিবার সময় ছিল না, হাতে লিখিয়া আমাকে দেওয়া হইল।

১৯এ জুন যাত্রার দিন ধার্য্য করিলাম।

কঃ পন্থাঃ

তেত্রিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যে শিক্ষাব্রত বরণ করিলাম, তাহা আর ছাড়ি নাই। আমার জীবনে তিন বার কোন পথে যাইব, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হইয়া সাধনাশ্রমে প্রবেশ করিয়া আবার শিক্ষকতার কার্য্যেই ব্রতী হইয়াছিলাম। আমি ভ্রাতা সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও হেমচন্দ্র সরকারের ন্যায় সংকল্পাধীন পরিচারকরূপে শিক্ষক হইয়াও ক্রমশঃ আশ্রমের পরিচারক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি সে পথ ত্যাগ করিলাম। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়াতেই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট আমাকে দ্বিতীয় বার এক কঠিন সমস্যায় ফেলিলেন। আমি শিক্ষা ও রাজনীতি, এক সঙ্গে দুই ক্ষেত্রে কাজ করিতে পারিব না, আমাকে দুইয়ের একটী বর্জ্জন করিতে হইবে। অনেকে শিক্ষাবিস্তারের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেই প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন ; আমি শিক্ষাব্রতই ধরিয়া রহিলাম। ১৯১১ সনে তৃতীয় বার শিক্ষাব্রত ও ধর্ম্মপ্রচার, উভয়ের মধ্যে কোনটী নির্ব্বাচন করিব, এই প্রশ্ন আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছিল। এবারও সমস্যাটীর সমাধানে আমি অধ্যাপনার কার্য্য ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় খণ্ড

শিক্ষাব্রত

নবম অধ্যায়

বরিশালে দশ বৎসর

১

১৯এ জুন বুধবার প্রাতঃকালে আহারান্তে বরিশাল যাত্রা করিলাম। প্রসূতি এবং শিশু, উভয়েই তখন জ্বরে পীড়িত; শিশুটীকে বিদায় লইবার সময় আদর করিতে যাইয়া মনে হইল ইহাকে আর দেখিতে পাইব না। আমি হাওড়ার যে গাড়ী ধরিলাম, গুরুদাসবাবু সেই গাড়ীতেই দানাপুর হইতে আসিয়া ষ্টেসনে প্লাটফর্ম্মে আমাকে প্রণাম করিবার অবসর দিলেন। মোকামা হইতে তার-যোগে অশ্বিনীবাবুকে যাত্রার সংবাদ জানাইলাম। রাত্রি ৮টার সময় হাওড়ায় পঁহুছিয়া সোজা শিয়ালদহ যাইয়া খুলনার গাড়ীতে উঠিলাম। ১০টায় গাড়ী ছাড়িল; এ পথে আমি নূতন যাত্রী, গাড়ীতে ও ষ্টীমারে একটীও পরিচিত লোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। সঙ্গে কিছু আহার্য্য ছিল, রাত্রিতে তাহার অর্দ্ধেকই চলিয়া গেল। ভোরে খুলনা যাইয়া বরিশালের ষ্টীমার ধরিলাম। দুপ্রহরে বাট্‌লার সমাংস অন্ন যোগাইল। রাত্রি নয়টার পরে ষ্টীমার বরিশালের ঘাটে লাগিল।

শ্রীযুক্ত হরকিশোর বিশ্বাস তখন বরিশালে চাকুরী করিতেন, আমার পরিচিত, গুরুদাসবাবুর বন্ধু। গুরুদাসবাবু তাঁহাকে অনুরোধ

করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, আমাকে যেন কয়েকদিনের জন্য তাঁহার গৃহে স্থান দেন। যাত্রা শেষ হইবার প্রাক্কালে, ভাবিতেছিলাম, হরকিশোরবাবুর বাড়ীতে থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। ষ্টীমার পঁহুছিলে প্রথমেই আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, ব্রজমোহন কলেজের সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় থাকিব?" তিনি বলিলেন, "অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে!" মনটা দমিয়া গেল। তখনই বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ৺সর্ব্বানন্দ দাসের পুত্র শ্রীমান্ ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ এবং দৌহিত্র শৈলেন্দ্র আসিয়া জানাইলেন, তাঁহারা আমাকে হরকিশোর বাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। আমি সানন্দে তাঁহাদের সঙ্গে গেলাম। হরকিশোরবাবু ও তাঁহার পত্নী আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তাঁহাদের শিশু-পুত্রটী মাস দুই পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে, এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে। শুনিয়া বড়ই লজ্জায় ও সঙ্কোচে পড়িলাম, কিন্তু কি করি, আসিয়া পড়িয়াছি। এত বিপদের মধ্যেও ইঁহাদের আদর যত্নের ত্রুটি হয় নাই।

পর দিন প্রভাত হইতেই শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আমাকে দেখিতে আসিলেন। হাত মুখ ধুইবার পরে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি একটী সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিলেন। সেই যে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত হইল, ১৯৩৮ সনে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। চা পানের পরে মধুবাবু আমাকে অশ্বিনীবাবুর গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। আমরা তিন জন সেখানে গেলাম; যাইয়া দেখি, বৈঠকখানা ঘরে, এক সন্ন্যাসীকে লইয়া প্রকাণ্ড মজলিস জমিয়াছে। অশ্বিনীবাবু ফরাসে বসিয়াছিলেন,

আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া করমর্দ্দন করিয়া অভিনন্দন করিলেন; তারপর গান, রগড়, হাসি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, হাকিম, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি লোকে কক্ষ পরিপূর্ণ। প্রায় দুই ঘণ্টা থাকিয়া বাসায় যাইয়া স্নানাহার করিয়া ব্রহ্মানন্দের সহিত কলেজে গেলাম। অশ্বিনীবাবু আমাকে চতুর্থ বার্ষিক ও অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে লইয়া গেলেন; তারপরেই নবাগত অধ্যাপকের সম্মানার্থ কলেজ ছুটী হইল। অশ্বিনীবাবু, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা সকলেই আমার প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। বাঁকিপুরে ব্রজমোহন কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বাবু অমলেন্দু গুপ্ত অশ্বিনীবাবুর চেহারা, কণ্ঠস্বর, পোযাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহা অবিকল মিলিয়া গেল।

প্রথম বার্ষিক হইতে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর পাশ ও অনার্স পর্য্যন্ত আমার জন্য সপ্তাহে একুশ ঘণ্টার কাজ নির্দ্দিষ্ট হইল। জুন মাসে মোটে তিন ঘণ্টা পড়াইতে হইয়াছিল।

হরকিশোরবাবুর বাসা লাখুটিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের বাসবাটীর হাতার মধ্যে ছিল। ১লা জুলাই রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যাটী পরলোকে প্রস্থান করিল; বয়স মোটে বার, কিন্তু দেখিলে আঠার উনিশ বৎসরের তরুণী বলিয়া বোধ হইত। ইহার পরেই, ৭ই জুলাই হরকিশোরবাবুর কন্যা প্রতিভাও পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল। আমি উভয়সঙ্কটে পড়িলাম। পিতার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস, মাতার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, এই দৃশ্যের মধ্যে বাস করা দুর্ব্বহ, ইঁহাদিগকে ছাড়িয়াই বা যাই কিরূপে?

ইঁহাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে আমি আরও কয়েক দিন থাকিয়া

গেলাম। ১৪ই জুলাই শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুহঠাকুরতার বাংলা-বাড়ীতে (ইটের প্রাচীর, হোগলার চালা) একটী মুসলমান ভৃত্য লইয়া সংসার পাতিলাম। দুই এক দিন পরেই শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ, বিনয়ভূষণ ও ইন্দুভূষণ গুপ্তের মাতা সহসা পরলোক গমন করিলেন। মনোমোহনবাবু, রাজকুমারবাবু প্রভৃতির কীর্ত্তনের দল মৃতদেহের অগ্রে অগ্রে চলিল, আমরা অনেকে পশ্চাতে অনুসরণ করিলাম। বরিশালে ব্রাহ্মদিগের স্বতন্ত্র শ্মশান আছে। এই মহিলা গৌরবর্ণা ও দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। চিতায় শব স্থাপনা করিয়া শ্মশানবন্ধুরা যখন তদুপরি বড় বড় সুন্দরী কাঠ রাখিলেন, তখন অকস্মাৎ আমার মনে হইল, একদিন এমনি করিয়া স্বর্ণলতার দেহের উপরে ভারী ভারী কাঠ রাখা হইবে ; আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইহাও আগামী বিচ্ছেদের পূর্ব্বচ্ছায়া !

১৮ই জুলাই গৃহিণী ও পুত্রকন্যারা নিরাপদে বরিশালে উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, দীর্ঘরোগভোগের পরে বীণার দিব্য ফুটফুটে ফরসা চেহারা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায়, এবং দেবেন্দ্র তথা হইতে বরিশালে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছিলেন।

২০এ আগষ্ট পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের কন্যার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বরিশালে আসিলেন। বিহারীবাবুর আহ্বান পাইয়া শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি বরিশালে যাইতেছি, তুমি কি তোমার গৃহে আমাকে একটু স্থান দিবে?" আমি আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ষ্টীমার ঘাটে তাঁহাকে আনিতে গেলাম। বিহারী বাবু তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না বলিয়া আমার কুটীরে তাঁহার যাওয়া হইল না, কিন্তু তিনি আমাকে বলিয়া দিলেন, তিনি যে কয়

দিন বরিশালে থাকিবেন, বৈকালে আমার বাটীতেই জলযোগ করিবেন। আমাকে তিনি ভাবিবার অবসরই দিলেন না যে, আশ্রমত্যাগী বলিয়া আমার প্রতি তাঁহার কোন প্রকার বিরূপ-ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এবার শাস্ত্রীমহাশয় উপাসনাদি ছাড়া ব্রজমোহন কলেজে, রাজচন্দ্র কলেজে ও ব্রাহ্মসমাজে চারিটী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। তাঁহার কয়েক দিনের অবস্থান দ্বারা আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলাম।

বরিশাল সহরটী তরুলতাতৃণশষ্পে নয়নরোচন, তবে জঙ্গল একটু বেশী ; লোকালয়ের মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, সেগুলি ভরাট করিয়া এখনও বাড়ী নিৰ্ম্মিত হইতেছে। বাখরগঞ্জ জেলা বালাম চাউলের আকরস্থান ; কৃষকেরা এত অল্প পরিশ্রম করিয়া প্রচুর শস্য পায় যে, তাহারা শস্য কৰ্ত্তন করিবার ক্লেশ স্বীকার করে না, মজুর আসিয়া ধান কাটিয়া যায়। রাস্তাগুলি লাল বর্ণ, দেখিতে সুন্দর। প্রত্যেক বাড়ীতেই নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল, আম প্রভৃতির ছোট বড় বাগান ও দুই একটী পুকুর আছে। পুকুরগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ খাল নালার দ্বারা নদীর সহিত যুক্ত, সুতরাং সেগুলিতে দিবারাত্রি দুই বার জোয়ারভাটা খেলে। জল লোণা ও অপেয় ; পানীয় জলের জন্য দূরে দূরে ‘রক্ষিত’ পুষ্করিণী আছে। আমার বরিশাল ত্যাগের পরে জলের কল হইয়াছে। তৎপূৰ্ব্বে বরিশালের সাংবাৎসরিক মারাত্মক ব্যাধি ছিল ওলাওঠা। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক দেখি নাই, মোটের উপরে স্বাস্থ্যকর বলিয়া বরিশালের খ্যাতি ছিল।

প্রবাদ শুনিতাম, বরিশাল তিনটী বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধ—অশ্বিনী বাবু, নদীর তীর ও মসূরির ডাল। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া বুঝিলাম, প্রবাদটী সার্থক।

এই লোণা জলের দেশে নারিকেল, সুপারী ও বালাম চাউল অর্থাগমের প্রধান উপায়।

ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন

ব্রজমোহন কলেজের কার্য্যে যোগ দিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই অনুভব করিলাম, আমি স্বভাবানুকূল আব্‌হাওয়ার মধ্যে আসিয়াছি। ব্রজমোহন স্কুল ১৮৮৪ সনের জুন মাসে স্থাপিত হইয়াছিল; ১৮৮৯ সনে উহা দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ১৮৯৮ সনে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। অশ্বিনীবাবু লাভজনক ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে দেহ মন সমর্পণ করেন। তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, শিক্ষাবিস্তার ও অন্যবিধ স্বদেশ সেবায় ঐকান্তিক অনুরাগ, নির্ম্মল চরিত্র, নিঃস্বার্থপরতা ও ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ের গুণে ছাত্রমণ্ডলী ও জনসাধারণের উপরে তিনি অনন্যসুলভ প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী ও নৈতিকচরিত্র সংগঠনের নৈপুণ্য, এই উভয়ের খ্যাতি দূর দূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি যখন আসিলাম, তখন বিদ্যালয়ের গৌরব মধ্যাহ্নগগন অতিক্রম করিয়াছে। তথাপি, যতখানি ছিল, তাহাও অন্যত্র দেখি নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক শিক্ষকদিগের নৈতিক আদর্শ অতি উচ্চ ছিল; আমি ব্রাহ্মসমাজের দুইটী কলেজে যাহা দেখি নাই, এখানে তাহা দেখিয়া পুলকিত হইলাম; দেখিলাম, ব্রাহ্ম আদর্শই এই শিক্ষায়তনে কার্য্যতঃ প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। তাহা না হইবে কেন? অশ্বিনীবাবু স্বয়ং যৌবন কালে কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুই বৎসরের জন্য বি. এ. পরীক্ষা স্থগিত রাখিয়াছিলেন; তৎপরে বরিশালে

প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র ছিল, "সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা"। যত দিন তিনি উহার কর্ণধার ছিলেন, ছাত্রগণকে ঐ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার প্রযত্ন তিনি শ্লথ হইতে দেন নাই। তাঁহার প্রচেষ্টা তিন দিকে প্রকাশ পাইত। প্রথম বান্ধবসমিতি (Friendly Union); দ্বিতীয়, দরিদ্র-বান্ধব সমিতি (Little Brothers of the Poor); তৃতীয়, বনভোজন, নৌকাবিহার ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া শারদীয় উৎসব প্রভৃতিও ছিল। ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে ছাত্রেরা ১১ই মাঘ পূরা ছুটী ও ছাত্রসমাজের উৎসবের দিন অর্দ্ধ ছুটী পাইত।

(১) সপ্তাহে এক দিন সায়ংকালে কলেজের হলে বান্ধবসমিতির অধিবেশন হইত। কোনও অধ্যাপক প্রার্থনা পূর্ব্বক উপদেশ দিতেন। অশ্বিনীবাবু, প্রধান শিক্ষক চিরকুমার শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এক এক দিন আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আমিও কয়েক বার করিয়াছি। অশ্বিনীবাবুর প্রার্থনাদি বড়ই মধুর লাগিত। এই প্রতিষ্ঠানটী ঠিক ব্রাহ্মসমাজের একটী অঙ্গ ছিল, ইহা বলিলে ভুল হয় না। এক দিন দেখিলাম, ছাত্রেরা প্রার্থনা ও কীর্ত্তন করিল, অশ্বিনীবাবু উপদেশচ্ছলে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া সকলের হৃদয় দ্রব করিলেন।

(২) দরিদ্রবান্ধব সমিতি—ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমকালে "বরিশাল নগরটী ওলাওঠা রোগের আবাসভূমি ছিল।" এক দিন অশ্বিনীবাবু সংবাদ পাইলেন এক মুসলমান ওলাওঠায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে, তাহার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। অশ্বিনীবাবু তৎক্ষণাৎ সেবা করিবার জন্য

তাহার নিকটে গেলেন। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্মযুবক বরদাপ্রসন্ন রায়, শিক্ষক মথুরানাথ রায়, কবিরাজ মথুরানাথ সেন প্রভৃতি অশ্বিনীবাবুর সহিত মিলিত হইলেন ; এইরূপে একটী সেবক-দল গড়িয়া উঠিল। ইহারই নাম দরিদ্রবান্ধব সমিতি। ক্রমশঃ ইহা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের একটী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৮৯৪ সনে সংস্কৃতের দ্বিতীয় অধ্যাপক কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সমিতির পরিচালনভার গ্রহণ করেন, এবং আমৃত্যু ২০ বৎসর কাল ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত সেবাধর্ম্ম পরিপালন পূর্ব্বক সমিতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলেন। এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ওলাওঠা প্রভৃতি ভীতিজনক পীড়ার সেবায় হিন্দু মুসলমানের ভেদ বিচার করিতেন না। সেকালে বঙ্গ-দেশে এতদনুরূপ ব্যবস্থা আর কোনও স্কুল কলেজে ছিল কি না, জানি না।

(৩) অশ্বিনীবাবু সাতিশয় ছাত্রবৎসল ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগের সহিত খোলা প্রাণে মিশিতেন, তাহারাও নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিত। আমরা জানি, কেহ কেহ পদস্খলনের পরেই অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং সেই যুবক এই উদার স্নেহের প্রভাবে দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়া নির্ম্মল জীবন ও ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে। অশ্বিনীবাবু প্রতিদিন সায়ংকালে নদীতীরে বা গ্রামের পথে মাঠে ভ্রমণ করিতেন, তখন একদল ছাত্র তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সঙ্গে যাইত। ময়দানে, নৌকাযাত্রায়, ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলনে, তাঁহার সহিত আমিও কয়বার যোগ দিয়াছি। বিশেষ বিশেষ উৎসবে সঙ্গীতরচনা ও সঙ্গীতপরিচালনে দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

অশ্বিনীবাবুর একটী গুণ তৎপ্রতি আমার সমধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল; তিনি বিবাহিত হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। তিনি যে দিন প্রথম আমাদের গৃহে আগমন করেন, সে দিনই আমি স্বর্ণলতাকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত করি। তিনি তাঁহাকে স্নেহ ও মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ

বরিশালে যাইয়া দেখিলাম, এখানকার ব্রাহ্মসমাজটী জীবন্ত। সহরে অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবারের বাস, অধিকাংশই দরিদ্র, তুই-একটীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, একটীকে ধনী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম অনেক আছেন, উৎসাহী কর্ম্মীর অভাব নাই, পরস্পরের মধ্যে খুব একটা জমাট ভাব। রবিবার তুই বেলা উপাসনা, ছাত্রসমাজ, সঙ্গত, মহিলাসমিতি, ব্রাহ্মবন্ধুসভা, মাসিকপত্রিকা ব্রহ্মবাদী, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ও অন্যান্য মহাজনদিগের স্মৃতিসভা, মাঘোৎসবাদি উৎসব—এ সমস্তই ব্রাহ্মসমাজের সজীবতার পরিচয় দিত। সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় প্রেমিক শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস প্রধান আচার্য্য ছিলেন। উৎসাহের জীবন্ত মূর্ত্তি, অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই বৎসরই মাঘোৎসবে ধর্ম্মপ্রচারের ব্রতে আত্মসমর্পণ করেন। গায়ক ও সঙ্গীতপ্রণেতারূপে তিনি বঙ্গদেশে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ব্যাকুলপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ কীর্ত্তনে সুদক্ষ ছিলেন। জ্ঞানতপস্বী, স্বল্পভাষী শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্য ও বক্তারূপে বরিশালে এক চিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সেবার কাজ প্রধানতঃ এই চারিজনের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইত।

বরিশালেই আমার আচার্য্যের কার্য্য ও বাঙ্গলা বক্তৃতার হাতেখড়ি হয়।

পারিবারিক জীবন

বরিশালে ব্রাহ্মদের হিন্দু চাকর কদাচিৎ জোটে; পাওয়া যায় খৃষ্টান ও মুসলমান, কিন্তু কেহই বেশী দিন থাকে না। আমাদের তিন বৎসরে যে কত আসিল কত গেল, তাহার সংখ্যা নাই। একটী তিন আনা পয়সা লইয়া বাজারে গেল, আর ফিরিল না, কয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহাকে রাস্তায় দেখিলাম। এই কারণে বৎসরের বেশী দিন সংসারের কাজ নিজেদের করিতে হইত। গৃহিণী রন্ধনাদি ঘরের কাজ করিতেন, আমি বাজার হইতে মাছ তরকারী, মুদিদোকান হইতে চাল, ডাল, তৈল প্রভৃতি এবং রক্ষিত পুকুর হইতে কলসী করিয়া পানীয় জল আনিতাম; বাজার করিতে মান্তু কখনও কখনও সঙ্গে যাইত। অশ্বিনীবাবু এক দিন বলিলেন, কে তাঁহার নিকটে অভিযোগ করিয়াছে, রজনীবাবু নিজের হাতে বাজার হইতে ভারী তরকারীর থলিয়া আনেন, এটা কি রকম? "আমি তাহাকে বলিয়াছি, 'সে যদি ভাল পড়াইতে পারে, তবে মাথায় করিয়া চাউলের বস্তা আনিলেও আমি কিছু মনে করিব না'।" ফলতঃ চাকর ও চাকরাণীর অস্থিরতার জন্য আমাদিগকে খুবই ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। যত দিন গৃহিণীর শরীর সুস্থ ছিল, তত দিন ভৃত্যের অভাবে আহারাদি বরং উৎকৃষ্টই হইত; সঙ্কট উপস্থিত হইল, যখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আমাদের পারিবারিক উপাসনা পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মবদ্ধ হইল। এই সময়ে আমি কলেজের লাইব্রেরী হইতে আনিয়া Amiel's

Journal পাঠ করিতে আরম্ভ করি। অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগ আমরা দুই জনেই পাঠ করিতাম। দুইখানি হইতেই প্রভূত উপকার পাইয়াছিলাম।

প্রথম পুত্র মান্তুর শিক্ষা গৃহেই চলিতেছিল, ইংরেজী আমি দেখিতাম, বাংলা, অঙ্ক তাহার মাতা শিক্ষা দিতেন।

অলির লেখাপড়াতে আমি বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। কিন্তু সে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির গুণে দাদার মুখে শুনিয়া অনেক কবিতা মুখস্থ করিয়াছিল।

সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের উপরে আমার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল পাঠ। কলেজে গুরুতর খাটুনি, অনেক বই পড়িতে হইত, তদুপরি অধ্যাপনার বহির্ভূত বিস্তর বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বাড়িতেছিল। "I feel inclined to read so many subjects and languages—don't know where to begin or where to stop. Sanskrit scriptures (including the Vedanta, the epics, the dramas & the Kavyas), English literature, Greek, Latin, French, Italian, Pali—I am attracted by each of these. History, Philsophy, Poetry—all equally interest me." "Art is long, life is fleeting." (Diary, Sep. 13, 1901).

পূজার ছুটীতে এফ. এ. পরীক্ষার পাঠ্য একখানি ফরাসী পুস্তক পড়িলাম। নবেম্বর মাসে বিলাত হইতে Homer's Iliad, edited by W. Leaf, vol. I আসিয়া পঁহুছিল। ইংরেজী ভাষায় ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ। উৎসাহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলাম; ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য পাই নাই, সুতরাং বুঝিবার অসুবিধা

হইত। ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ৯ই জানুয়ারী (১৯০২) পর্য্যন্ত প্রথম চারি সর্গ পড়া হইল। পঞ্চম সর্গ আরম্ভ করিয়াই সেই যে ইলিয়াড পাঠ বন্ধ হইল, এগার বৎসর পরে, ১৯১৩ সনে পুনশ্চ আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী জুন মাসে এই অতুলনীয় মহাকাব্য একবার সমাপ্ত করিলাম। ১৯২৭ সনের মধ্যে সমগ্র কাব্যখানি তিন বার এবং কতকগুলি সর্গ চারিবার পড়িয়াছি।

এই ছুটীতেই আমি বাল্মিকীর রামায়ণ বালকাণ্ড পড়িয়াছিলাম। বহুবৎসর অন্তে ১৯২৮ সনে আবার পাঠারম্ভ করিয়া উহা শেষ করি।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে একখানি ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত পালি ব্যাকরণ, মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র, শুধু মূল, এবং Fausböl এর ধর্ম্মপদ, মূল, লাটিন অনুবাদ ও বুদ্ধঘোষ প্রণীত টীকার সারসংগ্রহ পাইলাম। অমনি আমার পালি শিখিবার আগ্রহ জন্মিল। ব্যাকরণ খানিতে একবার চক্ষু বুলাইলাম। বাসনা হইল, মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্র, মূল, সংস্কৃতরূপান্তর এবং বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করিব। বাঙ্গালা অক্ষরে মূল নকল করিতে আরম্ভ করিলাম, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার জন্য স্থান রহিল। কয়েক পৃষ্ঠা নকল করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, আর উহাতে হাত দিই নাই। ধর্ম্মপদের কথা পরে বলিব।

বরিশালে একটা সাহিত্যসমিতি ছিল, রবিবার বৈকালে উকীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাসের বাড়ীতে উহার অধিবেশন হইত। যতদূর মনে পড়ে, উকীল শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস, এম্. এ., বি. এল. সভাপতি ও জেলাস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, বি. এ. সম্পাদক ছিলেন। অধিবেশন শেষে গৃহস্বামী সভ্যদিগকে মিষ্টিমুখ করাইতেন। আমি বরিশালে অবস্থানকালে পূর্ব্বাপর উহার সহিত যুক্ত ছিলাম, কখনও কখনও বক্তৃতাও করিয়াছি।

বরিশালে যাইবার অল্পকাল পরেই একদিন সায়ংকালে ব্রাহ্ম-মন্দিরে কঠোপনিষৎ হইতে নচিকেতার উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলাম। ১৭ই আগষ্ট ইংরেজীতে শিক্ষাবিষয়ে পাটনার সেই বক্তৃতাটী আবার দিলাম ; ২৭এ সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায় অনুরুদ্ধ হইয়া সংক্ষেপে বাঙ্গালায় কিছু বলিলাম। এ দুটী সভারও স্থান ছিল ব্রাহ্মমন্দির। ১৯০১ সনের উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছু নাই।

নানাকথা

কৃষ্ণমেঘসঞ্চার

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের বড় সুখের সংসার ছিল। পরিবারে ছোটখাট অসুখবিসুখ না ছিল তা' নয় ; কিন্তু আমরা যখন ইংরেজী নববর্ষে (১৯০২) প্রবেশ করিলাম, তখন জীবনাকাশ নির্ম্মল ছিল। অচিরে এককোণে কৃষ্ণমেঘ দেখা দিল ; বর্ষ অতীত না হইতেই আমাদের যুগলহৃদয় শোকের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মাঘোৎসব

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত মাঘোৎসব উৎসাহ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। উপাসনা, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, বালকবালিকাসম্মিলন, মহিলাসমিতি, ছাত্রসমাজ ও ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসব, শ্মশানে সম্মিলন ও ধর্ম্মালোচনা, শান্তিবাচন ও তদন্তে প্রীতিভোজন—মাঘোৎসবের কোন অনুষ্ঠানই বাদ পড়ে নাই।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "উদ্বোধন," শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন, ধর্ম্মসাধনা (লিখিত), অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র "God in man" ; শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস "জীবনের উচ্চতম বিকাশ" বিষয়ে

বক্তৃতা করিলেন। ৮ই মাঘ আমি "প্রাচীন ও নবীন" শীর্ষক বক্তৃতা করিলাম। ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। এইটীই আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম দীর্ঘ বক্তৃতা। বক্তৃতাটী প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার এবারকার উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিলেন; উপদেশ উদ্দীপনাপূর্ণ হইয়াছিল। তার পরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রাণস্পর্শী প্রার্থনাপূর্ব্বক আপনাকে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় উৎসর্গ করিবার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। মধ্যাহ্নে আমি পুত্রকন্যাসহ শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আহার করিয়া ১টার সময় আবার মন্দিরে গেলাম। স্বর্ণলতা সেখানেই ছিলেন; চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঝি তাঁহার জন্য ভাত লইয়া গেল। ২টার সময় মনোমোহন বাবু উপাসনা করিলেন, চমৎকার হইল। তৎপরে সত্যবাবু সংক্ষেপে কতিপয় উক্তি পাঠ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে অশ্বিনীবাবু ব্রাউনিং ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে কিছু কিছু পাঠ ও প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার পাঠ ও বিবৃতি অত্যন্ত বাগ্মিতা-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পাঠকদিগের তালিকায় আমারও নাম ছিল, এবং আমি প্রস্তুত হইয়াও গিয়াছিলাম; কিন্তু অশ্বিনীবাবু একঘণ্টার অধিক সময় লইলেন, সুতরাং আমি আর উঠিলাম না, এবং কেহ আমাকে আহ্বানও করিলেন না। রাত্রিতে সত্যানন্দ বাবু বেদী গ্রহণ করিলেন এবং 'সত্যে প্রতিষ্ঠা' সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ দিলেন। ১০টার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার পর পত্নী রান্না করিলেন, আহারান্তে শয্যায় যাইতে ১২টা হইল।

২৫এ জানুয়ারী দাদার পত্রে অবগত হইলাম, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইংরেজীর পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি। ঐ পরীক্ষায় তিনিও বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

২৭এ শ্রীমান্ রমণী আসিল, এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চলিয়া গেল। আমরা তাহার সঙ্গ পাইয়া সপ্তাহকাল আনন্দে কাটাইলাম।

মাঘোৎসবের পরে ব্রাহ্মবন্ধুসভার অধিবেশন নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। বৈকালে প্রায়শঃ অশ্বিনীবাবু, মনোমোহন বাবু প্রভৃতির সহিত বেড়াইতাম। এ দিকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছুটী হইলেও কলেজে আমার কাজ সপ্তাহে সতের ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হইল, সুতরাং নিজের পাঠের অবসর অধিক পাইলাম না।

৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমান্ সত্যব্রতকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। সে পাঠে আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই দেখিয়া মন বড়ই ক্ষুব্ধ হইল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে আমি অন্যতম সহকারী আচার্য্য ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলাম। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস আচার্য্য ছিলেন।

রোজনামচায় দেখিতে পাই, কয়েক মাস ধরিয়া আমার প্রায়শঃ মাথা ধরিত ও শরীর খারাপ বোধ হইত।

৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

১লা মার্চ্চ শনিবার ভোর ৪টায় উঠিয়া ৫॥টার ষ্টীমারে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। মধ্যাহ্নে বাট্‌লারের ও রাত্রিতে খুলনার এক হোটেলের অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। পর দিন সকাল ৫॥টায় শিয়ালদহ

পঁহুছিয়া হাঁটিয়া সাধনাশ্রমে উপনীত হইলাম। ভ্রাতা হেমচন্দ্রকে যথাসময়ে আগমনসংবাদ দিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একতলার একটা ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন; সে ঘরে তক্তপোষ ছিল না।

সোমবার ৩রা মার্চ্চ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ১০টা হইতে প্রায় ৪॥টা পর্য্যন্ত সেনেট হাউসে রহিলাম। আমাদের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন চুঁচুড়ার ধর্ম্মাচার্য্য Mr. Mc.Culloch. ৪ঠা মার্চ্চ মিঃ হেক্টরের গৃহে (কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার) পরীক্ষকদিগের প্রথম ও ৭ই দ্বিতীয় সভা হইল। ইতোমধ্যে ৩খানা কাগজ পরীক্ষা করিয়া প্রধান পরীক্ষককে পাঠাইয়া দিলাম। নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইলে ছুটী পাওয়া গেল।

৬ই মার্চ্চ মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ লিহী (Leahy) দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইলাম। তাঁহার সহকারী এক বাঙ্গালী ডাক্তার আমার সহিত বড়ই রুক্ষ ব্যবহার করিয়াছিল। ডাক্তার সাহেব –·৩ চশমার ব্যবস্থা দিলেন। ১৮৯৮ সনে আমার চশমা হারাইয়া কি চুরি গিয়াছিল, এ কয় বৎসর চশমা কিনিতে পারি নাই। রাম মিত্রের দোকানে চশমা ক্রয় করিলাম, তাঁহারা চক্ষু পরীক্ষা করিয়া—২·৭৫ চশমা মনোনীত করিলেন। তৎপরে ভবানীপুরে যাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার স্নেহ ও আদর হৃদয় স্পর্শ করিল।

৭ই মার্চ্চ রাত্রির গাড়ীতে বরিশালে রওনা হইলাম। পর দিন ষ্টীমারে আহার ও নিদ্রার সময় বাদে সমস্তক্ষণ কাগজ দেখিলাম—২১ খানা কাগজের আড়াইটী প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করা হইল। রাত্রি ৯টার সময় বরিশালে পঁহুছিলাম।

পর দিন হইতে পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেলাম। প্রথম প্রথম বড়ই মন্থর গতিতে কাজ চলিতে লাগিল। তাহার কারণ প্রশ্নপত্র দীর্ঘ এবং নিয়মাবলী অত্যন্ত জটিল ও অস্বাভাবিক ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রশ্ন, "সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের সহিত সিংহমনাঃ রিচার্ডের যুদ্ধ বর্ণনা কর।" মোট নম্বর ১০। প্রথমতঃ পরীক্ষার্থী যত পাতাই লিখুক না কেন, উত্তরের জন্য শব্দের একটা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল, যেমন ৮০। মোটামুটি ৮০ শব্দ গণিয়া একটা লম্বা দাঁড়ি টানিয়া দিলাম। এই সীমার মধ্যে matter অর্থাৎ বিষয়ের জন্য ৩, ও composition অথবা রচনার জন্য থাকিল ৭। তারপর বানান ও ব্যাকরণের (এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি ভুল) দাগ দিয়া প্রত্যেক ভুলের জন্য ½ নম্বর এবং স্থল বিশেষে ¼ কাটিতে হইবে। যদি দেখা গেল পরীক্ষার্থী রচনার অংশে 0 পাইল, তবে বিষয়ের অংশ ভাল লিখিলেও পূরা নম্বর পাইবে না, যোগ্যতানুরূপ নম্বরের অর্দ্ধেক পাইবে, যথা ৩ স্থলে ১½, ২ স্থলে ১, ইত্যাদি। এখন এমন হইতে পারে, আমি ১৩টা ভুল কাটিয়াছি, একটা আমার নজরে পড়ে নাই। সুতরাং আমি দিয়াছি, রচনা ½, বিষয় ৩। প্রধান পরীক্ষক আর একটা ভুল ধরিয়া দিলেন, রচনা, 0, বিষয় ১½ সুতরাং আমার ৩½এর পরিবর্ত্তে পরীক্ষার্থী পাইল ০+১½=১½; তফাৎ দাঁড়াইল ২—পরীক্ষকের বিষম অপরাধ। "টানা লেখার" প্রশ্নের পর প্রশ্নে এই বিপত্তি। ইহাতে আমার পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বেগ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। রোজ সকালে মনে হইত, আমি এই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির কাজ করিয়া উঠিতে পারিব না, প্রায় সপ্তাহ কাল প্রতিদিন ভাবিতাম, কাগজগুলি ফেরৎ দিব। গা' বমি বমি করিতে আরম্ভ করিল, আহারে রুচি চলিয়া গেল, মন বিষাদে অবসাদে

আচ্ছন্ন হইল। গৃহিণী কত যত্নে নানা উপাদেয় খাদ্য রাঁধিতেন, মুখে দিতে ইচ্ছা হইত না। ক্রমশঃ মনের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল, কাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাত হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত কাগজ দেখিতাম, স্নানাহার, বিশ্রাম, ভ্রমণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কার্য্য এবং অপরিহার্য্য ব্যাঘাতের সময় বাদ যাইত। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ দয়া করিয়া আমাকে সপ্তাহে মোটে ৩ ঘণ্টা অধ্যাপনার কার্য্য দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত হইয়াছিলাম। গৃহিণী পরীক্ষিত কাগজগুলির নম্বর দেখিয়া দিতেন, এই কাজে তাঁহার প্রশংসনীয় দক্ষতা ছিল। নম্বরের প্রতিলিপি করা, সপ্তাহে সপ্তাহে কাগজ বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ষ্টীমার ঘাটে যাইয়া প্রধান পরীক্ষকের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ আমাকে নিজে করিতে হইত। পরিশ্রম ও নিয়মনিষ্ঠার ফলে নম্বর পাঠাইবার শেষ দিন ১৯এ এপ্রিলের দশ দিন পূর্ব্বে আমার কার্য্য সমাপ্ত হইল। আমি পাঁচ বারে ৭৭০ খানা কাগজ শেষ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। প্রধান পরীক্ষক প্রথম বারের কাগজ পরীক্ষা করিয়া অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই নিশ্চিন্তমনে কাজ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। তিনি নিজে খুব খাটিতেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভ্রম প্রদর্শন করিতেন।

৮

পীড়া

পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইবার পরে ২১এ এপ্রিল আমাকে উদরাময়ে ধরিল। পর দিন গভীর নিশীথে ব্রাহ্ম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিশিবাবুকে ডাকিয়া আনিতে হইল। ২৬এ ভাত পাইলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ ভুগিয়াছিলাম।

২৬এ বৈশাখ (৯ই মে) হরকিশোরবাবুর ভ্রাতা আমার সুহৃৎ শ্রীমান্ দেবেন্দ্র কিশোরের বিবাহ তাঁহার শ্যালী, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দত্তের তৃতীয়া কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইল। ১১ই মে নববধূর আগমন উপলক্ষে বিশ্বাস ভবনে প্রীতিভোজন করিয়া পর দিন হইতে আবার উদরাময়ে আক্রান্ত হইলাম। বরিশাল আগমনের দশ মাস অন্তে আমাদিগের রোগ ভোগ আরম্ভ হইল। কদাচিৎ একটী দিন কাটিত, যখন আমরা সকলে সুস্থ থাকিতাম।

২৭এ মে পূজনীয় শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, আমি গতবৎসর প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের সিটী কলেজে অধ্যাপক হইয়া যাইতে ইচ্ছুক কি না, এবং যদি যাই, কত বেতনে যাইতে পারি। অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; তিনি আর এক বৎসর থাকিতে বলিলেন, যদিচ ইহাও বলিয়া রাখিলেন, এ বৎসর বেতন বৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। মনোমোহনবাবু অমত প্রকাশ করিলেন ; পত্নী জানাইলেন আমি সিটী কলেজের সংস্পৃষ্ট কোনও বিদ্যামন্দিরে কর্ম্ম করিব, ইহা তাঁহার অভিমত নহে। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলাম।

২৯এ দাদার পত্রে অবগত হইলাম, বৌদিদি ২২এ মে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

কয়েকদিন ধরিয়া বাটী ক্রয় ও গৃহসংস্কারের কাজে আমার গুরুতর পরিশ্রম যাইতেছিল ; ৩১এ মে সকালে উদরাময় ও তৎপরে জ্বর হইল ; বৈকালে তাপ ১০৪.৩ পর্য্যন্ত উঠিল ; আনুষঙ্গিক গুরুতর শিরঃপীড়া ও আমাশয় দেখা দিল। আমার অজস্র বকুনি, বক্তৃতা, শ্লোকাবৃত্তি প্রভৃতির সংবাদ পাইয়া শয়নকক্ষে অনেক ব্রাহ্ম জড় হইলেন। গৃহিণীর পক্ষে নূতন কিছুই নয়, তাঁহারা তাঁহার ধীরতা

দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। নিশিবাবু চিকিৎসার ভার লইলেন, দুইটী অপরিচিত যুবক, বাবু রজনীকান্ত দাস ও সুরেন্দ্রবাবু রাত্রিতে আমার নিকটে রহিলেন; মনোমোহনবাবু ও রসরঞ্জনবাবু দীর্ঘকাল আমার নিকটে ছিলেন। ২রা জুন জ্বর ত্যাগ হইল, ৪ঠা ভাত খাইলাম।

৯
বসতবাটী ক্রয়

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইল পাঁচ শত সাড়ে সাতাত্তর টাকা। প্রশ্ন উঠিল, টাকার কি প্রকার ব্যবহার করা যাইবে? ঠিক সেই সময়ে সংবাদ পাইলাম, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় তাঁহার বসতবাটী বিক্রয় করিবেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা দরদস্তুর ঠিক করিয়া, আমরা দুই জনে উহা ক্রয় করাই স্থির করিলাম। আমি জন্মাবধি দক্ষিণমুখ বাড়ীর পক্ষপাতী। বরদাবাবুর বাস্তুভূমি দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত; দক্ষিণে রাজপথ, পশ্চিমে খাল ও রাজপথ। প্রায় তিন বিঘা জমি। চল্লিশ পঞ্চাশটা নারিকেল গাছ, আট দশটা ফলিতেছে; কয়েকটা ফলবান্ কাঁঠালগাছ, দুটী জামরুল ও একটা উৎকৃষ্ট কুলগাছ, গুটী দুই ছোট বড় বেলগাছ, ছোট আমগাছ, সুপারীর বাগান, গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী কয়েক ঝাড় বাঁশ, একটা বৃহৎ বট ও একটা খুব বড় জঙ্গলী জাম ও অন্যান্য বৃক্ষ। সদরে ও অন্দরে ছোট পুকুর, রোজ জোয়ারের জলে পূর্ণ হয়। বাটীর অবস্থান ও গাছপালা দেখিয়া আমি আকৃষ্ট হইলাম। তিনখানি খরের ঘর; ছোট তিনচালার রান্না ঘর, ছয়চালা মধ্যম আকারের বাসগৃহ; বহির্বাটীতে একখানি চৌচালা ঘরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের বালিকা বিদ্যালয়

বসিতেছে। তাহার অপর দিকে পশ্চিমখণ্ডে জেলাস্কুলের শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ অল্পদিন পূর্ব্বে বার্ষিক ছত্রিশ টাকা খাজানায় অস্থায়ী প্রজারূপে দুখানি ঘর তুলিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এক মুদি দোকান, মাসে খাজানা আট আনা। দোকানদার যজ্ঞেশ্বর দে উত্তরকালে স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস নামে দেশবিখ্যাত হইয়াছিল।

বরদাবাবু স্বয়ং আমাকে সুবিধাজনক সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, তবে মূল্য প্রথমে যে চারিহাজার টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাই রহিল; অধিকন্তু তিনখানি ঘরের বাবদ পঁচিশ টাকা দিতে হইল। আমি তাঁহাকে নগদ ছয়শত টাকা দিব, এবং বাকি তিন হাজার চারিশত টাকার জন্য রেহানী তমঃশুক দ্বারা বসতবাটী তাহার নিকটে বন্ধক রাখিব; প্রত্যেক বৎসর কিস্তিবন্দী মত আসল টাকা ও প্রতি মাসে শতকরা বার্ষিক ছয়টাকা হারে সুদ দিতে প্রতিশ্রুত থাকিব—এই সকল সর্ত্তে আমি আবদ্ধ হইলাম। সকলেই বলিতে লাগিলেন, বাটীর মূল্য অত্যধিক হইয়াছে, উকীল সভার সভাপতি হইতে জমিদার শিক্ষক প্রভৃতি ভদ্রব্যক্তিরা আমাকে একান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। সে যাহা হউক, আমি অশ্বিনীবাবু, মনোমোহনবাবু প্রভৃতির সহিত পরামর্শপূর্ব্বক এই অসমসাহসের কার্য্যে প্রবেশ করিলাম। ডুবিব কি ভাসিব, জীবনস্বামীই জানিতেন, আমি কিছু জানিতাম না।

প্যারীবাবুকে সংবাদ দিয়াছিলাম আমি ২রা জুন তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিব। তিনি ঐদিন ভোরে সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন জ্বরে শয্যাগত। তিনদিন নানা অসুবিধার মধ্যে দুই পরিবারকে একসঙ্গে থাকিতে হইল। ৫ই জুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে

আমরা বরদাবাবুর বাটীতে গমন করিলাম। গৃহে প্রবেশ করিবার পরেই আমি গৃহিণী ও সন্তানদিগকে লইয়া প্রার্থনা করিলাম। বরদা বাবু ও ভূষণ উপস্থিত ছিলেন। ভূষণ শ্রীযুত হেমচন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্রকাশ নাম বিভূতিভূষণ; বাঁকিপুরে অধ্যয়ন কালে আমাদিগের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া কি একটা কর্ম্মোপলক্ষে বরিশালে আসিয়া একমাস আমাদিগের সহিত বাস করিতেছিলেন, তারপরে ব্রজমোহন কলেজে পুনরায় পড়িবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের সঙ্গেই রহিয়া গেলেন। আপদে বিপদে এই যুবককে সহায়রূপে পাইয়া আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম।

বাসগৃহখানির সংস্কার পূর্ব্বক ছোট বড় কতকগুলি জাফ্রিওয়ালা জানালা করিয়া যথাসম্ভব সুন্দর ও স্বাস্থ্যের অনুকূল করা হইয়াছিল। বাস্তুবাটীর চিরস্থায়ী খাজানা ছিল বার্ষিক ৫৶৫ (পাঁচ টাকা দুই আনা এক পয়সা), সুপারী বিক্রয় করিয়াই পরিশোধ হইত। পাঁচ ছয় জন মালিক, দুই আনা চারি আনা হইতে ৩৵৫ পর্য্যন্ত এক এক অংশীদার পাইতেন। আমি আসিয়াই স্কুল ঘরের ভাড়া সাড়ে তিন ও দোকান ঘরের ভাড়া এক টাকা করিলাম। শিক্ষকটী দিবেন তিন টাকা। প্রথম বৎসর আমাকে প্রতি মাসে বরদা বাবুকে সতের টাকা সুদ দিতে হইবে; বাড়ী হইতে সাড়ে সাত টাকা উঠিবে। আমি মাসিক পঁচিশ টাকা ভাড়া দিতেছিলাম। ভাড়াস্বরূপ সাড়ে নয় টাকা দিয়া নিজের পর্ণকুটীরে বাস করিব, এই বন্দোবস্ত আমাদিগের নিকটে ভালই বোধ হইল।

১০ই জুন মঙ্গলবার শ্রীমতী স্বর্ণলতা গুহের নামে বাড়ীর কবালা ও বন্ধকী তমঃশুক রেজেষ্ট্রী আফিসে যাইয়া উভয় পক্ষ রেজেষ্ট্রী করিয়া

দিলেন। রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বসু আমাদিগের সহিত সাতিশয় সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯এ জুন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর (অধুনা মহারাজা স্যর) সহিত তারযোগে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী কলেজের অধ্যক্ষের পদবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। আমি দুই শত টাকা চাহিলাম, তিনি এক শত পঞ্চাশ টাকা প্রস্তাব করিলেন। অশ্বিনীবাবুকে মন্মথবাবুর তার দেখাইলাম; তিনি বলিলেন, আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হইলেই আগামী বৎসর আমার বেতন ১৫০৲ করিয়া দিবেন, এবং ব্রজেন্দ্র বাবু অবসর গ্রহণ করিলে আমাকে অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করিবেন।"

নব গৃহে নব পরীক্ষা

নব গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই আমাদিগের সকলের স্বাস্থ্য মন্দের দিকে চলিল। পত্নীর দেহ ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা কেহ জ্বর, কেহ কাসি ও উদরাময়ে ভুগিতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ অলি মাসের পর মাস আমার সহিত পেটের পীড়ার ঔষধ সেবন করিত। আমি আবার সপ্তাহাধিক কাল উদরাময়ে ভুগিলাম। তারপর সপ্তাহকাল স্বল্পজ্বরে কাটিল; পরিশেষে আমাশয় হইল। অল্পাধিক অজীর্ণতা রোগ লাগিয়াই ছিল। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু বিনাপারিশ্রমিকে পারিবারিক চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার সহিত আমাদিগের সুমিষ্ট হৃদ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল।

এই বৎসর টাঙ্গাইল হইতে আমার মাসতুত ভাই যাদবলাল ও তাহার বন্ধু ও সহাধ্যায়ী একদল যুবক ব্রজমোহন কলেজে পড়িবার

জন্য বরিশালে আগমন করে। যাদবের সহিত আরও দুই তিনটী ছাত্র আমাদিগকে নিজ পরিবারের মত প্রীতি করিত।

১১
সুকুমারীর বিবাহ

আমার বাঁকিপুর ছাড়িবার অল্পকাল পরেই শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর সহিত সুকুমারীর পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। গুরুদাস বাবু ও বরকন্যার ইচ্ছা ছিল, শীঘ্রই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু অবিনাশ রামমোহন রায় সেমিনারীতে মোটে পনর টাকা ভাতা পাইতেন, এজন্য আমি সে প্রস্তাবে সম্মতি দিই নাই। কিছু কাল পরে তিনি স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিবাহের দিন পিছাইতে পিছাইতে পরিশেষে স্থির হইল, এই বৎসর (১৯০২) পূজার অবকাশে শুভ-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে।

৩রা অক্টোবর কলেজ বন্ধ হইল ; আমরা ৫ই বরিশাল ছাড়িয়া ৭ই বাঁকিপুরে উপনীত হইলাম। ১০ই অক্টোবর শুক্রবার সায়ংকালে রামমোহন রায় সেমিনারীর নূতন বাড়ীতে পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। অনুষ্ঠানের প্রথমার্দ্ধে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিলেন। আমি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ পাঠ করিলাম। আহারাদি সমগ্র ব্যাপার সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

পর দিন অপরাহ্ণে গৃহিণী উদরাময়ে পীড়িত হইলেন। তার পর দিন, রবিবার, মান্তু, অলি, খোকা, তিনটীরই জ্বর হইল। মঙ্গলবারে খোকার জ্বর ১০৫° পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ডাক্তার বিমানবিহারী বসুর চিকিৎসায় রোগীরা ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিল।

সতীশ ইতঃপূর্ব্বে দীর্ঘকাল দুরন্ত সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। জ্বর ত্যাগের অল্পকাল পরে, ১৮ই অক্টোবর তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ ও তাঁহার কন্যাগণের সহিত কৈলোয়ার গেলেন।

২০এ অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক আমার ৩৫শ জন্মদিনে গুরুদাস বাবু উপাসনা করিলেন এবং উৎকৃষ্ট উপদেশ দিলেন।

এই সময়েই ডাক্তার আসদার আলীর হস্তে পত্নীর চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করিলাম।

২৭এ অক্টোবর সকালের ট্রেনে কৈলোয়ার যাইয়া সতীশের সহিত অন্তরঙ্গ কথাবার্ত্তা বলিয়া বৈকালে ফিরিয়া আসিলাম।

৩রা নবেম্বর সোমবার আমি মান্তুকে লইয়া বরিশাল যাত্রা করিলাম। রাত্রিতে দাদার বাসায় বিশ্রাম ও আহার করিয়া ১১টার খুলনার ট্রেন ধরিলাম, এবং পর দিন ভোরে ষ্টীমারে উঠিয়া রাত্রি ৮টার সময় বরিশালে উপনীত হইলাম। ভূষণ চাকর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। সে রাত্রি শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের গৃহে আহার করিলাম ; এবং পর দিন পিতাপুত্র উভয়েই উদরাময়ে ভুগিলাম।

১২
আসন্ন আঘাতের অপরিজ্ঞাত ইঙ্গিত

এই সময়ে ফরাসী সাধু পাস্কালের "চিন্তাবলী" (Pascal's Thoughts) এবং "এপিকটীটসের উক্তি" পড়িতাম। ৯ই নবেম্বরের দৈনন্দিন লিপি হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"Read Pascal and prayed. In the morning while

walking in the front of the house I felt the exhilarating influence of nature, so beautiful & enjoyable it was. Everything becomes sweet in Him. The more we feel His presence, the more do we forget the bubbles of the world. My life is really a playing with bubbles. When these will burst! Wife, children, rank, wealth, the affections of the world—how short-lived all these are!"

১৩
মৃত্যুর ছায়া

১৫ই নবেম্বর সন্ধ্যা পৌণে সাতটার সময় মধ্যমদাদার নিকট হইতে তারে সংবাদ পাইলাম, "মা রক্তামাশয়ে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত। অবিলম্বে রওনা হও।" তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরের টাকা দিয়া তার করিলাম—"মান্তু গুরুতর প্রতিবন্ধক। বন্দোবস্তের চেষ্টা করিতেছি। তারে মার অবস্থা জানাও।" সমস্ত রাত্রি গুরুতর উদ্বেগে ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কাটিল।

পর দিন বৈকালে আমি মান্তুকে ভূষণের নিকটে রাখিয়া একাকী জামুরিয়া যাইব, স্থির করিলাম। ১৭ই সোমবার কলেজে যাইয়া বারটার পূর্ব্বে আমার তারের জবাব পাইলাম। "মা একটু ভাল, যদি সুবিধা হয়, দুইজনেই এস।" তার পরেই মান্তু জ্বর লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন অশ্বিনীবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া মধ্যমদাদাকে পুনরায় টেলিগ্রাম করিলাম—"রওনা হইবার সময় মান্তুর জ্বর হইয়াছে। অবস্থা খারাপ হইলে জানাইও।" সাতটার

পূর্ব্বে উত্তর আসিল—"Mother dying, expects anxiously ; start immediately ; no excuse." "মাতা মৃত্যুমুখে ; আগ্রহের সহিত তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ; এক্ষণই রওনা হও ; কোনও অজুহাত করিও না।"

তার পাইয়া একেবারে বিহ্বল হইলাম ; বুক ফাটিয়া কান্না পাইতে লাগিল। আমি পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রা করিবার সংকল্প করিলাম। ভূষণকে পাঠাইয়া বিনয়বাবুর নিকট হইতে কুড়িটাকা হাওলাত আনিলাম। মান্তুকে জাগাইয়া জানাইলাম, আমি পরদিন মাকে দেখিতে যাইতেছি। পত্নীকে তার করিলাম, "মা মৃত্যুমুখে ; একাকী বাড়ী যাইতেছি ; দ্বিতীয়বার তার পাইলেই আসিবার জন্য প্রস্তুত থাক।" ময়মনসিংহে পণ্ডিত মহাশয়কে তারযোগে অনুরোধ করিলাম—"অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুধবারের জন্য ঘাটাইল যাইবার ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করুন। আগামী কল্য রওনা হইতেছি।"

১৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার প্রাতঃকালে নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমারে উঠিয়া সন্ধ্যার পরে সেখানে পঁহুছিলাম, এবং রাত্রির গাড়ীতে ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম।

পরদিন ১৯এ, প্রাতঃ আটটার সময় ময়মনসিংহে উপনীত হইলাম। পণ্ডিত মহাশয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন, আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া বিশ্রাম করিলাম। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী দুইজন আমার খুব সমাদর করিলেন। আহারান্তে বারটার পরে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। মধুপুর অতিক্রম করিবার পরে এক স্থানে ভাঙ্গা রাস্তা পার হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইল ; কয়েকজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান ও এক ডাকওয়ালার সাহায্যে বিপদ উত্তীর্ণ হইলাম। ঘাটাইল

পঁহুছিতে রাত্রি সাড়ে এগারটা হইল। তথা হইতে সহিসের হাতে ছোট বিছানা বাক্সের মোট দিয়া হাঁটিয়া প্রায় সাড়ে বারটার সময় বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখনই মাতার ঘরে যাইয়া চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া মান্তুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহার সমস্ত পুত্রকন্যা শয্যাপার্শ্বে মিলিত হইয়াছিলাম। রাত্রিতে কিছুই আহার করিলাম না। ১টার সময় সেই ঘরেই দাদা ও আমি এক শয্যায় শয়ন করিলাম।

পর দিন, ২০এ, শয্যা হইতে উঠিয়া উপলব্ধি করিলাম, মাতার অবস্থা হৃদয়বিদারক, রাত্রিতে উহা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। বৈকালে টাঙ্গাইল হইতে ডাক্তার শশিমোহন তরফদার, এল. এম. এস. আসিলেন—ইনি সিটী কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন। রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মাতার নিকটে জাগিয়া রহিলাম। কয়েক ঘণ্টা তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, এবং ঔষধ খাইবার শক্তি ছিল না।

আজ অপরাহ্ণে ভূষণের টেলিগ্রাম পাইয়া জানিলাম, মান্তুর জ্বর ১০১·২°।

২১এ, শুক্রবার, মাতার অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার উদর বিকল হইল। শশী একটা ঔষধ খাইতে দিলেন; রাত্রি অনাহারে ও ভয়ানক দুশ্চিন্তায় যাপন করিলাম। দেহাসক্তির দৌর্ব্বল্য আমাকে আচ্ছন্ন করিল। সে রাত্রি মাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিবার জন্য দাদারা আমাকে বলেন নাই, আমিও যাই নাই।

২২এ, শনিবার শয্যাত্যাগের পরে মান্তুর জন্য বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। শশীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, মায়ের অবস্থা একটু আশাপ্রদ, কিন্তু তাহাতে কোনও ভরসা নাই; ভাল, মন্দ, যে

দিকেই রোগের পরিসমাপ্তি হউক, সময় লাগিবে। আমি আজই বরিশালে যাত্রা করিবার সংকল্প করিলাম। দাদারা ভূষণের টেলিগ্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন; মা, ছোটদিদি ও মেজ বৌদিদি ফিরিয়া যাইবার পক্ষে তৎক্ষণাৎ মত দিলেন। মা তাঁহার জন্য বেদানা ও কিসমিস পাঠাইতে বলিলেন। আমি বরিশালে যাইয়াই তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলাম। কিন্তু, হায়, তাহা তিনি আস্বাদন করিবার অবসর পাইলেন না।

মধ্যাহ্নে আহারের পরে একটী ভারবাহী লোক সঙ্গে লইয়া আমি পদব্রজে রওনা হইয়া সুবর্ণখালি ৪টার সময় পঁহুছিলাম। ৯ টার সময় ষ্টীমার আসিল; সাড়ে এগারটায় জগন্নাথগঞ্জ; ষ্টীমারেই অন্নাহার করিলাম। গাড়ীতে রাত্রি কাটিল।

মাতৃবিয়োগ

২৩এ নবেম্বর রবিবার বেলা দশটার সময় ময়মনসিংহ পঁহুছিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। রাত্রিতে নারায়ণগঞ্জের গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন ভোরে বরিশালের ষ্টীমার ধরিলাম।

২৪এ নবেম্বর সোমবার পাঁচটার সময় বরিশালে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম, মাস্তুর স্বল্পবিরামজ্বর (remittent fever) হইয়াছে। ভূষণ ও অন্যান্য অনেকে তাহার যথোচিত যত্ন করিতেছেন।

পরদিন সায়ংকালে দাদার তার পাইয়া অবগত হইলাম, মাতৃদেবী ২৪এ রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহরক্ষা ও আমার বরিশালে পদার্পণ ঠিক একই মুহূর্ত্তে হইয়াছিল।

১৪
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

মাস্তুর জ্বর কমিতেছে না। নিশিবাবু চিকিৎসা করিতেছেন; ১লা ডিসেম্বর প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার গুপ্ত এল. এম. এস্. মহাশয়কে দেখাইলাম। ৪ঠা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে বিছানায় বসিয়া যাদব, ভূষণ প্রভৃতি কয়েকটি যুবকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ঘরের দরজা বন্ধ, এমন সময়—তখন ৭টা—বারাণ্ডায় আসিয়া পিয়ন বলিল, "বাবু, টেলিগ্রাম।" শশব্যস্ত হইয়া খামখানা হাতে লইয়া খুলিয়া দেখি, গুরুদাসবাবু তার করিয়াছেন, "Ali Cholera, Asdur Ali attending, Bina diarrhoea, better to-day"—"অলির ওলাউঠা হইয়াছে, আসদার আলি চিকিৎসা করিতেছেন; বীণার উদরাময়, আজ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে।" প্রার্থনার পরে গুরুদাসবাবুকে জরুরী (urgent) টেলিগ্রাম করিলাম, "Save Ali all costs; wiring money; wire daily."—"যত ব্যয়ই হউক অলিকে রক্ষা করুন। তারযোগে টাকা পাঠাইতেছি; প্রতিদিন তারে সংবাদ দিবেন।" এই অভাবনীয় দুঃসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম।

৫ই ডিসেম্বর ভোরে আমাকে হাওলাত দিবার জন্য বিনয়বাবু ষাট টাকা লইয়া আসিলেন, সঙ্গে আরও দুইটী ভদ্রলোক ছিলেন। তারে গুরুদাসবাবুকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম। সমস্ত দিন গুরুতর উদ্বেগে কাটিল। বন্ধুবান্ধবেরা আসিতে যাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় তারে সংবাদ পাইলাম, "Collapse continues, pulse revived, no decided improvement; treatment best

available. Trust God.—"জীবনীশক্তির নিস্তেজ ভাব চলিতেছে; নাড়ী আবার জাগিয়াছে; নিঃসন্দেহ উন্নতি কিছু হয় নাই; চিকিৎসা যতদূর উৎকৃষ্ট সম্ভব হইতেছে। ঈশ্বরে নির্ভর রাখ।" সংবাদটী পাইয়া খানিকক্ষণ আত্মহারা হইলাম; প্রার্থনা করিলাম, চোখের জল সংবরণ করিতে পারি নাই; এমন সময়ে বন্ধুজন আসিলেন, তখন প্রকৃতিস্থ হইলাম। রাত্রিতে শান্ত ছিলাম এবং সুনিদ্রা হইয়াছিল।

৬ই ডিসেম্বর শনিবার সকালে প্রার্থনা করিয়া বললাভ করিলাম। পৌণে বারটার সময় কলেজে তার পাইলাম, "Ali hopeless. Trust God who always does good."—"অলির আশা নাই। ঈশ্বর নিয়ত মঙ্গল করিতেছেন; তাঁহাতে বিশ্বাসী থাক।" তখনই বাড়ী চলিয়া আসিলাম। চোখের জল নিবারণ করিতে পারিলাম না; কিয়ৎক্ষণ অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হইল। মনোমোহনবাবু ও আরও কেহ কেহ আসিলেন; চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রার্থনা করিলেন। তার পরে বাইবেল পড়িলাম—

"The Lord gave & the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord."

"My God, my God, why hast Thou forsaken me?"

"Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil; for Thou art with me; Thy rod & Thy staff they comfort me." "The Lord is my light & my salvation; whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?"

কয়েক দিন পূর্ব্বে এপিক্‌টীটস পড়িতে পড়িতে অন্তরে বাণী শুনিলাম।

Be prepared for the inevitable"—"ভবিতব্যের জন্য, যাহা অপরিহার্য্য, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।"

"I am not yet prepared to give up all—wife & all my children."

"O Lord, take my all, if so be Thy pleasure"—Diary. রাত্রি দশটার সময় টেলিগ্রাম আসিল—"Ali expiring. Khoka Bina seem attacked dysentery. Naren asked to come."—"অলি চলিয়া যাইতেছে। খোকা বীণা রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। নরেন্দ্রকে আসিতে তার করা হইয়াছে।" রক্তামাশয়ের সংবাদ পাইয়া পরদিন (৭ই) দাদাকে বাঁকিপুর যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তার করিলাম। তিনি ঐ ব্যারামের একটী খুব ভাল ঔষধ জানিতেন। রাত্রিতে গুরুদাসবাবুর নিকট হইতে অশ্বিনীবাবুর নামে এক টেলিগ্রাম আসিল; ভূষণ তখন আফিসে উপস্থিত ছিল, সে উহা আনিয়া আমাকে দিল—"Ali departed yesterday. Amitabha Bina no collapse; both passed urine. Doctor hopeful. Swarna patient under bereavement."—"অলি গতকল্য চলিয়া গিয়াছে। অমিতাভ বীণার অবসাদ হয় নাই; উভয়েরই প্রস্রাব হইয়াছে। ডাক্তার আশান্বিত। স্বর্ণ শোকে ধীর আছে।" এইবার বুঝিলাম, খোকা বীণার রক্তামাশয় নয়, ওলাউঠা হইয়াছে। চারিটী সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠটী একজ্বরে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত; দ্বিতীয়টী, প্রথম কন্যা, ওলাওঠায় দেহত্যাগ করিল, তৃতীয় ও চতুর্থটীও সেই মারাত্মক

রোগে আক্রান্ত। গুরুদাসবাবুর নিদারুণ মানসিক উদ্বেগজনিত ভুল এই ঘোরতর বিপদের প্রথম ধাক্কা সামলাইতে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। ছত্রিশ বৎসর পরেও সেই তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনের স্মৃতি মনে অনপনেয়রূপে জাগিয়া রহিয়াছে। এই সময়ে পরমসুহৃৎ মনোমোহনবাবু প্রতিদিন আমাকে লইয়া প্রার্থনা করিতেন। ৮ই সোমবার সংবাদ পাইলাম, সন্তানদুটী আরোগ্যের দিকে যাইতেছে। পত্নীকে তারযোগে বার্ত্তা প্রেরণ করিলাম— "Beloved, be comforted ; God will never forsake thee. Mantu remission."—"প্রিয়তমে, সান্ত্বনা লাভ কর। ঈশ্বর তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। মান্তুর জ্বর ছাড়িয়াছে।"

১২ই ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত আর কোনও সংবাদ পাইলাম না, এজন্য গুরুদাসবাবুকে ordinary prepaid টেলিগ্রাম করিলাম ; উত্তর আসিল, ছেলেমেয়ে ভাল আছে। ২১এ রবিবার স্বর্ণলতা সন্তান দুটীকে লইয়া বরিশালে ফিরিয়া আসিলেন। ভূষণ ষ্টীমার ঘাটে তাঁহাদিগকে আনিতে গেল। আমি শয়নঘরে উপাসনার স্থান করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কয়েকটী বর্ষীয়সী মহিলা পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার মানসে সমবেত হইলেন। বন্ধুরাও অনেকে উপস্থিত থাকিলেন। পত্নী আসিয়া উপবেশন করিলে আমি প্রার্থনা করিলাম। পরে কথাবার্ত্তা হইল।

অলি সুকুমারীকে 'ছোটমা' বলিয়া ডাকিত, এবং মাসীমার বিবাহের পরেও তাঁহার কাছেই শুইত। সুকুমারীর ক্রোড়েই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

স্বর্ণলতারা অবিনাশের সহিত কলিকাতায় আসিয়া দাদার সঙ্গে

বরিশালে আসিলেন। এবার কনিষ্ঠা ভগিনী ছায়াময়ীকে লইয়া আসিয়াছিলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধ

২৪এ ডিসেম্বর, বুধবার (১৯০২) প্রাতঃকালে বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে মাতাঠাকুরাণীর আদ্যকৃত্য সম্পন্ন হইল। মনোমোহনবাবু আচার্য্যের কার্য্য ও মহর্ষির "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" এই উপদেশটী পাঠ করিলেন। আমি গীতা ও শ্লোকসংগ্রহ হইতে কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মাতার সম্বন্ধে একটু বলিলাম ও প্রার্থনা করিলাম। দাদা কলিকাতায় শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি নীরবে যোগ দিলেন। বৈকালে কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইল।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

কন্যার স্মৃতিতর্পণ

১লা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার (১৯০৩) উপাসনার পর এই সঙ্গীতটী রচিত হইল।

ওগো, মেরেছ মেরেছ, করেছ ভাল
(তোমার) প্রেমের তুলনা নাই।
(মোরে) শোকের আঘাতে করে জর জর
রাখিবে আপন ঠাঁই।

এটী আমাদের ব্রহ্মসঙ্গীতে স্থান পাইয়াছে।

৪ঠা রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনাকক্ষে দুইজন একত্র উপাসনা

করিতে বসিলাম। আমি বাইবেল ও গীতা পাঠ করিলাম। পত্নী নীরবে প্রার্থনা করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। তৎপরে দায়ূদের ২৩শ স্তোত্র অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত সঙ্গীত রচনা করিলাম—

তুমি মম পালক, প্রভু দয়াময় হে,
তোমার প্রসাদে কোন অভাব না রয় হে।

এই সঙ্গীতটী নবমসংস্করণ ব্রহ্মসঙ্গীতে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অলির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। প্রাতঃ সাড়ে সাতটার সময় বন্ধুগণ সমবেত হইলে "কেন তোমায় ভুলি দয়াময়," এই সঙ্গীত করিতে করিতে অলির অস্থি ও চুল বোতলে করিয়া সমাধিস্থলে লইয়া যাওয়া হইল। মনোমোহনবাবু উহা প্রোথিত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, এবং "চলেছে অমর আত্মা"— এই সঙ্গীত করা হইল। তৎপরে সকলে উপাসনাস্থলে সমবেত হইলেন। প্রথম সঙ্গীত, "ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম" গাহিয়া— মনোমোহনবাবু উদ্বোধন করিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গীত, "তুমি মম পালক"। কালীমোহনবাবু আরাধনা করিলেন। তৃতীয় সঙ্গীত "ব্যাকুল হয়ে এসেছি তব দ্বারে।" তৎপরে সত্যবাবু কিছু পাঠ করিলেন; উহা বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল। পরে আমি অলির সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলাম। চন্দ্রনাথবাবু একটী গান করিলেন। তৎপরে আমি ও স্বর্ণলতা প্রার্থনা করিলাম, এবং 'ওগো, মেরেছ মেরেছ করেছ ভাল' এই সঙ্গীত হইল। পরে মনোমোহনবাবু প্রার্থনা করিলে "তোমায় কেমনে ছাড়িব হে" এই সঙ্গীত ও শান্তিবাচন হইয়া অনুষ্ঠান শেষ হইল।

অলি

(অমিয়া গুহ)

অলি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম যেন আমাদের একটী কন্যা হয়। তাহার জন্মের সময় লোকের অভাবে আমাকে ধাত্রীর সাহায্যের জন্য উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। কন্যা লাভ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহার কাকা শ্রীমান সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আদর করিয়া তাহাকে জন্মের পরদিন 'অলি' নাম দিয়াছিলেন।

সে এই সংসারে মোটে সাত বৎসর ছিল ইহার মধ্যে অনেক সময় সে দুরন্ত রোগ ভোগ করিয়াছে। তিন মাস বয়সে এবং ঠিক একবৎসর পরে পুনরায় পনর মাস বয়সে তাহার ব্রঙ্কাইটিস হয়। তৎপর আড়াই বৎসর বয়সে ভীষণ জ্বর, তাহার দুই বৎসর পরে দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর নিমোনিয়া ও তাহার ৮।৯ মাস পরেই পুনঃ পুনঃ জ্বরে ও বিস্ফোটক রোগে তাহাকে বহুদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। যে করাল কলেরা রোগে সে পরলোক গমন করে, তাহার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ জ্বরে পীড়িত হইয়া বালিকা অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। এত রোগযন্ত্রণার মধ্যে তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। নীরবে সমস্ত যাতনা বহন করিত, কখনও কুপথ্য করিতে চাহিত না, পীড়ার আক্রমণ বুঝিতে পারিলে নিজেই সতর্ক হইত। ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া প্রথম মলত্যাগের পরেই সে বলিয়াছিল, "এবার আর আমি ভাল হইব না।" স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে বড় সাবধান ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

এই বালিকার হৃদয় বড় কোমল ও স্নেহপ্রবণ ছিল। আমার

নিত্যনৈমিত্তিক কতকগুলি কার্য্যের ভার তাহার উপর ছিল। তাহার মাতার পীড়া হইলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিত। বয়স হিসাবে আমি তাহার নিকট যথেষ্ট সেবা পাইয়াছি। সে ছোট ভাইবোনদের অনেক উপদ্রব সহ্য করিত। অপরকে মার খাইতে দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হইত।

অলির সৌন্দর্য্যবোধ প্রবল ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত। নিজের কাপড় চোপড় যত্ন করিয়া রাখিত। কেহ ইহাকে কাল বলিলে মনে ক্লেশ পাইত।

এমন গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে খুব কম দেখা যায়। আপনার সুখদুঃখের কথা সহজে প্রকাশ করিত না। এই অল্প বয়সে আপনাকে শাসন করিবার এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, যে একবার গম্ভীরভাবে বসিলে অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাকে হাসাইতে পারা যাইত না।

ইহার লেখা পড়াতে আমি কখনও বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। কিন্তু ইহার স্মরণশক্তি প্রখর ছিল, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। এজন্য আমি আশা করিতেছিলাম, কালে এই বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইবে। ইহার দাদার মুখে শুনিয়া সে অনেক কবিতা শিখিয়াছিল। কোন গল্প শুনিলে তাহার অপেক্ষা বড় ছেলে মেয়ের চেয়ে তাহা সুন্দররূপে পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ পারিপাট্য ছিল। অনেক সময় বর্ষীয়সীদিগের ন্যায় মতামত প্রকাশ করিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র সেনাপতি ক্রঞ্জে বন্দী হইলে সাড়ে চারি বৎসরের বালিকা সঙ্গীদিগকে লিখিয়াছিল, "জানিস, বুয়ররা হেরে গেছে।" অলি উপাসনা প্রার্থনার কি বুঝিত বলিতে পারিত না কিন্তু দেখিয়াছি, চক্ষু

মুদিয়া প্রার্থনা না করিয়া কখনও অন্ন গ্রহণ করিত না। গৃহে পারিবারিক উপাসনার সময় স্থির হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিত। উৎসাহের সহিত আমাদের সহিত সঙ্গীত করিত। "প্রাণময়ী লুকালে কোথায়", "তোমায় কেমনে ছাড়িব হে" প্রভৃতি সঙ্গীত তাহার বড় প্রিয় ছিল।

অলি দেখিতে অনেকটা আমার মায়ের মত ছিল। আমি আশা করিয়াছিলাম কালে সে আমার মায়ের স্থান অধিকার করিবে। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল, তাই এই শিশু পনর দিনের মধ্যে তাহার ঠাকুরমার অনুসরণ করিয়া পরলোকে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। "প্রভু দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়াছেন, তাঁহার নাম ধন্য হউক।"

১৫

নানা কথা

প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ দুইটীর মিলন প্রস্তাব

১০ই জানুয়ারী শনিবার সহরে রাষ্ট্র হইল, রাজচন্দ্র কলেজের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় এক দলিল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার অনুবলে রাজচন্দ্র ও ব্রজমোহন কলেজ মিলিত হইল, সম্মিলিত কলেজের নাম হইবে রাজচন্দ্র-ব্রজমোহন কলেজ, অশ্বিনীবাবু একা উহার স্বত্বাধিকারী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকিবেন। দুই তিন দিন বেশ গোলযোগ চলিল, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাও উপস্থিত হইল; বিহারীবাবু ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইলেন, পরিশেষে বেল সাহেব আপাততঃ রাজচন্দ্র কলেজের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। কয়েক মাস পরেই কলেজটী উঠিয়া গেল।

সন্তানগণের পীড়া

১৭ই জানুয়ারী হইতে খোকার একদিন পর একদিন জ্বর হইতে-ছিল। ২১এ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় জ্বর ১০৬·৮° পর্য্যন্ত উঠিল। আমি কলেজে যাইবার জন্য আহার করিতে যাইতেছিলাম, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার তারিণীবাবুকে আনিতে ছুটিলাম। তিনি তখনই আসিলেন। জ্বর শীঘ্রই কমিতে আরম্ভ করিল এবং রাত্রিতে ছাড়িয়া গেল।

২৪এ জানুয়ারী, ১০ই মাঘ মান্তুর ১০৪·২° জ্বর হইল। এজন্য নগরকীর্ত্তনে আগাগোড়া যোগ দিতে পারি নাই, রাত্রিতে মন্দিরেও যাওয়া হয় নাই।

মাঘোৎসব

২০এ জানুয়ারী মঙ্গলবার (৬ই মাঘ) হইতে ২৮এ বুধবার পর্য্যন্ত মাঘোৎসব হইল। কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্ব বৎসরের মতই ছিল। ২৩এ (৯ই মাঘ) আমি "সাধ্য ও অসাধ্য" বিষয়ে ঠিক এক ঘণ্টা বক্তৃতা করিলাম। "I missed the opportunity for a strong appeal to the youngmen present. However people thought well of the lecture." (Diary).

১১ই মাঘ প্রাতঃকালে একাকী মন্দিরে গেলাম। সত্যানন্দ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। উদ্বোধন ও আরাধনাতে ব্যক্তিগত শোকদুঃখের প্রসঙ্গে আমাদের কথাও ছিল। আত্মার মহত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ হইল। উপাসনাদি সমস্তই উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে মনোমোহনবাবুর আরাধনা উপদেশও হৃদয়গ্রাহী হইল।

তৎপরে অশ্বিনীবাবু আত্মার মহত্ত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন—উহা অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। রাত্রিতে কালীমোহনবাবু বেদী গ্রহণ করিলেন। বহু লোক উপস্থিত ছিল, কাজেই একটু ব্যাঘাত উৎপন্ন হইয়াছিল। যোগ সম্বন্ধে চিন্তাপূর্ণ উপদেশ হইল। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণী রন্ধন করিলেন। আহারান্তে শয়ন।

পর দিন ১২ই মাঘ অপরাহ্ণে বালকবালিকাসম্মিলন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইল। অশ্বিনীবাবু সভাপতি ছিলেন। বীণা দর্শকবৃন্দের বিলক্ষণ মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

সায়ংকালীন উপাসনার পরে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ দুর্গামোহন দাস ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কালীমোহনবাবু আচার্য্য ছিলেন। মন্দিরে খুব ভিড় হইয়াছিল, এবং যুবকেরা অসঙ্গত ব্যবহারও করিয়াছিল, কিন্তু মনোমোহন বাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণ যুবকদলকে শান্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

২৮এ জানুয়ারী, ১৪ই মাঘ বুধবার সায়ংকালে শান্তিবাচন ও সুহৃদ্‌সম্মিলন। আমরা দুইজন উপাসনায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু প্রীতিভোজনে যোগ দিই নাই। মান্তু ও খোকা বাড়ীতে যাদবের নিকটে ছিল।

১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দত্তের গৃহে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থ সামাজিক সম্মিলন হইল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। তিনি প্রার্থনা করিলেন, মহিলারা সঙ্গীত করিলেন। ঠাকুর মহাশয় রবিবাবুর "পুরাতন ভৃত্য" নামক কবিতাটী চমৎকার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তিনি রাত্রিতে মন্দিরে উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

৪ঠা পারিবারিক উপাসনার জন্য "কাটি গেছে নিশি তোমারি কোলে"—এই সঙ্গীতটী রচিত হইল। এটীও ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে।

সরকারী চাকুরীর চেষ্টা

৭ই ফেব্রুয়ারী সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির আশায় ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের সকাশে এক দরখাস্ত পাঠাইলাম, এবং ডিরেক্টর পেডলার সাহেবকে একখানা পত্রও লিখিলাম। ১৮৯৪ সনে যাহা করিবার কথা, তাহা করিলাম নয় বৎসর পরে—ফল যাহা হইবার তাহাই হইল।

ধর্ম্মপদের বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রজমোহন কলেজের পুস্তকালয়ে প্রসিদ্ধ দিনেমার পণ্ডিত ফস্‌বোল (Fausböl) কর্ত্তৃক সম্পাদিত পালি ধর্ম্মপদ পাইয়াছিলাম। উহাতে মূল পালি ও তাহার নীচে লাটিন অনুবাদ এবং পরিশিষ্টে বুদ্ধ ঘোষের টীকার সার সংগ্রহ আছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী আমি বঙ্গাক্ষরে মূলের প্রতিলিপি এবং লাটিন ও মোক্ষ মূলরের ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে বাঙ্গালা অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ৩০এ নবেম্বর আমার সংকল্প পূর্ণ হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই ভীষণ সংগ্রামে পড়িলাম। আমার জীবনদেবতা আমাকে প্রস্তুত করিবার জন্য এই অতুলনীয় গ্রন্থখানির অনুবাদ করিবার ভার আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন; ঘোরতর দুর্দ্দিনে উহার উপদেশাবলি আমাকে প্রচুর বলদান করিয়াছিল।

পারিবারিক বিপদে দীর্ঘকাল বিব্রত থাকিবার দরুণ আমি যথাসময়ে ধর্ম্মপদের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে পারি নাই।

চারুচন্দ্র বসুর ধর্ম্মপদ এক বৎসর পরে (১৯০৪) বাহির হইয়াছিল।

সংসারযাত্রা

মাঘোৎসবের পরে এক মাস সংসারযাত্রার সংক্ষিপ্তসার—পাঠ, অধ্যাপনা, গৃহকর্ম্ম, পারিবারিক উপাসনা, পত্নী ও সন্তানগণের রোগ-ভোগ, শোকতাপ বহন। এই সময়ে মনোমোহনবাবু সপ্তাহে এক দিন আমাদের গৃহে উপাসনা করিতেন। আমি কখনও কখনও অলির নৈকট্য অনুভব করিতাম, কখনও বা মনে হইত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথে চলিতেছে।

২৬এ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হরকিশোরবাবুর গৃহে ব্রাহ্মবন্ধু-সভার অধিবেশনে "ব্রাহ্মসমাজে আমোদপ্রমোদ" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। উহা ব্রহ্মবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তত্ত্বকৌমুদীতেও সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি যে বিপদের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, পরবর্ত্তী কালে তাহা ঘনীভূত হইয়াছে।

পরীক্ষকের কার্য্য

২৮এ ফেব্রুয়ারী ভোরে রওনা হইয়া পরদিন প্রত্যূষে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। ৩৯নং হ্যারিসন রোডে দাদার মেসে উঠিলাম। তিনি সদর দরজায় অপেক্ষা করিতেছিলেন।

২রা মার্চ্চ সোমবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ৩রা পরীক্ষকগণের প্রথম ও ৬ই দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গেল। Rev. Mr. McCulloch প্রধান পরীক্ষক; তাঁহার কোন কোনও মন্তব্য অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইল।

৪ঠা মার্চ্চ ডিরেক্টর পেড্‌লার সাহেবের সহিত আফিসে সাক্ষাৎ করিলাম—He told me flatly that I was initially disqualified, যেহেতু আমি এম্. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করি নাই। দাঁড়াইয়া কথা বলিলাম, তিনি বসিতে বলেন নাই। সরকারী চাকুরীর জন্য দরবার জীবনে এই প্রথম ও শেষ।

৫ই বৃহস্পতিবার আশ্রমের উপাসনায় যোগ দিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিলেন। আরাধনার পরে "তুমি মম পালক", এই গানটী গাহিলাম। উপাসনা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "বেশ তো গানটী, কে বেঁধেছে—সতীশ ?" তারপরে বরিশালে সাধনাশ্রম-স্থাপন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল।

৬ই মার্চ্চ ১১টার গাড়ী ধরিয়া ৭ই রাত্রি ৯টার সময় বরিশালে উপনীত হইলাম। ৮ই মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রিল—সাতশত তিরাশী খানা কাগজ পরীক্ষা করিলাম। শেষের দিকে প্রধান পরীক্ষক অননুকূল মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আদেশে একবার ৩৭ হইতে ৪২ নম্বরের মধ্যে, এবং দ্বিতীয়বার ৩২ হইতে ৪২ এর মধ্যে কাগজগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইলাম। তাঁহার সহিত পত্রযোগে উত্তরপ্রত্যুত্তরও চলিল। ১৫ই এপ্রিল কাজ শেষ হইল। অতঃপর ম্যাক্‌কুলক সাহেবের অধীনে আর কাজ করিতে হয় নাই।

পরীক্ষাকার্য্যের দুরন্ত শ্রমের মধ্যেই আমি পুনর্ব্বার উদরাময়ে আক্রান্ত হইলাম। এবারকার দুর্ভোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

১৬

পারিবারিক সংবাদ

৩রা মে (৫ই বৈশাখ) স্বর্ণলতার ৩১শ জন্মদিনে মনোমোহন বাবু উপাসনা ও মধ্যাহ্নে আহার করিলেন। তখন বুঝি নাই, ইহলোকে ইহাই তাঁহার শেষ জন্মদিন।

১০ই মে রবিবার প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা করিলাম। নীচে ফরাসে বসিয়া কাজ করিয়াছিলাম, বেদিতে উঠিবার সাহস হয় নাই।

মান্তু বারংবার জ্বরে ভুগিতে লাগিল। ১৪ই মে তাহার চিকিৎসার ভার কবিরাজ মতিলাল দাসের হস্তে অর্পণ করিলাম।

১৮ই মে সোমবার পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আমাদিগের ভবনে আসিলেন এবং সপ্তাহকাল বরিশালে থাকিয়া নানাভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিলেন। আমরা তাঁহার সাহচর্য্য পাইয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম। ২৫এ মে তিনি বাঁকিপুরে যাত্রা করেন।

জুন মাসে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর সহিত বাঁকিপুরের শ্রীমান মহেন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের বিবাহ হয়; তদুপলক্ষে ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় বরিশালে আগমন করেন। তাঁহারা দুই এক দিন আমাদের অতিথি ছিলেন।

আমি উদরাময়ে ভুগিতে ভুগিতে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম; মনে হইল বরিশাল না ছাড়িলে রোগ সারিবে না। কলিকাতায় মেট্রপলিটান কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদ খালি ছিল, ২৬এ মে তাহার জন্য দরখাস্ত পাঠাইলাম। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, কত বেতনে যাইতে পারি। অশ্বিনী

বাবু ও মনোমোহন বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিলাম। ঘোষ মহাশয় আমার বর্ত্তমান বেতন একশত পঁচিশ টাকা দিতে চাহিলেন। ওদিকে দাদা মেট্রপলিটান কলেজে কাজ লইয়া যাইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন কলেজের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, টিঁকিবে কি না, সন্দেহ। অশ্বিনীবাবু ও সহকারী অধ্যক্ষ কালীপ্রসন্ন ঘোষের সহিত আমার বাড়ীতে আসিয়া জানাইলেন, তাঁহারা আমাকে ছাড়িবেন না। আমি রহিয়া গেলাম। সমস্ত জুন মাস রোগভোগে কাটিল। বাধ্য হইয়া কবিরাজী ঔষধ সেবন ও স্যাণ্ডোর প্রণালীতে ডাম্বেলের ব্যায়াম আরম্ভ করিলাম। শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য মাস দুই বৈকালে মাংসের জুস (broth) খাইতাম। কলেজের কাজ কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করিয়া একটু কমাইয়া দিলেন। নাগাইদ অক্টোবর মাস আরোগ্যের আশা পাইলাম।

অধ্যক্ষপদে নিয়োগ

২৯এ জুলাই অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টে ওকালতি করিবার মানসে সিটি কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি সেই দিন অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম। ১২ই আগষ্ট আমার বেতন পনর টাকা বৃদ্ধি পাইল। "আহ্লাদের সহিত আপনার বেতন ১৫০৲ করিয়া দিব," অশ্বিনীবাবুর প্রতিশ্রুতি এইরূপেই রক্ষিত হইল। বাকি দশটাকা বৃদ্ধির রহস্য পরে বর্ণিত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক

২৯এ নবেম্বর আমি সর্ব্বসম্মতিক্রমে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মনোনীত হইলাম।

১৫ই অক্টোবর ২৮এ আশ্বিন আমরা অলির অষ্টম বার্ষিক জন্ম-দিনে উপাসনা ও প্রার্থনা করিলাম। আমাদের প্রিয়তম কন্যার মধ্য দিয়া আমরা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হই, এবং পুত্রকন্যাদিগকে পরম পিতার ঋণ বলিয়া জ্ঞান করি—ইহাই প্রার্থনার বিষয় ছিল।

"Many are the afflictions of the righteous; but the Lord delivereth them out of them all."

২০এ অক্টোবর (৩রা কার্ত্তিক) আমার ৩৬শ জন্মদিনে মনো-মোহনবাবু আমাদিগকে লইয়া উপাসনা করিলেন। আমি পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য প্রার্থনা করিলাম। পত্নী এত অসুস্থ ছিলেন, যে প্রার্থনা করিতে পারিলেন না।

বৈকালে সত্যব্রতের দশম বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ বালকবালিকা ও দুই একটী বয়োবৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। মনোমোহনবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। জলযোগে অনুষ্ঠানটীর পরিসমাপ্তি হইল।

১২ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যম দাদা আসিলেন এবং ১৭ই মঙ্গলবার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। তিনি মুসলমান ভৃত্যের অন্ন গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না, এজন্য পত্নী গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহার জন্য রন্ধন করিতেন।

২৪এ নবেম্বর (৮ই অগ্রহায়ণ) সায়ংকালে মাতার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। মনোমোহনবাবু উদ্বোধন ও প্রার্থনা, কালী-মোহনবাবু আরাধনা ও সত্যানন্দবাবু পাঠ করিলেন। আমি মাতার সম্বন্ধে একটু বলিয়া প্রার্থনা করিলাম। স্থানীয় প্রায় সমস্ত ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। সামান্য মিষ্টান্ন পরিবেশিত হইয়াছিল।

১৭

নব গৃহনির্ম্মাণ—প্রেমনিকেতন ধূলিসাৎ

পূজার ছুটীতে দুইজনে পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলাম, বাসগৃহখানি বৃহৎ আটচালার আকারে মজবুত কাঠের খুঁটি দিয়া, ভিত্তি দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই হাত উচ্চ করিয়া সুন্দর ও আরামদায়করূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ২৩এ নবেম্বর সোমবার পুরাতন গৃহ পুনর্নির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রেমনিকেতনও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কন্যাকে হারাইয়া স্বর্ণলতা ভগ্নস্বাস্থ্যের আর জীর্ণসংস্কার করিতে পারিলেন না। এপ্রিলের পর হইতে অনিবার্য্য কারণে তিনি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ঐকান্তিক অনুরাগের বলে দীর্ঘকাল সেবাশুশ্রূষা করিয়া আমাকে আরোগ্যের পথে আনয়ন করিলেন, তার পরেই নিজে শয্যা লইলেন। ২১এ অক্টোবর নিশি বাবুকে আহ্বান করিয়া চিকিৎসার ভার দিলাম। ৫ই নবেম্বরের দৈনন্দিন লিপিতে লিখিত আছে, "সম্প্রতি পত্নীর স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার জন্য আশঙ্কা হইতেছে। চরম বিপদের জন্য প্রস্তুত হইবার আশঙ্কায় প্রভুর নিকটে বল ভিক্ষা করিতেছি। কবিরাজ মতিলাল দাসের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাখা হইল।"

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ বদলি হইয়া বরিশাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ঘরে আশ্রয় লইলাম। জিনিস পত্র স্থানান্তরিত করিবার তত্ত্বাবধান গৃহিণীই করিয়াছিলেন, আমি তখন এক আত্মশ্রাদ্ধে অন্যত্র গিয়াছিলাম।

১লা ডিসেম্বর লিখিয়াছি, "পত্নীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃই অধিকতর মন্দ হইতেছে; তাঁহার পেটে এক দানা ভাত থাকিতেছে না। আমার জন্য ভবিষ্যতে কি সঞ্চিত রহিয়াছে, ঈশ্বরই জানেন।"

৬ই ডিসেম্বর (২০এ অগ্রহায়ণ) অলির প্রথম বার্ষিক মৃত্যুদিনে প্রাতঃকালে আমরা উপাসনা ও প্রার্থনা করিলাম। বৈকালে তিনটার পরে স্কুলঘরে বিশেষ উপাসনা হইল। উপস্থিত—মনোমোহনবাবু, তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, হরকিশোর বাবু, মন্মথবাবু ও রাজকুমারবাবু। আমি অলির সম্বন্ধে একটু বলিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরিশেষে আমরা তাহার সমাধির পার্শ্বে মিলিত হইলাম, মনোমোহন বাবু একটী সঙ্গীত করিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন।

৭ই ডিসেম্বর ১৯০৩ হইতে ২৭এ জুন ১৯০৪ পর্য্যন্ত আমার দৈনন্দিন লিপি নাই। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে স্মৃতি হইতে যাহা লিখিব, তাহাতে অনেক ভুলচুক থাকিবার সম্ভাবনা।

পত্নীর গুরুতর পীড়া

বোধ হয় ২রা ডিসেম্বর ডাক্তার তারিণী কুমার গুপ্ত মহাশয়কে আহ্বান করিলাম। তিনি রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখন ইহাকে যে-প্রকার দেখিতেছি, তাহাতে প্রাণের আশঙ্কা নাই। তবে দিন দিন শরীর যদি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে, বলিতে পারি না।" পত্নী যাহা খাইতেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। দুধ, হর্লিক, ভাত, মাংসের সুরুয়া, সাগু, বার্লি কিছুই পেটে থাকিত না। প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথম পথ্য ভাত দিয়া দেখিলাম, তাহাও আহারের পরেই বমনের সহিত বাহির হইয়া গেল। ভয় হইল, অনাহারেই রোগিণীর প্রাণ যাইবে। যৎকিঞ্চিৎ

ভরসার স্থল ছিল যে, রাত্রিতে তুই একখানা বার্লির রুটী হজম হইত। বার্লীর রুটী আমি নিজের হাতে তৈয়ার করিতাম। বার্লী জলে গুলিয়া তাওয়াতে পাটীসাপটার মত প্রস্তুত করিতে হইত। কবিরাজী ঔষধে ফল না হওয়াতে তারিণীবাবুকেই চিকিৎসার ভার দিলাম।

নূতন গৃহনির্ম্মাণের কাজ চলিতেছে, মূল গৃহ পতনোন্মুখ ; আমার মন তুশ্চিন্তার ভারে প্রপীড়িত। তুইটি ভৃত্য রাখিয়াছি, কোন কোন দিন তুই জনই অদৃশ্য হইত। পত্নীর সেবাশুশ্রূষার আমার একমাত্র সহায় এগার বৎসরের বালিকা ছায়াময়ী, বিদ্যালয়ের ছাত্রী, অত্যধিক কাজের চাপ পড়িলে কাঁদিয়া ফেলিত। এক এক সময়ে স্বর্ণলতার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইত ; আমি উপস্থিত থাকিলে ৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা ব্রাণ্ডী দিতাম ; কলেজে থাকিলে প্রয়োজন মত চাকর যাইয়া আমাকে ডাকিয়া আনিত। ছুটীর পরে যে দিন রাস্তা হইতে দেখিতাম গৃহিণী ঘরের বাহিরে কুলগাছের ছায়ায় তক্তপোষে বসিয়া আছেন, সে দিন মনটা খুসী হইত ; না দেখিলে বুঝিতাম, অবস্থা ভাল নয়।

এই প্রকার মানসিক উদ্বেগের অবস্থায় এক দিন নিদ্রার মধ্যে দ্বিতীয়বার অশরীরী বাণী শুনিলাম। তখন রাত্রি এগারটা হইবে। স্বর্ণলতা জোড়া-খাটে পুত্র কন্যাসহ নিদ্রিত, আমি অদূরে একখানি তক্তপোষে ঘুমাইতেছি। একজনকে—তিনি কে, জানি না, চেহারাও স্পষ্ট দেখি নাই—জিজ্ঞাসা করিলাম, "Life or Death ?" ("জীবন, না মৃত্যু ?") উত্তর শুনিলাম, "Death" (মৃত্যু)। উত্তরটী এত স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে শুনিলাম, যে তৎক্ষণাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম আমার বুক ধড়ফড় করিতেছে।

সেই দিন হইতে আমার অটল প্রত্যয় জন্মিল, যে এবার স্বর্ণলতার আর রক্ষা নাই।

তার পর হইতে আমি মনশ্চক্ষুতে দেখিতাম, বাড়ীতে লোক জড় হইল, শ্মশানবন্ধুরা সমবেত হইলেন, খাটিয়া আসিল, তাহাতে শব স্থাপন করিয়া বাহকেরা শ্মশানের দিকে চলিলেন। এমন কত দিন দেখিয়াছি।

স্বর্ণলতার দেহ যখন রোগে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখন পূজনীয় শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় অনেক দিন আমাদিগের সংবাদ না পাইয়া আমাকে লিখিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, "মায়ের (স্বর্ণলতার) দেহ অত্যন্ত শীর্ণ, মুখ ক্লিষ্ট ও মলিন, তাঁহার অবস্থা অবিলম্বে আমাকে জানাইবে।" আমি লিখিলাম, "আপনি স্বপ্নে ঠিকই দেখিয়াছেন, সত্য সত্যই স্বর্ণলতা অত্যন্ত পীড়িত, তাঁহার দেহ শীর্ণ এবং মুখ ক্লিষ্ট ও মলিন হইয়াছে।"

পত্নী সময়ে সময়ে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট ও আর্ত্তনাদ করিতেন ; সব দিন আমিও স্থির থাকিতে পারিতাম না। আমার চোখে জল দেখিলে তিনি আরও অস্থির হইতেন, বন্ধুজন ঘরের বাহিরে থাকিলে চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিতে থাকিতেন। জীবনসঙ্গিনীকে হারাইতে চলিলাম, সহসা এই বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া কখনও ইহা সম্ভবপর বলিয়া অনুভব করিতেই পারিতাম না, কখনও বা বুক ফাটিয়া কান্না আসিত। কিন্তু অন্তরের বেদনা বাহিরে প্রকাশ করিবার অবসর খুব কমই পাইতাম। কলেজের খাটুনি, নবগৃহনির্ম্মাণের তত্ত্বাবধারণ, রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা—এ সমুদায় কাজ মাসাধিক কাল আমাকে একাকীই চালাইতে হইল।

২৭এ ডিসেম্বর (১৯০৩) রবিবার রাত্রি সওয়া নয়টার সময়

আমাদের পঞ্চম সন্তান ও তৃতীয়া কন্যা অণু ভূমিষ্ঠ হইল। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, প্রসবকালেই প্রসূতির প্রাণ যাইবে। ডাক্তার তারিণীবাবু আগাগোড়া বারাণ্ডায় বসিয়া থাকিয়া কখন কি করিতে হইবে বলিয়া দিতেছিলেন। প্রসূতির নিকটে লেডী ডাক্তার ও কয়েকটী প্রৌঢ়া ও অভিজ্ঞা মহিলা ছিলেন। প্রসব নির্ব্বিঘ্নে হইল।

পরদিন (২৮এ ডিসেম্বর) অপরাহ্ণে প্রসূতির জ্বর হইল ; তাপ সায়ংকালে ১০১·২° এবং তৎপর দিন রাত্রিতে ১০৩·৭° পর্য্যন্ত উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর অতিসার দেখা দিল। জ্বরত্যাগ হইয়াছিল রোগিণীর দেহত্যাগের পরে।

জানুয়ারী মাসে দেবেন্দ্র আসিয়া দশ বার দিন থাকিয়া ভগিনীর সেবাশুশ্রূষা করিয়া গেলেন। তারপরে গুরুদাসবাবু তাঁহার স্ত্রী, দুইটী শিশু পুত্রকন্যা ও স্বর্ণলতার খুড়তুত ভগিনী লাবণ্যকে লইয়া আসিলেন। গুরুদাসবাবুরা আট দশ দিন থাকিয়া মাঘোৎসবের পূর্ব্বে কলিকাতায় গেলেন, রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য লাবণ্য রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রও লোকমুখে মেজদিদির গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

তারিণীবাবু প্রায় তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়া দেখিলেন, আলোপ্যাথী ঔষধে ফলোদয় হইল না, তখন তিনি আমাকে বলিয়া নিজেই কবিরাজ প্রসন্ন কুমার সেনকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় আপাততঃ সুফল দেখা গেল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না।

এই অবস্থায় আমি মাঘোৎসবে "ক্ষুদ্র ও বৃহৎ" নামক বক্তৃতা করিলাম। মন্দিরে যাইবার কালে পত্নী যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেছেন ; ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিলাম। শ্রোতারা তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, ইহা না বলিলেও চলে।

জানুয়ারীর শেষ দিকে দেবেন্দ্র আবার আসিলেন ; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমণী আসিল ; পরিশেষে গুরুদাসবাবুও কলিকাতা হইতে বরিশালে আসিলেন।

এতদিনে নবগৃহ বাসোপযোগী হইয়াছে। আমরা স্বর্ণলতাকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। তৎপূর্ব্বে স্কুলঘর নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হইত, এজন্য বালিকাবিদ্যালয় অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছিল।

অন্যূন তিন শত টাকা ব্যয়ে নবগৃহ নিম্মিত হইল ; গৃহিণী তাহাতে আট দশ দিন বাস করিলেন।

কলিকাতায় চিকিৎসার্থ গমন

দেবেন্দ্র উপস্থিত থাকিলে ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা প্রভৃতির ভার নিজের হস্তে গ্রহণ করিতেন। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ভগিনীর অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন, তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার গুরুতর অন্তরায় অর্থাভাব। দেবেন্দ্র বলিলেন, কলিকাতায় আমাদিগের যত অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি ঋণ দিবেন। পাথেয় বাবদে প্রায় আড়াই শত টাকা দরকার। ষ্টীমারে পত্নীর জন্য প্রথম শ্রেণী, খুলনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী স্বতন্ত্র কামরা, সঙ্গে একজন ডাক্তার, খুলনায় ষ্টীমার ঘাট হইতে রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত পালকী—ইত্যাদি কত প্রকার বন্দোবস্তের প্রয়োজন। উদারচিত্ত সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্ত দুই শত চল্লিশ টাকা ধার দিলেন। তাঁহার ও অপর বন্ধুদিগের সাহায্যে খুলনায় পাল্কী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিবার বন্দোবস্ত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এল্. এম্. এস., বরিশালে ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন, দেবেন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে অযাচিতভাবে রোগিণীর সংবাদ লইয়া যাইতেন। দৈনিক পঁচিশ টাকা ও যাতায়াতের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিতে হইবে, এই সর্ত্তে ঘোষাল মহাশয় আমাদিগের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যার পরে আমরা ষ্টীমারে উঠিয়া বরিশালের ঘাটে রাত্রি যাপন করিব।

সেই দিন সকালে তারিণীবাবু আসিলে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অনুকূল প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। বারটার সময় আবার আসিলেন; বলিলেন, "একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। রোগিণীর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা যে-প্রকার, তাহাতে পথেই একটা বিপদ ঘটিতে পারে।" আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা ততক্ষণ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, আমরা নিরস্ত হইলাম না।

আমরা যে-দিন কলিকাতায় পঁহুছিব তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে ভক্তি-ভাজন শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তার করিয়া অনুরোধ করিলাম, তিনি যেন একদিন অপেক্ষা করিয়া যান। শাস্ত্রী মহাশয় একবার যাত্রার সময় স্থির করিলে পারতপক্ষে তাহার পরিবর্ত্তন করিতেন না। আমার টেলিগ্রাম পাইয়া অনেকক্ষণ কি করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন; নির্দ্ধারিত দিনের নড়চড় করিতেও মন উঠিতেছে না, আমাদিগের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতেও পারিতেছেন না। এক এক বার টেলি-গ্রামটা পড়েন, আর বলেন, "নাঃ, রজনী স্বর্ণকে লইয়া আসিতেছে, একদিন থাকিয়া যাইতেই হইবে।" তিনি যাত্রা স্থগিত করিলেন।

আমরা ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রির প্রথম প্রহরে ষ্টীমারে উঠিলাম। পত্নী, আমি এবং চারি পুত্রকন্যা, লাবণ্য, ছায়াময়ী, গুরুদাসবাবু, দেবেন্দ্র, রমণী ও ডাক্তার রাজেন্দ্র ঘোষাল, মোট বার জন। বাড়ীঘর ও জিনিসপত্র বলিতে গেলে অরক্ষিত অবস্থায় রহিল। কলিকাতায় যাইবার জন্য স্বর্ণলতা খুব উৎসাহ প্রকাশ করিলেন, প্রস্তুত হইবার ব্যস্ততার মধ্যে বলিলেন, "আমার রোগ অর্দ্ধেক সারিয়া গেল। ৮ই সোমবার রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় ষ্টীমার খুলনার ঘাটে লাগিল। সকল যাত্রী নামিয়া গেল, রোগিণীর জন্য খালাসিরা পৃথক্ সিড়ি করিয়া দিল, তাহাতে বিস্তর বিলম্ব হইল। পাল্কী ও বেহারা উপস্থিত ছিল। আমি স্বর্ণলতাকে ছোটছেলের মত বুকের উপরে শোয়াইয়া ধীরে ধীরে উপরের ডেক হইতে নামিয়া পাল্কীতে লইয়া গেলাম। রেলষ্টেসন একটু দূরে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পয়েন্টস্ ম্যান (Pointsman) বলিল, "বাবু পহেলা ঘণ্টা হো গিয়া।" শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। রাজেনবাবু পূর্ব্বেই ষ্টেসনে পঁহুছিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরোধে ষ্টেসনমাষ্টার আমাদের অপেক্ষায় গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব করিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টার সময় অতীত হইবার পরে আমরা উপস্থিত হইলাম, রোগিণীকে লইয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কক্ষে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রাজেন্দ্রবাবু ষ্টীমারে ও গাড়ীতে পুনঃ পুনঃ স্বর্ণলতাকে দেখিতেন ও প্রয়োজন মত ঔষধ দিতেন; এজন্য পথে কোনও বিপদ ঘটে নাই।

কলিকাতায় চিকিৎসা

পর দিন ভোরে আমরা কলিকাতায় ৫নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেনে উপনীত হইলাম। এখানে শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র হোম ও

শ্রীমান্ নরেন্দ্র নাথ চৌধুরী বাস করিতেন। এক ঘণ্টা পরেই শাস্ত্রী মহাশয় আমার পত্নীকে দেখিতে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, "আমি প্রাণকৃষ্ণকে বলিয়াছি, রজনী স্বর্ণকে লইয়া আসিতেছে, তোমার কাজ বাড়িল।" শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাণকৃষ্ণবাবু আসিলেন, এবং বিশেষরূপে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি তখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সন্নিকটে এক বাড়ীতে বাস করিতেন। ডাক্তার আচার্য্যের চিকিৎসায় প্রথমে একটু উপকার হইল এবং ইহাতে তিনি নিজেও আনন্দিত হইলেন। তাঁহার মতে রোগীর জীবনের আশঙ্কা ছিল না।

নরেন্দ্রের বাড়ীতে আমরা তেতালার ঘরটী পাইয়াছিলাম; পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম খোলা, সম্মুখে দোতালার ছাদ, আলো বাতাস মনোহর। ফেব্রুয়ারী মাসটা তাহাদের সহিতই আহারাদি চলিল। স্বর্ণলতা একটু সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা ১লা মার্চ্চ হইতে পৃথক সংসার করিলাম। তিনি নিজে বাজারের হিসাব রাখিতেন, কোন কোন দিন তরকারী কুটিতেন, আমরা কে কি খাইব, রাঁধুনীকে বলিয়া দিতেন। কিন্তু সপ্তাহ দুই যাইতে না যাইতেই দেখা গেল অবস্থা আবার মন্দের দিকে চলিয়াছে। তখন প্রাণকৃষ্ণবাবুর মতানু-সারে এক বিখ্যাত চিকিৎসককে রোগী দেখিতে অনুরোধ করা হইল। তিনি সময় নির্দ্ধারণ করিলেন; ডাক্তার আচার্য্য সেই সময়ে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না। একে একে তিন বার এই প্রকার হইল। পরিশেষে আচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি লইয়া তৎকালে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার আর. এল. দত্তকে আহ্বান করিলাম। আমরা এত দিন জানিতাম, স্বর্ণলতা সূতিকা রোগে ভুগিতেছেন। ডাক্তার দত্ত

বলিলেন, রোগ pernicious aenimia (দুষ্ট রক্তহীনতা) ; তবে রোগীর প্রাণহানির আশঙ্কা নাই, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিতে সময় লাগিবে। ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রাণকৃষ্ণ বাবু, এবং ১৬ই মার্চ্চ হইতে ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ডাক্তার আর. এল. দত্ত চিকিৎসা করিলেন।

ডাক্তার দত্ত প্রথম দিন দেখিয়া ভরসা দিয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তাহ দুই পরে তাঁহার ইঙ্গিতেই সে ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। তাঁহাকে প্রথম দুই দিন ষোল টাকা করিয়া দর্শনী দিয়াছিলাম, পূজনীয় গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের অনুরোধে তিনি তৃতীয় বার বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখিয়াছিলেন। স্বর্ণলতার অবস্থা ভীতিজনক হইয়া উঠিলে ৭ই এপ্রিল হইতে আবার কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কবিরাজ গোপীবাবুকে রোগী দেখিয়া যাইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোগ সুসাধ্য না দুঃসাধ্য ?" তিনি উত্তর করিলেন, "সুসাধ্য তো নয়ই, অতি কষ্টসাধ্য। বয়স কম না হইলে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন ছিল না।" তিনি দুই তিন বার আসিয়াছিলেন। দর্শনী আট টাকা। ১৩ই এপ্রিল দেবেন্দ্র ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম. ডি. মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন বটে, কিন্তু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমাকে শেষ মুহূর্ত্তে (at the eleventh hour) ডাকিয়াছেন।"

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে উদরী, পেটফাঁপা, পেটে তীব্র বেদনা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিল। জ্বর কখনও বাড়ে কখনও কমে, কিন্তু বিরাম নাই।

আমি মার্চ্চ মাস হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার কাগজের চাপে নিষ্পেষিত হইতেছি। নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে ৮১৪ খানা কাগজ

পরীক্ষা করিতে হইবে, মরণাপন্ন পত্নী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সহিত এক ঘরে বাস; চিকিৎসার সম্বল পরীক্ষালব্ধ কয়েক শত টাকা। দেবেন্দ্র ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে গিরিডি গিয়াছিলেন, ভগিনীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিলেন। আমি একটু অবসর পাইলাম, কিন্তু ইতোমধ্যে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল।

পত্নীর সেবাশুশ্রূষায় লাবণ্য আমার প্রধান সহায়; বিশেষতঃ মাতৃস্তন্যবঞ্চিত শিশুটী তাহার যত্নেই বাঁচিয়া আছে। এই সময়ে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী সুশীলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল এবং স্বর্ণলতা ভাল আছেন, লোকমুখে এই প্রকার বার্ত্তা শুনিয়া গুরুদাস বাবু ১৭ই এপ্রিল বিবাহের দিন ধার্য্য করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে লাবণ্য শিশুটীকে লইয়া বাঁকিপুরে চলিয়া গেল, অণু লাবণ্যের মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল। পত্নীর রোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমরা ১লা এপ্রিল হইতে আবার নরেন্দ্রের সহিত একান্ন হইয়াছিলাম। তাহা সত্ত্বেও লাবণ্যের অভাবে আমি আপনাকে একান্ত বিপন্ন মনে করিয়াছিলাম। ছায়াময়ীরও যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা বাধার দরুণ তাহার যাওয়া হয় নাই।

স্বর্ণলতার লোকান্তর যাত্রা

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এবং ডাক্তার আর. এল্. দত্তের আশ্বাস বাক্য শুনিয়াও আমার চিত্ত প্রবোধ মানে নাই। আমার কাণে সেই দৈববাণী বাজিতেছিল। আমি সেইজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলাম যাহাতে গৃহে মৃত্যুর ছায়া পড়িবার পূর্ব্বেই পরীক্ষার কাজটা শেষ করিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। ১৫ই এপ্রিল

হইতে জ্বর ১০৩° এর উপরে উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উদরের পীড়া অত্যধিক বাড়িয়া গেল। ১৭ই এপ্রিল রবিবার স্বর্ণলতার অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। সকাল বেলায় দুর্লক্ষণ দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণবাবুকে লইয়া আসিলাম। স্বর্ণলতা "দাদাবাবুকে" (গুরুদাসবাবুকে) দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ গুরুদাসবাবুকে জরুরী টেলিগ্রাম করা হইল। আমি ডাক্তার ডাকিতে গেলে পত্নী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "উনি কোথায়?" বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্য বন্ধ হইল; সেই সময়ে তিনি অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়াছিলেন। তারপর সংজ্ঞা লোপ পাইল, মধ্যাহ্ন হইতে শ্বাস আরম্ভ হইল। অপরাহ্নে কে একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ডি. এন্. রায়কে লইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, রোগীর coma (সংজ্ঞাহীনতা) হইয়াছে। তিনি দর্শনী লইয়া চলিয়া যাইবার অল্পকাল পরেই নবদ্বীপবাবু ডাক্তার নীলরতন সরকারকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সরকার জানালার মধ্য দিয়া চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইয়া গিয়াছে নাকি?" শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী তৎপূর্ব্বেই আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "চক্ষু নিশ্চল হইয়াছে।" সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতে আমরা অনেকে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, আমি দুই একটী সঙ্গীত করিলাম, অধীরতার মধ্যে দাদা সান্ত্বনাবাক্য বলিলেন। রাত্রি পৌনে আটটার সময় স্বর্ণলতা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তখনও দেহ উত্তপ্ত ছিল।

সৎকারের ব্যবস্থার ভার দেবেন্দ্র নিজের হস্তে রাখিলেন। আমার পরিচিত অপরিচিত কয়েকটী যুবক শ্মশানযাত্রীর কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে নবদ্বীপবাবু প্রার্থনা

করিলেন, তারপর শববাহকেরা অগ্রে চলিলেন, দাদা, দেবেন্দ্র, আমি অনুগামী হইলাম। বিডন ষ্ট্রীটে যাইতে আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গেলাম, সেজন্য একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আমরা নিমতলা শ্মশানঘাটে পঁহুছিলাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ সমাপন করিতে রাত্রি প্রায় বারটা হইল। চিতা সজ্জিত হইলে দাদা প্রার্থনা করিলেন। কিছুকাল পরে আমরা দুইজন গাড়ীতে যাইয়া বসিলাম, আমার একটু তন্দ্রাও হইল। ভোরবেলায় দেবেন্দ্র অস্থি লইয়া আসিয়া আমাকে জাগাইলেন, আমরা গাড়ীতেই গৃহে ফিরিয়া গেলাম।

আমি বাড়ী যাইয়াই দোতলায় নরেন্দ্রের একটী ঘরে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নে যে আহার করিয়াছিলাম, তাহার পরে জলগ্রহণ করি নাই। অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, কেহ কিছু খাইতে দিলে হয়তো খাইতাম; কিন্তু কেহ বলে নাই, আমারও চাহিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। আমি অন্তরে অবিরত শুনিতেছিলাম, পত্নী বলিতেছেন, "ওগো, তুমি কিছু খাও।" দেহীবিদেহীর বাক্যালাপ বিষয়ে পরে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়া আমি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকিলাম। সকালে নবদ্বীপবাবু উপাসনা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। তারপর মহলানবিশ মহাশয় ও অপর কেহ আমাকে দেখিতে আসিলেন, তাঁহাদিগের সহিত দুই চারিটী কথা বলিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।

নরেন্দ্ররা বাড়ীঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিল, হাঁড়িপাতিল ফেলিয়া দিল; তারপর আমাকে জাগাইল। তাহারা স্নানের পরে আমাকে একটু জলপানি দিল, তৎপরে চব্বিশ ঘণ্টা অন্তে অন্নাহার করিলাম।

স্বর্ণলতার ঘরে সেদিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইল; তৎপর দিন হইতে প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা উপাসনা চলিতে লাগিল।

১৭ই তারিখ অপরাহ্ণে গুরুদাসবাবু আমার তার পাইয়া জানাইলেন, শারীরিক অক্ষমতাবশতঃ তিনি আসিতে পারিলেন না, এজন্য তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বিবাহোৎসবের পরদিন, কন্যা-বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি শোকসংবাদ পাইলেন, এবং দুই এক দিন পরেই আমার পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহাদের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ভ্রাতা সতীশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল আমি কাগজ স্পর্শ করিতে পারি নাই। ১৯এ মঙ্গলবার হইতে আবার পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেলাম। ইহাতে আমার উপকার হইল। চোখের জল সংবরণ করিয়া আমি প্রগাঢ় মনোনিবেশের কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম, এজন্য শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইবার অবসর পাইল না। আশীখানা কাগজ বাকি ছিল, ২২এ আমার গুরুতর শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল। সতীশচন্দ্রের সহিত স্থির হইল, পরদিন তিনি সত্যব্রতদিগকে লইয়া বাঁকিপুরে যাইবেন, আমি বরিশালে যাইব।

২৩এ শনিবার সকালে জিনিসপত্র গুছাইবার সময়ে দেখিলাম, আমাদের নূতন হারিকেন লণ্ঠনের চিমনীটা ভাঙ্গা। কি করিয়া ভাঙ্গিল বুঝিতে পারিলাম না। দুপ্রহরে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীতে পরীক্ষার কাগজ লইয়া প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক জে. এন্. দাসগুপ্তের রডন ষ্ট্রীটের বাসভবনে যাইতেছি; গাড়ীতে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছি; বৌবাজারে যাইয়া নিজের মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, চিমনীটা কি করিয়া ভাঙ্গিল?" অমনি শুনিলাম, গৃহিণী সুস্পষ্টকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো, তা' জান না বুঝি? ওটা যে ওদের

চিমনী, বদল হয়ে গেছে।" অধ্যাপক দাসগুপ্তকে কাগজপত্র দিয়া বাড়ী আসিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের চিমনীটা কি করিয়া ভাঙ্গিল ?" সে বলিল, "চিমনী বদল হইয়াছে, ভাঙ্গা চিমনীটা আমাদের।" বলিয়াই সে আমাদের চিমনী আনিয়া দিল। চিমনী বদলের কথা আমি জানিতাম না, আমাকে কেহই বলে নাই। এই যে অশরীরী বাণী শুনিলাম, ইহার ব্যাখ্যা কি ?

সন্ধ্যার গাড়ীতে সতীশ আমার পুত্রকন্যা ও ছায়াময়ীকে লইয়া বাঁকিপুরে গেলেন, আমি হাওড়া হইতে সোজা শিয়ালদহ যাইয়া খুলনার গাড়ীতে উঠিলাম। পরদিন রাত্রি নয়টার সময় বরিশালে পঁহুছিয়া দেখিলাম, হরকিশোর বিশ্বাস মহাশয় আমার জন্য ষ্টীমার ঘাটে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিলাম যে আমি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিব। সোমবার হইতে শনিবার (২৫এ হইতে ৩০এ এপ্রিল) পর্য্যন্ত কলেজে অধ্যাপনা করিলাম। এই কয়দিন প্রত্যহ প্রাতঃকালে মনোমোহনবাবু তাঁহার গৃহে আমাকে লইয়া উপাসনা করিতেন, এবং আমি সেখানেই চা পান করিতাম।

বাড়ীঘর অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলেও দেখিলাম, কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

রাজচন্দ্র কলেজ উঠিয়া যাইবার পরে দর্শনের অধ্যাপক সুরেন্দ্র-নারায়ণ মিত্র ব্রজমোহন কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল, গ্রীষ্মাবকাশের পরে তিনি আমার আট-চালা ঘরের অর্দ্ধেক ভাড়া লইবেন, অপরার্দ্ধে আমি থাকিব। তিনি, তাঁহার দুই একটী বন্ধু, এবং আমি ও মান্তু—এই কয়জনে মিলিয়া একত্র আহারাদি করিব। গোপালবাবুর ঘরে—উহাও আমার

অধিকারে ছিল,—সুরেন্দ্রবাবুর দেশস্থ কয়েকটী মুসলমান ছাত্র মেস (ছাত্রাবাস) করিয়া বাস করিবে।

১লা মে রবিবার হইতে গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হইল। আমি সেই দিন ভোরে বরিশাল ত্যাগ করিয়া ২রা সোমবার প্রত্যূষে কলিকাতায় পঁহুছিলাম, এবং রাত্রির গাড়ীতে বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম। সঙ্গে এমার্সনের গ্রন্থাবলী একখণ্ড ক্রয় করিয়া লইয়া গেলাম।

৩রা মে মঙ্গলবার প্রত্যূষে সাধনাশ্রমে উপনীত হইলাম—সাধনাশ্রম অলির মৃত্যুর পরে চৌহাট্টা হইতে পাগলাখানার সম্মুখের বাটীতে উঠিয়া গিয়াছিল। সান্ত্বনা স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই আমাকে দেখিতে পাইয়া গুরুদাসবাবুকে সংবাদ দিল। তিনি আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন, দুই জনেই বিলাপ করিতে লাগিলাম; ক্ষণকাল পরে "দাদাবাবু" আমাকে লইয়া উপাসনার ঘরে গেলেন; সেখানে পরিবারস্থ সকলে সমবেত হইলে উপাসনা হইল। তারপরে ছেলেমেয়েদিগকে দেখিবার জন্য উপরে গেলাম। দেখিলাম, লাবণ্যের মা, আমাদের মাসীমা ও খুড়িমা, আমার শিশু কন্যাটীকে নিজের গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় পালন করিতেছেন; স্নেহের আবেগে বার্দ্ধক্যসীমায় উপনীতা এই নারীর বক্ষে পনর ষোল বৎসর পরে আবার ক্ষীরধারা সঞ্চারিত হইয়াছে, অভাগিনী বালিকা নিজের মাতা হারাইয়া নূতন মাতা পাইয়াছে।

পারলৌকিক অনুষ্ঠান

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২২এ মে) রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় বাঁকিপুর ব্রাহ্মসাধনাশ্রমে আমি পত্নীর আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিলাম। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ, কুমারী

ব্রহ্মকুমারী সেন ও কুমারী লাবণ্যলতা চৌধুরী সঙ্গীত, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা করেন। আমি তাঁহার চরিত্র ও গার্হস্থ্য জীবনের বর্ণনা পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিলাম। এই অনুষ্ঠানের সমগ্র ভাগ প্রায় অবিকল পারলৌকিক নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার ইচ্ছা, চরিতাখ্যান (২৪-৪২ পৃষ্ঠা) সমগ্রভাবে এই জীবনস্মৃতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঐ দিন প্রায় একই সময়ে কলিকাতা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, এলাহাবাদ, কর্সিয়ং, মান্দ্রাজ, লাহোর, মহম্মদপুর, দেরাদুন প্রভৃতি স্থানেও স্বর্ণলতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে ও প্রতিষ্ঠানে একশত টাকা প্রদত্ত হয়।

১৮

স্বর্ণলতার চরিত-আখ্যান

(পারলৌকিক হইতে)

স্বর্ণলতা বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে * পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতামাতা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী ময়মনসিংহ জেলার একটী গ্রামে কায়স্থকুলে আমার জন্ম হয়। যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদের মিলন হয়, তাহা উপন্যাস বর্ণিত ঘটনাবলী অপেক্ষা কম বিচিত্র নহে।

সতর বৎসর হইল, ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর গৃহে স্বর্ণলতার সহিত আমার পরিচয় হয়। তখন আমরা উভয়েই

* [২২শে জুন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আদ্যশ্রাদ্ধে পঠিত]

কেবল যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছি। আমি তখন এণ্ট্রেন্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। তাঁহাতে কি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না; কিন্তু একদিন, পরীক্ষা-গৃহে ইংরেজীর উত্তর লিখিতে লিখিতে, হঠাৎ তাঁহাকে আত্মীয়, অথবা তদপেক্ষাও নিকটতর আপনার জন বলিয়া অনুভব করিলাম। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার বাক্য বিনিময় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এই যে তাঁহার দিকে চিত্ত ধাবিত হইল, অনেক যত্ন, চেষ্টা, দুঃখ লাঞ্ছনাতেও তাহা আর প্রত্যাবৃত হইল না। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় ইহার জন্য আশ্রয়চ্যুত হইলাম। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় ইহাকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে ঢাকায় পলায়ন করিলাম। কিন্তু আমার সকল প্রয়াস নিষ্ফল করিয়া ইহার প্রতি আমার হৃদয়ের আকর্ষণই জয়যুক্ত রহিল। এবং আমিও, সহায়বিহীন দীন ছাত্র হইয়াও, ইঁহার মমতা-করুণ স্মরণ-পথে বর্ত্তমান থাকিলাম। এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গেল।

ইঁহার পিতা ইঁহার উজ্জ্বল লাবণ্যচ্ছটা লক্ষ্য করিয়া আদর করিয়া ইঁহাকে স্বর্ণময়ী নাম দিয়াছিলেন; এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পরেও পিতামাতা উভয়েরই হিন্দুসংস্কার বর্ত্তমান ছিল; এই দুই কারণে ইঁহাদের মানস ছিল, আদরের কন্যাকে সুরূপ ও সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পাত্রে অর্পণ করিবেন। অতএব, যখন ইঁহারা কন্যার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন, তখন, প্রথমে প্রসন্নমনে তাহার অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঁহার সুখ ও কল্যাণ কামনা করিয়া পিতামাতা পরিশেষে আহ্লাদের সহিত এই মিলনের পক্ষপাতী হইলেন। আমার অভিভাবকও পূর্ব্বে ইহার বিরোধী ছিলেন,

স্বর্গতা স্বর্ণলতা গুহ

মৃত্যু : ১৭ই এপ্রিল, ১৯০

কিন্তু তিনি স্বাধীন নির্ব্বাচনের সম্মান করিতে জানিতেন, তজ্জন্য তাঁহার ও আমার মাতা ঠাকুরাণীর অনুমোদন ও অনুমতি পাইতে কাল বিলম্ব হইল না। প্রথম দর্শনের পাঁচ বৎসর পরে, পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। সে দিন শাস্ত্রী মহাশয় যে জ্বলন্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, আজও তাহা কাণে বাজিতেছে। একজন প্রাচীন ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, অনেক-দিন ওরূপ উদ্দীপনা-পূর্ণ উপদেশ শুনা যায় নাই।

মাসিক ত্রিশ টাকা আয় লইয়া কলিকাতা ব্রহ্মপরিচারকাশ্রমে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়, গুরুদাস বাবু প্রভৃতির সহিত আমাদের সংসার আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে আমি এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। স্বর্ণলতা বরাবর পিতামাতা, ভগিনী ভগিনীপতি প্রভৃতি সকলের আদর যত্নে, সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গরিবের ঘরে অতি সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া ইঁহাকে একটী দিনের জন্যও মুখ মলিন করিতে দেখি নাই। বরং যখন আমরা পরিচারকগণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলাম, যখন, রন্ধনাদি সকল প্রকার শারীরিক শ্রমের কার্য্যই তাঁহাকে একাকী করিতে হইত, তখনও তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতোজ্জ্বল বদন-কান্তি কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই।

বিধাতা ইঁহাকে এমন একটী সরল, অকপট, স্বচ্ছ হৃদয় দিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা ইনি অপর শত অভাব সত্ত্বেও আমাকে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার এই সরল, সুব্যক্ত হৃদয়ই আমার গৃহকে এত মিষ্ট করিয়াছিল। ইনি সমগ্র হৃদয়খানি পতির নিকট ধরিয়া-ছিলেন, ইহার কোথাও কিছুমাত্র আবৃত বা লুক্কায়িত ছিল না। ইঁহার এই স্বচ্ছতার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিবাহের তৃতীয়

বৎসর ইনি আমাদের প্রথম পুত্রের স্বাস্থ্যলাভার্থ আরা সাধনাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। আমি কলিকাতায় ছিলাম। একদিন ইঁহার একখানা পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "আমি তোমার নিকট দুটী অপরাধ করিয়াছি, যদি ভরসা দাও ত তোমাকে তাহা বলিয়া ক্ষমা চাহিব"। আমি ভাবিলাম, না জানি কি গুরুতর ব্যাপার। ভীষণ যাতনার মধ্যে দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রত্যুত্তরে জানিলাম, প্রথমটী আমার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বের এমন একটী ঘটনা যাহা আমাকে না বলিলে কিছুই অন্যায় হইত না, এবং যাহা হইতে তাঁহাতে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শ করে নাই। দ্বিতীয় ঘটনাটী এই। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী এক বাড়ীতে পাঁচালি শুনিতে গিয়াছিলেন। পাঁচালির কথা আমাকে বলিয়া যাওয়া হয় নাই, এই জন্য যাইয়া কিছুক্ষণ পরেই চলিয়া আসিয়াছিলেন। আমাকে না বলিয়া আপনার মাতার সহিত ক্ষণ-কালের জন্যও যে অপর গৃহে পাঁচালি শুনিতে গিয়াছিলেন, এই জন্যই এত অনুতাপ। আমাকে না বলিয়া এই ইঁহার প্রথম ও শেষ কার্য্য। ইহার পর সাড়ে নয় বৎসর কাল ইনি আমার গৃহে বর্ত্তমান ছিলেন, আমার অজ্ঞাতে অতি তুচ্ছ কর্ম্মও ইঁহা দ্বারা কখনও সম্পন্ন হয় নাই। এক পয়সা মূল্যের একটা জিনিস ক্রয় করিলেও তাহা আমাকে না বলিয়া পারিতেন না। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় হইতে অতি সাবধানে যাহা বাঁচাইতেন, নিজেই আবার তাহা আমাকে বলিয়া অভাবের সময় ব্যয় করিবার সাহায্য করিতেন। এই সরলতা ও স্বচ্ছতা প্রণোদিত হইয়াই ইনি শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার জীবনের সমগ্র চিত্রপট আমার নিকট খুলিয়া দিয়াছিলেন,

তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা করেন নাই। এবং এই অকপট আন্তরিকতা গুণেই ইনি অনেকের গভীর স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন।

ইঁহার ঐকান্তিকতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পতি-ব্রতা নারীর যে ধর্ম্ম, আপনাকে ভুলিয়া কায়মনোবাক্যে পতির সেবা করা, তাহা ইনি পূর্ণরূপেই পালন করিয়া গিয়াছেন। সুস্থতায়, অসুস্থতায় অগ্রে পতিকে দেখিতেন, পরে আপনার কথা ভাবিতেন। পীড়িত অবস্থায়, নিতান্ত অনুরুদ্ধ না হইলে কখনও স্বামীর অগ্রে আহার করিতেন না। এমন কি আমি ক্বচিৎ কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া আহার বন্ধ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইনিও উপবাস করিতেন। একবার শ্রদ্ধাস্পদ অশ্বিনীবাবু প্রভৃতির সহিত নৌকা-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। যাইবার সময় ইঁহাকে যথাসময়ে আহার করিতে বলিয়া যাই নাই। ইনি তখন উদরাময়ে ক্লেশ পাইতেছিলেন। আমি আহার করিয়া রাত্রি বারটার সময় গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু ইনি আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন, এবং আমার অবিবেচনায়, অসময়ে আহার করিয়া, ইঁহার রোগবৃদ্ধি হইল। আমাদিগের যত্ন করা ইঁহার পক্ষে এমনই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে, ইনি যে কলিকাতায় শেষ রোগশয্যায়ও আপনার গৃহিণীপদ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন, সংসারের সমস্ত হিসাব নিজে রাখিতেন, শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি হারাইয়াও আমরা কে কি খাইব বলিয়া দিতেন, এবং ইহলোক হইতে বিদায় লইবার দুই দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পতিকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না, তাহাও আমার নিকট কিছুমাত্র নূতন বলিয়া মনে হইত না। বিবাহের পর আমি অনেকবার দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়াছি। তখন ইনি দিবারাত্রি কিরূপ অক্লান্ত সেবা করিতেন,

বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে তাহা দেখিয়াছেন। আমি রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে সত্য সত্যই অনুভব করিতাম, ইঁহার ভিতরে পরম জননীর করুণা মাতৃমূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধের একটা মহান আদর্শ ইঁহার মনে বর্ত্তমান ছিল। ইনি স্বামীর অতি সামান্য দোষ ত্রুটির কথাও, আপনার প্রিয়তম আত্মীয় এমন কি জননীর নিকটেও বলিতেন না, এবং যে বার বৎসর কাল ইনি আমার জীবনকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক দিনের জন্যও আমার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই। কতবার এইরূপ হইয়াছে, ইনি নির্দ্দোষ মনে করিয়া খাইবার জন্য কিছু মুখে দিয়াছেন; আমি তাহা ইঁহার পক্ষে অপকারী মনে করিয়া নিষেধ করিলাম, অমনি ইনি মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিলেন।

ইঁহার মধ্যে এমন একটা কমনীয়তা ছিল যে, নিতান্ত উত্তেজনার মধ্যেও দু একটী মিষ্ট কথা বলিলে একেবারে জল হইয়া যাইতেন। ইঁহার ব্যবহারের অমায়িকতাতে বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে আমাদের গৃহকে নিজ গৃহের ন্যায় মনে করিতেন; একথা বলিলে কিছুই অতিরিক্ত বলা হয় না।

এই বার বৎসরের কথা স্মরণ করিয়া চিত্ত কৃতজ্ঞতাতে অবনত হইতেছে। এক সময়ে আমাদের পরিবারে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে, তখন যদি ইঁহার প্রেম অতি অল্প পরিমাণেও পরাজয় স্বীকার করিত—যদি ইনি বিন্দুমাত্রও অধীর ও অসহিষ্ণু হইতেন,—তবে আমাদের সংসার ছারখার হইত। কিন্তু ধন্য ইঁহার ঐকান্তিক আত্মবিলোপকারী অনুরাগ—যাহা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে, নিয়ত স্বামীর কল্যাণ কামনা করিয়াছে—কিন্তু কখনও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হয় নাই।

এই ঐকান্তিক অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনচিত্ততা ইহাতে বিলক্ষণ বিদ্যমান ছিল। ইনি অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টবাদিনী ছিলেন। ছল, কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। মনে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন, তাহা কাহাকেও বলিতে ছাড়িতেন না—স্বামীকেও নহে, অপরকেও নহে। এজন্য ইনি সময়ে সময়ে লোকের অপ্রিয় হইতেন। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, অনেক সময় যাহা অনাবশ্যক রূঢ়তা বলিয়া মনে করিয়াছি তাহা সত্য ও ন্যায়ের দিকেই ঝুঁকিয়া থাকিত।

বিবাহের পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ইঁহার বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নাই। কিন্তু আমার গৃহে আসিয়া অবধি বিলাসিতা ইঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। ত্রিশ টাকায় সংসার আরম্ভ করিয়াছিলাম, ইঁহার জীবনের সায়ংকালে মাসিক আয় ছয় সাত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু আহারে পরিচ্ছদে ইনি দিন দিন দীনতার দিকেই অগ্রসর হইতেছিলেন। বিবাহসভা বা উৎসব ক্ষেত্রে ইঁহাকে নিতান্ত গরিবের গৃহিণী হইতে ভিন্ন বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় ছিল না। কুমারী কালে প্রাপ্ত এবং বহুদিনের ব্যবহারে নিতান্ত জীর্ণ একজোড়া সোনার বালা বই ইঁহার অন্য অলঙ্কার ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য তো দূরের কথা, অনেক সময়ে বরং অভাবের মধ্যেই বাস করিতেন।

এরূপ নিঃস্পৃহতা না থাকিলে ইনি স্বামীর সহিত ব্রাহ্মসাধনাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। ইঁহার যদি সংসারের কোন সাধ থাকিয়া থাকিত, তখন তাহার কোনটীই পূর্ণ হয় নাই। ইনি জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা হেয় মনে করিতেন। তথাপি ইনি সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন।

স্বামী সাংসারিক উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিতে, ক্ষুণ্ণ না হইয়া ইনি এই প্রার্থনাই করিতেন, যেন স্বামীর ধর্ম্মসাধনে সহায় হইতে পারেন। আমরা আশ্রমে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল বাস করি, ইহার মধ্যে ইনি স্বামী ও সন্তানগণের রোগে দারিদ্র্যে কত ক্লেশ পাইয়াছেন—এমন কি কতদিন উদর পূরিয়া আহার হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু কখনও স্বামীকে আশ্রমত্যাগ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার জীবনকে ভারবহ করেন নাই। ইনি বিশ্বাস করিতেন, চাকুরী করিয়াও ধর্ম্মলাভ করা যাইতে পারে, এই জন্য ইনি আমার বরিশাল গমনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আশ্রমের যে মূলমন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা তাহার সহিত ইঁহার বরাবর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

জননী মাত্রেই স্নেহশীলা—কিন্তু ইহার সন্তান-পালনে একটু বিশেষত্ব ছিল। আমাদের প্রত্যেক সন্তান পুনঃ পুনঃ কঠিন ও সুদীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগ করিয়াছে। প্রতিবারেই ইনি প্রায় একাকী তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছেন—তাহাতে কখনও তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণু হইতে দেখি নাই। আমি যে এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া সন্তানগুলিকে লইয়া আপনাকে এত অসহায় মনে করিতেছি, তাহার কারণ এই যে তিনি তাহাদিগের লালনপালন, সেবাশুশ্রূষার ভার আপনি সমস্তই গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিপূর্ণ অবসর দিয়াছিলেন, সুতরাং আমার এদিকে কিছুমাত্র জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জ্জিত হয় নাই। ইহাদিগের অসুখ অভাবের কথা আমা অপেক্ষা ইনি অনেক ভাল বুঝিতেন, তাঁহার এই আকুল স্নেহের গুণেই অনেক সময় ইহাদিগের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। জননীর সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন দুঃখ যাহা, বিধাতা তাহাও ইঁহাকে দিয়াছিলেন। পরলোক

গমনের পূর্ব্ববৎসর বাঁকিপুরে অবস্থান কালে আমাদের প্রথমা কন্যা ওলাউঠা রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করে; সেই দিনই অপর যে দুটী সন্তান ইঁহার নিকটে ছিল, তাহারাও ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথম পুত্রটী তখন বরিশালে আমার নিকটে রেমিটেণ্ট ফিবারে শয্যাগত। এই ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে করুণাময়ী মা ইঁহাকে কি অপূর্ব্ব শক্তি দিয়াছিলেন, যাহার কথা ভাবিয়া মন কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হইতেছে। তখন ইঁহার শরীর ভগ্ন। আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম, এই কঠিন আঘাত ইনি সহ্য করিতে পারিবেন না। কন্যার পরলোকগমনের সংবাদের সহিত জানিতে পারিলাম ইনি patient under bereavement—শোকে ধীর। তখন অসহ্য সন্তান-শোকের মধ্যেও অনেক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সত্য সত্যই এই সন্তান-শোক তাঁহার কাল হইল। ইনি হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, বাহির হইতে তাহা বুঝা যাইত না। কিন্তু যখন প্রার্থনা করিতে বসিলেই চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইত, যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইলে ইনি আমার নিকট নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তখনই বুঝিতাম, মর্ম্মে মর্ম্মে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে। কন্যার শ্রাদ্ধবাসরে ইঁহার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

বিবাহের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থান কালে ইঁহার ধর্ম্মসাধনের বিশেষ প্রণালী ছিল, নামসাধন তাহার প্রধান অঙ্গ। সে সময়ের ডায়েরী পড়িয়া জানা যায়, নামসাধনে ইনি বেশ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে এই প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সংসারচক্রে পড়িয়া ধর্ম্মসাধনের জীবন্ত ভাবও মন্দীভূত হইয়াছিল; আমি তাহা আমারই অপরাধ বলিয়া মনে করি।

কিন্তু বিধাতা ইঁহাকে যে সরল ধর্ম্মানুরাগ ও শ্রদ্ধা দিয়াছিলেন, তাহা ইঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। ইনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ অতি ভক্তির সহিত শুনিতেন, গৃহে বন্ধুজন উপাসনা করিলে, অতিশয় আনন্দিত হইতেন, পারিবারিক উপাসনায় শিথিলতা প্রবেশ করিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। ইঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমি ইঁহাকে লইয়া উপাসনা করি। প্রতিদিন আচার্য্যের কাজ করিলে আত্মার ক্ষতি হয়, আমার এই বিশ্বাস ছিল। এজন্য প্রথম কয়েক বৎসর কেবল রবিবারে, ও কখনও কখনও অন্য দিন, মিলিত উপাসনা হইত; তাহাও সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে নহে। ইহাতে তিনি দুঃখ করিতেন। পূজনীয় গুরুদাসবাবুর উপদেশে ১৮৯৯ সনের আগষ্ট মাস হইতে আমাদের গৃহে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভগবানের নাম করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। তদবধি ইনি রোগে শয্যাগত হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা একরূপ নিয়মিতরূপেই চলিয়া আসিতেছিল। উহাতে আমাদের কতদূর উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না। বলিতে গেলে আমাদের সম্বন্ধের যাহা কিছু মধুরতা, তাহা এই মিলিত প্রার্থনা হইতে। ইদানীং দেখিয়াছি, কাজে কর্ম্মে অধিক বেলা হইলেও ইনি উপাসনা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না। সন্তানশোক পাইয়া ইনি ভগবানকে ভাল করিয়া ধরিবার জন্য আরও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এজন্য বিশেষভাবে পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইঁহার প্রাণের একান্ত আগ্রহ ছিল, কন্যার সমাধির উপরে একখানি সুন্দর উপাসনা গৃহ নির্ম্মিত হয়। পরম জননী ইঁহাকে আপনার কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। কেনই বা করিবেন! ইনি সংসারত্যাগের দুইতিন দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ভক্তির সহিত স্থিরভাবে তাঁহার নাম শ্রবণ করিয়াছেন। যখন শারীরিক

দুর্ব্বলতার জন্য পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না, তখনও চক্ষু মুদিত করিয়া, করযোড়ে প্রার্থনায় যোগ দিয়াছেন। কোন কোন দিন বা এমন হইয়াছে, আমি প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ করিয়াছি, এমন সময় একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রার্থনা করিতে আসিলেন, ইনি এত দুর্ব্বল হইয়াও আবার প্রার্থনায় যোগ দিলেন। হৃদয়ের এই সরল স্বাভাবিক ভক্তিই ইহাকে এত দীর্ঘরোগ যন্ত্রণার মধ্যে অসাধারণ ধীরতা ও নির্ভীকতা আনিয়া দিয়াছিল। ইনি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, “আমি মরিতে ভয় করি না।” মরিতে ইঁহার ইচ্ছা ছিল না—কাহারই বা থাকে—কিন্তু শেষ দিনেও প্রিয়জনদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া ইহার নয়ন প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা যায় নাই। ইনি যে রোগ শয্যায় গাহিয়াছেন ও মহাপ্রস্থানের সময়েও শুনিয়াছেন, “মরণের অন্ধকার উপত্যকা মাঝে, চলিতে, চলিতে কভু হব না হে ভীত,” তাহা জীবন দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সরল, অকপট হৃদয়ে বিধাতার কৃপা নামিয়া আসে, ইহা অতি সত্য কথা, নতুবা ইনি কিরূপে মৃত্যুর বিভীষিকা অগ্রাহ্য করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে, নির্ভয়ে পরম মাতার অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন? হৃদয় বিহারী ভগবান ইঁহার হৃদয় দেখিয়াছিলেন, তাই শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, এই সরল আত্মাটীকে ফুলের মত তুলিয়া লইয়াছেন। ধন্য তাঁহার কৃপা, জয় তাঁহারই জয়।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

নিঃসঙ্গ জীবন

সাংসারিক কথা

আমার সন্তানেরা যখন মাতৃহীন হইল, তখন সত্যব্রতের বয়স দশ হইতে এগার ও অমিতাভের ছয় হইতে সাতের মধ্যে; বীণার বয়স তখনও তিন পূর্ণ হয় নাই, অণু চারি মাসের শিশু।

১৯এ জুন রবিবার, কলেজ খুলিবার পূর্ব্ব দিন আমি সত্যব্রতকে লইয়া বরিশালে ফিরিয়া গেলাম; অমিতাভ, বীণা ও অণু মেশো-মহাশয় ও বড়মাসীমার নিকটে রহিল।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ষ্টীমারে আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তিন চারিজন ও আমরা দুইজন একত্র আট-চালা ঘরে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। গোপালবাবুর ঘরে মুসলমান ছাত্রদিগের একটা মেস হইল, কিন্তু তাহা অধিক দিন ছিল না। ইহাতে আমার কতকগুলি টাকা বৃথাই ব্যয় হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রবাবু সাত টাকা ঘর ভাড়া দিতেন এবং ম্যানেজারের কাজ করিতেন। তাঁহার অবস্থান কালে কয়েকটী ছাত্র বালিকা বিদ্যালয় ও গোপালবাবুর ঘরে আমাদের সহিত বাস করিত। দুই একটী এখন উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

স্ত্রীর দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসায় প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয় হইল। কলেজে অনুপস্থিতির দরুণ প্রায় আড়াই শত টাকা বেতন কাটা গেল, কলিকাতায় আড়াই মাসে দেবেন্দ্রের নিকট হইতে ৪১২৲ চারিশত বার টাকা কর্জ্জ করিলাম। বরিশালেও কাহারও নিকটে

একশত, কাহারও নিকটে পঞ্চাশ টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। বরদাবাবুর কয়েক মাসের সুদ বাকি পড়িল এবং ১৯০৪ সনের কিস্তিবন্দীর টাকা বরখেলাপ হইল।

এই বিপদের মধ্যে বাড়ী বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। ক্রেতা কিংবা তথাকথিত ক্রেতারা ভাবিলেন, আমি অগাধ সলিলে ডুবিয়াছি, সুতরাং জলের দরে বাড়ী বেচিয়া ফেলিব; তাহারা হাস্যজনক প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। আমার প্রতিবেশী এক আদালতের আমলা একদা আমার সহিত দরদস্তুর করিতে আসিলেন। দুই জনে এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইল—

আমলা—"শুনিলাম, আপনি বাড়ী বিক্রয় করিতে চাহেন, সত্য নাকি?"

আমি—"হাঁ, উপযুক্ত দাম পাইলে বেচিতে পারি।"

আমলা—আমার এক আত্মীয় এই বাড়ী কিনিতে চাহেন, কিন্তু দাম বড় কম বলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি এই প্রস্তাব লইয়া রজনীবাবুর নিকট যাইতে পারিব না। আমি তাঁহাকে কিছুতেই বলিতে পারিব না, আপনি যে বাড়ী চারি হাজার টাকায় কিনিয়াছেন, তাহা আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করুন।"

আমি – "নমস্কার।"

বাড়ীর দাম তিন হাজার টাকার উপর উঠিল না, বরিশাল ছাড়িবার পূর্ব্বে উহা বিক্রয়ও করিলাম না।

কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে বরদাবাবুর সহিত ঘোরতর অপ্রীতির ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি সুদ ও আসল টাকা কিস্তিবন্দীর সর্ত্তানুসারে পরিশোধ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে

লাগিলেন ; আমি সাধ্যমত দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, একবার সুদের টাকা ফেরৎ দিলেন। পরিশেষে বরদা বাবু আমাকে স্পষ্ট কথায় বলিলেন, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আমার ঘরে মনোমোহনবাবু, মন্মথবাবু, বরদাবাবু প্রভৃতির বৈঠক হইল। মন্মথবাবু বরদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রজনীবাবুর নামে নালিশ করিতে পারেন ?" উত্তর—"হাঁ, পারি।" মন্মথবাবুর চোখে জল আসিল।

আইনজ্ঞ বন্ধুরা আমাকে আশ্বাস দিলেন, নালিশ করিলে উত্তমর্ণের বিশেষ সুবিধা হইবে না। নালিশ হইল না। ১৯০৫ সন হইতে আমি পরীক্ষার সমস্ত টাকা বাড়ীর দেনা শোধের জন্য দিতে লাগিলাম, তদুপরি অন্য সময়েও আসল টাকার জন্যও কিছু কিছু দিতাম। ১৯০৭ সনের প্রারম্ভে ঋণ এক হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাবাবু আমাকে চাপিয়া ধরিলেন, এবার বাকী টাকা একবারে পরিশোধ করিতে হইবে। উকীল সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয়কে কি কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমরা লোন আফিস হইতে আপনাকে অল্প সুদে এক হাজার টাকা কর্জ্জ দিতেছি, আপনি বরদাবাবুর টাকাটা দিয়া ফেলুন।" আমি ২১এ মার্চ্চ (১৯০৭) আমার জীবন-বীমা বন্ধক দিয়া লোন আফিস হইতে শতকরা বার্ষিক নয় টাকা সুদে এক হাজার টাকা ঋণ করিয়া বরদাবাবুর দেনা পরিশোধ করিলাম। ১৯০৮ সনের ১৩ই জুলাই লোন আফিসের ধার নিঃশেষে পরিশোধ হইল।

জমাখরচের খাতায় দেখিতেছি, আমার বেতন প্রায় আড়াইশত টাকা কাটা গেল বটে, কিন্তু কলেজ হইতে আমাকে অগ্রিম টাকা

দেওয়া হইত। ১৯০৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার পরিমাণ ছিল ৩৩২৸৶১০; ১৯০৭ সনের জুন মাসে ১১৪৷৵৮ পাই। এই সদাশয়-তার জন্য আমি অশ্বিনী বাবুর নিকটে চিরকৃতজ্ঞ।

অন্তরের সংগ্রাম

ছত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইলাম। শাস্ত্রী মহাশয় পত্নীর পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মের পক্ষে বিপত্নীক হওয়া এক মহা বিপদ। আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পত্নীর অনাবিল প্রীতি ও সহানুভূতি আমার বিপদের ভার লঘু করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমি পিতার কর্ত্তব্য হইতে দীর্ঘকালের জন্য মুক্তি পাইব, এমন অস্বাভাবিক আশা অন্তরে পোষণ করিতে পারি নাই। কবে, কিরূপে, শিশু সন্তানদিগকে নিজের নিকটে রাখিয়া স্নেহের ক্ষুধা তৃপ্ত করিতে পারিব, এই ভাবনা আমার চিত্তে নিরন্তর জাগিয়াছিল।

ইহার সহিত প্রবল সুখলালসা যুক্ত হইল। সংসারাশ্রমের কল্পনা আট বৎসর কাল প্রথমে তীব্র ও তৎপরে মৃদু ভাবে আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছিল।

প্রবৃত্তির উদ্দামতা শৃঙ্খলিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনটী সংকল্প গ্রহণ করিলাম।

(১) আমিষবর্জ্জন। স্বর্ণলতার উপরত্তির দিন হইতেই নিরামিষাশী হইলাম।

(২) এক বৎসরের জন্য সামাজিক নিমন্ত্রণে আহার ত্যাগ করিলাম।

(৩) "উপাসনার মধ্যে এই সংকল্প জাগিল। এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে সংসার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিব না।" (২৯ই জুন ১৯০৪)।

ইহার একটু ভাষ্য প্রয়োজন। চিন্তা রোধ করা আমার সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে নূতন সংসার করিবার বিষয়ে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইব না, এ সংকল্প অটুট ছিল।

সুখলালসাকে নির্জ্জিত রাখিবার জন্য আমাকে যে দারুণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, সেই কথাই প্রথমে বলিতেছি।

"মনটা যেন সাংসারিক সুখের অসারতা একটু একটু বুঝিতে পারিতেছে। ক্ষণিক না হইলে বাঁচি। উনি গিয়াছেন বলিয়া মনে এখন খুব বেশী ক্লেশ হয় না, মনে হয় যেন ভালই হইয়াছে। এটাও ক্ষণস্থায়ী ভাব হইতে পারে। * * * উঁহার সহিত যোগ তো যাইবার নয়। মিষ্টতা কমিতেছে না।" (৩রা জুলাই ১৯০৪)।

"তিনি কৃপা করিয়া হৃদয় না ছুঁইলে ক্ষুদ্র সুখের বাসনা কি হৃদয় হইতে যায়? সংসার অনিত্য, এখানকার সুখ অনিত্য, ইহা বুঝিয়াও মনের উদ্দাম প্রবৃত্তি সংযত হয় না, যদি তাঁহার নামের আস্বাদন যথার্থভাবে একবার না পাওয়া যায়। হৃদয়ের আমূল পরিবর্ত্তন দরকার, নতুবা কেবল prop up করিয়া রাখা যায় না।" (৬ই জুলাই)।

"I am passing through the valley of the shadow of death." (পত্র, ২৮এ জুলাই)।

"কামিনীকাঞ্চন, কামিনীকাঞ্চন, কামিনীকাঞ্চন"—জীবিত বা পরলোকগত, [illegible] একই। হে ভগবান্, তোমাতে মতি কোথায়? চব্বিশ ঘণ্টা ঐ এক চিন্তা—উদ্ধার হইবে কি? মন ফিরিবে কি?

একটা radical change of the heart হইবে কি?" (২০এ সেপ্টেম্বর)।

এই দারুণ সংগ্রামে আমার সহায় ছিল (১) পাঠ, (২) সজন ও নির্জ্জন উপাসনা (৩) প্রেমস্মৃতি ও বিদেহী সত্তার অনুভূতি, এবং (৪) স্বপ্নদর্শন।

(১) পাঠ

শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনখানি পুস্তক হইতে আমি মহোপকার লাভ করিয়াছিলাম। (১) এমার্সনের গ্রন্থাবলী, (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রী ম—কথিত), (৩) Tennyson's In Memoriam. এগুলি ছাড়া The Unseen Universe, Bishop Welldon রচিত Immortality বিষয়ক গ্রন্থ, এবং উপনিষদ গীতা ও ভাগবত আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল।

(২) সজন ও নির্জ্জন উপাসনা

গ্রীষ্মাবকাশের পরে কয়েক মাস প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আমাদের গৃহে আসিয়া সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেন আমি 'কথামৃত' পাঠ করিতাম।

শুক্রবার সন্ধ্যাকালে কয়েক জন ভক্ত ও সাধক আমাদের ঘরে সমবেত হইতেন, দুই তিন ঘণ্টা সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও কথাবার্ত্তা চলিত। এক এক বার জমাট কীর্ত্তন হইত। কিছু কাল এই অনুষ্ঠানটী জীবিত ছিল।

সোম ও শুক্রবারের উপাসনা কীর্ত্তনাদি হইতে আমি যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছিলাম।

যিনি অশরণের শরণ, অনন্যগতি হইয়াই আমাকে তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রাতঃকালে পাঠে ও উপাসনায় অধিকাংশ দিন দুই তিন ঘণ্টা যাপন করিতাম, প্রায়শঃ স্নানান্তে উপাসনার কক্ষে যাইয়া বসিতাম। সায়ংকালেও অনেক দিন সেখানেই প্রার্থনা ও ভাববিনিময়ে কিছু কাল কাটিত।

(৩) প্রেমস্মৃতি ও বিদেহী সত্তার অনুভূতি

আমার সুখপ্রিয় মনকে সংযত করিবার একটা বড় সহায় ছিল প্রেমস্মৃতি। চিত্ত সংসারের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে বিদেহিনীর অগাধ প্রীতি ও তাঁহার সত্তানুভূতি তাহাকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিতেছে—প্রথম কয়েক বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল।

"কলেজ হইতে আসিয়া প্রিয়তমার ছবি দেখিলাম।" (ফটোগ্রাফের ব্রোমাইড্ এন্‌লার্জমেণ্ট)। "আহা, কি সুন্দর, যত দেখি, আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য এমন প্রিয় এমন মিষ্ট, আগে তো এতটা বুঝিতে পারি নাই ? এই স্মৃতি লইয়া জীবনটা কাটাইতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করি।" (২৮এ জুন ১৯০৪)

"এক এক বার ভাবিলে বেশ আনন্দ হয়, যে এমন এক জন ছিলেন, যিনি আমাকে এত ভালবাসিতেন। তিনি এখন দেহে নাই, কিন্তু এত ভালবাসা যে পাইয়াছি তাহার স্মৃতিই সান্ত্বনা। (১লা জুলাই)।

"আমি ভাবি কি, যত দিন যাইতেছে, উনি তো পুরাতন হইতেছেন না। ঘনিষ্ঠতা যেন আরও বাড়িতেছে। তাঁহার ভালবাসার কথা ভাবিলে কত সুখ পাই। এভাব কি ক্রমে ম্লান হইবে ? মুস্কিল এই, ভুলিতে পারিব না,—ভোলা পাপ—অথচ মনে ক্লেশ

হইতে পারিবে না। উৎকট বৈরাগ্য, শোককে চাপিয়া বিনাশ করা, আর হা হুতাশ, ক্রন্দন—এই উভয়ের মাঝখানে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে। বড় শক্ত। ভগবান্, তুমি সহায় হও।” (৫ই জুলাই)

“এক দিকে দেখিতেছি, উনি সর্ব্বদাই মনের মধ্যে রহিয়াছেন, এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছি না—উঁহার ছবি যেন ক্রমে অধিকতর সুন্দর বোধ হইতেছে—আজও উপাসনার মধ্যে তাঁহার মুখখানি দেখিয়াছি—অথচ মনটা এক এক সময় সুখের স্মৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করে।” (১৮ই জুলাই)

২৫এ জানুয়ারী (১৯০৫) “পারলৌকিক” নামক পুস্তিকা হস্তগত হইল। তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া লিখিয়াছি—

“এত দিন গেল, এখনও প্রিয়তমার ছবি যত দেখি, আরও দেখিতে ইচ্ছা করে। ওগো, তোমাকে কি ভুলিতে পারি? ভোলা কি সম্ভব? তোমার সহিত অনন্ত কালের সম্বন্ধ—আত্মার যোগ কখনও ছিন্ন হইবে না। আজও তোমায় এত মিষ্ট লাগে, তোমার স্মৃতি এত মধুর, সকল জিনিসের সঙ্গে তুমি মিশিয়া রহিয়াছ—শত শত কথা, শত শত বিষয় তোমার স্মৃতি জাগাইয়া দেয়; কেমনে ভুলিব তোমায়?”

“কি আশ্চর্য্য! তিন বৎসরের অধিক হইল তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, আজিও তাঁহার প্রতি প্রেম কিছুই কমিল না, বরং দিন দিন যেন আরও বাড়িতেছে। কৈ, তাঁহাকে ভুলিতে তো পারিতেছি না! একখানি চিঠি, একটা হাতের অক্ষর দেখিতে মন এত অভিভূত হয় কেন? আর তাঁর ভালবাসাই বা কি আন্তরিক ছিল—আমার মত মানুষ যে এতটা ভালবাসা লাভ করিয়াছিল,

ইহাতে প্রাণ খুলিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। * * * ইহা বুঝি প্রেমের etherialized হওয়া? মনে হয়, তিনিও বুঝি আমার জন্য এখনও এমনই ব্যাকুল, তিনিও বুঝি আমার জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিতেছেন, তাই চিত্তের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহার প্রতি এখন চিত্তের যে ভাব, তাহাতে সংসার করিবার চিন্তা আর মনে স্থান পায় না। ভগবান্, প্রার্থনা কি শুনিলে? মনের এই অবস্থা স্থায়ী হউক।" (১৯এ জুলাই ১৯০৭)।

অশরীরী সত্তানুভূতি

"মাঝে মাঝে যেন একটা unseen presence feel করিয়াছি।" (৩০এ জুন)। ১৫ জুলাই শুক্রবার সমবেত কীর্ত্তনের সময় মনে হইল স্বর্ণলতা আমার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

"রাত্রিতে প্রার্থনা করিতে বসিলাম। একতারার সহিত 'অন্ধ-জনে দেহ আলো' গাহিতে গাহিতে ভাবোদয় হইল। যেন প্রিয়-তমার উপস্থিতি অনুভব করিলাম। হঠাৎ গা ছম ছম করিতে লাগিল। মনে হইল আমার ন্যায় তাঁহারও এই গানের প্রয়োজন আছে।" (৩০এ জুলাই)।

"সন্ধ্যার পরে উপাসনার ঘরে বসি। একটা গানের পরেই মনে হইল, আর কেহ আসিয়া বসিলেন। শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, গা কাঁপিতে লাগিল। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই গানটা ধরিলাম, বহুবচনে গাহিতে লাগিলাম। * * * নাম করিতে করিতে মনে হইল, আরও অনেক সাধু ভক্ত যোগ দিতেছেন, যেন সুমিষ্ট সুর শুনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে জোরে 'ওঁ ব্রহ্ম' ধ্বনি উঠিতেছে। অনুভব করিলাম, প্রিয়তমা বলিতেছেন, 'আমার জন্য

প্রার্থনা কর, আমি বড় দুঃখে আছি।' অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিলাম।" (১৫ই আগষ্ট)।

সত্তানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিদেহিনীর বাণী কতবার শুনিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। ২২এ আগষ্টের ব্যাপার বলিতেছি। আমি গোপালবাবুর ঘর কিনিয়া মেরামত করিয়া সুরেন্দ্রবাবুর অনুরোধে তাঁহার দেশস্থ কয়েকটী মুসলমান ছাত্রকে ভাড়া দিয়াছিলাম। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি তাহারা উঠিয়া গেল; আমার কতকগুলি টাকা লোকসান হইল। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ঐ দিন অপ্রীতিকর বাক্যবিনিময় হইল, মনটা খারাপ হইয়া গেল। বৈকালে অর্দ্ধজাগ্রৎ অবস্থায় পত্নীকে বলিলাম, "বল দেখি, যেটা ধরি সেটাতেই লোকসান হইতেছে কেন? এ হ'ল কি?" তিনি প্রেমপূর্ণ স্বরে ভরসা দিয়া বলিলেন, "অপেক্ষা কর।" কথাকয়টী শুনিয়া আমার উপকার হইল।

আর এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মান্তু বলিল, "বেড়াইতে যাইব?" আমি বলিলাম, "না!" তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট শুনিলাম, পত্নী বলিতেছেন, 'আহা, বেচারাকে যাইতে দেও।" তখন পুত্রকে বলিলাম আচ্ছা, যাও। সুরেন্দ্র বাবু নিজের কক্ষে বসিয়া কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, তিনি জানিতেন, আমি একবার 'না' বলিলে, আর 'হাঁ' বলি না। হঠাৎ মতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি নিগূঢ় কথা বলিলাম।

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯০৫) কোনও কারণে কয়েক দিনের ছুটী পাওয়া গেল। সুতরাং অনায়াসে বাঁকিপুর যাইতে পারি। রাত্রিতে (২৪এ) উপাসনান্তে প্রিয়তমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর পাইলাম, "এই সে দিন আসিলে, নাই বা গেলে।' আমি।

"ছেলেমেয়েদের দেখিব না?" উত্তর—"আমি তো আছি।" যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

২৫এ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫। "রাত্রিতে উপাসনান্তে প্রিয়তমার সহিত অনেক কথা হইল। 'বল দেখি, কি হবে?' 'অধীর হইও না, কখনও অমঙ্গল হইবে না।' 'ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে?' 'এখন কিছু বলিতে পারি না। তোমার জন্য রোজ প্রার্থনা করি। আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। ছি! ছি! এত অবিশ্বাস কর কেন'?"

"ময়মনসিংহ (সিটী) কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া যাইবার জন্য শ্রীনাথ বাবু লিখিয়াছেন। সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পুনঃপুনঃ নিষেধ শুনিতেছি। আজ কথোপকথনে বড় আনন্দ হইয়াছে। এই যে তিনি আমার সঙ্গেই—তবে আর মৃত্যু কি? তবে আর বিচ্ছেদ কোথায়?"

(পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ উপলক্ষে স্বপ্নদর্শনের কাহিনী বিবৃত হইবে।)

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রস্তাব

দৈববাণী শুনিয়া আমার মনে অটল প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, যে স্বর্ণলতার আরোগ্য লাভের আশা নাই। কিন্তু আমি সে কথা তাঁহাকে কখনও বলি নাই। তাঁহার দুঃসহ রোগযন্ত্রণার মধ্যে দুই জনে একত্র চোখের জল ফেলিয়াছি, বিদায় সূচক কথা আমার মুখ হইতে কখনও বাহির হয় নাই। শুনিয়াছি কত গৃহিণী মহাযাত্রার পূর্ব্বে স্বামীকে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন; পাঁচ মাস শয্যাগত থাকিলেও আমার গৃহিণী আমাকে একটী কথাও বলেন নাই। তিনি সে অভাব পূরণ করিলেন পর-লোকে যাইয়া স্বপ্ন ও অশরীরী বাণীর দ্বারা।

২১এ মে (১৯০৪), আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বপন দেখিলাম—

"কোথায় যেন তাঁহার দর্শন পাইলাম। * * * আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কৈ, তুমি তো আমাকে সংসার সম্বন্ধে কিছু বলিলে না?' তিনি বলিলেন, 'আমাকে কি মনে কর? আমি কি বলিব, ভাবিতেছ?' আমি বলিতে যাইতেছিলাম, 'আমি জানি, তোমার অমত হইবে না,' কিন্তু এমন সময়ে ঠাকুরঝি সেখানে আসাতে চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি চলিয়া গেলে উনি বলিলেন, 'আবার সংসার করিলে আর কি করিয়া বাঁচি?' "

কয়েক মাস পরে এক বন্ধুর পত্র পাইলাম, তিনি কোনও আত্মীয়ার সম্পর্কে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার সংকল্পানুযায়ী উত্তর দিলাম, এক বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিব না। বন্ধুবর ঠিক এক বৎসর পরে পুনশ্চ বিষয়টা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 'হাঁ', 'না' কোনও সঠিক জবাব দিই নাই।

অণুর পরলোকগমন

৫ই অক্টোবর বুধবার (১৯০৪) সংবাদ পাইলাম অণুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুই দিন তারযোগে কখনও একটু ভাল, কখনও খুব মন্দ পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ খবর আসিল। শুক্রবার, ৭ই, ষ্টীমার ধরিয়া পরদিন ভোরে কলিকাতায় দাদার আবাসে উপনীত হইলাম। গুরুদাস বাবু দাদাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, দশটার সময় তাহা পড়িয়া জানিতে পারিলাম, অণু বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টায় দেহত্যাগ করিয়াছে। শনিবার রাত্রির গাড়ীতে উঠিয়া রবিবার প্রত্যূষে

বাঁকিপুর সাধনাশ্রমে পঁহুছিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে গুরুদাসবাবু হলঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে পাইয়াই বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, দুই জনেই বিলাপ করিলাম, তার পর উপাসনাকক্ষে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইল। যথাসময়ে সামাজিক উপাসনায় অনেকে আসিলেন, আমিও যোগ দিলাম।

১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে অণুর আদ্যকৃত সম্পাদিত হইল, গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, আমি প্রার্থনা করিলাম।

তৎপূর্ব্ব দিন গুরুদাসবাবুর সহিত কঙ্করবাগ গিয়া সেখানে পত্নীর নৈকট্য অনুভব করিলাম।

১৯এ অক্টোবর বুধবার আমার ৩৭শ বার্ষিক জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইল; বন্ধুবান্ধব অনেকে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীরাম-পুরের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ লাহিড়ী তন্মধ্যে অন্যতম। গুরুদাসবাবু উপাসনা করিলেন, এবং উপাদেয় উপদেশ দিলেন। বার বৎসর পরে জন্মদিনে এই প্রথম প্রিয়তমাকে দেহে নিকটে পাইলাম না, এজন্য প্রার্থনার মধ্যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই।

অণু চলিয়া গেল; যে তিনটী সন্তান রহিল, তাহাদের কাহারও স্বাস্থ্যই ভাল নয়। এই সময়ে আমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, যে ইহারা কেহই বাঁচিবে না। নিম্নে যাহা বর্ণিত হইতেছে, তাহার মূলে এই ভাবটা কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

আমার পরমাত্মীয় গুরুদাসবাবু, তাঁহার পত্নী ও সুকুমারী, তিন জনেরই আমার দ্বিতীয় বার সংসার করিবার পক্ষে মত ছিল। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে একদিন ঠাকুরঝি ও সুকুমারীকে স্বতন্ত্র-

ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কাহাকে পছন্দ করেন। দুই জনেই একটী বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার নাম করিলেন। দুই একদিন পরে গুরুদাস-বাবুকে কথাটা বলিলাম, তিনিও উঁহাদের মতে মত দিলেন। তার পর তিনি কন্যার পিতামাতার নিকটে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা জানাইলেন, আমার প্রতি তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা আছে, প্রস্তাবটী তাঁহারা সাগ্রহে অনুমোদন করিতেছেন। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি ভাবিবার সময় চাহিলেন। পিতা বলিলেন, ইহা সম্মতির পূর্ব্বলক্ষণ। আমার এই আশ্বাসবাক্যে আস্থা হইল না। দুই এক দিন পরে স্বপ্ন দেখিলাম, পিতা গুরুদাসবাবুকে বলিয়াছেন, "গোল হয়েছে, মেয়ের মত হচ্ছে না।"

আমি মেয়েটীকে দূর হইতে জানিতাম, প্রবেশিকা পরীক্ষার বাছনি পরীক্ষার ইংরেজী কাগজ পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধিমতী বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল ; চেহারা সম্বন্ধে মত অনুকূল ছিল না। আমি কন্যাটীকে দেখিতে চাহিলাম, নিজেদের আগ্রহ থাকিলেও সে বিষয়ে পিতামাতা কোনও ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই অবস্থায় আমি মান্তুকে লইয়া ৯ই নবেম্বর রাত্রিতে বরিশালে ফিরিয়া গেলাম। ১০ই কলেজ খুলিল।

গুরুদাসবাবুকে বলিয়া রাখিলাম, এক বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে পাকা কথাবার্ত্তা হইবে না।

বরিশালে পুনর্দারপরিগ্রহ বিষয়ে যাঁহাদিগের সহিত আলাপ হইত, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রভৃতির ন্যায় যাঁহাদিগের বিমাতার অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহারা দুই হাতে আমাকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেন। পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস, অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি

অনেকে উহার পক্ষপাতী ছিলেন। চারি পাঁচ বৎসর পরেও এক পূজনীয়া বর্ষীয়সী মহিলা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি আবার বিবাহ করুন।" কেন বলিয়াছিলেন, আজিও বুঝিতে পারি নাই।

১৯১০ কি ১৯১১ সনে পরদুঃখকাতর পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী হঠাৎ একটা কথা বলিয়া আমাকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় যাইয়া একদিন সাধনাশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন রাশি রাশি গ্রন্থে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিতেই আমাকে বলিলেন, "তুমি এক কাজ কর। জয়ার নিকটে (গুরুদাসবাবুরা তখন ঢাকায়) ছেলেমেয়েদিগকে রাখ, একজন গভার্নেস রাখিয়া দেও, তার পর তুমি বিবাহ কর।" আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ক্ষণকাল পরে বলিলাম, "আমার সে দিকে মন নাই।" "তবে তো ভালই।"

চিরহিতৈষী ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ও দ্বিতীয় সংসারের অনুকূল ছিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বাপর দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছেন আমার বিদেহিনী পত্নী।

স্বপ্ন দর্শন

(১) ২১এ নবেম্বর স্বপ্ন দেখিলাম, কোথায় কোন্ বাড়ীতে পরিচিত ও অপরিচিত কয়েকটী মেয়ের সহিত দেখা হইল। কথায় কথায় একজন বলিলেন, স্বর্ণলতা ঐ বিবাহের পক্ষপাতী নহেন।

(২) ৫ই ডিসেম্বরের স্বপ্ন—স্বর্ণলতা ও সুকুমারীকে একসঙ্গে

দেখিলাম। পত্নী আবার সংসারে ফিরিয়া আসিয়াছেন, দেখিতে পূর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি ও অল্পবয়স্কা। আমি মনে মনে বিবাহের বিষয় ভাবিতেছি, পরে বলিলাম, "যদি বিবাহ করিতেই হয়, তবে ইঁহাকেই কেন করি না, তাহাই তো ঠিক্ হইবে ; অপরকে কেন ?"

(৩) ২৭এ জানুয়ারী, ১৯০৫—রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহার মধ্যাংশ সুস্পষ্ট। প্রিয়তমা একটা বাড়ীতে অত্যন্ত পীড়িত, বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। দাদা উপস্থিত আছেন। প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি আবার বিবাহ করিতে যাচ্ছ ?" আমি—"তুমি কি বল ? আমার মনে এই ভাবটা জাগিতেছে, যে ছেলেমেয়েগুলি এখন বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, যদি একটা সুবিধা হয়।" তিনি বলিলেন—"কিসের আবার বিবাহ করিবে।" "This is her second warning."

২৫এ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে উপাসনার পরে যে কথোপকথন হইল, তাহার একাংশ :

"—সম্বন্ধে কি বল ?"

"বড় Obstinate."

"— ?" "না।"

৮ই আগষ্ট (১৯০৫)—"For the last few days, am reading wife's diaries and my own ;—her diaries before marriage have again stirred my heart to its depth."

(৪) "Two nights before saw wife in a dream in a most loving attitude. She looked very beautiful in my eyes, though somewhat reduced. Very strange to say the following night—appeared before me in a

dream; she seemed to be rather unattractive, being a shade too dark."

"For the past week wife's deep, self-sacrificing love has been once again brought home to my mind. O what a loving soul dwelt in that beautiful form!"

"Is it possible that her love, so ardent so deep so forgetful of self, should have altogether perished on her leaving this world? O, never, never, never. If this universe is God's universe, if God is true, her love is still living, it is still mindful of me, however unworthy of it I may be, and she is still hovering about me like my good angel." (8th Aug. '05)

স্বর্ণলতা স্বপ্ন ও বাণীর সাহায্যে শুধু আমাকে নিজের অমত জানাইয়াই নিরস্ত হন নাই; উদ্যোক্তাদিগকেও নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। যখন কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন এক দিন সুকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার মেজদিদি তাঁহাকে বলিতেছেন, "সুকুমারী, তোমরা করছ কি?"

কথাবার্ত্তার সময়েই গুরুদাসবাবু একদা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীসরঞ্জন দাসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে একটী বৃহৎ কক্ষে একাকী শুইয়া আছেন, নিশীথ কালে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তারপর জাগ্রত অবস্থায় সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, স্বর্ণলতা তাঁহাকে বলিতেছেন "দাদা বাবু, কেন মিছামিছি বিবাহের চেষ্টা করছেন?"

বিদেহিনীর প্রেমের আকর্ষণই পরিশেষে জয়যুক্ত হইল। ১৯০৫ সনের অক্টোবর মাসে, ঠিক এক বৎসর অন্তে, নবগৃহ রচনার আকাঙ্খা নির্ব্বাণ লাভ করিল। অতঃপর কেহ প্রস্তাব পাঠাইলে

আমি উত্তর দিতাম "যদি ভবিষ্যতে আবার সংসার করিবার মানস করি, তখন আপনাকে জানাইব।" ইহার সাতবৎসর পরে ভ্রান্তি-বিলাসের মত একটা অভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষের সম্পর্কের তিক্ততা প্রবেশ করে নাই। ১৯১২ সনে নবগৃহ রচনার কামনা নির্ব্বাপিত হইল।

আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত ও সুখপ্রিয় মানুষ বিপত্নীক অবস্থায় জীবন অবসান করিতে পারিবে, বিচ্ছেদের ঘোরান্ধকারের মধ্যে আমার এমন ভরসা ছিল না। আমার পক্ষে যে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহার মূলে ছিল সর্ব্বোপরি পরম পিতার করুণা, এবং তারপরেই প্রিয়তমার অপরাজেয় মরণহীন প্রেম।

সুখলালসায় মন যখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে চাহিত, তখনও প্রিয়তমার সামান্য একটু রচনা, চিঠিপত্র, দৈনন্দিন লিপিতে রক্ষিত একটা গল্প—এই সমুদায় আমাকে মোহিত করিত, শৃঙ্খলিতও করিত।

স্বর্ণলতা কুমারীকালে পণ্ডিত শ্রীনাথচন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিয়া রাজেন্দ্র ও নিরুপমার গল্প লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯০৫ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর "একটী সামাজিক চিত্র" নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম। মূল্য এক আনা, এক হাজার খণ্ড ছাপা হইয়াছিল, দুই এক বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হয়।

বিদেহিনীর সহিত আত্মিক যোগ রক্ষা করিবার পক্ষে বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান আমাকে প্রচুর বল দান করিয়াছিল। তাহার একটু আভাস দিতেছি।

৩

পারলৌকিক

১৯০৫ হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত বরিশালে প্রতিবৎসর পত্নীর বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। সব বৎসর ৫ই বৈশাখ বা ১৭ই এপ্রিল হইত না; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাজ শেষ করিয়া দিন স্থির করিতাম, সে জন্য কোন কোনও বার দুই এক দিন পরে হইত। তিন বার ৫ই বৈশাখ, একবার ৫ই রবিবার ছিল বলিয়া ৬ই, দুই বার ৮ই এবং একবার ১০ই বৈশাখ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বার্ষিক শ্রাদ্ধ আটচালা ঘরে সম্পন্ন হইত। স্থানীয় ব্রাহ্মেরা প্রায় সকলে এবং ব্রজমোহন কলেজের কতিপয় শিক্ষক, প্রাচীন সমাজের কেহ কেহ উপস্থিত থাকিতেন; সহরে থাকিলে অশ্বিনী বাবুও আসিতেন।

সাত বৎসরের মধ্যে ১৯০৮ সনে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী এবং অবশিষ্ট ছয়বার শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমি প্রায় প্রতিবৎসর প্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিয়া প্রার্থনা করিতাম। শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সামান্য মিষ্টান্ন দেওয়া হইত।

আমি যে বৎসর যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

১৯০৫

"হে প্রিয়তম, তোমার বিশেষ আগ্রহে এই গৃহ রচিত হইয়াছিল। আজ এখানে আমরা সকলে তোমাকে স্মরণ করিবার জন্য মিলিত

হইয়াছি। ইহা তাঁহারই বিধান, তাঁহারই লীলা। এক বৎসর হইল তুমি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছ ; এই এক বৎসরের কয় মুহূর্ত্ত তোমাকে ভুলিতে পারিয়াছি, তুমি জান। এই এক বৎসর কাল আমার পক্ষে কি ভাবে গিয়াছে, তাহাও জান। তুমি একাকী যাও নাই। কন্যাকে তোমার নিকটে নিয়াছ, স্নেহের অজিতকে তোমার নিকটে নিয়াছ। কিন্তু সেজন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আজ স্বীকার করিতে হইতেছে, তুমি আমাকে ফেলিয়া দূরে চলিয়া যাও নাই ; আজ স্বীকার করিতে হইতেছে, তুমি দিন দিন আমার নিকটে আরও প্রিয় আরও মিষ্ট হইতেছ। যখন অর্থাভাব হইয়াছে, তোমার নিকটে আশার কথা শুনিয়াছি, যখন দুর্ব্বলতার মধ্যে মরণের দিকে চলিয়াছি, তখন তোমার নিকটে, তোমাকে দেখিয়া, বল পাইয়াছি ; উত্তেজনার মধ্যে ক্ষমা করিবার উপদেশ পাইয়াছি— ইহা আজ স্বীকার করিতে হইতেছে।"

১৯০৬

"হে প্রিয়তম, দুই বৎসর হইল তুমি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছ, দুই বৎসর হইল তোমার সুন্দর মূর্ত্তি চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তুমি যে দিন দিন আরও প্রিয়, আরও মিষ্ট হইতেছ। এক সময়ে আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে তোমাকে ভুলিয়া যাই। এখন দেখিতেছি, তুমি আজীবন আমার সাথের সাথী, ভুলিব, সে সাধ্য কি আর আমার আছে ? পথের ধূলিকণায়, কর্ম্মক্ষেত্রে পুস্তকের ছত্রে ছত্রে তোমার স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলে তুমি, জলে অবগাহন করিলে তুমি, যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, তুমি অন্তরে থাক, ঘুমাইলে তোমাকে নিকটে পাই। আগে তো

জানিতাম না, তুমি এত কাছে। তুমি যত দিন আমার গৃহে ছিলে আপনার অকপট, আত্মবিস্মৃত প্রেমের দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলে ; এখন ওখান হইতে নিজের প্রেম দ্বারা, প্রার্থনা দ্বারা আমাকে কত রূপে সাহায্য করিতেছ। হৃদয় যে মহত্ত্বের পথে, সেবার পথে আত্মবিসর্জ্জনের পথে চলিতে চায়, সে তো তোমারই প্রার্থনার ফল ; হৃদয় যে ক্ষুদ্র সুখলালসা ছাড়িতে চায়, সে তো তোমার প্রেমের আকর্ষণ। আমি দেখিতেছি, তুমি দেহে থাকিলে হয় তো যাহা হইত না, এখন তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন মন স্বীকার করিতে চাহে এই যে মর্ম্মভেদী আঘাত, ইহাতে কল্যাণ আছে, নবজীবন আছে, নবসুখ আছে। নতুবা এমন কেন হইল, আগে যাহাতে কাঁদিয়াছি এখন আর তাহাতে কাঁদিতে ইচ্ছা হয় না, আগে যাহাতে আপনাকে দুঃখী মনে করিয়াছি, এখন তাহাতেই আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে হয়। এমনই বা কেন হইল, যাহাকে দুই বৎসর চোখে দেখি নাই, তাহার সহিত একাত্মবোধ কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না। সকলি তাঁহার লীলা, তাঁহার বিচিত্র খেলা। কে জানে এর পর আরও কি আছে ? হৃদয় এখনও নির্ম্মল হয় নাই সুখের আশা এখনও যায় নাই, কিন্তু তবু দেখিতেছি, তুমি যে আজ দেহে নাই ইহাও আমার পক্ষে বিধাতার আশীর্ব্বাদ। হয় তো তুমি আজ গৃহে থাকিলে দেশের এই দুর্দ্দিনে এতটা নির্ভয় হইতে পারিতাম না, হয় তো দেশের জন্য খাটিবার এতটা অবসর মিলিত না। তবে আরও প্রার্থনা কর। দুই বৎসর তোমার প্রার্থনার ফলে, বিধাতার কৃপায়, বাঁচিয়া আছি। প্রার্থনা কর তাঁহার ইঙ্গিত যেন আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি, তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করেন শত ক্লেশ হইলেও তাহাতে যেন অবিচ্ছেদে

চলিতে পারি। তোমার জন্য আর দুঃখ করিব না। আমি জানি তুমি সুখে আছ, কল্যাণে আছ। তোমার নিকট মিনতি এই, তোমার প্রার্থনা যেন আমার নিত্য সঙ্গী হয়, তোমার পবিত্রতা যেন আমার জীবন পথে আলোকস্বরূপ হয়, তোমার অবিনাশী প্রেম যেন সকল দুঃখ ক্লেশে সকল বিপদ প্রলোভনে ভয়বিভীষিকায় আমার অক্ষয় সান্ত্বনা হয়।”

১৯০৮

“হে প্রিয়তম, দিন দিন নূতন নূতন যাহা শিখিতেছি, তাহা তোমারই প্রেমের ফল, আজ তাহা বলিবার দিন। চারি বৎসর চোখে না দেখিলে যে সম্বন্ধ আরও গভীর হয়, শরীর নষ্ট হইলে যে আত্মার যোগ আরও বাড়ে, আগে তো তাহা জানিতাম না। তুমি দেহে থাকিতে তো জানিতাম না। আত্মার যোগ, প্রাণযোগ কাহাকে বলে ; এখন তাহা ক্রমে বুঝিতেছি তাহা আজ সকলকে বলিতে হইবে। তোমার সহিত সম্বন্ধ আরও মধুর হইতেছে, তুমি দিন দিন আরও প্রিয় হইতেছ তোমাকে ক্রমে আরও কত সুন্দর দেখিতেছি ইহা তো স্বীকার না করিয়া পারি না। চারি বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দূরে যাইও না, আমার জন্য প্রার্থনা করিও, তোমার পবিত্রতা দ্বারা এই মলিন হৃদয়কে পবিত্র করিও। আজ স্বীকার করিতেছি তুমি আমার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ। জীবনে যাহা কিছু নব তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে তাহা তোমারই প্রার্থনার ফল, ইহা অনুভব করিতেছি। শুভ সংকল্পে তোমার উৎসাহের বাণী শুনিয়াছি, মন্দ চিন্তা মনে আসিলে তুমি লজ্জা দিয়াছ, তিরস্কার করিয়াছ। তোমার প্রেম আমাকে

পরাজিত করিয়াছে, আত্মবিক্রীত করিয়াছে। তবে আরও নিকটে এস, প্রাণে থাক, সাধনে প্রার্থনার সঙ্গে থাক।”

১৯০৯

“হে আমার প্রিয়তম, তোমার সহিত যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহার কথা আজ ব্যক্ত না করিলে অপরাধী হইব। পাঁচ বৎসর হইল চক্ষু তোমাকে দেখিতে পায় না, পাঁচ বৎসর হইল তোমার দেহ নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তোমার সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা দিন দিন আরও গভীর ও মিষ্ট হইতেছে। তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে রহিয়াছ, হাত ধরিয়া চলিয়াছ। কত কঠিন পথ চলিলাম তোমার সহিত, কত কণ্টকময় পথ চলিলাম তোমার সহিত, কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, সজনে বিজনে জয়ে পরাজয়ে দুঃখে শোকে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিও, আমার জন্য প্রার্থনা করিও সে অনুরোধ তুমি পূর্ণরূপেই পালন করিয়াছ। যাহা কিছু নূতন তত্ত্ব জানিতেছি, অভিনব সত্য জানিতেছি, তাহা তোমারই প্রার্থনার ফল। কত দেখিলাম, কত শিখিলাম। প্রিয়জনকে পরলোকে পাঠাইয়া আনন্দ হয়, যে জন্য ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছি তাহার জন্য ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়—ইহা বলিলে লোকে পাগল বলিবে। কিন্তু সত্য সত্যই তোমাকে পরলোকে রাখিয়া, তোমার সহিত সম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আনন্দ হইতেছে। তাই তোমার স্মৃতির জন্য যে এই অনুষ্ঠান, ইহা আমার পক্ষে উৎসব বলিয়া মনে হইতেছে। দৃশ্যের পশ্চাতে অদৃশ্যে যে বিশ্বাস দিন দিন বাড়িতেছে——ইহা কি আশ্চর্য্য! প্রার্থনা করিও, আশীর্ব্বাদ করিও, বিশ্বাস যেন আরও বাড়ে, সমস্ত ভয় ভাবনা, দেহের মায়া যেন উত্তীর্ণ হইতে পারি। সন্তানগণ যেন তোমার স্মৃতিতে বর্দ্ধিত হয়।”

১৯১১

"হে আমার প্রিয়তম বিদেহী-আত্মা, সাত বৎসর হইল তুমি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ। সাতবৎসর আমাদের জীবনে অল্প সময় নয়। কিন্তু তুমি যে এতদিন হইল চলিয়া গিয়াছ তাহা তো মনে হয় না। এই সাত বৎসর যেন মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হয় যেন তুমি এখনও কাছেই আছ। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তোমার সহিত যখন প্রথম মিলন হয়, সেইটাই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, তোমার সহিত যে বিচ্ছেদ, সেটা তত সত্য বলিয়া বোধ হয় না। এক এক সময় মনে হয়, তুমি কোন্ লোকে চলিয়া গিয়াছ ; জীবন ক্রমেই রহস্যময় হইতেছে। দেহে থাকিতেই তুমি আমার অপেক্ষা কত অধিক পবিত্র ছিলে, কত অধিক নির্ম্মল ছিলে। এখন তুমি আরও কত বেশী পবিত্র হইয়াছ, নির্ম্মল হইয়াছ। এখন তুমি কোন্ ঊর্দ্ধ-লোকে চলিয়া গিয়াছ, আমি কি আর তোমায় ধরিতে পারিব ? কিন্তু তোমার সঙ্গে যে প্রেমের যোগ তাহা তো যাইবার নয়। আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তোমার প্রতি আমার প্রাণের যে আকর্ষণ তাহা তো কিছুতেই ম্লান হইতেছে না, তাহা যে দিন দিন আরও সত্য আরও উজ্জ্বল হইতেছে। জীবনে যত দুঃখ পাইয়াছি, পাইতেছি, যত রোগ সহিয়াছি, সহিতেছি, অন্ধকারপূর্ণ পরীক্ষায় পড়িয়াছি, সে সমুদায়ের মধ্যে তোমার প্রেম কি ছিল না ? রোগে যত শুশ্রূষা পাইয়াছি, বন্ধুবান্ধবদের স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছি, বিপদে আশ্বাসবাণী শুনিয়াছি ; তাহার মধ্যে কি তোমার হাত ছিল না ? সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন দুঃখ বিপদে বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন তুমি যে প্রাণে স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলে, "অপেক্ষা কর। ভাল হইবে।" তাহা তো বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। ভালই হইয়াছে, মন্দ তো

কিছুতেই হইল না। আজ সেই সাক্ষ্য দিতে হইতেছে। বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান! শরীরের দিক দিয়া তোমার সহিত যত রকমের যোগ ছিল, একে একে সকলই চলিয়া যাইতেছে। সাতবৎসর হইল তোমার সুন্দর মূর্ত্তি নয়নের অন্তরাল হইয়াছে। কত আগ্রহে তোমার প্রতিকৃতি করাইয়াছিলাম, তাহা নষ্ট হইয়াছে। এই গৃহের সহিত তোমার যে কত যোগ ছিল, তাহাও ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে। বিধাতার অভিপ্রায়ই এই, যে তোমার সহিত কেবল প্রাণের যোগ থাকিবে, কেবল প্রেমের যোগ থাকিবে। তবে তাহাই হউক। তোমার সহিত অখণ্ড প্রেমের যোগ স্থাপিত হউক। তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে থাক। আমরা মিলিত হইয়া যেন তাঁহাকে লাভ করি।”

প্রতিবৎসরের অনুষ্ঠানটী আগাগোড়া শান্ত গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইত। উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ, প্রার্থনা, গান ও কীর্ত্তন—সমস্তই প্রাণে পরম তৃপ্তি দান করিত।

বরিশাল হইতে চলিয়া যাইবার পরে যে আবহাওয়ার মধ্যে পড়িলাম, তাহাতে স্বভাবতঃই নিয়মিত বার্ষিক শ্রাদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল।

নানা কথা

সঙ্গীত রচনা

১৮৯৮ সনে আমি সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করি। তদবধি পত্নী বিয়োগ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে ৩৪টী সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। শোকের আঘাতে কাতর হইয়া আমি অন্তরের সংগ্রাম, আকাজ্ক্ষা ও প্রার্থনা সঙ্গীতে প্রকাশ করিতাম। প্রথম বৎসরে ৫০টী সঙ্গীতে মনের বিভিন্ন ভাব বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমশঃ অনুপ্রাণন মন্দীভূত

হইতে থাকে। ১৯০৫ সনের জুন মাস হইতে ১৯০৯ সনের শেষ পর্য্যন্ত মোটে ২৯টী সঙ্গীত রচনা করি; পরবর্ত্তী বৎসরের ১টী সঙ্গীত লিখিত পাইয়াছি। কয়েকটি বিলুপ্ত হইয়াছে। চারি পাঁচটী ব্রহ্ম-সঙ্গীতে মুদ্রিত আছে।

সেবার আকাঙ্ক্ষা

শোকের আঘাতে ও সুখলালসার তাড়নায় এক এক সময়ে বিষয়-কর্ম্মের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইত; অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিত, যে অর্থোপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়া পুনশ্চ ঈশ্বরের সেবাতে আত্ম-সমর্পণ করিব। ২২এ নবেম্বর (১৯০৪) স্বপ্ন দেখিলাম, রাত্রিকালে কোথায় এক নদীর তীরে গুরুদাসবাবু, অপর কেহ কেহ ও আমি মিলিত হইয়াছি। নিকটে ও দূরে চিতা জ্বলিতেছে। আমি আরাধনা করিলাম। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "এক বৎসর প্রচার বা spiritual work কর; যদি inward consolation (ঠিক এই দুই কথা) পাও, তবে কাজ ছাড়িয়া দাও।"

১০ই সেপ্টেম্বর (১৯০৫)—"The thought is repeatedly occurring—'The time has come when I should devote myself to the service of the Lord. I have waited too long already."

৫ই অক্টোবর (১৯০৫)—"Feel drawn towards the service of God. This life seems to be far higher than the other course". কিন্তু মনে এই সংশয় উপস্থিত হইল—আমি একবার সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া সেবার পথে আসিয়াছিলাম, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। আবার বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া সেবাব্রত

গ্রহণ করিলে আজীবন একনিষ্ঠভাবে যে তাহা পালন করিতে পারিব, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি আছে ?

৯ই অক্টোবর (১৯০৫)—"বিশ্বাস ও আনুগত্যের জীবনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আছে। তাহার পূর্ব্বাভাসই এত সুন্দর, আসল বস্তু না জানি কেমন!"

"আঃ! সংসারের ক্ষুদ্র সুখের প্রলোভন পদদলিত করিয়া যদি অনন্ত অদৃশ্য রাজ্যে দাঁড়াইতে পারিতাম!"

"A life of purity is an unspeakable joy."

অক্টোবর (১৯০৬)—"The mind is setting to a state of calm resignation. The hope is growing stronger day by day that it will be possible for me to conquer the love of pleasure and to serve my God and my country."

১৭ই অক্টোবর (১৯০৭)—"একটী কথা আবার মনে জাগিয়াছে। সমস্ত ছাড়িয়া একেবারে তাঁহার সেবায় লাগিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু নিজের দিকে চাহিয়া কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। আরও মনে হয় প্রচারক হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে কাজ করিলে বোধ হয় নিজের অধিক কল্যাণ। দুই বৎসর ধরিয়া বিশেষ-ভাবে কথাটা মনে উঠিতেছে। সেটাকে চাপা দিয়া রাখাই কর্ত্তব্য, না বাহির হইয়া পড়া উচিত। তিনি যে দিকে লইয়া যান, যাইব, এই সংকল্পই মনে জাগিতেছে।"

অন্তরের তিন বর্ষব্যাপী এই সংগ্রামের পরিণাম দাঁড়াইল এই যে, আমি ১৯৩৭ সনের ৩১এ মে পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসর কাল শিক্ষা-ব্রতেই লাগিয়া রহিলাম।

বড় দিনের ছুটীতে ২৩এ ডিসেম্বর শুক্রবার বরিশাল ছাড়িয়া পর দিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পঁহুছিলাম। মান্তুকে বাসার ছেলেদের নিকটে রাখিয়া গেলাম। খোকা বীণাকে দেখিবার আগ্রহ তো ছিলই ; তা'ছাড়া মনের কোণে লুক্কায়িত একটা দুর্ব্বলতাও বাঁকিপুর যাইতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ২৬এ সোমবার বাঁকিপুরে উপনীত হইলাম। ৩১এ অবগত হইলাম, মনস্কাম পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তদুপলক্ষে এই সঙ্গীতটী রচিত হইল—

"কি অপূর্ব্ব দয়া তব লভিতেছি পদে পদে।
নিরাপদ রেখেছ মোরে বিপদে সুখসম্পদে।"

আসিবার পথে ষ্টীমারে একটী সঙ্গীত রচনা করিয়াও সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম।

৮ই জানুয়ারী (১৯০৫) বরিশালে ফিরিলাম।

নিদারুণ দুর্দ্দৈব

১লা মার্চ্চ প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তদুপলক্ষে কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া পুত্রকন্যা দেখিবার মানসে দুই দিনের জন্য বাঁকিপুরে গেলাম। ৫ই রবিবার ভোরে পাগলাখানায় সাধনাশ্রমের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পরদিন বৈকালে ভাঁড়ার ঘরে একটা মরা ইন্দুর পাওয়া গেল। গুরুদাসবাবুর তৃতীয় পুত্র অজিত সেটা হাতে ধরিয়াছিল। মনে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইল। ৭ই প্রাতঃকালে বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইবার কালে দুশ্চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া পড়িলাম। খোকা বীণাকে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই মন চাহিতেছিল না। প্রার্থনা করিয়া বল পাইলাম ; অন্তরে 'Trust me' এই বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। পরদিন ৮ই রাত্রিতে বরিশালে পঁহুছিলাম।

১২ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে পরীক্ষার কাগজ দেখিতেছি, এমন সময়ে গুরুদাসবাবুর তার আসিল, "Await plague serious wire advice money." তারের অর্থ ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম, তাই তৎক্ষণাৎ তারে উত্তর দিলাম, "change house remitting money." সোমবার কলেজের নিকটে যাইয়া আবার তার পাইলাম, "House changed 9th Critical." অশ্বিনীবাবু এই তার পড়িয়া এবং প্রথম তারের সংবাদ শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "A অক্ষরে নাম আরম্ভ হইয়াছে, এমন কেহ আশ্রমে আছে কি ?" ধাঁ করিয়া আমার খোকার কথা মনে পরিল ; তাহার নামতো 'অমিতাভ' ; গুরুদাসবাবুরা তাহাকে 'অমিতা' বলিয়া ডাকেন। টেলিগ্রাম অফিসে 'Amita' 'Await' রূপে বিকৃত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অশ্বিনীবাবু ও অপর সকলের পরামর্শে তখনই জবাবের টাকা দিয়া এক জরুরী টেলিগ্রাম করিলাম।—'Who attacked with plague, &c.' ভীষণ উদ্বেগে সময় কাটিতে লাগিল ; মর্ম্মান্তিক অনুতাপ উপস্থিত হইল, যে কেন আমি সন্তান দুটীকে বাঁকিপুরে রাখিয়া আসিলাম। ভাবিলাম পুত্রটী গেল। সন্ধ্যাকালে অনেকে আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আটটার সময় জবাব আসিল "Yetkumar got plauge Sunday condition critical others well." এবারও নাম বিকৃত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যে অজিতকুমারের প্লেগ হইয়াছে। তার পাইয়া চোখের জল রোধ করিতে পারিলাম না। আবার এই মর্ম্মে তার করিলাম, "অপর সকলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিন ; আমার যাওয়া একান্ত আবশ্যক কি না, জানাইবেন।"

১৬ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে অজিত বার বৎসর বয়সে পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল। শনিবার দুপ্রহরে আমি সে সংবাদ পাইলাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমান্ রমণী বরিশালে আসিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খোকা ও বীণাকে লইয়া আসিবার জন্য তাহাকে বাঁকিপুরে পাঠাইয়া দিলাম, সে তাহাদিগকে লইয়া নিরাপদে ২০এ মার্চ্চ সোমবার ফিরিয়া আসিল।

বরিশালে আসিবার দিন দশেক পরেই বীণা প্রবল জ্বর ও কাসিতে শয্যাগত হইল। কি বিপদে পড়িলাম, কথায় বলিবার নয়। আমার হাতে ছয় সাত শত পরীক্ষার কাগজ ও কলেজের কাজ, তার উপরে মাতৃহীন শিশু গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত। বন্ধুবান্ধবেরা কেহ কেহ প্লেগ আশঙ্কা করিয়া ঘরে ঢুকিতেন না, বাহির হইতে খবর লইয়া যাইতেন। যিনি অসহায়ের সহায়, তাঁহার কৃপায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেন, রমণী প্রধান সহায় ছিল; বাসার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ সেনের নিকটে আশাতীত সাহায্য পাইলাম; বীণা যন্ত্রণায় কাতর হইলে সে তাহাকে কোলে করিয়া বেড়াইয়া শান্ত করিত, এবং নানারূপে রোগীর সেবায় যথেষ্ট সময় দিত। এক এক রাত্রি বীণার রোগযন্ত্রণার দরুণ তিনটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিতাম না, কিন্তু সকাল হইতে আবার পরীক্ষার কাজে লাগিয়া থাকিতে হইত। চারিবৎসরের বালিকা কঠিন রোগে আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিল। বিধাতার করুণায় আটদিন পরে জ্বর ছাড়িয়া গেল, বীণা ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিল। আমার গুরুতর শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্যও নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইল।

বাঁকিপুরে গ্রীষ্মাবকাশ

২৯এ এপ্রিল কলেজ বন্ধ হইল, ৩রা মে পুত্রকন্যাসহ বাঁকিপুরে রওনা হইলাম। সূর্য্যাস্তের পরে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল, বৃষ্টিধারা তীরবেগে ষ্টীমারের একপার্শ্ব হইতে অপরপার্শ্ব ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল। বীণা অল্পদিন হইল গুরুতর পীড়ায় ভুগিয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য বড়ই ভয় হইল। যিনি অসহায়ের সহায়, তাঁহার করুণায় এই বিপদের মধ্যেও বান্ধব জুটিল। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কালীবর দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিল। ষ্টীমারের কয়েকটী কর্ম্মচারীও খুব সহৃদয়তা দেখাইলেন; একজন ঝড়ের মধ্যে বীণাকে নিরাপদ স্থানে কোলে করিয়া রাখিলেন, কেহ কেহ প্রথম শ্রেণীর কামরায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কারণ ষ্টীমার কলিকাতার গাড়ী ধরিতে পারিল না। আলাইপুর ষ্টেসনে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমাদিগের সহিত মিলিত হইল, সে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে রাত্রিতে ও পরদিন প্রাতঃকালে তাহার নিকটে বিস্তর সাহায্য পাইয়াছিলাম। বাট্‌লারও আমাদের সহিত খুব ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল।

৪ঠা মে সায়ংকালে কলিকাতায় পঁহুছিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বাঁকিপুরে আমাদের পূর্ব্বনিবাস গুরুপ্রসাদবাবুর বাংলাবাড়ীতে উপনীত হইলাম। গুরুদাসবাবুরা প্লেগের আশঙ্কায় পাগলাখানার বাড়ী ছাড়িয়া সেই বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

আমাদিগকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না। গুরুদাসবাবু তখন গৃহে ছিলেন না। একটু পরে ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার

বিশ্বাসবল ও ধীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। উপাসনালয়ে দৈনন্দিন উপাসনা হইল; গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, তিনি ও আমি দুইজনেই অজিতের জন্য প্রার্থনা করিলাম। ১০ই মে প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক জে. এন্. দাসগুপ্তের পত্র পাইয়া আমি কলিকাতায় গেলাম, এবং কতকগুলি কাগজ দ্বিতীয় বার পরীক্ষা (re-examine) করিয়া ১৬ই প্রাতঃকালে বাঁকিপুরে ফিরিলাম।

২৬এ মে শুক্রবার শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী একাকী দার্জিলিং যাত্রা করিলেন। ১৬ই জুন রাত্রি দুপ্রহরের সময় তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন, ১৭ই শনিবার, বরিশালে রওনা হইয়া ১৮ই রবিবার রাত্রিতে স্বধামে উপনীত হইলাম।

বিহারের গ্রীষ্ম অত্যন্ত পীড়াদায়ক। দীর্ঘ অবকাশকালে অল্প-স্বল্প পাঠ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে Darwin's Origin of Species, Lecky's History of European Morals, and Tennyson's Dramas উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৪ সনে বড়লাট কার্জনের এই অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল, যে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবে; চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সহিত যুক্ত হইবে, বঙ্গের অবশিষ্টাংশ বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সহিত পূর্ব্ববৎ স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে বর্ত্তমান থাকিবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রবল প্রতিবাদ হইতে লাগিল; ঐ বৎসরের শীতকালে তৎকল্পে ব্রজমোহন কলেজে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতিবাদের ফলে বড়লাট বাহাদুর তাঁহার পূর্ব্বসংকল্প পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচার করিলেন, সমগ্র

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ, অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামক এক নূতন প্রদেশ গঠন করিবে, পশ্চিমবঙ্গ বিহারাদি প্রদেশের পুচ্ছরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া "বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট" নামের সার্থকতা অটুট রাখিবে। বাঙ্গালী জাতিকে চিরতরে হীনবল করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে এই কূট, সর্ব্বনাশী নীতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী দুর্জ্জয় আন্দোলন উপস্থিত হইল, তৎকাল পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা ছিল না। এই আন্দোলনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। আমার নিজের ইহার সহিত যতটুকু সংস্রব ছিল, শুধু সেইটুকুই বলিব।

১৯০৫ সনের ২০এ জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের বঙ্গব্যবচ্ছেদবিষয়ক ঘোষণা প্রচারিত হইল। তাহাতে দেশময় ভীষণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সে দিন প্রাতঃকালে কয়েকটী ছাত্র আসিয়া আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বৈকালে এক বিপুল নীরব অভিযান নগর পরিক্রম করিল। সকলেই নগ্নপদ; আমি না জানিয়া জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়াছিলাম; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে আমার এক অনুগত ছাত্র আমার জুতা খুলিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে রাখিয়া দিল।

তারপরে সভা, সমিতি, বক্তৃতার প্লাবন চলিল। ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে এক জনাকীর্ণ সভায় বিলাতি বর্জ্জন বিষয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। আমরা তাহা মনপ্রাণে গ্রহণ করিলাম। অশ্বিনী বাবুর নেতৃত্বে বাখরগঞ্জ জেলা বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

৪ঠা অক্টোবর শারদীয় অবকাশে বাঁকিপুরে গেলাম।

৩০এ আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর সোমবার বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। প্রাতঃকালে শত শত পুরুষ গঙ্গায় স্নান করিলেন, আমরাও করিলাম; তৎপরে সাধনাশ্রমে উপাসনা হইল, গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং সতীশ ও শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ প্রার্থনা করিলেন, আমি একটী সঙ্গীত করিলাম। মধ্যাহ্নে অরন্ধন ব্রত পালিত হইল।

আমি এই সম্পর্কে কয়েকটা বক্তৃতা করিলাম। ১৭ই অক্টোবর এঙ্গ্‌লো-সংস্কৃত স্কুলের সভায় বারিষ্টার উপেন্দ্রমোহন দাস সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "A Few Thoughts on the Present Situation." শ্রোতার সংখ্যা সন্তোষজনক।

২১এ শনিবার রামমোহন রায় সেমিনারীতে ছাত্রদিগের বিতর্ক সভায় The Swadeshi Movement বিষয়ে কিছু বলিলাম।

পরদিন, রবিবার অপরাহ্নে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হিন্দুছাত্র-দিগের যাত্রা (procession) বাহির হইল। তাহাতে যোগ দিলাম, এবং উহা মোরাদপুরে এক জমিদারের বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে অনুরুদ্ধ হইয়া সংক্ষেপে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলাম। যাত্রাকারীরা রাজপথে একটী সুন্দর নূতন বাঙ্গালা গান গাহিয়াছিল।

২৪এ অক্টোবর মঙ্গলবার এঙ্গ্‌লো-সংস্কৃত স্কুলে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইল। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাপতির কার্য্য করিলেন শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, এম্. এ., বি. এল্.। উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ছয় শত, তন্মধ্যে কয়েকটী মহিলা ছিলেন। সভাপতি মহাশয় বক্তার পরিচয় দিতে যাইয়া এমন অত্যুক্তিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার

করিলেন যে, তাহা স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা বোধ হয়। আমার বক্তব্য বিষয় ছিল "The Swadeshi Movement—What it is, and what it is not." এক ঘণ্টা বলিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, ভারতবাসীর দারিদ্র্য এবং ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস, এই দুইটীর বর্ণনা শুনিতে শুনিতে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাটী প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া কার্য্য সমাপন করেন।

বন্ধুগণের অনুরোধে ২৬এ অক্টোবর সায়ংকালে স্কুলেই বাঙ্গলায় "স্বদেশের কথা" শীর্ষক একটী বক্তৃতা করিলাম। ডাক্তার রামকালী গুপ্ত ছিলেন সভাপতি। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত, তন্মধ্যে বাইশজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষ দিকে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশীপণ্য বর্জ্জনের সপক্ষে উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া নিজের গাত্র হইতে বিদেশী আলোয়ানখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সভাভঙ্গ হইলে মহিলাগণ "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিলেন।

পরদিন, পাটনা সহর হইতে কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া সেখানে আমাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। স্থির হইল, ২৯এ রবিবার অপরাহ্নে তথায় এক সভা আহূত হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রদিগের নিমন্ত্রণ পাইয়া ২৮এ শনিবার ৬টার সময় তথায় গমন করিলাম। গুরুদাসবাবু, স্কুলের শিক্ষক শ্রীমান মহেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত ও কয়েকটী ছাত্র সঙ্গী হইলেন। অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ালফোর্ড আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সভাপতি হইলেন গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাস, এম্. এ.। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল "The Source of Power." সওয়া ঘণ্টা

সময় লাগিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে তিনটী ছাত্র অগ্রসর হইয়া 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া আমাকে ও অধ্যক্ষকে নমস্কার করিল। সভা শেষ হইলে মিঃ ওয়ালফোর্ড বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

পাটনা বিহারের ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র; তথাকার সভায় দোকানদার ও ব্যবসায়ী লোকই অধিক থাকিবেন, এজন্য সতীশকে উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি প্রস্তুত হইলেন।

২৯এ রবিবার অপরাহ্নে গুরুদাসবাবু, সতীশ এবং আরও কয়েকটী ভদ্রলোকের সহিত পাটনায় গেলাম। সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেন, এল্. এম্. এস্., তাঁহার নামেই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। বিজ্ঞাপিত সময় ছিল তিন ঘটিকা, এক ঘণ্টা বিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইল। বাবু নারায়ণ প্রসাদ সভাপতি। প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিল, অধিকাংশই বিহারী, অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী। প্রথমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উর্দ্দুতে সুন্দর বক্তৃতা করিলেন; এক স্থলে সভাপতি তাঁহাকে বাধা দিলেন, কেন বুঝিলাম না। তারপর বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ ও আর দুইটী বিহারী ভদ্রলোক হিন্দীতে বক্তৃতা করিলেন। পরিশেষে আমি কুড়ি মিনিট ইংরেজীতে আমার বক্তব্য বলিলাম। সতীশের যে কথায় সভাপতি বাধা দিয়াছিলেন, আমি যখন জোরে সেই কথারই সমর্থন করিলাম তখন তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। সভাপতির মতান্তে সভা ভঙ্গ হইল। এক কলের মালিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতায় অত্যধিক প্রীত হইয়া আমাকে প্রচারকার্য্যে বাহির হইতে পরামর্শ দিলেন। আমরা ৭টার সময় আবাসে ফিরিয়া গেলাম।

আমি আসেসর রূপে ১লা ডিসেম্বর আহূত হইয়াছিলাম। এজন্য ৩১এ অক্টোবর বরিশালে প্রত্যাগমন করিলাম।

বরিশালে যাইয়াই স্বদেশী আন্দোলনে লিপ্ত হইয়া পড়িলাম। ২৬এ আগষ্ট (১০ই ভাদ্র) ব্রজমোহন কলেজের হলে "বর্ত্তমান আন্দোলনে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য" নামক একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ফিরিয়া যাইয়া রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই একবার স্বদেশীতত্ত্ব প্রচার করিলাম। একদিন চকবাজারে মহাজনদিগের সভায় আমি এবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

১লা নবেম্বর সঙ্গীত করিতে করিতে এক বিপুল অভিযান নগর পরিক্রম করিল, তৎপরে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে সভা হইল। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও অপর কেহ কেহ বক্তৃতা করিলেন। ২রা রবিবার ঐস্থানে আর একটী সভা হইল, উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান। সভাপতির কার্য্য করিলেন ফরিদপুরের অন্তর্গত হবিগঞ্জের এক তরুণ জমিদার। মুসলমান নেতৃবর্গ অন্যত্র প্রতিকূল সভা করিলেন। সভাপতির মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠের সময়ে কয়েকটী মুসলমান ছাত্র বাধা দিতে ও তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। আমি তখন উঠিয়া বলিলাম, "ইহাদিগের প্রতিবাদের কোনও মূল্য নাই, কেন না কিছুদিন পূর্ব্বে ইহারাই কয়েক জন হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য বিষয়ে জিলা স্কুলের এক সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিল, আমি তাহাতে সভাপতি ছিলাম।"

১৪ই নবেম্বর উন্মুক্ত আকাশতলে এক সভাতে আমি "ধীরতা ও বিধির বাধ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলাম।

১৫ই নবেম্বর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট স্যার ব্যামফিল্ড

ফুলার বরিশালে আগমন করেন। অশ্বিনীবাবু, উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস, জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি পঞ্চনেতা বাখরগঞ্জ জেলায় এক পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, যেন হাটে বাজারে বিলাতী লবণ, বিলাতী বস্ত্র, চিনি, মনোহারী পণ্য ও মদ বিক্রয় না হয়; অধিকন্তু নেতৃগণ বিবাদ মীমাংসার জন্য সালিসী সভা স্থাপন করিতেও পরামর্শ দিয়াছিলেন, ছোট লাট আসিয়াই সায়ংকালে উক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষরকারী পাঁচ জনকে মধ্য নদীতে রোটাস জাহাজে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ভয় দেখাইয়া একে একে পাঁচ জনকেই উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিলেন। এই সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইলে জনগণের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। অশ্বিনীবাবু ও রজনীবাবুর বাড়ীতে বহু শত লোক মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে নীরব দর্শক-রূপে আমিও ছিলাম।

ইতোমধ্যে মিঃ জ্যাক বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত নেতাদিগের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লইলেন যে, দুই সপ্তাহের মধ্যে কোনও প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিবেন না। পর দিন, ১৬ই, জ্যাক সাহেব অশ্বিনীবাবুর সহযোগে আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীচরণ সেন (উকীল), নিশিকান্ত বসু, শরচ্চন্দ্র রায় ও আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গমন করিলাম। তিনি অপর সকলের সহিত কথা বলিয়া পরিশেষে আমাকে ও শরৎকে একসঙ্গে আহ্বান করিলেন। আমার সহিত যে কথোপকথন হইল, তাহার মর্ম্ম দিতেছি।

Jack—"Inflammatory speeches are delivered; there may be a Mahommedan rising. You don't know what sort of men these Mahommedans, these *Chasha* people are. If they rise, that's nothing to me; they will not kill me, but how will you live with your wives and children?"

Guha—"Well, Sir, I am surprised to hear that I deliver inflammatory speeches. I should be the last man to do so. Only the day before yesterday I spoke on sobriety and law-abidingness. Aswini Babu must have told you that I never went into the interior to address any meeting."

Jack—"I don't say that you do (deliver inflammatory speeches). (Turning to Sarat) What do you find in Burke? If you address the lower class people, if you only inflame their passions, they don't understand reason. (To me) I have got a list of six or seven men. I have asked the Police to keep watch over those people. Your name is not on the list."

Sarat—"Is my name on the list?"

Jack—"No. Are you Khosal's brother?"

Sarat—"Yes, Sir."

Jack—"He is in Government pay, and you do this thing.

Guha—"I am thinking of reading an essay on union between Hindus and Mahommedans."

Jack—"Oh, what union can there be between Hindus and Mahommedans? There can be no union

between you and these illeterate people, keep aloof from all meetings and lectures for some days. I have called you because you are amenable to reason."

কথা সাঙ্গ হইলে আমরা অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম।

ডিসেম্বর মাসে সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার পিউ সাহেবের পুত্র বারিষ্টার পিউ বরিশালে আসিয়া মিঃ জ্যাকের সহিত কথোপকথনের মর্ম্ম লিখিয়া লইয়া গেলেন। দৈনিক বেঙ্গলী পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ র‍্যাট্‌ক্লিফও আমাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

জ্যাক সাহেব মনোমোহন বাবুকে রুক্ষ ভাষায় তিরস্কার করিয়া এক পক্ষের জন্য বরিশাল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। ১৯এ নবেম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুরোধে ব্রাহ্ম বারিষ্টার মিঃ এন্. গুপ্তের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলাম। তাঁহার নিকটে সহানুভূতি তো পাওয়া গেলই না, বরং তিনি জ্যাকের চেয়েও গরম সুরে কথা বলিলেন।

বৈকালে আমরা স্বদেশবান্ধবসমিতির কয়েকটী সভ্য এক বাড়ীতে মিলিত হইলাম।

২৩এ নবেম্বর বৃহস্পতিবার সায়ংকালে গুর্খা সৈনিকদিগের অভিযান বাহির হইল। পথে অনেকে তাহাদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইলেন। নিশিবাবুকে প্রহার করিল, উকিল শ্যামাচরণ দত্তের মাথা ফাটাইয়া দিল। ইহাতে সহরে খুব আতঙ্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল।

একপক্ষব্যাপী নিস্তব্ধতার পরে ৩রা ডিসেম্বর, রবিবার রাজা-

বাহাদুরের হাবেলীতে এক বিপুল জনসভার অধিবেশন হইল। গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে নিষেধ করিয়া এক সার্কুলার প্রচার করিয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও অন্যূন দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং উক্ত সার্কুলারের প্রতিবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০ই ডিসেম্বর ঐ স্থানেই আর এক সভা হয়। উপস্থিতির সংখ্যা চারি সহস্রের অধিক; এটী রাজনৈতিক সভা নয়, এজন্য ছাত্রেরাও দলে দলে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ একটী বক্তৃতা করেন।

তখন মিঃ এমার্সন বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট। জেলা স্কুলের যে সকল ছাত্র সভায় উপস্থিত ছিল, তিনি হেড্‌মাষ্টারের নিকটে তাহাদিগের নামের তালিকা চাহিয়া পাঠাইলেন। একশত ছিয়াত্তরটী নাম প্রেরিত হইয়াছিল। এবার অপরাধী ছাত্রদিগকে সতর্ক করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইল।

১৪ই, বৃহস্পতিবার ব্রতীসমিতির অধিবেশনে মনোরঞ্জন বাবু দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করিলেন—এটীও চিত্তহারী হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রদিগের সভায় যোগদান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কলেজের যাহারা আসিয়াছিল, অশ্বিনীবাবু তাহাদিগকে সভা হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত করেন। বারিষ্টার এ. কে. ঘোষ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পরদিন কলেজ হলে Debating Society নামক সমিতির আহ্বানে ঘোষ মহোদয় Debating Societies in Europe শীর্ষক বক্তৃতা করেন।

কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স

বারাণসী

এবার বারাণসীতে জাতীয় মহাসমিতি এবং একেশ্বরবাদী সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এবার আমি প্রথম প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলিলাম। ২৩এ ডিসেম্বর শনিবার বরিশাল ছাড়িয়া ২৫এ বাঁকিপুরে পঁহুছিলাম। গুরুদাসবাবু সস্ত্রীক তৎপূর্ব্বেই বারাণসী চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া প্রায় একটার সময় সিক্রোলে (Benares Cantonmentএ) এল. এম্. এস্. স্কুলের বাটীতে উপনীত হইলাম। Theistic Conferenceএর যাত্রীগণ সেইখানেই বাস করিতেছিলেন। গুরুদাস বাবুরা সকলেই নৌকাভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, বন্ধু শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় আমার অভ্যর্থনা করিলেন। সায়ংকালে একেশ্বরবাদী-দিগের অধিবেশনে প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনা হইল; বিষয়নির্ব্বাচন-সমিতির মনোনয়নে আমিও উহার সভ্য মনোনীত হইলাম, এবং সভাপতি অধ্যাপক রুচিরাম সাহানিকে ধন্যবাদসূচক কিছু বলিলাম।

২৭এ ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে আহারান্তে রেলগাড়ীতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত কাশী রাজঘাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম। সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের অভিভাষণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিষয়নির্ব্বাচন কমিটীতে স্থান পাইলাম। রাত্রি ৮টার সময় উহার অধিবেশন শেষ হইল, আবাসে ফিরিয়া যাইতে ৯॥টা হইল।

পরদিন ২৮এ, মধ্যাহ্নের অবসানে আরম্ভ হইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন চলিল। তৎপরে বিষয়নির্ব্বাচন কমিটি বসিল।

৯টার সময় রামানন্দবাবু ও আমি ষ্টেশনে যাইয়া অবগত হইলাম, অচিরে Prince of Wales (পরে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ) বারাণসীর পথে পূর্ব্বদিকে যাইবেন, এজন্য রেলগাড়ীর চলাচল স্থগিত হইয়াছে। এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমরা দুইজন এক্কাতে ১২টার পরে বাসায় পঁহুছিলাম। খুব ঠাণ্ডা ভোগ করিতে হইল, বলাই বাহুল্য। ২৯এ ডিসেম্বর কংগ্রেসের কার্য্য সমাপ্ত হইল না, এজন্য ৩০এ প্রাতঃকালে চরম অধিবেশন হইল। বৈকালে একেশ্বরবাদী সম্মিলন। সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী চমৎকার বক্তৃতা করিলেন। ৩১এ যুগপৎ একেশ্বরবাদীদিগের অধিবেশন, সামাজিক সম্মিলন ও শিল্প প্রদর্শনী।

১লা জানুয়ারী, ১৯০৬ প্রাতঃকালে পণ্ডিত শাস্ত্রী ও সরকারী উকীল যোগেন্দ্র বাবুর সহিত সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ দেখিলাম। বৈকালে শ্রীযুক্ত ভি. আর. শিন্ধে ও আমি আবার সহরে যাইয়া সরকারী কলেজ, মানমন্দির, বিশ্বেশ্বরমন্দির প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। পরদিন, ২রা, গুরুদাসবাবুদের সহিত ১টার গাড়ী ধরিয়া সন্ধ্যার সময় বাঁকিপুরে ফিরিয়া গেলাম।

৬ই জানুয়ারী ডুমরাঁও সুশীলাকে দেখিতে গেলাম, এবং এক রাত্রি তাহাদের গৃহে যাপন করিয়া পর দিন বাঁকিপুরে ফিরিলাম। ৯ই, কাশীতে সেই ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে জ্বর হইল। ডাক্তার আস্‌দার আলীর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া ১৬ই অন্নপথ্য পাইলাম, এবং ২১এ রবিবার সন্তানদিগকে লইয়া বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মাঘোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল, আমার নগর-সংকীর্ত্তনে উপস্থিত থাকা হইল না।

কাশীতে শ্রীযুক্ত শিন্ধের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি

বঙ্গদেশের ব্রাহ্ম-সমাজ সমূহ পরিদর্শন করিতে করিতে ২৫এ জানুয়ারী বরিশালে আসিয়া আমার গৃহে অতিথি হইলেন। পর দিন তিনি মন্দিরে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন ; ঐ দিন আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবার মাঘোৎসবে আমি বক্তৃতা করি নাই। ২৭এ পত্নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। শিন্ধে মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভ্রমণে বাহির হইয়া অবধি তিনি এক দিনও ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া খাইতে পারেন নাই, কারণ বাঙ্গালীরা রন্ধনে সরিষার তৈল ব্যবহার করে, তাহার গন্ধ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। মারাঠীরা তিসির তৈল ভালবাসে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি
(Bengal Provincial Conference)
এপ্রিল ১৯০৬

১৯০৬ সনে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যার পরে নারায়ণগঞ্জ ও খুলনার ষ্টীমারে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্ব্বাচিত সভাপতি আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতি নেতৃবর্গ বরিশালে উপনীত হইলেন। ষ্টীমারঘাটে বিপুল জনতা হইয়াছিল। আমি অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য ছিলাম, আমিও কৃষ্ণবাবু প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলাম।

কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এন্টিসার্কুলার সোসাইটীর ১৬।১৭ জন সভ্য—শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে—সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। "হাওড়া হিতৈসীর"

সম্পাদক শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থও তাঁহাদিগের সহযাত্রী ছিলেন। ষ্টীমার ঘাট হইতে অদূরে উপস্থিত হইতেই কন্‌ফারেন্সের যাত্রীগণ পুনঃ পুনঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তীর হইতে সহস্র সহস্র দর্শকের মধ্যে একজনের কণ্ঠ হইতেও তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হইল না। কারণ অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি বরিশালের জননায়কেরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যে রাজপথে বা অপর প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারিত হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন, এই প্রতিশ্রুতি না দিলে তিনি প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিবেন। যখন "বরিশালের একজন প্রধান লোক ষ্টীমারে আসিয়া আমাদিগকে এই সংবাদ দিলেন," তখন "আমরা বলিলাম, 'বন্দেমাতরম্' বলিতে পারিব না এইরূপ সর্ত্তে যে কন্‌ফারেন্স করা হইবে তাহাতে আমরা যোগদান করিতে পারিব না।" (কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত, ২৬৪ পৃঃ)

ষ্টীমার ঘাটে লাগিতেই আমি উপরের ডেকে যাইয়া কৃষ্ণবাবুকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "রজনী, আমরা তোমার বাড়ীতে যাইব।" কয়েক শত প্রতিনিধি ব্রজমোহন কলেজের বাটীতে গেলেন; সুরেন্দ্রবাবু স্বীয় বৈবাহিক জমিদার বিহারীলাল রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন; মিত্র মহাশয়কে দলসহ আমার কুটীরে লইয়া আসিলাম।

কিছুকাল পরে উকীল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ ও অপর কেহ কেহ আসিয়া কৃষ্ণকুমার বাবুকে সানুনয় অনুরোধ করিলেন, "আমরা অভ্যর্থনা সমিতির পথ হইতে আপনাদিগের জন্য আহার্য্য এই বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেছি, আপনারা আহার করুন।" তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

এ দিকে আমি এতগুলি অপ্রত্যাশিত অতিথির আহারের ব্যবস্থা করিতে বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার বাড়ীতে তখন একটা মেসের মত ছিল, সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। আমি নিজের ও মাস্তর জন্য দেয় টাকা দিতাম, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত সুরেন্দ্রবাবু করিতেন। তিনি এখন স্বেচ্ছাসেবকদলের কাপ্তান, কয়েক দিন ধরিয়া সমিতির মণ্ডপেই বাস করিতেছেন। রসুই বামুণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঘরে ডাল তরকারী কিছুই নাই, রাঁধিবার কাঠও নাই। তাহাকে রান্না-ঘরের একটা বাঁশের খুটী উঠাইয়া রাঁধিতে বলিলাম। সে মসুরীর ডাল রাঁধিল, আলুর কি একটা করিল; রাত্রি দশটায় পরে আমরা সকলে একত্র আহার করিলাম।

অতঃপর মিত্রমহাশয়ের আত্মচরিত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের বাড়ীতে নেতৃবর্গ মিলিত হইয়া (কৃষ্ণ বাবুও অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন) নির্দ্ধারণ করিলেন, "যে বেলা দ্বিপ্রহরের পর কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলী নামক বিখ্যাত স্থানে সমবেত হইবেন। তথায় বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করা হইবে এবং তথা হইতে প্রতিনিধিগণ বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজমোহন কলেজের সন্নিকটবর্ত্তী কন্‌ফারেন্স মণ্ডপে যাইবেন। আমরা তখন কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে সম্মত হইলাম।" (২৬৫ পৃঃ)

অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় সভ্য কৃষ্ণকুমার বাবুকে পুনরায় তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাতে সম্মতি জানাইলেন, কিন্তু বলিলেন, "আমরা রজনীর বাড়ীতে

বেশ আছি, আমরা এখানেই থাকিব।" এজন্য ব্যবস্থা হইল যে, তাঁহারা আমার বাটীর পশ্চিমে রাজপথের অপরপার্শ্বে উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর গৃহে রসদ পাঠাইবেন, মিত্র মহাশয়েরা সকলে সেইখানে আহার করিবেন; তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমিও তাঁহাদিগের সঙ্গে জুটিলাম। যে কয়দিন তাঁহারা বরিশালে ছিলেন, এই ব্যবস্থাই চলিয়াছিল।

১৫ই এপ্রিল শনিবার "দ্বিপ্রহরের পর আমরা রজনীবাবুর বাসা হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজাবাহাদুরের হাবেলী নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।" যাত্রিগণ মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজাবাহাদুরের হাবেলীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই "বহু সংখ্যক পুলিস লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প আমাদিগকে বাধা দিলেন, এবং" হাতের লাঠি দিয়া ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবুকে আঘাত করিলেন। "ফণী ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু সর্ব্বাগ্রে (প্রথম সারিতে) ছিলেন, রজনীকান্ত গুহ, হাবড়া-হিতৈষী সম্পাদক গীষ্পতি রায় চৌধুরী ও আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম। তাঁহারা ও আমি দৌড়িয়া সম্মুখে গেলাম ও দেখিলাম ফণীর (চিবুক) হইতে রক্ত পড়িতেছে।" (২৬৬ পৃঃ)। মিঃ কেম্প যুবকদিগকে মিছিল করিয়া হাবেলীতে ঢুকিতে দিলেন না, আমরা মিছিল ভাঙ্গিয়া ঢুকিলাম।

প্রায় তিনটার সময়, 'বন্দেমাতরম্' ও আর একটী সঙ্গীতের পরে, প্রতিনিধিগণ এক এক সারিতে তিন তিন জন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সপত্নীক সভাপতির শকটের পশ্চাতে হাবেলী হইতে বহির্গত হইয়া মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির পরে

এন্টিসার্কুলার সোসাইটীর সভ্যগণ রাজপথে পদার্পণ করিবামাত্র পুলিস রেগুলেশন লাঠি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বয়স্ক ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও অনেকের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। আমি তোরণের নীচে দাঁড়াইয়া প্রতিনিধিদিগের প্রসেসন দেখিতেছিলাম; এক কনেষ্টবল রাস্তা হইতে সেখানে আসিয়া আমাকে বেশ কয়েক ঘা দিয়া গেল; আমি বাম হস্তে লাঠি ঠেকাইয়াছিলাম, আঘাতে আঘাতে হাত ফুলিয়া উঠিল; ফুলা ও বেদনা সারিতে এক সপ্তাহ গেল। কনেষ্টবলটীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রিজার্ভ পুলিসের সুবাদার বাবুরাম সিং দুই হাত উঁচু করিয়া 'মত মারো মত মারো' বলিয়া চেঁচাইতেছিল, কিন্তু সেটা একেবারেই মৌখিক, মার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মাথায় লাঠির আঘাত পাইয়া ভূপতিত হইলেন, সুগায়ক ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন; যুবক চিত্তরঞ্জন গুহকে পুলিস যে নৃশংস প্রহার করিয়াছিল, তাহা আজিও আমরা ভুলিতে পারি নাই। এই হাঙ্গামার মধ্যে কৃষ্ণবাবুর সাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম।

প্রতিনিধিগণ সকলে রাজপথে বাহির হইবার পূর্ব্বেই কেম্প সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধৃত করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে লইয়া গেলেন, অশ্বিনীবাবু এবং বিহারীবাবু তাঁহার সঙ্গী হইলেন। প্রতিনিধিরা তখন কতকটা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় মণ্ডপের দিকে চলিলেন। সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—এক ছোকরা—অশ্বারোহণে সঙ্গে যাইতেছিল, সে মাঝে মাঝে যাত্রীদিগের উপরে ঘোড়া চালাইতে লাগিল। সকলে মণ্ডপে উপনীত হইলে

মিঃ আবদুল রসুল সভাপতি মনোনীত হইলেন, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীবাবুর অনুপস্থিতিবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত পাঠ করিলেন। কিছুকাল পরে সুরেন্দ্র বাবু, অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইলে সে দিনের কার্য্য শেষ হইল। অদ্যকার উত্তেজনা বর্ণনাতীত।

পর দিন, ১৫ই এপ্রিল, রবিবার, সাড়ে বারটার সময় কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ হইল। বিলাতী পণ্যবর্জ্জন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে দুই তিনটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইবার পরে, প্রায় তিনটার সময় মিঃ কেম্প ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সনের পরোয়ানা লইয়া বহু অস্ত্রধারী পুলিস সহ মণ্ডপের দ্বারদেশে উপনীত লইলেন। ভলান্টিয়ারদিগের দলপতি তাঁহাকে বলিলেন, সভাপভির অনুমতি ব্যতীত তিনি মণ্ডপে ঢুকিতে পারিবেন না। কেম্প অনুমতি পাইবার পরে মণ্ডপে আসিয়া সভাপতির পার্শ্বে দাড়াইয়া সভাস্থ জনগণকে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম জানাইলেন—এক্ষণই কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন বন্ধ করিয়া মণ্ডপ ছাড়িয়া সকলকে চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা বলপ্রয়োগ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। অদ্য বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা সহকারে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল; প্রায় পাঁচ শত নারী মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তৎপরে বিচার চলিল; কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করা হইবে কি না। নেতৃস্থানীয় অনেকেই রক্তপাতের আশঙ্কায় সভাগৃহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন; একা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কিছুতেই আমাদের সভা ভঙ্গ করা কিম্বা পুলিস গুলি চালাইলেও কাহারও এস্থান ত্যাগ করা

উচিত নয়।" (আঃ চ, ২৭৭ পৃঃ) ইহাতে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। মণ্ডপ অচিরেই শূন্য হইল ; "এ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, ইহা মনে করিয়া" কৃষ্ণবাবু বসিয়া রহিলেন। পরিশেষে কেন তিনি শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহের অনুরোধে মণ্ডপের বাহিরে চলিয়া গেলেন, তাহা আত্মচরিতে বর্ণিত আছে (২৭৮ পৃঃ)। আমি তাঁহার পশ্চাতে একটু দূরে বসিয়াছিলাম ; যখন দেখিলাম মণ্ডপে আর কেহই নাই, তখন আমিও গৃহে ফিরিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তার তারিণীবাবু আসিলেন ; তাঁহাকে বাম হাত দেখাইয়া তাহাতে জলপটি বাঁধিয়া সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিলাম।

এই দিন কি পরদিন গভীর নিশীথে দুই বন্ধু আসিয়া আমাকে জাগাইলেন, এবং বলিলেন, তাঁহারা গোপনে সংবাদ পাইয়াছেন, পুলিস কৃষ্ণবাবুকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহাদিগের অনুরোধে আমি পাশের কক্ষে যাইয়া মিত্র মহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম। তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং বন্ধুদুটীর কথা জানিয়াই বলিলেন, "নাঃ, পলাইয়া যাইব ? আমি যাইব না।" তাঁহারা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন ; উত্তরে ঐ এক কথা বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন, "আমরা অনর্থক জাগিয়া আছি কেন ? এখন ঘুমাই।" বন্ধুরা চলিয়া গেলেন, তিনিও নিদ্রামগ্ন হইলেন।

১৭ই মঙ্গলবার প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণবাবু প্রভৃতি বহু প্রতিনিধি কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ষ্টীমারে মিত্র মহাশয়

আমাকে সুরেন্দ্রবাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন ; আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পরে প্রায় কুড়ি বৎসর তাঁহার সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে, প্রত্যেক বারেই নিজের নাম বলিতে হইয়াছে।

বাঁকিপুর

গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইলে ৮ই মে মঙ্গলবার সন্তানদিগকে লইয়া বাঁকিপুর পঁহুছিলাম। ১৭ই বৃহস্পতিবার এঙ্গ্‌লো-সংস্কৃত স্কুলে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির প্রতিনিধিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এক সভা আহূত হইল ; একটী বিহারী উকীল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। আমি দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম উহার বিষয় ছিল স্বদেশী ব্রত গ্রহণ ; এই উপলক্ষে বরিশালের কন্‌ফারেন্স ভঙ্গের একটী বিবরণ দিলাম। ১৯এ শনিবার ঐ স্থানেই আর একটী সভাতে "আমাদের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা" (Our Aims and Aspirations) বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। ডাক্তার রামকালী গুপ্ত সভাপতি ছিলেন।

বীণার নামকরণ

৪ঠা জুন সোমবার, পঞ্চম বার্ষিক জন্মদিনে বীণার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। প্রাতঃকালে গুরুদাসবাবু উপাসনা করিলেন, আমি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিলাম ও প্রার্থনা করিলাম। সায়ংকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। কন্যার নাম স্বর্ণকুমারী ও বীণাপাণি রাখা হইল। আমি প্রার্থনা করিয়া, কন্যাকে মাতার নাম কেন দিলাম, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। তৎপরে সকলে আহার করিলেন। বড়

দিদির (গুরুদাসবাবুর স্ত্রীর) যত্ন ও পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন হইল।

১৮ই জুন বৃহস্পতিবার বরিশালে রওনা হইবার সময়ে আমার জ্বর হইল। রবিবার ভাত খাইলাম। ২৬এ রবিবার মান্তুর সহিত বাঁকিপুর ছাড়িয়া পরদিন রাত্রিতে বরিশালে উপনীত হইলাম। গৃহে ভৃত্য ছিল না; মনোমোহনবাবুকে তার করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই শূন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু মুস্কিলেই পড়িয়াছিলাম। একটী লোকের দ্বারা শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের বাড়ীতে আমাদের আগমন সংবাদ পাঠাইলাম; সেখান হইতে প্রচুর ভাত তরকারী আসিল, পরদিন মধ্যাহ্নেও সেইখানেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলাম। সায়ংকালে হরকিশোরবাবুর বাড়ীতে আহার করিলাম। পরদিন হইতে নিজেদের সংসার সুরু হইল।

শ্রাযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বার বরিশালে আগমন

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সন সুরেন্দ্রবাবুকে গ্রেফতার করিয়া নিজের কুঠীতে লইয়া গিয়া আদালত অবমাননার জন্য তাঁহার দুই শত টাকা এবং বে-আইনী মিছিল বাহির এবং 'বন্দে মাতরম্' করিবার অপরাধে দুই শত টাকা জরিমানা করেন। হাইকোর্টে উভয় দণ্ডই রহিত হয়। অতঃপর স্বদেশবান্ধব সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১১ই আগষ্ট শনিবার রাত্রিতে বরিশালে আগমন করেন। ব্রজমোহন কলেজের হলে ১৩ই যে সভা আহূত হয়, তাহাতে তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গলায় বক্তৃতা করেন। পরদিন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ লাঠিখেলা, তরবারী ও ছোরা

সঞ্চালনের কৌশল ইত্যাদি প্রদর্শন করেন। সুরেন্দ্রবাবুর এবারকার আগমন যেন লাঞ্ছিত বীরের রণক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের মত হইয়াছিল।

বাঁকিপুর

শারদীয় অবকাশ বাঁকিপুরে যাপন করিলাম। অক্টোবর মাসে প্রবাসীর জন্য একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলাম। উহা অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তুই ভাগে প্রকাশিত হইল। সম্পাদক মহাশয় প্রথমটীর নাম দিলেন, "ইংরেজ শাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ"; দ্বিতীয়টীর, "স্বদেশী আন্দোলন—উহার ত্রিবিধ কার্য্য।"

ইহার ফল পরে উল্লিখিত হইবে।

স্বদেশী সভা

১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার, বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রথম সাংবাৎসরিক দিনে, সায়ংকালে এঙ্গ্লো-সংস্কৃত স্কুলে বাঁকিপুর ও পাটনার অধিবাসী-দিগের এক সভা আহূত হইল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না; সভার উদ্দেশ্য ছিল, "to advocate the promotion and consumption of country-made goods,"—স্বদেশোৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের বিস্তার ও ব্যবহার। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে বাঙ্গালীরা অনেকেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ স্বরূপ সভা করিবার পক্ষে ছিলেন; বিহারী ভদ্রলোকেরা তাহার বিরোধী হইলেন। অনেক কষ্টে তুই প্রতিদ্বন্দ্বী সভার বিপত্তি হইতে সভার আহ্বানকারীরা বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। সভায় প্রায় ত্রিশটী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নবাব সরফরাজ হুসেন সভাপতিরূপে একটী অভিভাষণ পাঠ করিলেন; উহা বেশ হইয়াছিল, তবে তাহাতে

গবর্ণমেণ্টের স্তুতি স্থান না পাইলেও কোন হানি হইত না। আমি প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিলাম। দাঁড়াইতেই বিপুল করতালি ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হইলাম; কিন্তু সভার কর্ত্তারা এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে, দশ বার মিনিটের মধ্যে আমার হাতে চারিবার কাগজে লিখিয়া দেওয়া হইল, 'cut short'—'সংক্ষেপ করুন'। আরও কেহ কেহ বক্তৃতা করিলেন। সভা ভঙ্গ হইলেই তুই দলে ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল—অনেকে তখনই আর একটী সভা করিতে চাহিলেন। পরিশেষে সুবুদ্ধির জয় হইল—"যার শেষ ভাল, তার সব ভাল", এই বাক্য স্মরণ করিতে করিতে আমরা গৃহে ফিরিলাম।

পর দিন, ১৭ই, ঐ স্থানেই আমি বক্তৃতা করিলাম, বিষয় "Some Plain Facts." স্কুল কলেজের শারদীয় অবকাশ ছিল, তথাপি উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত, তন্মধ্যে প্রায় ১৪টী মহিলা। ডাক্তার রামকালী গুপ্ত সভাপতির কার্য্য করিলেন। দেড় ঘণ্টার বক্তৃতাটি যে শ্রোতৃবর্গকে সন্তোষ দান করিয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেল। পূজনীয় গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন, "ইনি, আজ আমাকে তাঁহার রাষ্ট্র-নৈতিক আদর্শে দীক্ষিত করিয়াছেন।" একটী বাঙ্গালী, একটী মারাঠী, এবং একটী বিহারী ছাত্র, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুদাসবাবু সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

স্বামী অভেদানন্দের সহিত আলাপ

৭ই অক্টোবর রবিবার ওরিএণ্টাল খোদাবক্স লাইব্রেরীতে স্বামী অভেদানন্দর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সায়ংকালে মোরাদপুরের এক

বাড়ীতে একটী আলাপসভা হইল, স্বামীজী তাহার সভাপতিরূপে নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বেদান্তধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা দিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার বিশেষ প্রভেদ দেখিলাম না। তাঁহার উদার মত ও গভীর স্বদেশী ভাবের পরিচয় পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে তাঁহার একটী উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

খুলনায় সাক্ষ্যদান

২০এ অক্টোবর বরিশালে ফিরিয়া গেলাম, ২৩এ মঙ্গলবার সাক্ষীর সমন পাইয়া খুলনায় যাইতে হইল। ফণি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী মারপিটের জন্য কেম্প, তাঁহার সহকারী (বোধ হয় হেন্‌স) ও বাবুরাম সিংহের নামে ফৌজদারী আদালতে অভি-যোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। খুলনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কর তাহার বিচারের ভার প্রাপ্ত হন। বরিশাল হইতে সুপরিচিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও আমি এক সঙ্গে খুলনায় গেলাম, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ফরিয়াদী, সাক্ষী প্রভৃতি আসিলেন। আমি উকীল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যপূর্ণ আতিথ্য লাভ করিয়াছিলাম। ২৪এ আমার মূল সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, ২৬এ আসামীদিগের কৌঁসুলী আমাকে জেরা করিলেন—তাহাতে সম্যক সহিষ্ণুতা রক্ষণ করিতে পারি নাই। সাক্ষীর সমন আমার অনুপস্থিতকালে বাড়ীর বেড়ায় লাগাইয়া রাখা হইয়াছিল, আমার হাতে দেওয়া হয় নাই (was not served on my person), তবু আমি সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি, হাকিম এজন্য একটু কটূ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আসামীর কৌঁসুলী আমাকে প্রশ্ন

করিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, পুলিস আপনাকে প্রহার করিয়াছিল। আপনি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই কেন ?" আমি বলিলাম, "Because I had no hope of getting justice done" (যেহেতু আমার ন্যায্য বিচার পাইবার আশা ছিল না।)

সাক্ষ্যদানের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট আমার উপরে খুব চটিয়া গিয়াছিলেন।

শনিবার উন্মুক্ত আকাশতলে একটী সভা হইল; তাহাতে কৃষ্ণবাবু, মিঃ চৌধুরী, ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু বক্তৃতা করিলেন, আমিও কিঞ্চিৎ বলিলাম। পরদিন (২৫এ) বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম!

বিচারে আসামীরা বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে বাবুরাম সিং রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে এক সভায় আমাকে বলিয়াছিল, "বাবু, আমার বেতন বাড়িয়াছে।" তারপর এই ব্যক্তি 'রায়সাহেব' উপাধি পাইয়াছিল, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্‌সি. উপাধিপ্রাপ্ত এক স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের সহিত সরকারী গেজেটে এই দুই জন এবং এক পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের নাম—মোট তিনটী নাম 'রায় সাহেব'দিগের তালিকায় একত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।

১০ই নবেম্বর ঐ স্থানে 'স্বদেশী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলাম; পরে আরও একটী করিয়াছিলাম। প্রবাসীর প্রবন্ধটী ওগুলির অবলম্বন ছিল। বক্তৃতা দুটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার পরিচয়ের কারণ হইয়াছিল—সে কথা পরে বলিতেছি।

জাতীয় মহাসমিতি ও একেশ্বরবাদী সমিতি কলিকাতা

ডিসেম্বর, ১৯০৬

পূজার ছুটীর পরেই গুরুদাসবাবুরাও বাঁকিপুর ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন, খোকা ও বীণা তাঁহাদিগের সঙ্গেই রহিল। আমি কংগ্রেস ও থিঈষ্টিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবার মানসে ঢাকা হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। ২২এ ডিসেম্বর শনিবার, প্রাতঃকালে বরিশাল ছাড়িয়া রাত্রি একটার সময় ঢাকায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বাটীতে উপনীত হইলাম। সোমবার কলিকাতার পথে ষ্টীমারে বিশেষতঃ গোয়ালন্দের গাড়ীতে অত্যধিক ভিড় ছিল। ষ্টেশনে প্রায় চারি শত যাত্রী পড়িয়া রহিল। একটী প্রথম শ্রেণীর কামরা ট্রেনে সংযোজিত হইয়াছিল; আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট লইয়া পাঁচ ছয় জন তাহাতে স্থান পাইলাম, ফলতঃ রাত্রিটা বেশ আরামেই কাটিল।

২৬এ ডিসেম্বর বুধবার প্রাতঃকালে সিটি কলেজে একেশ্বরবাদী সম্মিলনে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইংরেজীতে উপাসনা করিলেন; খুব সুন্দর হইল।

মধ্যাহ্নে ভবানীপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলাম। বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ অভিভাষণ পাঠ করিলেন; তৎপরে মহাসমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী স্বীয় অভিভাষণের কিয়দংশ পড়িলেন; অবশিষ্ট ভাগ শ্রীযুক্ত গোখ্‌লের দ্বারা পঠিত হইল। অভিভাষণটী আমার বেশ লাগিল। মধ্যপ্রদেশের শ্রীযুক্ত

খাপার্দ্দের মত জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, উহা worthless হইয়াছে, অর্থাৎ কাজের হয় নাই।

সায়ংকালে সিটি কলেজে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ময়ূরভঞ্জের মহারাজা ও কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরত্নম নাইডুর বক্তৃতা হইল। শেষোক্ত বক্তৃতাটী উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, যদিচ উহা লিখিত ছিল না। ২০এ প্রাতঃকালে ঐ স্থানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

মধ্যাহ্নে কংগ্রেস; অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইল, সমস্ত প্রতিনিধি উহার সভ্য ছিলেন। স্যার ফেরোজসা মেটা বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিষয়ে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; অন্যান্যের মধ্যে আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি আমার আপত্তির উত্তর দিলেন। পরে শুনিলাম, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্যর ফেরোজসা যে এই একটী লোকের কথার উত্তর দিলেন, ইনি কে?" আজ কমিটীর অধিবেশন কলহে পর্য্যবসিত হইল। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে বিরক্ত হইয়া সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একেশ্বরবাদী সমিতিতে যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল; দুই একটী বক্তৃতা শুনিলাম।

২৮এ, শুক্রবার প্রাতঃকালে বন্ধু যোগানন্দ দাসের গৃহে তাঁহার পিতা সর্ব্বানন্দ বাবুর বার্ষিক শ্রাদ্ধে যোগ দিলাম, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। একেশ্বরবাদীদিগের সভায় মোটে আধ ঘণ্টা থাকা হইল।

মধ্যাহ্নে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া সাড়ে পাঁচটায় শেষ হইল।

সায়ংকালে সিটি কলেজে প্রকাশ্য বক্তৃতা হইল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রবার্কার, অধ্যাপক ভাস্বানী, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও অপর কেহ কেহ বক্তৃতা করিলেন; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমিও কিছু বলিলাম। অনুকূল সমালোচনাই শুনিলাম।

শনিবার, ২৯এ প্রাতঃকালে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল, তাহাতে যাই নাই।

অপরাহ্নে সিটি কলেজে বিবিধ বিষয়ের আলোচনাতে উপস্থিত ছিলাম, তাহাতে দুই একটী কথা বলিলাম।

বীণা গুরুদাসবাবুদিগের সহিত আসিয়াছিল, সে আমার সঙ্গে ছিল। সন্ধ্যার পরে প্রীতিভোজনে যোগ দিয়া সাধনাশ্রমে রাত্রি যাপন করিলাম।

৩০এ ডিসেম্বর রবিবার, মধ্যাহ্নে সামাজিক সম্মিলনে (social conference) যোগ দিলাম। ইহাতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রকাশদেব ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রচারক পদে বৃত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

পরদিন, ৩১এ ভাই প্রকাশদেব, গুরুদাসবাবু স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ, আমি এবং আরও কেহ কেহ ভবানীপুর পদ্মপুকুরের যে বাড়ীতে ১৮৯৪ সনে আমরা কয়েকমাস বাস করিয়াছিলাম, সেই বাড়ীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে গমন করিলাম। পুর্ব্বাহ্নে তিনি সকলকে লইয়া উপাসনা করিলেন। একটার সময় প্রীতিভোজন হইল।

তারপরেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিতর বাড়ীর পুকুর ঘাটে গেল, সেখানে বীণা জলে পড়িল। শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকারের একটী বালক পুত্র তাহাকে টানিয়া তুলিল, তাই বেচারী রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় আমার মনটা এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, ইচ্ছা হইল, তাহাকে বরিশালে লইয়া যাইব। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হইলাম।

রাত্রিতে বরিশাল যাত্রা করিলাম। বীণাকে ছাড়িয়া যাইতে বড়ই কষ্ট হইল।

২০এ ফেব্রুয়ারী (১৯০৭) গুরুদাসবাবু খোকাকে লইয়া আসিলেন। সে তদবধি আমার নিকটেই রহিল। আমার তৃতীয় ভাগিনেয় যতীন্দ্রকে তাহার বড় দাদা পূর্ব্বের পূজার ছুটীতে চাকরের কাছে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেও আমার গৃহে ছিল।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ১৯০৬ সনে গ্রীষ্মের ছুটীর সঙ্গে সঙ্গেই কোনও কারণে ব্রজমোহন কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি এখন দুই পুত্র ও এক ভাগিনেয়কে লইয়া একটী ভৃত্যের সাহায্যে সংসার চালাইতে লাগিলাম।

৯

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয়

১৯০৪ সনে বড়লাট লর্ড কার্জনের প্রেরণায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিধি (The Indian Universities Act) প্রণীত হইল। তদনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নূতন নিয়মাবলী (The New Regulations) গৃহীত হইলে উহাকে নবাকারে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সনের ৩১এ মার্চ্চ

ভাইস্-চ্যান্সেলার (Vice-Chancellor) নিযুক্ত হইলেন। ইতোমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্রজমোহন কলেজের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে অভিযোগ যাইতে সুরু হইয়াছে। ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার (১৯০৭) প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে পরীক্ষকরূপে আমার কলিকাতায় যাওয়া প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার আমাকে লিখিলেন, আমি কলিকাতায় যাইয়া যেন ভাইস্-চ্যান্সেলার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি।

আমি ২৮এ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পথে কলিকাতায় রওনা হইলাম। ২রা মার্চ্চ শনিবার সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে "The Convergence of Science and Inspiration" নামে এক বক্তৃতা করিলাম। এটী বরিশালে মাঘোৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার নামান্তর। বেশ লোক হইয়াছিল, প্রশংসাও শুনা গেল। পর দিন কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। ৪ঠা সোমবার ১০টার সময় সিনেট হাউসে উপস্থিত হইলে সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "স্যর আশুতোষ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে হাইকোর্ট হইতে ছুটী লইয়াছেন; আপনি দুপ্রহরে তাঁহার গৃহে যাইয়া দেখা করুন।" তিনি যাইবার পথও বলিয়া দিলেন। আমি তদনুসারে মধ্যাহ্নকালে তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া শুনিলাম স্যর আশুতোষ ঘুমাইতেছেন। আমি একতলার বৈঠকখানা ঘরে বসিলাম; তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৬।৭ বৎসরের বালক শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া রাক্ষসখোক্ষসের গল্প বলিয়া এবং নানা প্রকার আলাপ করিয়া অবসর সময়টা বেশ আমোদে কাটাইয়া দিল। ঘণ্টা দুই পরে দোতলার একটী ঘরে কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম, এবং ঘরে ঢুকিয়া স্যর আশুতোষ আমার দিকে

চাহিতেই নিজের নাম বলিলাম, আর কিছু বলিতে হইল না উপবেশন করিলেই তিনি আমাকে বলিলেন, "খুব বক্তৃতা ক'চ্ছেন বুঝি ?"

আমি—"আমি যে বক্তৃতা করিয়াছি, তাহা তো 'প্রবাসী'তে ছাপা হইয়াছে।

স্যর আশুতোষ—"আমার তা' দেখা নাই এখন বক্তৃতা একটু বন্ধ রাখুন।

কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "আপনি Vice-Chancellor আছেন বলিয়া আমরাও (গবর্ণমেণ্টের হুকুম) একটু কম গ্রাহ্য করি।" তিনি বলিলেন, "না, তা' করবেন না।" (তারপর, মুষ্টিবদ্ধ বাহু নাড়িয়া), "আমি না থাকিলে আপনাদিগকে মারিয়া কাটিয়া পুঁতিয়া ছাড়িত।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, "আমরাও হাইকোর্টে মারামারি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম। উহাতে কিছু হয় না।" অনেকক্ষণ আমার সহিত কথা হইল। ঘরে আরও অগন্তুক ছিলেন, তাহারা নীরবে শুনিলেন।

স্যর আশুতোষের অসাধারণ বাক্‌পটুতা লক্ষ্য করিলাম ; তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইলাম , এবং আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তির পরিচয় পাইলাম। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—এই যে একবার তাঁহাকে আমার নাম বলিলাম, তাহা আর কখনও বলিতে হয় নাই। আমাদের দেশের বড় লোকদিগের মধ্যে তাঁহার এই একটা বিশেষত্ব ছিল, যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে নাম লিখিয়া বা বলিয়া পাঠাইতে হইত না। দেখা করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে, প্রাতঃকালে অথবা সায়ংকালে, অধিকন্তু ছুটীর দিন বৈকালে, সোজা, তাঁহার দোতলার ঘরে গেলেই হইল।

অন্যান্য কথা

এবার আমাদের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose)। ইঁহার ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও মনোরম ছিল।

৮ই মার্চ্চ শুক্রবার তত্ত্ববিদ্যাসভার অধিবেশনে উপস্থিতমত সভাপতির কার্য্য করিতে হইল। পরদিন মধ্যাহ্নে দাদার সহিত অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত দেখা করিতে গেলাম। দাদা চলিয়া আসিলে, আমার সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাতে একাধারে অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিনয়ের সমাবেশ দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। তাঁহাতে যে গভীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাইলাম, তাহা সচরাচর প্রকাশ পাইত না।

ফিরিবার পথে, সঙ্গীতসমাজের সম্মুখে আমাকে দেখিয়াই শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ও সুধীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিরূপে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিলেন। আমিও কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অস্বীকৃত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম। পরিশেষে লাঠিখেলা ও বিবিধ ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শিত হইল—অতি চমৎকার লাগিল।

১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বরিশালে ফিরিলাম।

৪ঠা মে কলেজ হইয়া গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল। ১১ই মে সন্তানদিগকে লইয়া ঢাকায় গেলাম, এবং ছুটীটা সেখানেই কাটাইলাম।

নূতন অভিজ্ঞতা

১৭ই অক্টোবর (১৯০৭) তারিখের

রোচনামচা হইতে উদ্ধৃত

"৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে খোকার, ৫ই মান্তর ও ৬ই টগার জ্বর হয়। একেবারে তিনটীর জ্বর হওয়াতে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করি। (সহায় একটী উড়ে চাকর, এমন বুদ্ধিমান, যে একদিন দেখিলাম, পটল ভাজিয়া মাটির মেঝের উপরে রাখিতেছে।) ৬ই রাত্রিতে খোকা ও মান্তুকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। দুইজনেরই জ্বর ১০৫° ডিগ্রীর উপর ; মাথার যন্ত্রণা খুব বেশী। এরূপ বিপদে যেমন বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক, আমার মধ্যে তাহার একান্তই অভাব। ৮ই মান্তুর জ্বর ১০৫° এর উপরে হওয়াতে ও মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশী থাকাতে আমি ব্যস্ত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় তারিণীবাবুর জন্য লোক যায়। বন্ধুরা কেহ কেহ থাকিয়া foot-bath ইত্যাদি দেন। Little Brothers of the Poor এর ছেলেরা রাত্রি জাগিবার ভার লয়। দিনের বেলাও তাহাদের কেহ কেহ সাহায্য করিবার জন্য আইসে। আমি সমস্ত সেপ্টেম্বর মাস দিন এক ঘণ্টার বেশী কলেজে পড়াইতে পারি নাই। দুই দিন তাহাও হয় নাই। ৭ দিনে খোকার ও ৫ দিনে টগার জ্বর ত্যাগ হয়। তাহারা ভাত খাইলে আমি অনেকটা বিশ্রাম পাই। ১৫।১৬ দিন ভাত খাইয়া খোকার প্রথমে পেটের অসুখ, পরে জ্বর ও আমাশয় হইল। এখনও তাহার পেট ঠিক হয় নাই। টগার দ্বারা প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

"মান্তুর জ্বর আজ ৪৩ দিন; একেবারে ত্যাগ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। এক এক সময় মন খারাপ হইয়া যায়। তারিণীবাবু একদিন বলিয়া গেলেন, "chronic remittent fever বলিয়া বোধ হইতেছে। ঢাকায় লইয়া যান।" গুরুদাসবাবুকে লিখিয়াছি। বেচারী এতদিন ধরিয়া ভুগিতেছে —ভাবিলেও কষ্ট হয়। কত দিনে ভাত পাইবে, কে জানে? খুব বিশ্বাস ও নির্ভরের প্রয়োজন।

এই বিপদের মধ্যে বিধাতার অপার কৃপার পরিচয় পাইতেছি। তাঁহার দয়াতে সমস্ত অভাব পূর্ণ হয়। তিনি কোথা হইতে সব জুটাইয়া দেন। কৈ, এমন দীর্ঘকালব্যাপী রোগের মধ্যেও তো আমার তেমন বেশী ক্লেশ পাইতে হইল না। রাত্রি জাগরণ, শুশ্রূষা, পথ্য—প্রায় সমস্ত বিষয়েই কত সাহায্য পাইলাম। ছেলেরা রাত্রি জাগিল, যত দিন প্রয়োজন ছিল, আমাকে কিছুই করিতে হয় নাই। স্যুপের প্রয়োজন বাবু শ্রীশচন্দ্র দাসকে বলিবা মাত্র বামনবাবুর বাড়ীতে বন্দোবস্ত হইল। এক সপ্তাহ সেখানে হইল। তারপর হইতে মন্মথবাবুর ঘরে হইতেছে। পালোর রুটীও তাঁহার ভগিনী করিয়া দিতেছেন। এই দুইটী আমার গৃহে হওয়া দূরূহ ছিল। একটা আশ্চর্য্য এই—যেখানে সাহায্য পাইবার আশা করা যাইত, সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না; যেখানে কিছুই আশা করা যায় নাই, সেখানে প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। এজন্য এক এক সময়ে সংকল্প হয় কিছুই করিব না—একেবারে ষোল আনা তাঁহার চরণে নির্ভর করিব।

২১এ অক্টোবর মান্তু খোকা ও টগাকে লইয়া ঢাকায় গেলাম। কয়েক দিন মান্তু ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় ও নেপালচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীন থাকিল। জ্বর আবার ধীরে ধীরে বাড়িয়া ১০৩° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিল। ৮ই নবেম্বর তাহাকে সদর ঘাটে একখানি গ্রীন

বোটে রাখিলাম। ৯ই হইতে কবিরাজ রামচন্দ্র দাস চিকিৎসার ভার লইলেন। ১৬ই রাত্রি ৯॥ টার সময় আমি মান্তু, খোকা ও টগাকে গুরুদাসবাবুর তত্ত্বাবধানে নৌকায় রাখিয়া বরিশাল যাত্রা করিলাম।

ঢাকা ছাড়িবার দিন সায়ংকালে ছাত্রসমাজে "ব্যঞ্জনসন্ধি" নামক একটী বক্তৃতা করিলাম। খুব লোক হইয়াছিল।

ঢাকায় এবং বরিশালে ফিরিবার পরেও আমার শরীর প্রায়শঃ অসুস্থ হইয়া পড়িত। কবিরাজ মতিলাল দাসের তৈল, ঘি ও বড়ী ব্যবহার করিয়া ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য লাভ করিলাম।

বড় দিনের ছুটী উপলক্ষে আবার ঢাকায় গেলাম; মান্তু ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ১লা জানুয়ারী অপরাহ্নে বরিশালে ফিরিয়া আসিলাম।

মান্তু ও খোকা ফেব্রুয়ারী (১৯০৮) মাসে ঢাকা হইতে আসিল। মান্তু আসিয়াই আবার জ্বরে আক্রান্ত হইল। ওদিকে পরীক্ষকরূপে আমার কলিকাতায় না গেলেই নয়। তারিণীবাবুর উপরে চিকিৎসার ভার দিয়া এবং ছেলেদিগকে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র হালদারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ২৯ এ তারিখ আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। তারিণীবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি মান্তুকে প্রত্যহ একবার দেখিয়া যাইবেন।

২রা মার্চ্চ প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এবারও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। পর বৎসর মিঃ ঘোষ প্রধান পরীক্ষকের কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। অধ্যাপক জে. এন্. দাসগুপ্ত পুনরায় প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

৫ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে বৌবাজারে বেঙ্গল ন্যাশনাল

কলেজে যাই। অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমস্ত দেখাইলেন। এইখানে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের সহিত আলাপ হয়; আলোচনার বিষয় ছিল, বাখরগঞ্জে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। সেখান হইতে মেছুয়া বাজারে শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করি। তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে আপার সার্কুলার রোডে ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর গৃহে যাই। শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ব্বেই আমার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; আমি যাইতেই প্রথমে আহার করিতে দিলেন, পরে কথাবার্ত্তা হইল।

৬ই তারিখ সায়ংকালে সিটী কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সভা হইল; তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের অনুরোধে ইংরেজীতে একটু নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম।

পরদিন শনিবার সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরে ছাত্র-সমাজের আহ্বানে "স্বরসন্ধি" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া রাত্রির গাড়ীতে বরিশাল যাত্রা করিলাম।

৮ই রবিবার ষ্টীমারে দেখিলাম শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী এক বিবাহ উপলক্ষে বরিশালে যাইতেছেন। মধ্যাহ্নে দুইজনের একত্র উপাসনা হইল; তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না, অগত্যা আমিই আচার্য্যের কার্য্য করিলাম। তিনি নিমন্ত্রণ কর্ত্তার অতিথি না হইয়া আমার গৃহেই কয়েক দিন যাপন করিলেন।

১৬ই এপ্রিল গুরুদাসবাবু বীণাকে লইয়া বরিশালে আসিলেন। ১৮ই শনিবার পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তাঁহার সপ্তাহকাল অবস্থানে যথেষ্ট উপকৃত হইলাম।

৭ই মে কলেজ বন্ধ হইল। ১২ই সন্তানদিগকে লইয়া ঢাকায়

গেলাম। সেখানে দুইদিন থাকিয়া তাঁহারা সকলে ও আমরা কুমিল্লায় অবসরকাল যাপনের জন্য গমন করিলাম।

কুমিল্লায় অবস্থান

১৫ই মে শুক্রবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমরা কুমিল্লায় পঁহুছিলাম। ত্রিপুরারাজের চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর দেওয়ান, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস গুরুদাসবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার ও ভাগিনেয় জ্ঞানরঞ্জন ষ্টেসনে আসিয়া আমাদিগকে দাস মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে সমাদরের সহিত আহার করিয়া আমাদের বাসভবনে গমন করিলাম। বাড়ীটী প্রসন্নবাবু আমাদের জন্য ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন; উত্তম খড়ের বাড়ী, খুঁটির দুই পাশেই দরমার বেড়া—আর কোথাও এই প্রকার দেখি নাই; আমাদের স্বচ্ছন্দ সমাবেশ হইল। আমাদের বিছানা আসিয়া না পঁহুছিলেও সকলের জন্য বিছানা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল; আমরা যাইয়াই শুইয়া পড়িলাম।

বাড়ীর উঠানের কোণে একটা খুব বড় আম গাছ ছিল; আমি রোজ ভোরে তাহার তলায় আম কুড়াইতাম; বড়ই আমোদ বোধ হইত।

১৫ই মে হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত আমরা কুমিল্লায় ছিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথারীতি আশ্রমের উপাসনায় যোগদান, পরিচিত ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং নিজের পাঠ —এইভাবে দিন কাটিত। একদিন সায়ংকালে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং এক রবিবার রাত্রিতে সমাজে উপাসনা করিলাম। কয়েক বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা গেল।

৪ঠা জুন বীণার সপ্তমবর্ষ পূর্ণ হইল; বৈকালে প্রায় ৫০ জন পুরুষ, রমণী ও বালকবালিকা সমবেত হইলেন; গুরুদাসবাবু উপাসনা করিলেন। মিষ্ট জলযোগ সহকারে অনুষ্ঠান শেষ হইল।

স্থানীয় টাউনহলে আমি একটা বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইলাম। বিষয়ের নাম দিলাম, "মানবজীবনে স্বরসন্ধি।" হলের জন্য অনুমতি চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, যদি বাবু প্রসন্নকুমার দাস প্রতিভূ (guarantee) থাকেন, তবে অনুমতি দিতে পারি। প্রসন্নবাবু প্রতিভূ হইতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন অজানিত ফ্যাসাদে পড়িবেন, এই আশঙ্কাতে আমি বক্তৃতা করিতে অস্বীকৃত হইলাম।

১০ই জুন সকলে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেখানে একটু জ্বরে ভুগিলাম। একদিন এক পরিবারে প্রাতঃকালে একটী শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে, এবং এক রবিবার সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা করিলাম। ২৬এ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় মন্দিরে "জীবনের সমাসচতুষ্টয়" বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম, এবং ভোর ৩টার সময় ঢাকা ছাড়িয়া শনিবার মধ্যাহ্নে দুই পুত্র লইয়া বরিশালে উপনীত হইলাম।

অতিথিসৎকার

সেই যে বরিশাল কন্‌ফারেন্সের সময়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, সদলবলে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তারপর হইতে বাড়ীখানি এক প্রকার অতিথিশালা হইয়াই উঠিল। ১৯০৬ সনের বর্ষাকালে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ব্রজমোহন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক হইয়া আসিলেন। তিনি পূজার ছুটী পর্য্যন্ত আমার সহিত

থাকিলেন ;।পরে পরিবারসহ স্বতন্ত্র বাসা করিলেন। ১৯০৮ সনে ঢাকার সুপরিচিতি ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বরিশালে বদলি হইয়া দুই এক মাস আমার গৃহে থাকিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া আসিলেন। তারপর, একদিন সন্ধ্যার পরে বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, দুইটী অপরিচিত ভদ্রলোক শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া আমার শূন্য ঘরে বসিয়া আছেন, চাকর লণ্ঠন জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহারা একটা স্কুলের জন্য টাকা তুলিতে ঝালকাঠী যাইবেন ; কিরূপে আমার সন্ধান পাইয়া আতিথ্যকামনায় উপস্থিত হইয়াছেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন—তরুণ যুবক ; ইনি কয়েক বৎসর পরে অরুণাচল আশ্রমে পুলিসের সহিত সংঘর্ষে বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। আর একদিন একটী বালক—বয়স ১৪।১৫ হইবে—বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীর সহিত একটা স্বদেশী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য কৃষ্ণবাবুর পত্র লইয়া উপস্থিত। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, গুপ্তচর নাকি। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে মৌলভী লিয়াকত হোসেনও বরিশালে আসিয়া অশ্বিনীবাবুর অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে সংবাদ লইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম।

১৯০৮ সনে গ্রীষ্মের ছুটীর পরে শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ দর্শনের অধ্যাপক হইয়া আসিলেন। ইঁহার বাড়ী টাঙ্গাইল, আমাদের সহিত দূর সম্পর্কও আছে। ইঁহাকে ইচ্ছা করিয়াই কলেজের হোষ্টেলে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। অল্পকাল পরেই পিতৃবিয়োগ হইলে ইনি প্রায় এক মাস আমার সঙ্গে বাস করেন। খড়্গসিংহের সহিত আমার সবিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। আমরা প্রায় প্রতিদিন কলেজের কার্য্য শেষ হইলে একত্র বাড়ী আসিয়া জলযোগ করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইতাম। ইনি দুই বৎসর

বরিশালে ছিলেন। মাঝে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্র জেলা স্কুলে বদলী হইয়া আমার সঙ্গে এক মাস থাকিয়া বরিশাল হইতে চলিয়া গেলেন। আমার বরিশালবাসের শেষ বৎসর জেলা স্কুলের আর একটী শিক্ষক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস বরিশালে আসিয়া কয়েক মাস আমার সঙ্গে ছিলেন; পরে, পরিবার আনয়ন করিয়া অন্য বাড়ীতে গমন করেন। ধীরেন্দ্রবাবু, সতীশবাবু ও জানকীবাবু, তিন জনেই আমাদের প্রথম বৎসরের বাসবাটী ভাড়া করিয়াছিলেন।

নূতন সম্বন্ধ

আতিথেয়তার দরুণ একটা নূতন সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল। ১৯০৮ সনের ২৬এ সেপ্টেম্বর পূজার অবকাশ আরম্ভ হইলে কোনও কারণে আমি ছুটীটা বরিশালেই যাপন করিতে মনস্থ করিলাম। ৫ই অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যার পরে অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষের গৃহে কীর্ত্তন, উপাসনা ও পাঠ উপলক্ষে তথায় গমন করিলাম। মনোমোহন বাবু উপাসনা করিলেন; আমি ভাগবত হইতে পাঠ করিলাম। তৎপরে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া বাড়ী আসিয়া দেখি, দুইটী অতিথি উপস্থিত; দুইটীই যুবক, এবং ব্রাহ্ম। একটীর নাম সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অপরটী কৃষ্ণদয়াল রায়। সতীশের পিতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; টাঙ্গাইলে ছাত্রাবস্থায় আমি দুই একবার দাদার প্রয়োজনে ইঁহার নিকটে গিয়াছিলাম। কৃষ্ণদয়ালের নিবাস যমুনার তীরবর্ত্তী পোড়াবাড়ী, আমাদের কলিকাতা যাতায়াতের ষ্টীমার ষ্টেসন; একবার ইঁহাদের বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম। ক্রমশঃ অবগত হইলাম, এই দুই যুবক, এবং আমার মাসতুত ভাই শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ গুহ,

আমার ছাত্র, টাঙ্গাইলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শশিমোহন তরফদার, পরবর্ত্তীকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ও আরও দুই একটীতে মিলিয়া—সতীশ ব্যতীত আর সকলেই টাঙ্গাইল মহকুমার অধিবাসী—এক ঘননিবিষ্ট দলে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই সূত্রে সতীশ ও কৃষ্ণদয়ালের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু ১৯০৩ সনে মাণিকদহবাসী পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের প্রথমা কন্যা বালুকণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার অল্পকাল পরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বগ্রামে লোকান্তর গমন করেন। নিশিবাবু শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন; সৎকারের পরে তিনি পিতৃমাতৃহীন তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যাকে বরিশালে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকটে লইয়া আইসেন। তৃতীয়া কন্যা কৃপাকণা এক্ষণে অক্‌সফোর্ড মিশনের বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্ম করিতেন; বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে। ইঁহার সহিত সতীশের বিবাহের প্রস্তাব উপলক্ষ্য করিয়া দুই বন্ধু বরিশালে আসিয়াছেন।

৬ই মঙ্গলবার বৈকালে বর ও বরের বন্ধুকে লইয়া কন্যাদর্শনের জন্য নিশিবাবুর গৃহে গমন করিলাম। বরকন্যার প্রথম পরিচয়ের পরে কয়েকদিন উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ আলাপাদি চলিল; একাধিকবার তাঁহাদের সহিত আমরাও নিমন্ত্রণে ভোজন করিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। বন্ধুদ্বয় আলোচনা, ব্রাহ্মবন্ধুসভা প্রভৃতিতে যোগ দিয়া ও বক্তৃতা করিয়া সকলকে আনন্দদান করিলেন, পরিশেষে ১১ই অক্টোবর রবিবার বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। ভোর বেলা আমরা তিনজন নিশির বাড়ী যাইয়াই উপাসনার ঘরে বসিলাম। নিশি, বালু, কৃপা ও মাণিকদহের বিনোদলাল সেন উপাসনায় উপস্থিত

ছিলেন ; উপাসনা ও গান আমাকেই করিতে হইল। উপাসনা শেষ হইলে বাসগৃহের বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইলাম ; ক্ষণকাল পরে কৃপা আসিয়া প্রণাম করিল ; আমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপরে কৃপা নিশিকে প্রণাম করিল এবং দুই জনেই কাঁদিল। আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরে উপাসনায় গেলাম। মনোমোহনবাবু আচার্য্য। গান ও উপাসনা বেশ হইল।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় নিশিবাবুর গৃহে বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরী-করণসূচক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল ; মনোমোহনবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন ; উদ্বোধন, আরাধনা, উপদেশ, গান—সমস্তই সুন্দর হইল, আধঘণ্টার মধ্যে। স্থানীয় ব্রাহ্মেরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রিতে আমাকেই মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইল। অদ্যকার দিনটী স্মরণীয় ; এ জন্যও বটে, যে দুই বেলা আচার্য্যের কার্য্য করিলাম, এবং দুই বার উপাসনায় যোগ দিলাম। তা'ছাড়া আজ হইতে একটা নূতন সম্বন্ধের সূচনা হইল।

পরদিন, সোমবার প্রাতঃকালে আমাদের গৃহে উপাসনা হইল। কালীমোহনবাবু, মনোমোহনবাবু, মন্মথবাবু, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং সতীশ, কৃষ্ণদয়াল ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণদয়াল উপাসনা করিলেন—খুব সুন্দর হইল ; আমি প্রার্থনা করিলাম।

আজিকার ডায়েরী হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—"কাল হইতে অনুভব করিতেছি, আচার্য্য হওয়া বড় কঠিন কথা। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াও চিত্তে চাঞ্চল্য আইসে। সহানুভূতির মধ্য দিয়া ক্লেশ উপস্থিত হয়। সাধু রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

মহাত্মাদিগের মায়া থাকে, কিন্তু মমতা থাকে না। ইহা সাধন করা বড় শক্ত।"

পরদিন ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপঃ ঐশ্বরম্॥

আজ নিশিবাবু, বিনোদবাবু ও আমরা সকলে একত্র আহার করিলাম। আহারের সমুদায় ব্যবস্থা মান্তু পরিপাটীরূপে করিয়াছিল।

সতীশ ও কৃষ্ণদয়ালের জীবনকাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। যখন শুনিলাম, মাতৃহীন সতীশ, চন্দ্রনাথের মাতা আমার মাসীমাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন, তখন তিনি হইলেন আমার 'ভাই', আমি হইলাম তাঁহার 'দাদা'। ইঁহাদের সহিত এক এক রাত্রি আলাপে ১টা ১॥টা বাজিয়া যাইত।

১৬ই অক্টোবর শুক্রবার বঙ্গব্যবচ্ছেদের চতুর্থ বার্ষিক দিন। প্রাতঃকালে বন্ধুজন ও অনেক ছাত্র আসিয়া রাখি বন্ধন করিলেন। বৈকালে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে সভা হইল; সঞ্জীবনীর সহযোগী সম্পাদক সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন। আমার রাজনৈতিক বক্তৃতা ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

৩রা কার্ত্তিক ১৯এ অক্টোবর আমার ও মান্তুর জন্মদিন। ভোরে একাকী উপাসনা করিলাম। স্নানান্তে মান্তু, খোকা ও সতীশকে লইয়া মান্তুর জন্য প্রার্থনা করিলাম। কৃষ্ণদয়াল গতকল্য চলিয়া গিয়াছেন। বৈকালে কয়েকটী পরিবারের ছেলেমেয়েরা জলযোগ করিল।

২০এ অক্টোবর সতীশ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

২৪এ পুনরায় মান্তু, খোকা ও টগার এক সঙ্গে জ্বর হইল। তবে এবার দুর্ভোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

বড়দিনের ছুটীতে ৩০এ ডিসেম্বর ঢাকা গেলাম। ২রা জানুয়ারী (১৯০৯) শনিবার সায়ংকালে মন্দিরে এমার্সন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলাম। কলিকাতার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় উহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ৬ই সন্ধ্যার পরে বীণাকে লইয়া বরিশালে ফিরিয়া আসিলাম।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই চারি মাস আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে নিশির বাড়ী যাইতাম। এইখানে প্রথমে আমার ভৃত্যের গুণের কথা বলি। সে ছিল উড়িয়া, নাম মধু, বয়স্ক লোক, আমরা তাহাকে বুড়ো বলিয়া ডাকিতাম। আমি রাত্রি নয়টার সময় ঢুকিয়াই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম "বুড়ো, কি করিতেছ?" সে রান্নাঘর হইতে জবাব দিত, "আর কি করিব, বসিয়া আছি।" সে উনুনে আমার ভাত দমে বসাইয়া পাহারা দিতেছে। এই চারি মাসের মধ্যে সে আমাকে একদিনও ঠাণ্ডা ভাত খাইতে দেয় নাই, রোজই ধোঁয়া উঠিতেছে, এইরকম গরম ভাত পাইয়াছি।

বরিশাল যাইবার পর হইতেই নিশিবাবুর সহিত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি যখন ব্রাহ্ম-বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, তখন তাঁহার স্ত্রী—ছোট বালিকা—সেই স্কুলে পড়িত; সুতরাং তাহার সহিত কতকটা ছাত্রী শিক্ষক সম্বন্ধ ছিল। এইবার কৃপার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার পর হইতে বসুপরিবারের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইঁহারা তিন জনই আমাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন; সে ডাক মৌখিক ছিল না। আমার প্রতি নিশির যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তাহার তুলনা মিলে না। তিনি

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিয়া গিয়াছেন।

আমি এই বাড়ীতে যাইয়া কোনও দিন ম্যাট্‌সীনির গ্রন্থ, কোনও দিন এমার্সনের প্রবন্ধ, বা বাইবেল হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতাম। অনেক সময়ে বিবাহবিষয় পরামর্শের মধ্যেও থাকিতে হইত। ধীরে ধীরে কৃপার সহিত একটা গভীর আত্মিক সম্বন্ধ (spiritual affinity) দাঁড়াইয়া গেল; এমন হইল, আমরা পরস্পরকে না দেখিয়াও উভয়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিতাম। আমার নিকটে কৃপার অবক্তব্য কিছুই ছিল না।

২৮এ নবেম্বর শনিবার কৃপার ২২শ জন্মদিনে সায়ংকালে উপাসনা হইল। মনোমোহনবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আমি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ পাঠ করিলাম এবং শাস্ত্রীমহাশয়ের "রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ" উপহার দিলাম।

৮ই জানুয়ারী কৃপা কোনও কারণে মনে ভয়ানক আঘাত পাইল। কয়েকদিন সে যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে বাস করিল, তাহা দেখিয়া লিখিয়াছিলাম, "আজ যেমন দেখিলাম, মানুষকে যেন এমনতর অবক্তব্য যাতনা ও অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে না হয়।" ১০ই তারিখে লিখিত আছে—"Terrible shock পাইয়াছিল।"..."চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে তাহার ক্লেশ দেখিয়া আর থাকিতে না পারিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলাম। ক্রমে কৃপা একটু সুস্থ হইল। তখন ২।১টী গান করিলাম।" আমার উপরে মাঘোৎসবের কয়েকটী কার্য্যের ভার ছিল; সেজন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তুত হইতে গেলে চাই সর্ব্বাগ্রে মনের নিরুদ্বিগ্ন ভাব। এই কথা বুঝাইয়া ১২ই জানুয়ারী কৃপাকে পত্র লিখিয়া

চিত্ত স্থির করিতে বলিলাম। এই strong appealএ সুফল হইল।

১১ই ফেব্রুয়ারী কৃপার আইবুড়ো ভাত। ১১টার সময় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস উপাসনা করিলেন, বেশ উপাসনা হইল। "পারিবারিক উপাসনার ঘরেও এঁরা একটা পরদা না দিয়া পারেন না। আমি কিন্তু কৃপাকে পরদার ভিতরে বসিতে দিই নাই।"

আজ বর ও বরযাত্রীরা রাত্রিকালে আসিয়া পঁহুছিলেন।

১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার কৃপার বিবাহ। প্রাতঃকালে বরকন্যাকে দুইখানি আসন উপহার দিলাম। উপাসনাতে আমাকেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইল। সন্ধ্যার পরে বিবাহানুষ্ঠান আরম্ভ হইতে প্রায় নয়টা বাজিল। বীণা ও আর একটী ছোট মেয়ে মিতকন্যা হইল; আমি ও নিশিবাবু কন্যার পশ্চাতে বসিলাম; মনোমোহনবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আরাধনাটী বেশ হইয়াছিল। আমি একটী উপদেশ পাঠ করিলাম। আচার্য্যের উপদেশ ও সঙ্গীতের পরে অনুষ্ঠান শেষ হইল। তৎপরে প্রীতিভোজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটী আগাগোড়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে সতীশ, বরযাত্রীরা, নিশি প্রভৃতি আমাদের গৃহে আহার করিলেন। সকলের মনেই বিষাদ, মিলনটা কিছুতেই জমিয়া উঠিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বালু, রেণু (দ্বিতীয় ভগিনী) সসন্তান ও কৃপা আসিলেন। কৃপা আমার ঘরে বসিয়াই কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ কান্না চলিল। পরিশেষে তাঁহারা এবং বর ও বরযাত্রীরা জলযোগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মাসতুত ভাই চন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় ও অশ্বিনী কুমার বর্ম্মণ বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বরকন্যা কলিকাতায় যাত্রা করিয়া রাত্রি ১২টার সময় ষ্টীমারে উঠিলেন। সারাদিন ধরিয়া যে বিদায়ের দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বড়ই করুণ। নিশি, বালু, সতীশ, কৃপা কতই কাঁদিল; কৃপা এই অভাগার জন্যও বিস্তর চোখের জল ফেলিল। রাত্রি নয়টার সময় বিয়োগান্ত উপাসনা হইল, আমি আচার্য্য। বর-কন্যাকে বিদায় দিয়া দুইটার সময় বাড়ী আসিয়া শয়ন করিলাম।

যেসকল গুণে কৃপা আমার অকৃত্রিম প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল, দৈনন্দিন লিপি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া তাহার আভাস দিতেছি।

"এতখানি সহৃদয়তা আমি তো আর কাহারও নিকট পাই নাই। এই নারীর সরলতা, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও পবিত্রতা অতি অপূর্ব্ব ও আদরণীয়; আমার নিকট এগুলির মূল্য অনেক। যেমন বুদ্ধি—কোন্ situationএ কি করিতে হইবে, ধাঁ করিয়া বুঝিবার শক্তি, সরল—perfectly guileless;—প্রাণটা তেমনি ভালবাসায় পূর্ণ। আর আজন্ম বিশুদ্ধ, পাপের লেশমাত্র মনে নাই। পাপ কাহাকে বলে, তাহাই জানে না। অনেক শিখিলাম ইহার নিকটে—ইহার নির্ম্মল আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়াছি, জীবনের অনেক মুহূর্ত্ত ইহার কাছে বসিয়া খুব ভাল গিয়াছে। মায়ের নিকটে কৃতজ্ঞ হইতেছি, যে তিনি এমন একটী সুন্দর আত্মার সহিত (আমাকে) পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।" (১৮।২।০৯)

বিগত ত্রিশ বৎসরে আর কাহারও সহিত এই প্রকার প্রাণযোগ স্থাপিত হয় নাই।

এইখানে ১৯০৯ সনের আরও কয়েকটী ঘটনা লিখিয়া রাখিতেছি।

১৭ই জানুয়ারী রবিবার আমি ও উকীল শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ

চক্রবর্ত্তী বাটাজোড় গমন করিলাম। বাটাজোড়ের এবং নিকটবর্ত্তী শোলক গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টীকে মিলিত করিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপন করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পরামর্শ করাই আমাদের গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমরা সকাল ৬টার পরে রওনা হইয়া রহমতপুর পর্য্যন্ত গাড়ীতে, ৬ মাইল হাঁটিয়া এবং অবশিষ্ট ৩ মাইল নৌকায় যাইয়া সাড়ে এগারটার সময় অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে উপনীত হইলাম; এবং তৎক্ষণাৎ পদব্রজে লক্ষ্মণকাঠী গ্রামে সম্মিলিত স্কুলের জন্য স্থান দেখিতে গেলাম। ২টার সময় আহার করিলাম; দত্তমহাশয়েরা আমাদিগের খুব যত্ন করিলেন। আমার এমন উৎকট মাথা ধরিল যে, আমি শোলক গ্রামে স্কুল বিষয়ে পরামর্শ করিরার জন্য যাইতে পারিলাম না। শুধু বাটাজোড় স্কুল গৃহে যে আলোচনা হইল, তাহাতে উপস্থিত থাকিলাম। রমাপ্রসাদবাবু ও শ্যামাপ্রসন্ন শোলকে গেলেন, এবং নেতৃবর্গের সহিত সম্মিলনের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। আহারান্তে রাত্রি ১১টার সময় আমরা নৌকায় বরিশালে যাত্রা করিয়া ভোরে লাখুটিয়ায় পঁহুছিলাম, এবং তথা হইতে ৪ মাইল হাঁটিয়া এবং ২ মাইল গাড়ীতে চলিয়া গৃহে ফিরিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষা উপলক্ষে ১৪ই মার্চ্চ কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম এবং ২২এ পর্য্যন্ত তথায় থাকিলাম। এবার কলেজের কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিব।

ময়মনসিংহে দুই পক্ষ

গ্রীষ্মের অবকাশে ২৫এ মে দুই পুত্র সহ ঢাকায় গেলাম। ১লা জুন গুরুদাসবাবু স্ত্রী ও কয়েকটী সন্তান লইয়া শিলং যাত্রা করিলেন,

আমরা বীণাকে লইয়া ময়মনসিংহ শ্রীমান্ রমণীর সহিত কয়েকদিন যাপন করিবার জন্য গমন করিলাম। মধ্যমদাদা পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। বধূমাতা আমাদিগের যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন।

একুশ বৎসর পরে ময়মনসিংহে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পাইলাম। পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, নববিধানসমাজের ডাক্তার বৈদ্যনাথ রায়, সহাধ্যায়ী বন্ধু যামিনীকান্ত ঘোষ আমাদিগকে সমাদরে ভোজন করাইলেন, আরও দুই গৃহে বিশেষ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলাম। ব্রাহ্মসমাজে ৫ই জুন শনিবার "গ্রহণ ও বর্জ্জন" এবং ১২ই জুন "জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের অতিব্যক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ৬ই জুন ও ১৩ই জুন সায়ংকালে মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিলাম। শেষোক্ত দিন উপাসনার পরে মন্দিরেই ব্রজমোহন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কালীপ্রসন্ন ঘোষের তার পাইলাম, অবিলম্বে বরিশালে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তদনুসারে ১৬ই মঙ্গলবার ভোর ৪টায় ময়মনসিংহ ছাড়িয়া এগারটার সময় ঢাকায় পঁহুছিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া শ্রীমান্ অনাদিনাথ সেনের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। বীণাকে ইডেন ফিমেল স্কুলের হষ্টেলে রাখিলাম; সান্ত্বনা ও ছায়াময়ী সেখানেই ছিল; এবং দুই এক জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রি ১০টায় রওনা হইয়া ১৫ই বুধবার রাত্রিতে বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ময়মনসিংহে যাইয়া সংবাদ পাইলাম, বালুকণার কনিষ্ঠা ভগিনী লীলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে যেন একটী বৃত্তি দেওয়া হয়, এই অনুরোধ লইয়া ৯ই জুন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউডের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি লীলাকে দরখাস্ত পাঠাইতে বলিয়া দিলেন। ১৬ই জুলাই জানিতে পারিলাম, লীলাকে

মাসিক কুড়ি টাকার একটী বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলাম।

ঢাকা ছাত্রসমাজের উৎসব

২রা সেপ্টেম্বর ছাত্রসমাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া ঢাকায় গেলাম। ৩রা শনিবার সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা, এবং ৪ঠা "ধর্ম্মসেতু" ও ৬ই সোমবার "The Mustard seed" বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। পরদিন বরিশালে ফিরিলাম।

ঢাকায় এই তো কাজ করিলাম। কে শাস্ত্রী মহাশয়কে কি লিখিয়াছিলেন, জানি না; আমি বরিশালে ফিরিয়া যাইয়াই তাঁহার একখানা পত্র পাইলাম। "Go on, dear fellow, I am at your back," এইরূপ কত কি তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন। তুচ্ছ কর্ম্মের এমন আশাতীত প্রচুর পুরস্কার জীবনে আর কখনও পাই নাই।

১৭ই অক্টোবর রবিবার দিনরাত্রি প্রবল দুর্যোগ (cyclone) চলিল। প্রাতঃকালে মন্দিরে মন্মথবাবু উপাসনা করিলেন, দ্বিতীয় আমি উপস্থিত; সায়ংকালে আমি উপাসনা করিলাম, দ্বিতীয় মন্মথ বাবু উপস্থিত। প্রাতঃকালে ডাক্তার পি. কে. রায়ের আহ্বানে বৃষ্টি-বাত্যার মধ্যেই সার্কিট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে জাগিয়া দেখিলাম আমার শয়ন কক্ষের চালে একটা বড় গাছ পড়িয়া আছে।

২০এ অক্টোবর, ৩রা কার্ত্তিক, বুধবার প্রাতঃকালে সপুত্রক ঢাকায় রওনা হইলাম। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস, মন্মথমোহন দাস, খড়্গসিংহ ঘোষ ও তাঁহার দুই জেঠতুত ভাই সকলে মিলিয়া আমাদের বেশ একটী দল হইল। পরদিন প্রাতঃ ৬টার সময় ঢাকায় পৌঁছিলাম।

অদ্য বৈকালে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও সায়ংকালে পণ্ডিত শ্রীনাথ-চন্দ মন্দিরে উপাসনা করিলেন। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ২২এ শুক্রবার প্রাতঃসন্ধ্যায় যথাক্রমে পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তৎপরদিন প্রাতঃকালে শ্রীমান্ খড়্গাসিংহের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিধানপল্লীর দেবালয়ে গেলাম; শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করিলেন। সম্মিলনীর অধিবেশনে এই আমি প্রথম উপস্থিত থাকিলাম। আলোচনাদি যথারীতি সম্পন্ন হইল। অনেক সাধু-সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল, উৎসবটী বেশ লাগিল।

সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ হইতেই, ২১এ অক্টোবর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী দার্জ্জিলিং হইতে ঢাকায় আসিলেন, আমরা আবার একটী উৎসব সম্ভোগ করিবার সুযোগ পাইলাম। তিনি ২৪এ রবিবার দুই বেলা ও ২৫এ সকালে মন্দিরে উপাসনা করিলেন। বৈকালে পরিচারক ও সহায়গণের আলোচনা হইল; ২৮এ বিবাহের বিজ্ঞাপন দিবার উপলক্ষে তিনি এক বাড়ীতে উপাসনা করিয়া সায়ংকালে মন্দিরে "নব্য ভারতের ভূত ও ভবিষ্যৎ" বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। শুক্রবার আমরা এক বড় দল তাঁহার সহিত নারায়ণগঞ্জ গেলাম; সেখানে তিনি উপাসনা করিলেন এবং তৎপরেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

৫ই নবেম্বর প্রাতঃকালে ঢাকায় এবং সায়ংকালে নারায়ণগঞ্জে আমাকে উপাসনা করিতে হইল। ১৮ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার "ভারতে সামাজিক অভিব্যক্তি"-শীর্ষক বক্তৃতা করিয়া খড়্গাসিংহ প্রভৃতির সহিত বরিশালে রওনা হইলাম।

১৯১০ সন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা নববিধি অনুসারে গৃহীত হইবে, এজন্য ১৩ই ডিসেম্বর অতিরিক্ত (supplementary) এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আমি বিনা আবেদনে পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কাজেই সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে হইল। ২৭৮ খানা কাগজ পাইয়াছিলাম।

১৯১০ সনের মাঘোৎসবের পরে আমার দৈনন্দিন লিপি একছত্রও লিখিত নাই। ইহার পরে যাহা লিখিব, স্মরণশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া লিখিতে হইবে, সুতরাং অবশিষ্ট জীবনস্মৃতিতে স্থূল স্থূল ঘটনারই উল্লেখ থাকিবে।

১৯১০ সনে আমি নবপ্রবর্ত্তিত ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইলাম, এবং ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত চারি বৎসর এই কার্য্য করিলাম।

গ্রীষ্মের ছুটীতে ঢাকায় যাইয়া অল্পদিন পরেই শ্রীযুক্ত হরকিশোর বিশ্বাসের পত্রে অবগত হইলাম, তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বড় উদারপ্রকৃতির নারী ছিলেন; স্বভাবটী নামের উপযুক্তই ছিল। হরকিশোরবাবু গুরুদাসবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে শ্রাদ্ধোপলক্ষে বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। যথাসময়ে গুরুদাসবাবু, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সান্ত্বনা এবং আমরা বরিশালে উপস্থিত হইলাম। শ্রাদ্ধবাসরে গুরুদাসবাবু ও মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, সত্যানন্দবাবু ও আমি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলাম। জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্র—চৌদ্দ বৎসরের বালক মাতার সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিল, তাহার ভাষা ও ভাব দুই-ই অতি চমৎকার হইয়াছিল।

গুরুতর পীড়া

১৯১০

১৯১০ সনের প্রধান ঘটনা আমার গুরুতর পীড়া। বর্ষাকালে মলদ্বারের মধ্যে এক পাশে কি একটা বেদনা হইল। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত দেখিয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। কয়েকদিন আহারাদি ও কলেজের কাজকর্ম্ম পূর্ব্বের মতই চলিল। তারপরে জ্বর হইল, অল্পকাল পরেই জ্বরমুক্ত হইলাম ; কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই পুনরায় জ্বরে ও বেদনায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। সহায় তিনটী বালক। একদিন তাহারা স্কুলে গিয়াছে, আমি একাকী পড়িয়া আছি, এমন সময়ে এমন তীব্র বেদনা আরম্ভ হইল যে, মনে হইল, আমি সংজ্ঞাহীন হইতে চলিলাম ; এমন সময়ে জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভাদুড়ী আসিলেন ; তিনি বন্ধুজনকে সংবাদ দিলেন ; শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইল। এক দিন তারিণীবাবু ও সরকারী ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ দাস একত্র আমাকে দেখিলেন। যন্ত্রণার উপশম হইতেছে না। মাস্তর দ্বারা পত্র লিখাইয়া দাদাকে অবস্থা জানাইলাম ; তিনি ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিলেন। তিনটী বালককে সহায়রূপে লইয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতে আমার ভরসা হইল না। প্রায় দুই মাস রোগভোগের পরে যখন অবস্থা ক্রমশঃ শঙ্কাজনক হইয়া উঠিল, তখন বন্ধুগণ গুরুদাসবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন, তিনি আসিয়া দুই একদিন থাকিয়া আমাকে ঢাকায় লইয়া গেলেন। তখন পূজার ছুটী নিকটবর্ত্তী। অশ্বিনীবাবুর অভিমতে আমি ঐ ছুটী অন্তর্ভুক্ত করিয়া পূরা বেতনে তিন মাসের (privilege leave) লইলাম।

ঢাকায় যাইয়া প্রচারাশ্রমের একতলার ছোট ঘরটীতে আমি স্থান পাইলাম। ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় ও ডাক্তার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত আমাকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের ব্যবস্থার ফলে সপ্তাহ দুই পরে মলদ্বারের ডান পার্শ্বে একটী বড় ও বাম পার্শ্বে একটী ছোট ফোঁড়া প্রকাশ পাইল। ফোঁড়া পাকিলে ডাক্তার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অস্ত্রোপচার করিলেন; অতুলবাবু ও সুরেশবাবু সাহায্যকারীরূপে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মন্দিরে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইল, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সভাপতি ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত মনে আছে, তারিখ স্মরণ নাই।

সুরেশবাবু প্রতিদিন ক্ষত ধুইবার ও ড্রেস করিবার ভার লইলেন, এক মাসের উপরে তাঁহাকে এই কাজ করিতে হইয়াছিল, দুই একদিন তিনি সহরের বাহিরে গেলে বন্ধু ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায় আমাকে দেখিতেন। শয্যাত্যাগ করিতে কয়েক সপ্তাহ গেল; ক্রমে গাড়ী করিয়া বায়ুসেবনের অনুমতি পাইলাম। কলেজ খুলিবার পরেও প্রায় একমাসকাল ঢাকায় থাকিতে হইল। আমার স্থলে একজন নূতন অধ্যাপক আসিলেন। শীতের প্রারম্ভে আমি বরিশালে ফিরিয়া গিয়া কার্য্যে যোগ দিলাম।

বাঁকিপুরে ১৮৯৭-৮ সনের জ্বরে আমার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এবারকার পীড়ায় চিকিৎসকেরা প্রাণাত্যয়ের আশঙ্কা করেন নাই বটে, কিন্তু ভুগিলাম তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল। রোগমুক্তি হইয়া কর্ম্মক্ষম হইতে আমার প্রায় চারিমাস লাগিয়াছিল, এবং রোগের পরিশিষ্টরূপ উপদ্রব প্রায় কুড়ি বৎসর বিদ্যমান ছিল।

আমার এই নিঃসহায় অবস্থায় দাদাবাবু ও বড়দিদি যাহা করিয়াছিলেন, আমি সে ঋণের শতাংশের একাংশও পরিশোধ করিতে পারি নাই।

আমার রোগভোগের মধ্যেই বীণা ইডেন ফিমেল স্কুল হইতে নিম্ন প্রাইমেরী পরীক্ষা দিয়া চারি বৎসরের জন্য মাসিক চারিটাকা বৃত্তি পাইল। সে অঙ্কে পূর্ণ নম্বর পাইয়াছিল। পিতামাতা কাহারও গণিতে মেধা ছিল না; সে কিরূপে গণিতে দক্ষতা লাভ করিল, বুঝিতে পারি নাই।

১৯১১ সনের পাঁচ মাস বরিশালে যাপন করিয়াছিলাম। কলেজের প্রসঙ্গে সে সময়ের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

দশম অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য

১৯০৪ সনে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বোধ হয় প্রায় এক বৎসরকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলাম। জানুয়ারী মাসে (১৯০৫) ছাত্রদিগের একটা পরীক্ষাও গৃহীত হইয়াছিল। ২৫এ উত্তীর্ণ ছাত্র-দিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রবাবু ও আমি কলেজে চারিটার পরে এক পণ্ডিতের নিকটে শাঙ্করভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র পড়িতাম। সারাদিনের খাটুনির পরে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িত, বেশী দিন অধ্যয়ন করিতে পারি নাই। পণ্ডিতটী প্রাঞ্জলরূপে ভাষ্য বুঝাইয়া দিতেন; আমরা তাঁহাকে সামান্য কিছু দিতাম।

পূর্ব্বে বলিয়া থাকিব, আমি দুই তিন বৎসর বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক ছিলাম। সম্পাদকীয় কার্য্য সমস্তই সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস করিতেন, আমি শুধু বার্ষিক কার্য্যবিবরণে সহি করিতাম। আমার পরে তিনি দীর্ঘকাল সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আমি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বরাবরই ছিলাম।

ইহাও বলিয়াছি যে, বরিশালেই আমি সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। প্রথম শুধু রবিবার প্রাতঃ-কালে, এবং বেদীর নীচে বসিয়া কাজ করিতাম। ক্রমশঃ বেদিতে

উঠিতে অভ্যাস করিলাম, এবং রাত্রিতেও আহূত হইতে লাগিলাম। শেষের দুই তিন বৎসর আচার্য্যকার্য্যের দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছিল।

বক্তৃতা, পাঠব্যাখ্যা, আলোচনা, জন্মদিন, নামকরণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠানে অল্পস্বল্প আচার্য্যের আসনে উপবেশন—ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার মধ্যে এই কয়টীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বরিশালে দশটী মাঘোৎসবে উপস্থিত ছিলাম; তন্মধ্যে নয়টীতে বক্তৃতা করিয়াছি; ১৯০৫ হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত আমার সামান্য কার্য্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

১৯০৫—২১এ জানুয়ারী, শনিবার — বক্তৃতা, বিষয়—ধর্ম্মের আকার ও বিকার।

২৪এ মঙ্গলবার ১১ই মাঘ অপরাহ্নে — Carlyle's Sartor Resartus হইতে "The Everlasting Yea" নামক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা।

২২এ জানুয়ারী, রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা।

২৫এ বুধবার প্রাতঃকালে — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে পাঠ ও প্রার্থনা।

১৯০৬—১৩ই মাঘ ২৬এ জানুয়ারী — আমার "এক ও বহু" বিষয়ে বক্তৃতা করিবার কথা ছিল; সেদিন মিঃ শিন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯০৭—২২এ জানুয়ারী, মঙ্গলবার সায়ংকালে — ব্রাহ্মবন্ধুসভার উৎসবে The Gospel of Buddha হইতে এক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা।

২৩এ বুধবার সায়ংকালে — Scientific Reconstruction শীর্ষক বক্তৃতা।

২৫এ শুক্রবার, ১১ই মাঘ অপরাহ্ণে	Emerson's Nature হইতে এক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা।
২৬এ, ১২ই মাঘ, শনিবার প্রাতঃকালে	উপাসনা এবং "In Tune with the Infinite" হইতে এক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা।
২৮এ সোমবার প্রাতঃকালে	পাঠ ও প্রার্থনা। আমার কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত হইতে পাঠ করিবার কথা ছিল। অসুস্থতাবশতঃ আমি নিজে পড়িতে পারি নাই; মনোমোহনবাবু আমার স্থলে পাঠ করেন।
১৯০৮—২২এ জানুয়ারী, ৭ই মাঘ সন্ধ্যাকালে	"The Mustard Seed" নামক বক্তৃতা।
২৩এ বুধবার প্রাতঃকালে	সঙ্গতের উৎসবে উপাসনা।
২৪এ, ১০ই মাঘ প্রাতঃকালে	"ব্রাহ্মসাধকগণের জীবনীপ্রসঙ্গ" উপলক্ষে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র বিষয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা।
২৫এ, মাঘ অপরাহ্ণে	Emerson's "Spiritual Laws" পাঠ ও ব্যাখ্যা।
২৬এ, ১২ই মাঘ রবিবার, প্রাতঃকালে	উপাসনা এবং "In Tune with the Infinite" হইতে এক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা।
১৯০৯—১৯এ জানুয়ারী, মঙ্গলবার প্রাতঃকালে	মহর্ষির স্মরণার্থ উপাসনার পরে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ।
২০এ জানুয়ারী	ব্রাহ্মবন্ধুসভার উৎসবে অন্যান্যের সহিত ক্ষুদ্র বক্তৃতা।

২১এ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে	"আহরণ ও নিষ্কাশণ" বিষয়ে বক্তৃতা।
২২এ প্রাতঃকালে	"ব্রাহ্মসাধকগণের জীবনী-প্রসঙ্গ" উপলক্ষে অন্যতম বক্তারূপে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ও উমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা।
২৪এ, ১১ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে	Tennyson's "Ancient Sage" পাঠ ও ব্যাখ্যা।
২৫এ, ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে	সঙ্গতসভার উৎসবে উপাসনা এবং এমার্সন হইতে 'নির্জ্জনতা' বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা।

২৬এ জানুয়ারী, মঙ্গলবার সায়ংকালে "সুহৃদ্‌সম্মিলন" অর্থাৎ উৎসবের সমাপ্তিসূচক উপাসনা ও প্রীতিভোজন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস আচার্য্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমাকে উপাসনা করিতে হইবে। এদিকে বৈকালে মন্মথবাবুর বাড়ীতে সুহৃদ্‌সম্মিলনে গরম পায়স খাইয়া আমার উদরাময় হইয়াছে। আর কেহই সম্মত হইলেন না, অগত্যা আমাকেই বেদিতে বসিতে হইল। কালীমোহন বাবুর ইঙ্গিত লইয়া 'প্রেম' সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া গেল।

১৯১০—১৮ই জানুয়ারী,

মঙ্গলবার সায়ংকালে	উৎসবের উদ্বোধনে উপাসনা।
২১এ, সন্ধ্যায়	"ভারতে সামাজিক অভিব্যক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা।
২৩এ, রবিবার, ১০ই মাঘ, সায়ংকালে	উপাসনা।
২৪এ, ১১ই মাঘ অপরাহ্ণে	Tennyson হইতে 'Akbar's Dream' পাঠ ও ব্যাখ্যা।

২৫এ, ১২ই মাঘ

প্রাতঃকালে	উপাসনা।
সায়ংকালে	"The Problem of Life" বিষয়ে বক্তৃতা।
১৯১১—জানুয়ারী	মাঘোৎসবে "সত্য ও সংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা।

যতদূর স্মরণ আছে, একদিন সায়ংকালে ও ১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা, এবং ১১ই অপরাহ্ণে মার্কাস অরেলিয়াস হইতে এক অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম।

"সত্য ও সংস্কার" বক্তৃতাটা ময়মনসিংহ (১৯১৩) কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৯১৩) এবং দার্জ্জিলিঙ্গে (১৯১৫) প্রদত্ত হয়। ১৯১৮ সনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

মাঘোৎসবের সময় ছাড়া বরিশালে আরও কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটীর স্মারকলিপি আছে—

(১) "জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি"—১লা ডিসেম্বর ১৯০৬।

এটী পরে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৯১৪) এবং ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে (১৯১৬), প্রদত্ত হইয়াছিল।

(২) 'ধর্ম্মসেতু'—৫ই ভাদ্র ১৩১৬ (১৯০৯)। এটীও ঢাকায় দেওয়া হইয়াছিল।

(৩) "The Powers of the Powerless" (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯)

(৪) সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড (মে ১৯১০)

(৫) কার্লাইলের শিক্ষা ও সংগ্রাম (শ্রাবণ ১৯১০)

কলিকাতা সাঃ ব্রাঃ সমাজ, ১৯।৭।১৩

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ২০এ আগষ্ট ১৯০৬ পরলোক গমন করেন। ১লা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার জন্য বিশেষ উপাসনা ও তৎপরে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। আমি তাহাতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। উহা ব্রহ্মবাদী পত্রিকার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বরিশালে কয়েকবার রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্র সেনের বার্ষিক স্মৃতিসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

ছাত্রসমাজে যে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে তিনটীর এক ছত্রও চুম্বক নাই। (১) জীবনের স্বরসন্ধি (৩।২।০৬), এবং (২) জীবনে ব্যঞ্জনসন্ধি (৮।৯।০৬) এবং (৩) জীবনে সমাসচতুষ্টয়।

প্রথমটীর ঢাকায়, ময়মনসিংহে এবং কলিকাতায় এবং দ্বিতীয়টীর ঢাকায় পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল।

আমার বরিশালবাসের কালে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা খুব সজীব ছিল। অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইত। ব্রাহ্মবন্ধুসভার অধিবেশন খুব নিয়মিত ছিল। আমি উহাতে দুইবার দুইটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম—(১) ব্রাহ্মসমাজে আমোদ-প্রমোদ (বোধ হয় ১৯০৩) (২) সামাজিক উপাসনা (১৯০৪); দুইটীই ব্রহ্মবাদীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। একদিন Emerson's Oversoul ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। বরিশাল ত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে "ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার" সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করি; এবং মনে পড়ে ১৯১০ কি ১৯১১ সনে 'চরিত্রগঠন' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম,

উহা প্রবাসী পত্রিকায় স্থান পাইয়াছিল। আলোচনায় কতবার যোগ দিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

K. W. Robertson (of Brighton) সম্বন্ধে একদিন কিছু বলিয়াছিলাম—তাহার স্মারকলিপি আছে, কিন্তু কবে কোথায় বলিয়াছিলাম, তাহা মনে নাই।

সাহিত্যচর্চ্চা

রাজনৈতিক বক্তৃতা ক্রমশঃ বন্ধ হইল; কিন্তু রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ মাঝে মাঝে চলিতে লাগিল। ১৯০৬ সনের পরে "প্রবাসীতে" 'বয়কট' (Boycott) নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—সম্পাদক উহাকে সেই সংখ্যার শিরোদেশে স্থান দিয়াছিলেন। ১৯০৮ সনে ঐ পত্রিকায় পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল; তাহার মর্ম্ম এই ছিল যে, আমেরিকা ধর্ম্মের বলে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই মতের আলোচনা-স্বরূপ আমার একটী প্রবন্ধ, "মার্কিনেরা কি ধর্ম্মের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল?"—দুই এক মাস পরে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের প্রত্যুত্তর যথাসময়ে ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইল। আমি তখন ভাবিলাম, ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বজনমান্য আচার্য্য সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত আমার ন্যায় নগণ্য বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সংবাদপত্রে বাদপ্রতিবাদ করা শোভা পায় না; এবং প্রকাশ্যে সকল প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে বিপদও আছে। এ জন্য তাঁহাকে একখানি পত্রে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইলাম। তিনি ২৬এ নবেম্বরের পত্রে, নোট পেপারের আঠার পৃষ্ঠায়, তাহার উত্তর দেন, এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে প্রবাসীতে উহা প্রকাশিত হয়। এই

পত্রখানি মূল্যবান্ স্মৃতিচিহ্নরূপে আমার নিকটে এখনও আছে। ঠাকুর মহাশয় আমাকে ছোট ছোট আরও কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলিতে তাঁহার কাগজ ভাঁজ করিবার নৈপুণ্য একটা দেখিবার জিনিস ছিল ; আমি সেগুলিও যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছিলাম ; দুঃখের বিষয়, জানি না, কিরূপে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে।

১৯০৭ সনের ১লা জানুয়ারী Modern Review প্রকাশিত হয়। উহার তৃতীয় সংখ্যায় "Residential Colleges in India" নামক আমার একটী প্রবন্ধ ছিল। পরবর্ত্তী জুন মাসে "The Genesis of the Present Unrest" শীর্ষক আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। তাহার অল্প দিন পূর্ব্বেই, মে মাসে, লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংহ ১৮১৮ সনের ৩ নম্বর রেগুলেশনের অনুবলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী প্রবন্ধ বলিয়া বিলাতের Review of Reviews নামক মাসিক পত্রিকায় নির্ব্বাসনব্যাপারের সম্পর্কে উহার দুইস্থল উদ্ধৃত হইয়াছিল। সম্পাদক উহাকে "a strong article বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯০৮ সনে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রসার লাভ করিল, সুতরাং সংবাদ পত্রে মনের কথা খুলিয়া বলাও কঠিন হইয়া উঠিল। নবেম্বর মাসে ঐ পত্রিকার জন্যই "Constitutional Nationalism" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ঢাকায় 'ভারতমহিলা' নামক মাসিক পত্রিকাতেও আমার কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থরচনা

১৮৯৪ সনে, আরায় অবস্থানকালে আমার মনে হার্বার্ট স্পেন্সারের Education আখ্যাত পুস্তকখানি অনুবাদ করিবার বাসনা উদিত হইয়াছিল। বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুক্ত শরৎ

কুমার লাহিড়ীকে ভবিষ্যৎ অনুবাদ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলে তিনি আমাকে লিখিলেন, সম্পূর্ণ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হস্তগত এবং মুদ্রণ ব্যয়বাবদে যত টাকার প্রয়োজন, তাহা অগ্রিম প্রাপ্ত হইলে তিনি সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—এই গরীবের গ্রন্থকার হইবার মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই বিলীন হইল। চৌদ্দবৎসর পরে, ১৯০৮ সনের ২৮এ সেপ্টেম্বর আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসরও হইলাম। কয়েকদিন পরেই সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অনুবাদ শুনিবার সময়ে বলিলেন, স্পেন্সারের এডুকেশনের বাঙ্গালা তর্জ্জমা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার যেটুকু সংশয় ছিল তিনি কলিকাতায় যাইয়া পুরাতন দোকান হইতে একখানি জীর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ পাঠাইয়া তাহা ভঞ্জন করিলেন। উহা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, তাহা হইলেও আমি নিবৃত্ত হইলাম।

বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের "The History of Indian Civilization" পড়িয়া অবগত হইলাম, মেগাস্থেনীসের 'ভারত বিবরণ' বর্ত্তমান নাই বটে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রীক পুস্তকে উহা হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং অপর যে অংশগুলির লাটিন অনুবাদ বর্ত্তমান আছে, জর্ম্মনীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঈ. এ. শোয়ানবেক (Chwanbeck) সেগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অধ্যাপক ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল (Macrnidle) কর্ত্তৃক Fragments of Megasthenes নামে উহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। তদবধি আমি উহার বঙ্গানুবাদ প্রচারের জন্য উৎসুক ছিলাম। ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে বিলাত হইতে বন-সহরে ১৮৪৬

সনে মুদ্রিত একখণ্ড পুরাতন মূল পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। উহাতে শোয়ানবেকের একটী দীর্ঘ লাটিন ভূমিকা আছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে বাঁকুড়া জিলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ স্কুলের লাইব্রেরী হইতে দুষ্প্রাপ্য ম্যাক্‌ক্রিণ্ডলের অনুবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর আমার ভূমিকা সমেত গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে রামানন্দবাবু এলাহাবাদ ছাড়িয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি প্রকাশক হইতে স্বীকৃত হইলেন। মার্চ্চ কি এপ্রিল মাসে (১৯১০) কলিকাতায় আসিয়া পাণ্ডুলিপি তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি কুন্তলীন প্রেসে ছাপিবার ব্যবস্থা করিলেন। পর বৎসর আমার বরিশাল ত্যাগের অল্পকাল পুর্ব্বে উহা প্রকাশিত হয়।

১৯১০ সনের আগষ্ট মাসে বিলাত হইতে সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়সের আত্মচিন্তার মূল গ্রীক গ্রন্থ একখানি আমার হস্তগত হয়—Leipzigএ ছাপা John Stich কর্ত্তৃক সম্পাদিত পরিপাটী সংস্করণ। ২১এ অক্টোবর, ১৯১২, ময়মনসিংহে উহার বঙ্গানুবাদ সম্পুর্ণ হইয়াছিল। ১৯১২ সনে ঢাকার ভারতমহিলা প্রেস হইতে "সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস আণ্টোনিনাসের আত্মচিন্তা" প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবারেও প্রকাশক রূপে নাম দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উভয় পুস্তকের ষাট খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। কোনও প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে পঞ্চাশ টাকার 'মেগাস্থেনীস' কতকগুলি লাইব্রেরীতে বিতরিত হইয়াছিল।

ব্রজমোহন কলেজ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গভর্ণমেণ্ট

ছোটলাটের কলেজ পরিদর্শন

১৪ই জুলাই, বৃহস্পতিবার (১৯০৪) অখণ্ড বঙ্গের শেষ ছোটলাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার প্রাতঃ ৮টার সময় ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। অশ্বিনীবাবু ও আমি ফটকে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলাম। ছোটলাট গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে ডিষ্ট্রিকট্ ম্যাজিষ্ট্রেট অশ্বিনীবাবুকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন; তিনি অশ্বিনীবাবুর করমর্দ্দন করিলেন। অশ্বিনীবাবু আমার পরিচয় দিলে ছোটলাট হাত বাড়াইলেন, কিন্তু আমি হাত বাড়াইতেই নিজের হাত সঙ্কুচিত করিলেন। কলেজ পরিদর্শন করিবার ফলে স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; অশ্বিনীবাবুই সব কথা বলিলেন, আমি নীরবে সঙ্গে রহিলাম। দক্ষিণের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ধানের ক্ষেত, বনজঙ্গল দেখিয়া তিনি বলিলেন, "The surroundings will not stand the inspection of the University." মুখচোখ দেখিয়া খুব সরল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল না।

১৬ই জেলা স্কুলের হলে দরবার হইল; অভিনন্দন পাঠের পরে ছোটলাট যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে জলের কলের উপরে খুব জোর দিলেন। বস্তুতঃ বরিশালবাসীর কলের জল পাইতে আরও সাত বৎসর লাগিল।

অশ্বিনীবাবুর নিকটে শুনিলাম, ছোটলাট কলেজ সম্বন্ধে মন্দ অভিমত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ব্রজমোহন কলেজ সম্বন্ধে রাজপুরুষগণের অনুকূল মত কয়েক বৎসরের জন্য এইখানেই শেষ

হইল। বঙ্গের অঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে পর বৎসর হইতেই উহা গবর্ণমেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইল। সেই কাহিনীই এখন বলিতে যাইতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকদ্বয়ের আগমন

১৯০৪ সনের বিধানানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় নবরূপে গঠিত হইলে উহার পক্ষে ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সিটী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এইচ্. আর. জেম্‌স্ ২২এ ফেব্রুয়ারী (১৯০৬) বরিশালে আগমন করেন। সুরেন্দ্রবাবু ও আমি হেরম্ববাবুর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টীমারঘাটে গিয়াছিলাম। পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁহারা কলেজ, কলেজের হষ্টেল, এবং একটা ছাত্রাবাস (mess) পরিদর্শন করিলেন। তাঁহারা ছাত্রগণের ব্যায়ামকৌশলও দেখিয়াছিলেন। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা প্রীত হইলেন বলিয়া বোধ হইল।

এইখানে একটা রহস্যকথা বলিয়া রাখি। ২৩এ ফেব্রুয়ারী, কলেজের পরিদর্শনের দিন, প্রাতঃকালে কাগজপত্র প্রস্তুত করিবার কার্য্যে সুরেন্দ্রবাবু ও আমি কলেজে গেলাম, অশ্বিনীবাবু, ভাইস প্রিন্সিপাল কালীপ্রসন্নবাবু প্রভৃতিও আসিলেন। অধ্যাপকগণের বেতনের তালিকায় দেখান হইয়াছিল, প্রিন্সিপালের বেতন মাসিক ১৪০৲, দর্শনের অধ্যাপকের ১২০৲। অশ্বিনীবাবুকে আমরা বলিলাম, প্রিন্সিপালের বেতন ১৫০৲ এবং সুরেন্দ্রবাবুর বেতন, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, ১৩০৲ হওয়া উচিত। কথাবার্ত্তায় দশটা বাজিয়া গেল, পরিদর্শকগণের আসিতে মোটে ঘণ্টা দুই দেরী। তখন অগত্যা অশ্বিনীবাবু আমার ও সুরেন্দ্র বাবুর বেতন ১০৲ টাকা বাড়াইয়া যথাক্রমে ১৫০৲ ও ১৩০৲ লিখিয়া দিলেন।

তারপরে আমরা দুইজন অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে আহার করিলাম। আমরা এক কক্ষে বসিলাম, অশ্বিনীবাবু চৌকাঠের অপর পার্শ্বে আমাদের নিকটেই আর এক কক্ষে বসিয়া আহার করিলেন।

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রবাবু ও আমার উদ্যোগে শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাসের বাটীতে হেরম্ববাবুর সম্মানার্থ ব্রাহ্মবন্ধু সভার অধিবেশন হইল। মৈত্র মহাশয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, সকলে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা শুনিলেন। পরে প্রীতিভোজন হইল, উহার ব্যয়ভার আমরা দুইজনে বহন করিলাম।

যথাসময়ে পরিদর্শকগণের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। উহাতে তাঁহারা ব্রজমোহন কলেজের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়া উহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ইহাও লিখিয়াছিলেন, "এই কলেজের অধ্যাপকগণ অর্থের খাতিরে কাজ করেন না। প্রিন্সিপাল ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর এম্. এ., অথচ তাঁহার বেতন মোটে একশত পঞ্চাশ টাকা।"

বিপদের সূত্রপাত

পর বৎসর (১৯০৭) ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন ঢাকা বিভাগের সহকারী ইন্স্পেক্টর ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ব্রজমোহন স্কুল দেখিতে পাঠাইলেন। ১৬ই তারিখ স্কুল পরিদর্শন করিয়া তিনি উহার বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ এক রিপোর্ট দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট হইতে রিপোর্ট পাইয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমরা উত্তর দিলাম যে, অভিযোগগুলির অধিকাংশই অমূলক। তখন বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারণ

করিলেন, “যেহেতু ব্রজমোহন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ অভিযোগসমূহের অধিকাংশই ভিত্তিহীন বলিতেছেন, অতএব এই সমুদায়ের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটী কমিটী গঠিত হউক।” অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সভাপতি মনোনীত হইলেন, স্যর এস্. পি. সিংহ (পরে লর্ড সিংহ), অধ্যাপক ব্রুল প্রভৃতি উহার সভ্য ছিলেন।

ক্রমশঃ পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার দুইটী প্রধান কারণ ছিল।

বিরাগের কারণ

(১) বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরেই ব্রজমোহন বিদ্যালয় বাখরগঞ্জজিলায় স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হইল। বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের প্রচেষ্টায় এই জিলা ভারতবর্ষে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। “এই অসামান্য সাফল্যের মূলে ছিল অশ্বিনীবাবুর স্বদেশসেবা।” “তারপর ইহাও সত্য, যে এই মঙ্গলানুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীশ চন্দ্র দাস, শরৎ কুমার রায়, রামচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাঁহার সহায় ছিলেন।” (মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, ১১৪ পৃঃ)

(২) তৎপরে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ “রিজলী সার্কুলার” (Risley circular) অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। ১৯০৭ সনের ৪ঠা মে স্যর হার্বার্ট রিজলীর স্বাক্ষরিত ভারত গবর্ণমেণ্টের এক সার্কুলার প্রচারিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে, স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে কিংবা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

১৯০৫ সনে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ছাত্রগণের সম্বন্ধে ঐরূপ এক সার্কুলার প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পরেই আমাদের কোন কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে সরকার হইতে অভিযোগ আসিতে লাগিল। ১৯০৭ সনের ২৯এ জুন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন হইতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর নামে এক পত্র আসিল। তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে, রিজলী সার্কুলারের সর্ত্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে (strictly) পালিত হইবে তিনি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এইরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি চাহেন।

পর দিন, রবিবার উকীল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেনের গৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক পরামর্শ সমিতির অধিবেশন হইল। তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, দীনবন্ধুবাবু, অশ্বিনীবাবু, ডাক্তার অশ্বিনী কুমার গুপ্ত, উকীল হরনাথ ঘোষ, নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত, শরচ্চন্দ্র গুহ, রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভাইস প্রিন্সিপাল, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার, চিন্তাহরণ দে, অধ্যাপক ও আমি। স্থিরীকৃত হইল যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাইবে না, ফল যাহাই হউক না কেন।

ফল হইল দুইটী—(১) গবর্ণমেণ্ট ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদিগকে বৃত্তি পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন।

(২) এক গোপনীয় সার্কুলার প্রচারিত হইল এই মর্ম্মে যে ব্রজ-মোহন কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোনও ছাত্র সরকারী চাকুরী পাইবেন না।

১৯০৭ সনে আমাদের একটী ছাত্র এফ. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইয়াও তাহাতে বঞ্চিত রহিল। ১৯০৮ সনে শ্রীমান্ দেবপ্রসাদ ঘোষ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার

করিয়াও বৃত্তি পাইল না। ১৯০৯ সনে শ্রীমান্ মধুসূদন সরকার এফ. এ. পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বৃত্তি দিলেন না। ১৯১০ সনে শ্রীমান্ দেবপ্রসাদ ঘোষ পুনরায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষদেশে স্থান পাইল, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে গণিতে প্রথম স্থান লাভ করিবার জন্য ডাফ্ বৃত্তি দিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে তাহার প্রাপ্য প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন।

গ্রীষ্মের অবকাশে ঢাকায় অবস্থান করিবার কালে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ রিডের (Reid) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আমাদের একটী ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। আমরা গত বৎসর রিজলী প্রস্তাব মানিয়া চলিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। এই বার তাহাকে বৃত্তি দিন।" রিড সাহেব তদুত্তরে বলিলেন, "We shall watch," অর্থাৎ "আমরা দেখিব, তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছ কি না। তারপর বলিলেন "Rajani Babu, there are Colleges a pass from which is a recommendation for government employment, as for example, the Aligarh College; in your case, it is just the opposite," "এমন কোন কোনও কলেজ আছে, যেখান হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী কর্ম্মপ্রার্থী বিশেষ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়; যেমন আলিগড় কলেজ। আপনাদের বেলায় ঠিক তাহার বিপরীত।"

দেখা যাইতেছে, যে গবর্ণমেণ্ট যখন ব্রজমোহন কলেজ হইতে বৃত্তি পাইবার অধিকার কাড়িয়া লইলেন তখন হইতে ১৯১১ সনের

নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর কোন না কোনও ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য স্থান লাভ করিত।

অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌ ও অধ্যাপক কানিংহাম

১৯০৮ সনের ২৩এ জুলাই প্রিন্সিপাল জেম্‌স্‌ ও অধ্যাপক কানিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শনের জন্য বরিশালে আসিলেন। অশ্বিনীবাবু ও আমি তাঁহাদিগকে ষ্টীমার ঘাট হইতে অভ্যর্থনা করিয়া ডাক বাঙ্গলায় লইয়া গেলাম। পর দিন তাঁহারা কলেজ পরিদর্শন করিলেন, তারপর অশ্বিনীবাবু ও আমার সহিত তাঁহাদিগের রিজলী সার্কুলার সম্বন্ধে দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তা হইল। তৎপর দিন, ২৫এ প্রাতঃকালে তাঁহারা হষ্টেল দেখিলেন। সেই দিন সায়ংকালে উকীল শরচ্চন্দ্র গুহের গৃহে পরামর্শের বৈঠক বসিল। ভোর রাত্রিতে পরিদর্শকদ্বয় বরিশাল ত্যাগ করিলেন।

মিঃ কানিংহাম অশ্বিনীবাবুর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; তিনি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিকট পরিচয়পত্র আনিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় যাইয়া ব্রজমোহন কলেজের সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার পি. কে. রায়

১৯০৭ সনে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় কলেজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জেম্‌স্‌ ও কানিংহাম সাহেব চলিয়া যাইবার দুই দিন পরেই, ২৭এ জুলাই ডাক্তার রায় কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টীমার ঘাটে গেলাম। ২৮এ তিনি অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কলেজ দেখিলেন। তৎপরে

লাইব্রেরীর কক্ষে সহরের প্রধান ব্যক্তিগণ আলোচনার জন্য মিলিত হইলেন; ডাক্তার রায় তাহাতে উপস্থিত থাকিলেন।

২৯এ ডাক্তার রায় কলেজের পরিদর্শন শেষ করিলেন। সন্ধ্যা-কালে ঐখানে এক আলোচনা সভা বসিল। সকল বিষয় বিবেচনা করিবার পরে এই প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল যে, অশ্বিনীবাবু কলেজটীকে এক কমিটির হস্তে সমর্পণ করিবেন। পর দিন ঐ প্রকার অনুরোধ করিবার অভিপ্রায়ে একটী প্রকাশ্য সভা আহূত হইবে।

৩০এ বৃহস্পতিবার সভার বিজ্ঞাপন বিতরিত হইল। ইতোমধ্যে অশ্বিনীবাবু তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত করিলেন। ডাক্তার রায় এবং শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তা বলিলেন; পরিশেষে স্থির হইল যে, সভা আপাততঃ স্থগিত থাকিবে, এবং অশ্বিনীবাবু কলিকাতায় যাইয়া পদস্থ ও প্রবীন ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিবেন। উকীল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুহের গৃহপ্রাঙ্গণে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু ও আমি সেখানে যাইয়া দেখিলাম, ইতোমধ্যে কয়েক শত লোক উপস্থিত হইয়াছে। সভা স্থগিত রহিল। সেখান হইতে পুনরায় অশ্বিনীবাবুর বাড়ী যাইয়া গভর্ণমেণ্ট কলেজের বিরুদ্ধে যে বহু সংখ্যক অভিযোগ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলাম। অভিযোগগুলি গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের উপরে স্থাপিত; বর্ণনা পত্র বৃহৎ type-written ২৭ পৃষ্ঠা; ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার রায়ের হস্তে উহা প্রদান করেন; অশ্বিনীবাবু রায় মহাশয়ের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এটী প্রথম দফা; সরকার হইতে আমরা এরূপ আরও কতকগুলি পাইয়াছিলাম।

শুক্র, শনি ও রবিবার (৩১এ জুলাই হইতে ২রা আগষ্ট তিন দিন) আমরা অভিযোগগুলির উত্তর প্রস্তুত করিলাম। অশ্বিনীবাবু

সোমবার ভোরে কলিকাতায় যাত্রা করিয়া এক সপ্তাহ পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

কমিটীর হস্তে কলেজ সমর্পণ করিবার প্রস্তাব এইখানেই শেষ হইল।

আমরা কলেজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের নথী (indictment) পাইয়াছিলাম, তাহা সাক্ষাৎভাবে পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট হইতে, বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও পাই নাই। সুতরাং উহার জবাব আপাততঃ আমাদের নিকটেই থাকিল।

গোয়েন্দা কাহিনী

এই সময়ে গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মতৎপরতা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। অশ্বিনীবাবুর জন্য দুইজন গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। তাঁহার সহকর্ম্মীরা, স্বদেশ বান্ধব-সমিতি, ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউশনের শিক্ষক ও ছাত্রগণ কেহই গোয়েন্দার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ছিল না। এমন কি, আমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য লোকেরও সেকালে কত মান ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের পরে আমি বাঁকিপুরে গেলেই সেখানে টেলিগ্রাম যাইত, "রজনী গুহ বাঁকিপুরে গেল।" আমার বক্তৃতায় পুলিশের লোক উপস্থিত থাকিত। ছাত্রসমাজের উৎসবে ঢাকায় গেলাম; যথাসময়ে যথাস্থানে সে সংবাদ প্রেরিত হইল। এক বন্ধু নিজে থানায় হুকুম দেখিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমার জন্য তিন ব্যক্তি মোতায়েন হইয়াছে। একদিন কলিকাতায় যাইতেছি। ষ্টীমারের ডেকে বিছানা পাতিয়া বসিয়া আছি, একটী লোক—মুসলমান—আমার নিকটে আসিয়া বসিল। নামধাম জানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ী বরিশাল সহরের কোন্‌খানে?" আমি বলিলাম। সে

বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর কোন্ দিকে?" বরিশালে তখন দুই মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ছিলেন; এক আমার বন্ধু ব্রাহ্ম-প্রচারক মনোমোহনবাবু; অপর সুবিদিত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। আমার ধাঁধা করিয়া মনে হইল, এ ব্যক্তির গরিব ব্রাহ্ম-প্রচারককে জানিবার কথা নয়; এ তবে পুলিশের লোক। আমি বলিলাম, "আপনি পুলিশ বিভাগে চাকুরী করেন?" উত্তর, "হাঁ!" তারপর সে বলিল, "এই যে গভর্ণমেণ্ট ছেলেদিগকে বিলাতী লবণ ফেলিয়া দেয় বলিয়া জেলে পাঠাইতেছে, কাজটা কি ভাল হইতেছে?" আমি মন্তব্য করিলাম, "অপরাধ করিলে সাজা হইবেই।" লোকটী দেখিল, বিশেষ সুবিধা হইতেছে না—দূরে যাইয়া অন্য দলে মিশিল।

বোধ হয় ১৯০৯ সনে পাবনা জেলার একটী ব্রাহ্মণ যুবক ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল, হষ্টেলে বাস করিত। তাহার চালচলন দেখিয়া সহরবাসীদিগের সন্দেহ হইল। তাহারা গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থানায় যায়। তারপর তাহার কাপড়ের বাক্সে "দুষ্কর্ম্মের" প্রমাণ পাওয়া গেল। সে হষ্টেলে কয়েকটী ছাত্রের নামে অভিযোগ করিল, তাহারা তাহার বাক্স হইতে টাকা চুরি করিয়াছে। তদন্তের জন্য হেড্ মাষ্টার মহাশয় ও আমি তাহার ঘরে গেলাম, দেখিলাম, তাহার পাঠ্য পুস্তক দুই একখানির বেশী নাই। আমাদের সন্দেহ দৃঢ় হইল। সন্ধ্যার সময় সে হেড্‌মাষ্টার জগদীশবাবুর নিকটে যাইয়া স্বীকার করিল, সে পুলিশের গুপ্তচর, তাহার নিজের জেলার অধিবাসী ঐ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে বরিশালে আনিয়া ব্রজমোহন স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছেন; মাসে মাসে সে পঁচিশ কি ত্রিশ টাকা পায়।

হেড্ মাষ্টারের এই রিপোর্ট পাইয়া পর দিন তাহাকে স্কুল ও হষ্টেল হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলাম (expelled him)। এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ও পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের শিক্ষাধ্যক্ষকে (Director of P. I.) বহিষ্কারের সংবাদ দিলাম; বহিষ্কারের কারণ দেখাইলাম যে, "On his own confession, he is a Police spy, and not a bonafide student "(সে নিজে মুখে স্বীকার করিয়াছে যে সে পুলিশের গুপ্তচর, প্রকৃত ছাত্র নয়।" সিণ্ডিকেট পত্র পাঠ করিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন, "To be recorded"; "পত্রের সংবাদ লিখিত রহিল।" ডিরেক্টর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

যতদূর মনে পড়ে, ঐ বৎসরেই ৭ই আগষ্ট কলেজে যাইতে দেখি, ফটকের সম্মুখে পথে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিপুলকায় সামরিক পুলিশের সিপাহীরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠী ঘুরাইতেছে এবং প্রচণ্ড গর্জ্জন করিতেছে। আমাদের অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইল। সন্ধ্যাকালে আবার কলেজের দিকে গেলাম; আমাদের ফটকের পুলের উপরে তরবারী লইয়া সিপাহী বসিয়া আছে। ভাবিলাম, ব্যাপারটা কি। পরে তত্ত্বকথা শুনিলাম; এক গুপ্তচর সংবাদ দিয়াছিল, ৭ই আগষ্ট (বয়কট্ ঘোষণার সাংবাৎসরিক) রজনীবাবু কলেজে বয়কট্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। সংবাদটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অগ্নিপরীক্ষা

১৯০৮ সনের ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার ব্রজমোহন কলেজ অগ্নি-পরীক্ষায় পতিত হইল। ঐ দিন প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাসিত হইলেন। একে তো গবর্ণমেণ্টের রোষানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতে-

ছিল; তদুপরি এই আকস্মিক বিপদে সর্ব্বসাধারণের মনে সংশয় জন্মিল, কলেজটী টিঁকিয়া থাকিবে কি না। সরকারী বৃত্তি পাইবার অধিকারে বঞ্চিত হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বিশেষ কমিয়া যায় নাই; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের গোপনীয় সার্কুলারের ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইল। যেখানে প্রতি বৎসর বি. এ. পরীক্ষাতে ন্যূনাধিক এক শত পরীক্ষার্থী পাঠাইতাম, সেখানে বি. এ. ক্লাস দুইটীতে তিন চারির অধিক ছাত্র হইতেছে না। অনেকে পরামর্শ দিলেন, বি. এ. ক্লাস উঠাইয়া দেওয়া হউক। আমি জানিতাম, একবার উঠিয়া গেলে, উহা আর হইবে না। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও তাহাই বলিলেন; "বি. এ. ক্লাস ছাড়িবেন না; ছাড়িলে আর পাইবেন না।" আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীকে বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম।

এই সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীও অন্যপ্রকারে একটা আঘাত পাইল। আমরা নব ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য আর্ট্‌স্‌ বিভাগে কেমিষ্ট্রী পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ অর্থব্যয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসের ২৭এ তারিখ ডাক্তার পি. কে. রায় এবং ঢাকা কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ ওয়াট্‌সন ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করিয়া আমাদিগকে কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপনা বন্ধ করিতে বলিলেন। অধ্যাপক ওয়াট্‌সন স্বয়ং ক্লাশে যাইয়া যাইয়া ছাত্রদিগকে কেমিষ্ট্রী ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিলেন; বলিলেন, দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিলে ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্‌ পরীক্ষার জন্য কেমিষ্ট্রী পড়িয়া কোনও লাভ নাই। কেহ কেহ কেমিষ্ট্রী ছাড়িল; যাহারা ছাড়িতে সম্মত হইল না, তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল।

এক্ষণে "মহাত্মা অশ্বিনীকুমার" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই সময়ে এই সুবিখ্যাত বিদ্যালয়টী যেন কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে আন্দোলিত হইতেছিল। যিনি হিমগিরির ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রতিকূল ঝটিকার প্রচণ্ডতার প্রতিরোধ করিতেন, সেই পুরুষসিংহ অশ্বিনীকুমার যখন কারারুদ্ধ হইলেন তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্রজমোহন বিদ্যালয়েয় ঘোর দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল। * * * *

"এই সময় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন নির্ভীক জ্ঞানবীর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিলেন—'তোমরা চঞ্চল হইও না, স্থির চিত্তে পড়াশুনা কর, ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কিছুতেই উঠিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বাঁকিপুরে রামমোহন সেমিনারি স্থাপন করিয়া (স্থাপন করিয়া কথাটা ভুল) আমি প্রথম যৌবনে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতাম, দরকার হইলে এই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে আবার দশ টাকা বেতনে কার্য্য করিব।' তেজস্বী অধ্যাপক মহাশয়ের মুখে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ছাত্রদের চিত্তচাঞ্চল্য তিরোহিত হইল। তাঁহার তেজস্বিতায় সেই দুর্দ্দিনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষা পাইল।"

(১১৫-১৬ পৃঃ)

ইহার অল্পকাল পরেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্রজমোহন কলেজের বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট যত প্রকার অভিযোগ করিয়াছেন, সে সমুদায়ের এবং গোয়েন্দা রিপোর্টের নকল প্রাপ্ত হইলাম। তৎসঙ্গে যে পত্র ছিল, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগের কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন; অধিকন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, আমরা রিজলী সার্কুলার মান্য করিয়া

চলিব। আমরা পত্রোত্তরে লিখিলাম, সমস্ত অভিযোগের উত্তর দেওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব; কেন না, উহার অধিকাংশই অশ্বিনীবাবু, সতীশবাবু, এবং স্কুলের শিক্ষক বাবু ভবরঞ্জন মজুমদারের বিরুদ্ধে; প্রথম দুই জন নির্ব্বাসনে এবং ভবরঞ্জনবাবু কারাগারে আছেন। অতএব এই তিন জনের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছে, সেগুলি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিবার অনুমতি আমাদিগকে দেওয়া হউক। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে সেইপ্রকার অনুমতি দিলেন।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলি 'সপ্রমাণ' করিবার জন্য 'তাঁহাদিগকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে; এবং নির্ব্বাসিত অশ্বিনীবাবু ও সতীশবাবু এবং ভবরঞ্জনবাবু যাহাতে যথারীতি আত্মসমর্থনের সুযোগপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐ দুই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না, কাজেই তদন্ত কমিটির কোন অধিবেশন হইল না।" (১১৭ পৃঃ)

পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণের বৃত্তি পাইবার অধিকার ও সরকারী চাকুরী লাভের সুযোগ লুপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহারা গোপনে কলেজটীকে বধ করিবার আয়োজন করিলেন। তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, ব্রজমোহন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত থাকিবার অধিকার (affiliation) হইতে বঞ্চিত করা হউক। আমাদের পরম সৌভাগ্য, "বাঙ্গালার শার্দ্দূল" আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সে সময় ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তাই কলেজটী

বাঁচিয়া গেল। শুনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বড়লাট লর্ড মিণ্টো ব্রজমোহন কলেজের disaffiliation প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মতি দেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশানুসারে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের তিন প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্রজমোহন কলেজের আত্মসমর্থনের বাহিরে রহিলেন; সুতরাং আমাদিগের কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিবার কার্য্য অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য হইল। আমরা অভিযোগগুলি খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু রিজলী সার্কুলার সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতির কোন উল্লেখ করিলাম না।

১৪ই মার্চ্চ, রবিবার, প্রবেশিকা পরীক্ষা উপলক্ষে কাগজপত্র লইয়া আমি কলিকাতায় উপনীত হইলাম। ১৬ই প্রাতঃকালে স্যর আশুতোষের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই অধ্যাপক কানিংহামকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সহিত জরুরী কথা আছে, এইরূপ বলিতেই তিনি সন্ধ্যার সময় আলিপুর মানমন্দিরে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিলেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় তখন বাহিরে যাইতেছিলেন, তিনিও সায়ংকালে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রথমে স্যর আশুতোষের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাদের পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া রিজলী সার্কুলার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে উপদেশ দিলেন। তৎপরে আলিপুরের মানমন্দিরে গেলাম। অধ্যাপক কানিংহাম কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "I have been deported" (আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি)। আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ব্রজমোহন কলেজের পরম সুহৃৎ, তাঁহার মতামতের খুব মূল্য আছে; এজন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বলেন? আমরা রিজলী সার্কুলার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি

দিব কি ?” তিনি বলিলেন, “হাঁ, দেও। আমি ছাড়া সিণ্ডিকেটে তোমাদের সমর্থন করিবার কেহই নাই।” তারপর খোলাখুলি আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মিঃ কানিংহাম আমার সহিত খুব অমায়িক ব্যবহার করিলেন। পরে জানিলাম অধ্যাপক কানিংহাম প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ছোটনাগপুরে বদলি হইয়াছেন।

১৭ই মার্চ্চ বৈকালে নারিকেলডাঙ্গায় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। আমি যাইয়া দোতলার বৈঠকখানায় বসিলাম; ক্ষণকাল পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া খটখট শব্দ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনি সমাদর করিয়া আমাকে বসাইলেন, এবং নিজে অদূরে বসিলেন। ব্রজমোহন কলেজের কথা উত্থাপন করিতেই তিনি বলিলেন, “আমি তদন্ত কমিটীর প্রেসিডেণ্ট, কলেজের সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না।” তার পরে তিনি আলাপ আরম্ভ করিলেন; সে আলাপ যেমন মধুর তেমনি জ্ঞানগর্ভ: ত্রিশ বৎসরেও তাহার স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। একটা ব্যাপারে বড়ই চমৎকৃত হইলাম। তিনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থার এক একটা প্রসঙ্গের উপরে আলোকপাত করিবার অভিপ্রায়ে এমন উপযোগী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন যে, আমি পূর্ব্বে বা পরে আর কাহারও মুখে সে প্রকার কখনও শুনি নাই। স্বদেশী যুগের ছাত্রগণের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা যেমন মৌলিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। বলিলেন, “আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কেশবচন্দ্র সেনের মত ক্ষমতাশালী পুরুষ বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু কৈ, আমরা তো তাহাতে ভুলি নাই। এখনকার ছেলেরা যাহার বক্তৃতা শোনে, তাহার পশ্চাতেই ছুটিয়া যায়।” অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা

হইল। প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। কলেজ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত পাইলাম না বটে, কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধ, যথার্থ জ্ঞানযোগীর সৌজন্য ও সরসবাক্‌পটুতায় পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।

তৎপরদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিবার মানসে কলুটোলা ষ্ট্রীটে "বেঙ্গলী" পত্রিকার অফিসে গেলাম। যাইয়া দেখি সম্পাদকীয় আসনে বসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খাতা দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে সংশোধন করিতেছেন; আমি তো অবাক, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে আমার বোধগম্য হইল, সেগুলি রিপন কলেজের ইংরেজী অনার্স ক্লাসের খাতা। হাতের খাতাখানা শেষ করিয়া আমার দিকে চাহিলেই আমি আমাদের কথা বলিলাম; তিনি তৎক্ষণাৎ স্যর এস. পি. সিংহকে আমাদের জন্য পত্র লিখিতে উদ্যত হইলেন। আমি বিনীত ভাবে মৃদু কণ্ঠে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম, যে সিংহমহাশয়কে পত্র দিবার প্রয়োজন নাই; তিনি নিবৃত্ত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবুও রিজলী সার্কুলার সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি দিতে পরামর্শ দিলেন।

১৯এ, শুক্রবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসুর নিকটে গেলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি রবিবার রাত্রিকালে কয়েক জনকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিবেন, আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন। বৈকালে বাগবাজারের অমৃত বাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের সহিত পরামর্শ করিলাম। তিনিও প্রতিশ্রুতি দিবার পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন।

২১এ, রবিবার ভূপেন্দ্রবাবুর গৃহে সামাজিক উপাসনার পরে মিলিত হইলেন শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাক্তার নীলরতন সরকার,

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রবাবু স্বয়ং ও রজনীকান্ত গুহ। আমাদের কৈফিয়ৎ আগাগোড়া পড়া হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিবার পরে সকলে একবাক্যে বলিলেন, আমরা রিজলী সার্কুলার মানিয়া চলিব, বিশ্ববিত্থালয়কে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মত জিজ্ঞাসা করিয়াও ঐ প্রকার উত্তর পাইলাম।

২৩এ মার্চ্চ বরিশালে ফিরিয়া গেলাম। কয়েক দিন পরে আমাদের আত্মসমর্থনের জন্য সর্ব্বশেষে "বিশ্ববিত্থালয়ের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, ব্রজমোহন কলেজ রিজলী সার্কুলার মানিয়া চলিবে" এই প্রকার বাক্য যোগ করিয়া উহা রেজিষ্ট্রারের নিকটে পাঠাইয়া দিলাম।

ইহার পরেও দুই একবার পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দাবিভাগের রিপোর্ট বিশ্ববিত্থালয়ের বরাবর আমাদের নিকটে আসিয়াছিল এবং আমরা তাহার উত্তর দিয়াছিলাম।

১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অশ্বিনীবাবু মুক্তিলাভ করিয়া বরিশালে ফিরিয়া আসিলেন। এক বৎসর না যাইতেই ব্রজমোহন কলেজের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

ব্রজমোহন কলেজের নবরূপ

কলেজটী ক্রমশঃ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। এক দিকে উহা পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের কোপানলে দগ্ধ হইতেছে; অপর দিকে অর্থাভাবে উন্নতি ও প্রসারের পথ অবরুদ্ধ। বিশ্ব-বিত্থালয়ের নূতন বিধান অনুসারে কলেজের রক্ষার জন্যই বিস্তর

অর্থের প্রয়োজন ; উন্নতি তো দূরের কথা। আমাদের এখন আছে শুধু ইন্টারমিডিয়েট ইন্ আর্টস্ এবং বি. এ. পরীক্ষার জন্য পাঠের ব্যবস্থা। আই. এস্. সি এবং বি. এস্. সি শ্রেণী না খুলিলে কলেজের আকর্ষণ বাড়িবে না ; কিন্তু সে জন্য বিপুল অর্থ চাই ; অশ্বিনীবাবুর যোগাইবার সাধ্য ছিল না। এই দ্বিবিধ সঙ্কট হইতে কলেজটীকে বাঁচাইবার পথ তাঁহার সম্মুখে ছিল মোটে একটী—পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিতেন এবং সুসময় আগত দেখিয়া তাঁহারা অশ্বিনীবাবুকে সেই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলেন।

এই স্থলে আমার নিজের একটা কথা বলা প্রয়োজন, কারণ পরবর্ত্তী কাহিনীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

১৯০৮ সনে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী এবং কলেজ কৌন্সিলের সভ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার এক সময়েই স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া আমাকে ঐ কলেজে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, “এখন গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদিগের সংগ্রাম চলিতেছে ; আমি যাইতে পারিব না।” ১৯১১ সনে, অশ্বিনীবাবুর কারামুক্তির প্রায় এক বৎসর পরে, বোধ হয় ফেব্রুয়ারী মাসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম, আনন্দমোহন কলেজের জন্য একজন ইংরেজীর অধ্যাপকের প্রয়োজন, বেতন ২০০-১০-২৫০ ; বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ দেওয়া যাইবে, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে। আমি দরখাস্ত পাঠাইলাম। আমার দরখাস্ত পাইয়াই সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় আমাকে গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং বিনা দ্বিধায় বলিলেন, আমার নিয়োগ নিশ্চিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাঁহার সহিত আরও পত্র বিনিময় হইল। সপ্তাহ দুই পরে তিনি

জানাইলেন, কলেজকৌন্সিলে আমার দরখাস্ত উপস্থিত করিলে সভাপতি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "I won't have Aswini Babu's man." (অশ্বিনীবাবুর লোক লইব না।) শ্যামাচরণবাবু তখনও আশা ছাড়িলেন না।

ঠিক ইহার পরেই, মার্চ্চ মাসে, পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ও অশ্বিনীবাবুর মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। মধ্যস্থ হইলেন স্থানীয় অক্সফোর্ড মিশনের প্রচারক ও অধিনায়ক ষ্ট্রং (Strong) সাহেব। হয়তো কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া দুই পক্ষে প্রাথমিক কথা চলিতেছিল। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের চিফ সেক্রেটারি মিঃ লি মেস্থরিয়ার (Mr. Le Mesurier) বরিশালে আসিলেন এবং অশ্বিনীবাবুকে প্রথম দিনের কথাবার্ত্তার মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তগুলি জানাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে তিনটী এই—

(১) পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ব্রজমোহন কলেজকে মাসিক এক হাজার টাকা সাহায্য দিবেন।

(২) কলেজের নূতন বাটী নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

(৩) তৃতীয় সর্ত্ত মূল ইংরেজীতে দেওয়া যাইতেছে—

Conditions for the reconstruction of the Brojo Mohan Institution, Barisal, sent with the Magistrate's D. O. letter 92/C. dated the 19th March, 1911.

The following gentelmen shall cease to be members of the College staff :—

1. Babu Rajani Kanta Guha.

2. Babu Satish Chandra Chatterjee.

The following gentlemen will cease to belong to the school :—

1. Babu Jnan Chandra Chakravorty.
2. " Srish Chandra Das.
3. " Ram Chandra Das Gupta.

If these five gentlemen are willing to sign an undertaking to abide loyalty by the terms of the Risley Circular, the Governnent will not interfere to prevent their obtaining employment elsewhere.

The resignations of the five gentlemen may be allowed to take effect from after the close of the present session.

অর্থাৎ অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুলের শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচন্দ্র দাস, রামচন্দ্র দাসগুপ্ত এই পাঁচ জনকে কলেজ ও স্কুল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অপিচ, তাঁহারা বর্ত্তমান সেসন শেষ হইবামাত্র প্রস্থান করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে "বর্ত্তমান" সেসন শেষ হইবে ৩১এ মে। কলেজ সমগ্র জুন মাস, এবং স্কুল উহার অধিকাংশ কাল গ্রীষ্মাবকাশে বন্ধ থাকে, সুতরাং ঐ পাঁচ ভদ্রলোক ছুটীর মধ্যেই কর্ম্মচ্যুত হইলেন। কলেজগুলি খুলিবে ১লা জুলাইর কয়েক দিন পরে।'

বলা অনাবশ্যক, অশ্বিনীবাবু প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া একান্ত অনিচ্ছার সহিত উক্ত সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিলেন। তবে "তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই সর্ত্তে সম্মত করাইলেন যে, বান্ধবসমিতি, দরিদ্র বান্ধব

সমিতি, প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতাগুলি রক্ষা করা হইবে। এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কলেজ কমিটীর সভ্য হইতে পারিবেন না। (১১৯ পৃঃ)

এইবার আনন্দমোহন কলেজে আমার কর্ম্ম পাইবার প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত হইল। ২২এ মে অশ্বিনীবাবু এক পত্রে মিঃ লি মেস্যুয়ারকে জানাইলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের সমুদায় সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব রজনীবাবুকে আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা হউক। ২৯এ লি মেস্যুরিয়ার সাহেব তদুত্তরে বলিলেন, "আপনি সমস্ত সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউডকে জানাইলাম যে, বাবু রজনীকান্ত গুহ যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে. তিনি আনন্দমোহন কলেজে কর্ম্ম করিবার কালে রিজলী সার্কুলার মানিয়া চলিবেন, তবে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করিলে গবর্ণমেণ্ট বাধা দিবেন না।" "অধ্যাপক" কথাটার মধ্যে কূট অর্থ ছিল, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই।

১৯১১ সনের ১লা জুন হইতে ব্রজমোহন কলেজ সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত কলেজে পরিণত হইয়াছে। অনেক বৎসর হইতে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণিং বডির (Governing Body) সভাপতি। কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি এক ডিষ্টীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টে সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেই সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২৪ সনে অপর এক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ (Casting) ভোটে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

বিদায়

এপ্রিলের শেষ দিকে আমাদের বিদায়ের ব্যাপার আরম্ভ হইল। একদিন সায়ংকালে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রগণ এক বিপুল সভা করিয়া

পঞ্চ বিতাড়িত অধ্যাপক ও শিক্ষককে বিদায়ের অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। যথারীতি অভিনন্দনপত্র পাঠ, ছাত্র ও সহযোগী-দিগের বক্তৃতা এবং আমাদিগের প্রত্যুত্তর—অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গই অপূর্ণ রহিল না। সভা ভঙ্গ হইবামাত্র এক ব্রাহ্মণ চিকিৎসক গুহ-বংশীয় ব্রাহ্ম আমার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পর দিন আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই যে নিমন্ত্রণের বহর আরম্ভ হইল, অনেক দিন ধরিয়া তাহা চলিল। ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় প্রতি গৃহেই অভ্যর্থিত হইলাম। প্রাচীন সমাজের অনেক বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইলাম, আমার দুর্ব্বল উদর সকলগুলি রক্ষা করিতে দিল না। পরিশেষে অশ্বিনীবাবু এক রজনীতে কলেজের হলে পঞ্চ সহকর্ম্মীর সম্বর্দ্ধনার জন্য বহু জনকে মিলিত করিয়া বিরাট ভোজন দ্বারা আমাদিগকে সমাদৃত ও সম্মানিত করিলেন।

বিদায়ের নিমন্ত্রণ সম্পর্কে একটা ঘটনা মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাসের সহিত ধীরে ধীরে আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। ইনি আমাকে অকপট প্রীতি করিতেন। ইঁহার পত্নীকে আমি "বৌঠাকুরাণী" বলিয়া ডাকিতাম, ছেলেমেয়েরা আমাকে 'কাকু' অর্থাৎ কাকাবাবু বলিত। যে দিন ইঁহাদের গৃহে আমাদিগের আহার করিবার কথা ছিল, সেই দিনে ভোরে প্রসবের পরে বৌঠাকুরাণীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়া জানিলাম, হৃদয়যন্ত্র বিকল হইবার আশঙ্কা আছে। ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। একটু সুস্থ হইয়াই তিনি আমাকে বলিয়া রাখিলেন "আমি ভাল হইয়া আপনাদিগকে খাওয়াইব।" তার পর কয়েক সপ্তাহ অন্তে নিরাময় হইয়া ইনি পুত্রাদিসহ আমাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

এমন ব্যাপকভাবে এত সহৃদয়তা, সমাদর ও প্রীতি বরিশাল ছাড়া আর কোথাও পাই নাই।

বরিশাল ত্যাগের পূর্ব্বে আমার একটা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইল বসতবাটী বিক্রয় করা। স্ত্রীর নামে উহা ক্রয় করিয়াছিলাম; তাঁহার অভাবে নাবালক পুত্রকন্যা উহার মালিক; এজন্য জজের নিকটে এফিডেভিট করিয়া আমার পিতৃত্ব সাব্যস্থ করিতে হইল; বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, তৎসম্বন্ধেও তাঁহার অনুমোদন গ্রহণ করিলাম।

বাড়ী বিক্রয় করিব, এই খবর পাইয়া প্রথম ক্রেতা আসিলেন মোক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, সঙ্গে ছিলেন আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র একটী উকীল। আমি দাম বলিলাম, পাঁচ হাজার টাকা; তিনি সেই মূল্য দিতেই সম্মত হইলেন। চারি হাজার টাকায় এই বাড়ী কিনিয়াছিলাম বলিয়া লোকে আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াছিল; এবার গালাগলি করিল এইজন্য যে আমি বুদ্ধি থাকিলে ছয় হাজার টাকা পাইতাম।

মে মাসের ২৩এ কি ২৪এ বাড়ী বিক্রয়ের কবলা (deed of conveyance) রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলাম। ক্রেতার অনুগ্রহে এক সপ্তাহ ঐ বাড়ীতেই বাস করিলাম। এত দিনে একরূপ নিশ্চিত জানিতে পারিলাম যে, আনন্দমোহন কলেজে চাকুরী পাইব। পুস্তক, আলমারী, টেবিল, চেয়ার, বাসনপত্র প্রভৃতি গুড্‌স এ ময়মনসিংহে পাঠাইয়া দিয়া আমি ৩১এ মে প্রাতঃকালে বরিশাল ত্যাগ করিলাম।

ইতি বরিশালে দশ বৎসর।

পরিশিষ্ট

যখন নির্দ্ধারিত হইল, আমাকে ব্রজমোহন কলেজ ছাড়িতে হইবে, অথচ আনন্দমোহন কলেজে চাকুরী পাইব কি না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই, তখন স্বভাবতঃই এই সমস্যার উদয় হইল, "অতঃ কিম্ ?"—ইহার পর কি করিব ? ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা উপলক্ষে কলিকাতায় যাইয়া প্রথমেই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করিলাম। আমি সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে গিয়াছিলাম, তিনি তখন সবে মাত্র হাইকোর্ট হইতে গৃহে ফিরিয়াছেন। আমি আসিয়াছি, শুনিয়াই তিনি বৈঠকখানা ঘরে নামিয়া আসিলেন। সেইখানেই ভৃত্য থালাভরা বৈকালিক জলযোগ আনিয়া দিল, তিনি খাইতে খাইতে আমার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। আমাকে ব্রজমোহন কলেজের কাজ ছাড়িতে হইবে, শুনিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আইন পড়া আছে কি ?" আমি বলিলাম, 'না।' "এখন বয়স কত ?" "৪৪ বৎসর চলিতেছে।" "তিন বৎসর 'ল' পড়িয়া বি. এল পাশ করিয়া ওকালতি ব্যবসায় বসিতে বসিতে বয়স অনেক হইয়া যাইবে।" আমি বলিলাম, "সেদিকে আমার রুচিও নাই।" কথায় কথায় স্যর আশুতোষ একটা পরিকল্পনার আভাস দিলেন। বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা, বি. এ. অনার্সে'র শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হস্তে আনয়ন করিবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আমাকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বেতন কত পাইব ?" তিনি একটু ভাবিয়া

উত্তর দিলেন, "পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "বেশ তো; আমার বাড়ী ভাড়াটা চলিয়া যাইবে। অন্যরূপে কিছু উপার্জ্জন করিব।" 'অন্যরূপ' বলিতে আমার মনে ছিল হেরম্ববাবুর প্রস্তাব; তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি Indian Messenger এর সম্পাদক হও, আমরা তোমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিব।" আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। স্যর আশুতোষ কলেজগুলির অনার্স অধ্যাপনায় হস্তার্পণ করেন নাই, কিন্তু অচিরেই এম্. এ. পরীক্ষার শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজে গ্রহণ করিলেন।

স্যর আশুতোষের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার ব্যবহারে অকৃত্রিম দরদীর সহানুভূতি পাইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে বরিশালে "সর্ব্বানন্দ ভবনে" আমার বিদায়-সূচক ব্রাহ্মবন্ধুসভার যে অধিবেশন হইল, তাহাতে এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিলেন, আমার এখন প্রচারক হওয়া উচিত। সে দিকে যে আমার মন না গিয়াছিল, তাহা নয়। কিন্তু এবারও আমি শিক্ষা-ব্রত পালনের সুযোগ পাইয়া তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। যদি ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যেই জীবন সমর্পণ না করিলাম, তবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িব, ইহাও আমার নিকটে শ্রেয়ঃ বোধ হইল না। এজন্য আমি "দাসখৎ" সহি করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রেই পড়িয়া রহিলাম। আমি এখনও বিশ্বাস করি, উচ্চাঙ্গের বিদ্যা বিতরণ, এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাতে দেশমাতৃকার সার্থক সেবা —এই উভয়ের সামঞ্জস্য আমার মত অল্পমতি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

একাদশ অধ্যায়

দুই বৎসরের দুঃস্বপ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মক্ষেত্র

ময়মনসিংহ আমার জন্মস্থান ও শিক্ষাক্ষেত্র। অথচ এই ময়মনসিংহেই ১৯১১ সনের জুলাই হইতে ১৯১৩ সনের জুলাই পর্য্যন্ত আমার জীবনের দুইটী বৎসর যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিল। এমন অস্বস্তি, অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্য দিয়া আমাকে আর কোথাও জীবনপথে চলিতে হয় নাই। তাহার কারণ ছিল দুইটী; প্রথম রাজনৈতিক; দ্বিতীয় সামাজিক।

জুন মাসটা ঢাকায় কাটিল; সেইখানেই আনন্দমোহন কলেজের নিয়োগ পত্র পাইলাম। গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইবে ৫ই কি ৬ই জুলাই; আমাকে কলেজ কমিটী ১লা হইতে নিযুক্ত করিলেন। অশ্বিনীবাবু পদচ্যুত শিক্ষকদিগকে জুন মাসের বেতন দিয়াছিলেন; সুতরাং আমার অধ্যাপকের কার্য্যে একদিনেরও ছেদ ঘটিল না।

জুলাই মাসের গোড়াতেই দুই পুত্র ও ভৃত্য লইয়া ময়মনসিংহে গেলাম। পণ্ডিত মহাশয় ও বাবু হরানন্দ গুপ্ত ষ্টেশনে আসিয়া আমাদিগকে স্বাগত জানাইলেন। কলেজের দারোয়ানও আসিয়াছিল; সে আমাদিগকে আনন্দমোহন কলেজের বাটীতে লইয়া গেল। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় সৌজন্যের সহিত নূতন অধ্যাপককে গ্রহণ করিলেন; আমাদের বাসগৃহের কার্য্য তখনও

শেষ হয় নাই; আমরা কলেজের একটী বৃহৎ কক্ষে স্থান পাইলাম; রন্ধনের জন্য একটু দূরে মুসলমান হোষ্টেলের সংলগ্ন একটী ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল।

দুই একদিন পরেই, প্রাতঃকালে কলেজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে লইয়া গেলেন। মিঃ ব্ল্যাকউড পূর্ব্বে বরিশালে ছিলেন; একদিন আমাদের কলেজে পুলিশের লোক লইয়া একটী ছেলের সন্ধানে গিয়াছিলেন; তখন ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; ১৯০৯ সনে ইঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তাহাও বলিয়াছি।

আমার ময়মনসিংহে যাইবার অল্পদিন পূর্ব্বে এক পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর প্রকাশ্য দিবালোকে জুবিলিঘাটের নিকটে রাজপথে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন; তখন পর্য্যন্ত অপরাধী ধৃত হয় নাই। মিঃ ব্ল্যাকউডের মন এই ঘটনাতে উত্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন ছিল; সেই প্রসঙ্গই তিনি স্বয়ং উত্থাপন করিলেন, এবং অনেকক্ষণ সেই বিষয়েই আলোচনা হইল। তারপর তিনি আমাকে একখানা "প্রতিশ্রুতিপত্র" (Declaration) দিলেন; আমি তাঁহারই কলমে উহা স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদকের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

আনন্দমোহন কলেজটী দ্বিতীয় শ্রেণীর, শুধু ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য পাঠের ব্যবস্থা অছে; কেমিষ্ট্রী পড়াইবার আয়োজন ও সাজসরঞ্জাম চমৎকার। আমি একাই ইংরেজীর অধ্যাপক, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর দুই শাখায় সপ্তাহে ষোল ঘণ্টা পড়াইতাম। পরিশ্রম লঘু; ছাত্রেরা অত্যল্পকালেই অনুরক্ত হইল।

কিন্তু দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই বিষম বিপত্তি ঘটিল।

নাগাইদ ২২এ জুলাই সহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে সরারচর নামক গ্রামে রাত্রিতে একদল যুবক ডাকাতি করিবার অভিপ্রায়ে হানা দিল; গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া বাধা দেওয়াতে যখন তাহারা পলায়ন করিতেছিল, সেই সময়ে একজন গুরুতর আঘাতে অচল হইয়া ধরা পড়িল। সে আনন্দমোহন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, লাহিড়ী-চৌধুরীবংশীয় এক প্রখ্যাত জমিদারের পুত্র। এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার পরে গভর্ণমেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দেখা গেল, ডাকাতির দিন ছাত্রটী মধ্যাহ্নে আমার অধ্যাপনার কালে উপস্থিত বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে; অর্থাৎ নাম ডাকার সময় (at the roll-call) আমি তাহার নামে p. (উপস্থিত) লিখিয়াছি ইহাই হইল আমার প্রথম দুর্দ্দৈব।

আমার দ্বিতীয় দুর্দ্দৈব—ডাকাতির পরদিন কিশোরগঞ্জের অদূরে পথে একটী কিশোরবয়স্ক স্কুলের ছাত্র সন্দেহবশতঃ পুলিশের দ্বারা গ্রেফ্‌তার হইল। সে আমাদিগের গ্রামের সন্নিকটে গলগণ্ডা গ্রামের এক গুহ বংশের সন্তান। আর যাও কোথায়, পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাহাকে দিনের পর দিন জেরা করিয়া আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, আমি এই ডাকাতির মূলে আছি কি না, আমি তাহাদিগকে ডাকাতি করিতে প্রণোদিত করিয়াছি কি না। এই গুহ ছাত্রটীকে আমি কোন কালে দেখি নাই; এবং সে নিজেও ডাকাতির মোকদ্দমার জালে পড়ে নাই।

এক দিন এক পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া আমার দ্বারা বর্ণনাপত্র লিখাইয়া লইয়া গেলেন, আমি ধৃত যুবককে ডাকাতির দিন কেন উপস্থিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি। উহার স্থূল কথা এই—নাম

ডাকিবার সময় বরাবর আমার নিয়ম, ছাত্রেরা একে একে তাহাদের নামের নম্বর বলিয়া যায়, আমি তদনুসারে p মার্ক করি। আমি নূতন আসিয়াছি, অধিকাংশ ছাত্রকেই চিনি না; যদি এক ছাত্র অপর অনুপস্থিত কোনও ছাত্রের নম্বর বলে, তবে আমার তাহা ধরিবার উপায় নাই।

তৃতীয় দুর্দ্দৈবটী ছিল একেবারেই আকস্মিক। একদিন কলেজের ছুটীর পরে নিজের ঘর হইতে বারাণ্ডায় বাহির হইয়া প্রিন্সিপালের কক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি আমাকে দেখিয়াই ডাকিলেন। তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলে তিনি বলিলেন, "এই পুলিশ অফিসার (এক স্বনামখ্যাত ইন্‌স্পেক্টর) কলেজের রেজিষ্টার বহি লইয়া যাইতে আসিয়াছেন; দিব কি?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত আদেশ আপনাকে দিয়াছেন কি?" উত্তর "না"। তখন আমি তাঁহাকে আমার এই মত জানাইলাম, যে ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত আদেশ ছাড়া রেজিষ্টার বহি দেওয়া যাইতে পারে না।

এই কর্ম্মচারীটীই আমাকে ডাকাতিতে জড়াইবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি কলেজে হইতে যাইয়া মিঃ ব্ল্যাকউডকে বলিলেন, "প্রিন্সিপাল রেজিষ্টার বহি দিতে সম্মত ছিলেন, রজনীবাবু দিতে নিষেধ করিলেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট আমার উপরে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন।

১৩ই শ্রাবণ সায়ংকালে সূর্য্যকান্ত টাউন হলে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সভা হইবে, আমাকে সভাপতি করা হইয়াছে। আমি সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে মিঃ ব্ল্যাকউড পুলিশ লইয়া কলেজে আসিলেন, এবং প্রিন্সিপালের ঘরে বসিয়া তাঁহার সমক্ষে আমার বিরুদ্ধে উগ্রভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

"Rajani Babu forbade you to deliver the registers—he will have to explain why he marked that boy present"—"রজনীবাবু আপনাকে রেজিষ্টার দিতে নিষেধ করিলেন; তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, তিনি কেন ঐ ছেলেটাকে উপস্থিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।" শুনিয়াছি, এই কথাগুলি বিরক্তির সহিত ভয়প্রদর্শক ভাষায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন।

আমার আশঙ্কা হইল এক্ষণই আমার খানাতলাসী হইবে। ১৯০৫ সন হইতে সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "দেশের কথা" একখণ্ড আমার ছিল; পরে উহার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। রান্না ঘরে যাইয়া সেখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম, এবং তৎপরে টাউন হলে গেলাম। সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহে আসিয়া দেখিলাম, খানাতলাসী হয় নাই।

যথাসময়ে Additional Magistrate Mr. Nelson এর এজলাসে ধৃত যুবকের বিচার হইল। সরকার আমাকে সাক্ষী মান্য করিয়াছিলেন। কাঠগড়ায় অপরাধীকে দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল—তাহার মাথা প্রায় সমস্তটা ভীষণ আঘাতে দুইভাগ হইয়া গিয়াছিল। বিচারক ডাকাতির দিন তাহার কলেজে উপস্থিত থাকা বিষয়ে আমাকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন না—সে কথাটা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল। বিচারে ছাত্রটীর ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

পূজার ছুটীতে ঢাকাতে মিঃ ব্ল্যাক্‌উডের এক পত্র পাইলাম, তাহার সঙ্গে ছিল এক বেনামী চিঠি। তিনি লিখিয়াছেন, "This has been sent to me by one of your enemies." (আপনার এক শত্রু আমাকে এই পত্র পাঠাইয়াছে।) বেনামী চিঠির একটা বাক্য মনে আছে —

"Remove the Barisal recruit"—"বরিশালের আমদানী লোকটীকে সরাও" (তাড়াইয়া দেও)।

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলাম, "আমি জানি, আপনি যত দিন ময়মনসিংহ জেলার শাসন সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তত দিন আমি নিরাপদ। (So long as you are at the head of the district I am safe.)

ডাকাতির পরেই, আর এক কারণে মিঃ ব্ল্যাকউড আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন কলেজের ভাগ্যাকাশে একে একে তিন কুগ্রহ মিলিত হইল। প্রথমতঃ দুই তিন মাস পূর্ব্বে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়; তাহার প্রতিনিধিবর্গকে অবস্থানের জন্য কলেজের হষ্টেল প্রদত্ত হইয়াছিল; তাঁহাদিগের এক জন ছিলেন শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। এই সংবাদ পাইয়া পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট খুব রুষ্ট হইলেন, এবং প্রিন্সিপালের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কলেজ কমিটী প্রতিনিধিদিগকে হষ্টেলে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, ইহাই হইল তাঁহার কৈফিয়ৎ। কিছুদিন পরে হষ্টেলের একটী হিন্দু ছাত্রের নিকটে একটা পিস্তল পাওয়া গেল। তার পর এই ডাকাতি। একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। কলেজ কমিটীর সভাপতি এক দিন পূর্ব্বাহ্নে কমিটীর সভ্য ও অধ্যাপকদিগকে কলেজের এক কক্ষে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন। আমি ইতোমধ্যে কমিটীতে অধ্যাপকদিগের একতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছি। বিপ্লববাদ প্রতিরোধ করিবার জন্য কি করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মিঃ ব্ল্যাকউড প্রস্তাব করিলেন, অধ্যাপকেরা অতর্কিতভাবে ছাত্রগণের বাক্স খুলিয়া তল্লাস করুন। হঠাৎ এরকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া উপস্থিত

সকলেই অবাক্ হইলেন। অধ্যাপক রাধাবিনোদ পাল ও অধ্যাপক শশিমোহন দাস উহার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিলেন। আমি বলিলাম —"যে শিক্ষক ছাত্রদিগের খানাতলাসী করিবে, তাহার আর শিক্ষকতা করিতে হইবে না ; (his profession will be gone) ; I for one refuse to play the part of a spy"—"অন্ততঃ আমি গোয়েন্দার কাজ করিতে অস্বীকার করিতেছি।" মিঃ ব্ল্যাকউড খুব চটিয়া গেলেন। প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হইল।

আমরা জানিতাম, এই আলোচনা নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। কয়েকদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পাদককে এক পত্রে লিখিলেন, "আমি ঢাকা বিভাগের কমিশনারকে সেদিনকার আলোচনার যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলাম, তাহার নকল আপনাকে দিতেছি। রিপোর্টে আর কাহারও নাম নাই আছে, একা আমার। ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন, Rajani Babu said, "I for one refuse to play the part of a spy." চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নামে আর একটী কাল দাগ পড়িল।

উপর্য্যুপরি কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকউডের উপরে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল কলেজের উন্নতিসাধনের প্রস্তাবে তাঁহাদিগের বাধাপ্রদানে। যমুনাতীরবাসী এক প্রবল জমিদার স্বগ্রামে কয়েকটী ভদ্রলোকের উপরে অত্যাচার করিয়া ফ্যাসাদে পড়িয়াছিলেন। মিঃ ব্ল্যাকউড তাঁহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ না করিয়া কলেজের জন্য তাঁহার নিকট হইতে কয়েক হাজার টাকা (কত ঠিক মনে নাই) আদায় করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে নির্দ্ধারিত হইল, আই. এস্. সি. শ্রেণী খোলা হইবে। সে জন্য কলেজের

কয়েকটী কক্ষ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। যে কণ্ট্রাক্টর কোম্পানী কলেজ-বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইল; তাঁহারা কলেজের হাতায় মালপত্র আনিয়া সঞ্চিত করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটীর অনুমোদন করিলেন না। ইহাতে মিঃ ব্ল্যাকউড অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, আমরাও হইয়াছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ পূজার ছুটীর কয়েক দিন পরে তিনি বদলী হইলেন। কলেজ খুলিবার প্রাক্কালে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ বোনাম-কার্টারের (Bonham-Carter) সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "Mr. Blackwood is going away" (মিঃ ব্ল্যাকউড ময়মনসিংহ হইতে চলিয়া যাইতেছেন)। দিন দুই পরে ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কালে সেই কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি যেন একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন "Did he say so?" (তিনি এইরূপ বলিয়াছেন?) কথার ভাবে বোধ হইল, তিনি বদলীর আঁচ পাইয়াছিলেন, আমার কথায় বুঝিলেন, উহা নিশ্চিত।

শেষের দিকে ব্ল্যাকউড সাহেব আমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার স্থলে মিঃ ফ্রেঞ্চ (French) ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলেন। এইবার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে ত্র্যহস্পর্শের ফল ফলিল। বড় দিনের ছুটীর কিছু দিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হ্যাল্‌ওয়ার্ড N. L. Hallward ফ্রেঞ্চ মহোদয়কে লিখিলেন, "আমি রায়সাহেব ডক্টর পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল করিয়া পাঠাইতেছি।

বাবু তারাপদ মুখার্জ্জীকে পত্রপাঠ বরখাস্ত করিবেন।” অভিজ্ঞ সিবিলিয়ান মিঃ ফ্রেঞ্চ তৎক্ষণাৎ তারাপদ বাবুকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, তিনি পদচ্যুত হইলেন। সম্পাদক ও কমিটীর অন্যান্য সভ্যেরা এই সরাসরি বরখাস্ত করিবার সংবাদ শুনিয়া সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইয়া দিলেন, কমিটীর অজ্ঞাতসারে একা তাঁহার কলেজের কোনও অধ্যাপককে পদচ্যুত করিবার অধিকার নাই। অধিকন্তু তারাপদ বাবু না হয় অধ্যক্ষপদের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন; কিন্তু তিনি সুদক্ষ অধ্যাপক; কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপনায় তাঁহার সুনাম আছে; তাঁহাকে অধ্যাপক রাখিতে আপত্তি কি? মিঃ ফ্রেঞ্চ বুঝিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে; সভ্যদিগের দুই কথাই সঙ্গত। তিনি সম্পাদকের দ্বারা অচিরে কমিটীর সভা আহ্বান করাইলেন। সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে তারাপদবাবু অধ্যক্ষের পদ হইতে অপসৃত হইলেন, এবং অধ্যাপকের কার্য্যে বহাল থাকিলেন। তাঁহার বেতন হইল অধ্যাপকের সর্ব্বোচ্চ বেতন দুই শত পঞ্চাশ টাকা। তারাপদ বাবু কুচবিহারের পেন্সনযোগ্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া ৩০০-১০-৪০০ টাকা বেতনে আনন্দমোহন কলেজে আসিয়াছিলেন এবং এক্ষণে ৩৩০ টাকা পাইতেছিলেন; অধিকন্তু বিনা ভাড়ায় বাসাবাটীও পাইয়াছিলেন। অধ্যক্ষের পদের সহিত তাঁহাকে বাড়ীও ছাড়িতে হইল।

তারাপদবাবু পবিত্রচরিত্র, মিষ্টপ্রকৃতি উদার মতাবলম্বী লোক ছিলেন। সকল বিষয়েই তিনি আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন; আমাদিগের মধ্যে বেশ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। তাঁহার পদচ্যুতি আমার পক্ষেও একটা দুর্দ্দৈবে পরিণত হইল।

১৭ই ডিসেম্বর দিল্লীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের অভিষেকের দিন

ভারতের নগরে নগরে মহোৎসব হইল। তদুপলক্ষে আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণ সম্রাটের চিত্র লইয়া নগর পরিক্রম করিল, অধ্যাপকেরা অনুগমন করিলেন। কলেজ কমিটীর অভিপ্রায় অনুসারে, অভিযান অন্তে ছাত্রগণ এক ময়দানে সমবেত হইলে আমি তাহাদিগের নিকটে অভিভাষণ পাঠ করিলাম। উহা ঢাকার "বিশ্ববার্ত্তা" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার কাছে তার চিহ্নমাত্রও নাই।

পর দিন সংবাদ আসিল, সম্রাট্ দরবারে ঘোষণা করিয়াছেন, বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হইল; অখণ্ড বঙ্গ এক গবর্ণরের অধীনে স্থাপিত হইবে; ভারতের রাজধানী বলিয়া কলিকাতার যে গৌরব ছিল, তাহা অতঃপর দিল্লী লাভ করিবে।

আমি অশ্বিনীবাবুকে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সহিত নিষ্পত্তিবিষয়ে আলোচনার কালে বলিয়াছিলাম, "ডিসেম্বর মাসে সম্রাট্ ভারতে আগমন করিতেছেন; সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন; দেখুন কি হয়।" তিনি বলিলেন, "কথাটা তো ভালই কহিয়াছ।" আমার পরামর্শ শুনিলে ব্রজমোহন কলেজ যে আরামে থাকিতে পারিত, তাহা বলিতে পারি না; কেন না, আমি তীব্ররূপেই অনুভব করিলাম পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার স্মারকচিহ্ন ও মেজাজ রহিয়া গেল।

ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বড় দিনের ছুটীর পরেই আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৮৮৮ সন হইতে ইঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। ইনি সুরূপ, সদালাপী, মিষ্টভাষী পুরুষ ছিলেন। ডাক্তার চাটার্জ্জী ব্রাহ্মসমাজের এক জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা, দুই ভাষাতেই

উত্তম উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ বেতনে চাকুরী করিয়া ইঁহার মনটা একেবারে বিদেশী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল; সেই স্বদেশী যুগে স্বদেশের মমতা ইঁহাকে এক রতিও স্পর্শ করে নাই। ইনি গবর্ণমেণ্টের চক্ষুতে দর্শন করিতেন, গবর্ণমেণ্টের মন দিয়া ভাবিতেন। সিরাজ-গঞ্জের বনোয়ারীলাল ও ভিক্টোরিয়া স্কুল তুলিয়া দিবার প্রচেষ্টা দ্বারা পূর্ণানন্দবাবু খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন; ব্রজমোহন স্কুলের ব্যাপারে যথাস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি বহু বৎসরের পরিচিত এই ব্রাহ্ম বন্ধুর অধীনে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর অধ্যাপকতা করিয়া-ছিলাম, এই সময়টা আমি যে প্রকার মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা বলিবার নয়।

ডাক্তার চাটার্জ্জী আনন্দমোহন কলেজের কার্য্যে যোগ দিবার অল্পকাল পরেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সুপরিচিত মিঃ পোলাক (H. S. Polak) ময়মনসিংহে আসিলেন। এক দিন অপরাহ্ণে তিনি টাউন হলে বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তারাপদবাবু ও আমি উহার সম্মুখ দিয়া ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলাম; বক্তৃতা হইতেছে দেখিয়া আমরা হলে প্রবেশ করিলাম; এবং দশ পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিয়াই চলিয়া গেলাম। পর দিন কলেজে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; এবং কতকটা কৈফিয়ৎ চাহিবার ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাল পোলাকের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন?" উত্তর, "হাঁ"। পোলাকের বক্তৃতা যে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ বস্তু বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহা আমার জানা ছিল না। এই রকম—"আলপিনের খোঁচা" (pin pricks) আরও খাইয়াছি।

"ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"—"মানুষ ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হয়"

আমিও ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিতাম। এই জন্য ইহার পরে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন সম্পর্কে ময়মনসিংহে আগমন করিলেন তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গেলাম বটে, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। তিনি কলেজ দেখিতে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি আমাকে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "Because you come from Barisal ; I wanted to hear things from you." "এই জন্য, যে তুমি বরিশাল হইতে আসিয়াছ, তোমার নিকটে নানাকথা শুনিবার ইচ্ছা ছিল।"

তৎপরে ডাক্তার পি. কে. রায় এবং তাঁহার সহযোগী পরিদর্শক গৌহাটী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ সিডমার্সেন (F. W. Siedmersen) আনন্দমোহন কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহারা যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গেলেন, তখন আমি সেখানে পড়াইতেছিলাম। পরিদর্শক দুইজন, অধ্যক্ষ এবং আমি—সকলেই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। ছাত্রদিগের জন্য কি কি সংবাদপত্র ক্রয় করা হয়, ডাক্তার রায় সেই প্রশ্ন তুলিলেন। আমি অনুচ্চস্বরে তাঁহাদিগকে বলিলাম, "Government does not permit the purchase of some of the best papers"—গবর্ণমেণ্ট কোনও কোনও উৎকৃষ্ট পত্রিকা ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই।" কথাটা ধ্রুব সত্য। তখন কেহ কিছু বলিলেন না; কিন্তু পরিদর্শন শেষ হইলেই পরিদর্শকেরা আমাকে অধ্যক্ষের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইয়া উপবেশন করিলে ডাক্তার রায় আমাকে বলিলেন, "তুমি কি অবস্থার গতিকে (under what circumstances) বরিশাল হইতে

এখানে আসিয়াছ, ইনি (Siedmersen) তাহা শুনিতে চাহিতেছেন।” আমি সংক্ষেপে ঘটনাগুলি বর্ণনা করিলাম। বোধ হয় ডাক্তার রায় বলিলেন, “তুমি ছাত্রদিগের সম্মুখেই বলিলে, ‘Government does not permit the purchase of some of the best papers’—এরূপ বলা কি ঠিক হইয়াছে?” আমি, “But, Sir, I spoke only to the Inspectors” (কিন্তু আমি শুধু পরিদর্শকদিগকে সে কথা বলিয়াছি)।” অমনি মিঃ সিডমার্সেন উষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, “You spoke before the whole class”—তুমি ক্লাশশুদ্ধ ছাত্রের সম্মুখে সে কথা বলিয়াছ।” আমি তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কথায় কথায় ডাক্তার রায় বলিলেন, তুমি বরিশালের স্বাধীন হাওয়াতে (in a free atmosphere) বাস করিয়াছ; সে ভাবটা এখনও আছে।” (অর্থাৎ এখানে একটু সাবধানে চলা উচিত।)

ডাক্তার রায় আমাকে স্নেহ করিতেন; ১৮৮৯ সন হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। পরিদর্শন শেষ হইলে তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে সার্কিট হাউসে গেলাম। তিনি আমাকে অনন্য চিত্তে শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। আমি যে বরিশালে রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছিলাম, সেটা তিনি আদবেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, একাগ্রচিত্তে জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত না থাকিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারে না।

আমি মেগাস্থেনীসের অনুবাদের কথা তাঁহাকে জানাইলাম; তিনি শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন। পর দিন রেল ষ্টেসনে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে গেলাম। তাঁহারা দুজনেই এক কামরায় ছিলেন। ডাক্তার রায় আমাকে দেখাইয়া হাসিমুখে বলিলেন,

"He has translated Megasthenes into Bengali from the original Greek."

কয়েক দিন পরে ডাক্তার রায়কে এক খণ্ড মেগাস্থেনীস পাঠাইয়া দিলাম। তিনি আনন্দ করিয়া অনেক সদুপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন।

ডাক্তার রায়ের সহিত বরিশালে একদা আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল এস্থলে তাহার মর্ম্ম লিখিয়া রাখিলাম।

আমি—শুনিয়াছি, আপনি হল্‌ডেনের (R. B. Haldane পরে Lord Haldene) সহিত একত্র পাঠ করিয়াছেন।

ডাক্তার রায়—হ্যাঁ, তিনি আমার সহাধ্যায়ী। আমরা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম (we were bracketed first); বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে প্রাচীরের গাত্রে আমাদের যুগ্ম নাম লিখিত আছে।

আমি—And Haldane is now a cabinet minister (War Secretary); and you could not be even a Director of Public Instruction. হল্‌ডেন এখন ইংলণ্ডের সমরসচিব, আপনি ডিরেক্টর অব্‌ পাব্‌লিক ইনষ্ট্রাক্‌শনও হইতে পারেন নাই।)

ডাক্তার রায় (আবেগের সহিত)—না, না, আমি ডিরেক্টর হইতে চাই নাই; আমি বেশ আছি।

আমি—সে স্বতন্ত্র কথা।

এক দিন মিঃ ফ্রেঞ্চ কমিটীর অধিবেশনে প্রস্তাব করিলেন, কলেজের আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রবেতন এক টাকা বৃদ্ধি করা হউক। অধ্যক্ষ, সম্পাদক, বা অপর কোনও সভ্য

তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। আমি বলিলাম, ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করিলে কলেজটী আমূল বিদীর্ণ হইবে। (The college will be shattered to its base.) তিনি বিরক্তির সুরে উত্তর দিলেন, "কলেজের আয়ে ঘাটতি পড়িয়াছে, কে টাকা দিবে?" আমি বলিলাম—"A magistrate has built it up, and only a magistrate can save it"—"এক ম্যাজিষ্ট্রেট কলেজটী গড়িয়া তুলিয়াছেন; (শুধু) আবার এক ম্যাজিষ্ট্রেটই ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন।" তিনি কথাটা কাণে তুলিলেন না। পরিশেষে সম্পাদক ও অন্য কোন কোনও সভ্য পরামর্শ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, কয়েকটী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়িতে দেওয়া হইবে, এই সর্ত্তে ছাত্রবেতন এক টাকা বৃদ্ধি করা হউক। এই প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

ডাক্তার চাটার্জ্জী আমাকে পরে জানাইলেন, আমার সম্বন্ধে মিঃ ফ্রেঞ্চের ধারণা খারাপ।

১৯১২ সনের বর্ষাকালে অখণ্ড বঙ্গের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল (Carmichael) ময়মনসিংহে আগমন করিলেন। তিনি কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অধ্যক্ষ এবং কমিটীর সভ্যগণ—তন্মধ্যে আমিও ছিলাম,—গাড়ী-বারাণ্ডার সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গবর্ণর মহোদয় আসিয়া সকলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। তাঁহার পরিদর্শনে অধিক সময় লাগে নাই।

লর্ড কারমাইকেলের সম্মানার্থ সূর্য্যকান্ত টাউন হলে অভ্যর্থনা সভা এবং মহারাজা শশিকান্তের আলেকজাণ্ড্রা ক্যাসলে উদ্যান সম্মিলন হইল। দুইটীতেই উপস্থিত ছিলাম।

ফ্রেঞ্চ সাহেব ঢাকা বিভাগের কমিশনার হইয়া চলিয়া গেলেন,

তাঁহার স্থলে মিঃ স্প্রাই (H. S. Spry) আসিলেন। ইনি অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক ছিলেন। ইহার সহিত আমার সহিত পুনঃ পুনঃ অপ্রীতিকর বাদবিসংবাদ হইয়াছিল।

১৯১২ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পরেই ডাক্তার চাটার্জ্জী আনন্দ মোহন কলেজ বি. এ. ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কলেজ কমিটী প্রস্তাবটী অনুমোদন করিলে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ কুক্‌লার (Kuchler) ময়মনসিংহে আসিয়া কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদক, প্রিন্সিপাল প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া একটা পরিকল্পনা (scheme) প্রস্তুত করিলেন। যথাসময়ে আনন্দমোহন কলেজকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিবার আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্যে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্থির হইল, ১৯১৩ সনের গ্রীষ্মের ছুটীর পরে তিনি চলিয়া যাইবেন। শীতের অবসানে (১৯১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ডাক্তার পি. কে. রায় এবং তদীয় সহযোগী, প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক মিঃ জে. এন্. দাসগুপ্ত আনন্দমোহন কলেজ দেখিয়া গেলেন। তাঁহারা রিপোর্টে বি. এ. অধ্যাপনার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন কিন্তু ইংরেজী অনার্স পড়াইবার পক্ষে তাঁহারা অনুকূল মত দিলেন না। এতৎ সম্পর্কে তাঁহারা লিখিলেন, "আশা করা যাইতে পারে, বাবু রজনী কান্ত গুহ এই কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন না" (It is expected that Mr. Rajani Kanta Guha will continue in this College.) আনন্দমোহন কলেজে বি. এ. শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইবার যোগ্য লোক আছে, এই মতের সপক্ষে কথাটা বলা হইল। অনার্স

পড়াইবার সপক্ষে মত না দিবার কারণ অধ্যাপক দাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন। মার্চ্চ কি এপ্রিল মাসে দারভাঙ্গা ভবনে তাঁহার সহিত দেখা হইতেই তিনি বলিলেন, "অনার্স ক্লাস খুলিলে আপনি প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে মোটে যাইতেই পারিবেন না, এই জন্য আমরা অনার্স পড়াইবার আবেদন অনুমোদন করি নাই।"

পূর্ণানন্দবাবু পরিদর্শকদিগের রিপোর্ট পাইবার পরে একদা আমার এক বন্ধুকে বলিলেন, "রজনীবাবুর জন্যই অনার্স পড়াইবার অনুমতি পাওয়া গেল না। তাহার documentary evidence (কাগজপত্রের প্রমাণ) আছে।" বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রমাণ আনিতে গেলেন ; কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে কিছুই দেখাইলেন না।

ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটীতে নূতন অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রশ্ন উঠিবে। ডাক্তার চাটার্জ্জীর কথার ভাবে বুঝিয়াছিলাম, আমার কোনও আশা নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় এবং অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর গুহ আমার পক্ষে ছিলেন। শ্যামাচরণবাবুর পরামর্শে স্প্রাই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, আমার প্রিন্সিপালের পদ পাইবার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং আবেদন না করাই ভাল। "তবে ইচ্ছা করিলে তুমি কলিকাতায় যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতে পার।" আমাকে মার্চ্চ মাসে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা উপলক্ষে কলিকাতায় যাইতেই হইবে, কাজেই ফেব্রুয়ারী মাসে গেলাম না। ১২ই ফেব্রুয়ারী আমার পত্রোত্তরে অশ্বিনীবাবুর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের নকল পাইলাম ; পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত

হইয়াছে। নাগাইদ ২০এ কমিটীর অধিবেশন হইল। টেবিলের এক পার্শ্বে মধ্যস্থলে সভাপতি-ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার বাম দিকে অধ্যক্ষ বসিতেন; সভাপতির ঠিক সম্মুখে আমি বসিতাম। মিঃ স্প্রাই প্রথমেই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—"I propose that applications for the post of principal be invited from outside." (বাহির হইতে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হউক)।

আমি—"Does it mean, Sir, that no member of the staff will be permitted to apply?" (ইহার কি অর্থ এই যে অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ আবেদন করিতে পারিবে না?)

Mr. Spry (রুক্ষভাবে)—"Which member of the staff wants to apply?" (কোন্ অধ্যাপক আবেদন করিতে চাহেন?")

আমি—"I want to apply" (আমি আবেদন করিতে চাই)"

Mr. Spry—"তুমি আবেদন করিতে চাও? তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার প্রিন্সিপালের পদ পাইবার কোনই আশা নাই—ইচ্ছা করিলে কলিকাতায় যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতে পার। যাও নাই কেন? তুমি আবেদন করিবার অনুমতি পাইবে না" (you will not be permited to apply.)

এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া সম্পাদক শ্যামাচরণবাবু ও শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর গুহ তাঁহাদিগের মতানৈক্য (dissent) জানাইলেন; এমন কি গবর্ণমেণ্ট প্রসিকিউটর মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল—যিনি আমার অধ্যাপকপদে নিয়োগে আপত্তি করিয়াছিলেন—বলিলেন,

"Will not be permitted to apply"—এ কি রকম কথা? মিঃ স্প্রাই মুস্কিলে পড়িলেন। তখন ডাক্তার চাটার্জ্জী তাঁহাকে বলিলেন, "He may apply, but you are not bound to receive his application" ("সে দরখাস্ত করিতে পারে, কিন্তু আপনি তাহার দরখাস্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।") ম্যাজিষ্ট্রেট অমনি হাত নাড়িয়া আমাকে বলিলেন; "If you send in your application I will send it back." (তুমি যদি দরখাস্ত পাঠাও আমি তাহা ফেরৎ দিব)।

আমার স্পষ্টই বোধ হইল, আমার সহিত পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট-সভাপতি তাহার বিপরীত ব্যবহার করিতে-ছেন। আমি ঢাকার কমিশনারকে তার করিলাম, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই; অনুগ্রহপূর্ব্বক দিন ও সময় জানাইবেন।" উত্তরের জন্য অগ্রিম টাকা দিলাম। তাঁহার উত্তর পাইয়া ২৬এ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে ঢাকায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কমিশনার মিঃ বেল (N. D. Beatson Bell) কয়েক বৎসর বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমাকে কলেজ কৌন্সিলের সভাপতি প্রিন্সিপালের পদের জন্য আবেদন করিতে অনুমতি দেন নাই ইহা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "you were not permitted to apply?" (তুমি দরখাস্ত করিবারই অনুমতি পাও নাই?) "Give me a small petition"—(ছোট একখানা দরখাস্ত আমাকে দাও।) বলিয়া পাঁচ আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলাম।

দরখাস্তের নকল

To

The Commissioner,

Dacca Division.

Sir,

I have the honour to state that the post of Principal of Anandamohan College will shortly fall vacant, and I had a desire to apply for it. But I was not allowed to do so, as the President of the College Council had doubts as to my nomination, if made, meeting with approval of government. Under the circumstances I most respectfully solicit the favour of your kindly permitting me to apply for the post.

I beg leave to add that since I was appointed Professor in the A. M. College in July 1911, I have been loyally abiding by the undertaking given by me.

I have etc. etc.

Feb. 26, 1913.

দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়া অপরাহ্নে ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইবার মানসে আমি ঢাকা ষ্টেসনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে মিঃ বেল সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। আমি ভাবিলাম, অবস্থা অনুকূল, ন্যায্য বিচার পাইব।

দশ দিন কোনও উত্তর পাইলাম না। ওদিকে স্থির হইয়াছে ১২ই মার্চ্চ কলেজ কমিটীর সভাতে অধ্যক্ষপদপ্রার্থীদিগের আবেদন বিবেচিত হইবে। ৫ই মার্চ্চ এই কথা জানাইয়া কমিশনার মহোদয়কে এক স্মারকলিপি পাঠাইলাম ; ১১ই পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর আসিল না। ঐ দিন তাঁহাকে টাকা জমা দিয়া উত্তরের জন্য টেলিগ্রাম করিলাম। কলিকাতা হইতে তিনি জবাব দিলেন "See no reasons to interfere"—"এই ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না।"

১২ই তারিখের সভাতে দেখা গেল, অধ্যক্ষ পদের যোগ্য কাহারও দরখাস্ত আইসে নাই।

দশ বার দিন পরে আমি পরীক্ষা উপলক্ষে কলিকাতায় গেলাম। যে দিন বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব মিঃ লায়নের (P. C. Lyon) সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই দিন প্রাতঃকালে দৈনিক কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হইল, দিল্লী অঞ্চলের মিঃ কেরী (Cary) নামক এক শ্বেতাঙ্গ আনন্দমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল মনোনীত হইয়াছেন। আমি মধ্যাহ্নে কেরানীখানায় যাইয়া মিঃ লায়নের নিকটে আমার কার্ড পাঠাইয়া দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে আহ্বান করিলেন, এবং আমি কক্ষে প্রবেশ করিতেই আসন হইতে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া করমর্দ্দন করিয়া সমাদরের সহিত আমাকে বসাইলেন। আমার সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন শুনিয়া মিঃ লায়ন হাসিমুখে বলিলেন, "Mr. Cary has been appointed (Principal)." আমি আমার কাগজপত্র তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া বলিলেন, "We agreed to make you Professor, not Principal. There is Tarapada Babu. You have no

claim." (আমরা তোমাকে প্রফেসার করিতে রাজি হইয়াছি, প্রিন্সিপাল নয়। তারাপদবাবু আছেন—তোমার কোনও দাবি নাই।)

এইবার বুঝিলাম, মিঃ লি. মেস্থুরিয়ার যে 'প্রফেসার' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি। আমার যতদূর সাধ্য করিলাম, কিছু হইল না। তারপর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আমাকে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিকট লইয়া গেলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "লর্ড কারমাইকেলকে বলিতে পারি, কিন্তু কোনও ফল হইবে না।"

"বাঘের কামড়ে আঠার ঘা'!" এই ১৯১৩ সনেই ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ময়মনসিংহে ফিরিয়া গেলাম। তারপর মিঃ কেরী লিখিলেন, তিনি আসিবেন না। অতঃপর কমিটীর এক অধিবেশনে আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম—"Resolved that government be requested to lend the services of a man who is a First Class M. A. of the Calcutta University, or of a man with European qualifications." (গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক, তাঁহারা এমন একটী লোক দিন যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম. এ., অথবা যাঁহার কোনও ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে।)

প্রস্তাবটী বিনা বাধায় গৃহীত হইল। যাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন কথাতেই উচ্চবাচ্য করিতেন না, এমন কেহ কেহ সভাভঙ্গের পরে বলিলেন, "রজনীবাবুর প্রস্তাবের দ্বারা কমিটীর স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল।"

এই নির্দ্ধারণের পরে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড (Archbold) অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র মজুমদারের দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করিলেন; তৎসঙ্গে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে অবিনাশবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষানৈপুণ্যের অজস্র প্রশংসা ছিল। এক দিন অপরাহ্ণে কমিটীর অধিবেশনে দরখাস্ত বিবেচিত হইল। পদ-প্রার্থী ইংরেজী ও দর্শনে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ., আমরা তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিলাম না। প্রিন্সিপাল মহাশয় বলিলেন, "No, he is not fit"—"না, ইনি এই পদের যোগ্য নহেন।" অবিনাশবাবুর নিয়োগ হইল না। এ হইল সায়ংকালের বৃত্তান্ত। রাত্রিতে মিঃ স্প্রাই ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের পত্র ও তৎসহ অবিনাশবাবুর দ্বিতীয় দরখাস্ত পাইলেন। অধ্যাপক মজুমদার একখানি দরখাস্ত প্রিন্সিপালের ও অপরখানি ডিরেক্টরের বরাবর পাঠাইয়াছিলেন; দুইখানি অগ্রপশ্চাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তগত হইয়াছে। ডিরেক্‌টর পদপ্রার্থীর প্রশংসাসূচক কিছুই লেখেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, অবিনাশবাবুকে নিযুক্ত করিলে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আবশ্যক হইবে।

পর দিন প্রাতঃকালে মিঃ স্প্রাই কমিটীর মিটিং ডাকিবার নোটীশ দিলেন, এবং লিখিলেন, "গত রাত্রিতে তিনি ডিরেক্‌টরের নিকট হইতে অবিনাশবাবুর উচ্চ প্রশংসাসূচক (highly recommending him) এক পত্র পাইয়াছেন" ইত্যাদি।

যথাসময়ে সভার অধিবেশন হইল। মিঃ স্প্রাই অবিনাশবাবুকে অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করিলেন। অধ্যক্ষের প্রথম শ্রেণীর এম্. এ. হওয়া চাই—কমিটীর এই নির্দ্ধারণ উড়িয়া গেল,

আমাদিগের আপত্তি টিকিল না, প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

সহরে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র সর্ব্বসাধারণের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। মান্য-গণ্য কয়েক ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের আপত্তি জানাইলেন। তাঁহারা ইহাও বলিলেন, কমিটীর নির্দ্ধারণ আছে, প্রিন্সিপাল প্রথম শ্রেণীর এম্. এ হইবেন, অবিনাশবাবু তো দ্বিতীয় শ্রেণীর এম্. এ.। মিঃ স্প্রাই বলিলেন, "প্রথম শ্রেণী" বলিয়া তো নির্দ্ধারণে কোনও কথা নাই, এই দেখুন কার্য্য-বিবরণে কি আছে—"Who is an M. A. of the C. U.—" তাঁহারা গোপনে আরও কিছু বলিয়াছিলেন, যৎসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সভাপতি নিজে নির্দ্ধারণগুলির চুম্বক লিখিতেন, এবং কার্য্য-বিবরণের বহি তাঁহার নিকটে থাকিত, এবং সভাতে তিনি নিজে উহা পাঠ করিতেন।

এক বন্ধু সংবাদ দিলেন, "প্রথম শ্রেণী" কথাটা কার্য্য-বিবরণে নাই। আমি সতর্ক রহিলাম।

ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আমি পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিতাম। একদিন তিনি আমার বাড়ীতে আসিলে বলিলাম, "আপনারা তো আমাকে প্রিন্সিপাল করিলেন না। আমার বেতনটা তবে বাড়াইয়া আড়াই শত টাকা করুন।" তিনি বলিলেন, "আমার তাহাতে আপত্তি নাই—সেটা বোধ হয় হইতে পারে।"

তারপরেই কমিটীর যে অধিবেশন হইল, তাহাতে স্প্রাই সাহেব আসন গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "I made certain enquiries about Babu Abinash Chandra Majumdar, and I think

as the result of it the appointment must be cancelled." (আমি অবিনাশবাবুর সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহার ফলে তাঁহার নিয়োগ নাকচ করিতে হইবে।) শ্যামাচরণবাবু অমনি "Thank you, Sir, Thank you, Sir," বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে সভাপতি পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। পাঠ শেষ হইলে আমি বলিলাম' "Sir, there is an inaccuracy at one place." (এক স্থলে একটু ভুল আছে।) Mr. Spry (জোরে)—What is it ? (কি ?)

Guha—"My proposal was—that Govt···who is a *First* class M. A. & etc. etc."

Mr. Spry (উষ্ণভাবে)—"You did not say so." (তুমি তা' বল নাই।)

Guha—"I said so not once, but thrice." (একবার নয়, তিনবার বলিয়াছি।)

তখন Spry সাহেব রুষ্ট হইয়া দ্রুতগতিতে কত কি বলিয়া গেলেন, সকল কথা ধরিতে পারিলাম না। পরে খবরের কাগজে এক পত্রপ্রেরকের পত্রে দেখিয়াছিলাম, স্প্রাই নাকি বলিয়াছিলেন, "আমি পুর্ব্বেই জানিতাম তুমি এইরূপ বলিবে।" পত্রপ্রেরক আমার নিন্দাচ্ছলে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই।

সভার পরে সম্পাদক শ্যামাচরণবাবুকে বলিলাম, "কৈ আপনারা যে কিছু বলিলেন না, ইহার কারণ কি ?" তিনি বলিলেন, "আপদ তো চুকিয়াই গেল, গোলমাল করিয়া কাজ কি ?"

তারপরে আমার বেতন বৃদ্ধির কথা উঠিল। মিঃ স্প্রাই আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "On what grounds" (কি হেতু) তোমার বেতন বৃদ্ধি করা হইবে ?" আমি বলিলাম, "যে হেতু আপনারা তারাপদবাবুকে মাসে আড়াইশ টাকা দিতেছেন।"

Mr. Spry— "There has been a reduction of eighty rupees." (তারাপদবাবুর বেতন আশী টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।)

মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল—"He is your senior" (তিনি আপনার আগে পাশ করিয়াছেন।)

আমি—"Senior by one year only" (মোটে একবৎসর আগে)।

সভাপতি অধ্যক্ষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "I don't mind giving him Rs 250"—(ইঁহাকে ২৫০৲ দিতে আমার আপত্তি নাই)।

অধিকাংশের মতে প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইল। সেই দিন সভা হইতে যাইয়াই এক বন্ধুকে বলিলাম, আমি ময়মনসিংহ ছাড়িয়া চলিলাম।

আর একটা কথা বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের বিবরণ শেষ করি।

আমি আনন্দমোহন কলেজে পদার্পণ করিয়াই দেখিলাম, ইংরেজীর অধ্যাপকের জন্য যে বাটী নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা খুব ছোট ; তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক। সম্পাদক মহাশয়কে কি কি চাই, বলিলাম। তিনি সুপারভাইজার দ্বারা প্ল্যান ও এষ্টিমেট করাইয়া কৌন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, আনুমানিক ব্যয় প্রায় এগারশত টাকা। সভাপতি মিঃ ব্ল্যাকউড ও কৌন্সিল বিনা আপত্তিতে তাহা মঞ্জুর করিলেন। তাঁহাদিগের এই সদাশয়তা সবিশেষ প্রশংসনীয়।

পূজার ছুটীর পরে নবগৃহে প্রবেশ করিলাম। আনন্দমোহন কলেজের অধিকারে প্রায় ত্রিশ বিঘা জমি ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাণ্ড দীঘি ; তাহার পশ্চিমে আমার বাসভবন, চারিদিক খোলা।

১৯১২ সনের প্রারম্ভে বীণাকে নিজের কাছে আনিলাম ; সে বিদ্যাময়ী স্কুলে পড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক অশান্তি

ময়মনসিংহের নৈতিক বায়ু কি প্রকৃতির ছিল, এই সহরে আগমনের পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইলাম। ঢাকায় থাকিতে দাদার একখানি পত্র পাইলাম। তখন আমার আনন্দমোহন কলেজে যাওয়া একপ্রকার স্থির হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি পরিদর্শক অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে আনন্দমোহন কলেজ পরিদর্শনের জন্য ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন সেখান হইতে আসিয়া আমাকে একদিন বলিলেন, "রজনীবাবু ময়মনসিংহে যাইতেছেন, ভালই হইল ; সেখানে তাঁহার বিবাহও স্থির হইয়াছে।" তিনি যে শিক্ষিতা মহিলাটির নাম করিয়াছিলেন, আমি তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখি নাই, তাঁহার নামও শুনি নাই।

ময়মনসিংহে যাইবার অত্যল্পকাল পরেই একদিন সন্ধ্যার সময় শ্যামাচরণবাবুর গৃহে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি ; ডাকপিয়ন একখানা পত্র দিল ; খুলিয়া দেখি, বেনামী চিঠি, ঐ মহিলার জঘন্য কুৎসায় পরিপূর্ণ। বুঝিলাম, এ বেনামী চিঠির দেশ। ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, ব্রাহ্ম-সমাজ দুই দলে বিদীর্ণ হইয়াছে ; দলাদলির মূলে ধর্ম্মগত মতভেদ কিছুই নাই ; আছে পরনিন্দা। নিন্দার লক্ষ্য,

যিনি সুদীর্ঘকাল ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, এবং এক্ষণে জরা এবং দুরারোগ্য রোগে দিনের পর দিন অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন, আমার ভক্তিভাজন সেই ঋষিকল্প পুরুষ এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শিক্ষিতা আত্মীয়া। সপ্তরথীর ব্যূহে, সাধারণী ও নববিধানী, পুরাতন ও নবাগত, উভয় শ্রেণীর সভ্যই ছিলেন। আমার অপরাধ, আমি আমার শিক্ষক ও ধর্ম্মাচার্য্যের বিরোধী দলে জুটিতে পারিলাম না; সে অপরাধের ভার আরও গুরু হইয়া উঠিল এইজন্য যে, আমি তাঁহার আই. এ. পরীক্ষার্থিনী এক কন্যাকে তাঁহার অনুরোধে ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এই কারণে প্রতিপক্ষের দুর্জ্জয় বৈরিতা আমার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

আমি প্রথমে একটু সমাদর পাইয়াছিলাম—তাহার প্রমাণ, প্রতিপক্ষের একজন আমাকে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্ম-সমাজে "জীবনের স্বরসন্ধি" নামে এক বক্তৃতা করি। অনতিবিলম্বে কায়স্থকুলকজ্জল এক ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কোনও শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম-প্রচারকের জামাতা, কলেজে আমার সহিত আলাপ করিতে গেলেন। প্রথমতঃ বক্তৃতার সমালোচনাচ্ছলে বলিলেন, "You talked rank sedition"—"আপনি রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা করিয়াছেন।" আমি তো শুনিয়া অবাক। বরিশাল, ঢাকা, কলিকাতায় এই বক্তৃতা করিয়াছি, কেহই এমন কথা বলে নাই। তারপর তিনি ঐ সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন; আমি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "আপনি মনে রাখিবেন, ইনি আমার শিক্ষক।" সেইদিন হইতে ইহার সম্বন্ধে আমি "দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ," এই নীতির অনুসরণ করিতাম।

একদিন সায়ংকালে এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ী গিয়াছি; ক্ষণকাল পরেই কোনও শ্বেতশ্মশ্রু ব্রাহ্ম সেখানে যাইয়া উপস্থিত। তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া টাউন হলে লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় কাগজ পাতিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কত কি বলিয়া গেলেন, লক্ষ্য হইল ঐ পূজ্য মানুষটী। কথার ভাবে বোধ হইল, সুনীতি রসাতলে যাইতেছে, তিনি তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য 'পাগলপারা' হইয়াছেন।

ইনিই আর এক দিন গভীর নিশীথে ডাক্তার বিপিনবিহারী সেনকে জাগাইলেন; ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে, মুখে কথা সরিতেছে না। "এ হলো কি? অমুকের কন্যা রজনীর বাড়ীতে পড়িতে যাইয়া সেখানেই রাত্রি যাপন করিয়াছে।" কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এই বহুজ্ঞ পুরুষ নিজেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার মাতুল পাগল ছিলেন। "নরাণাং মাতুলাক্রমঃ।"

ঐ যে শিক্ষিত মহিলাটীর কথা বলিয়াছি, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইল, একটু ঘনিষ্ঠতাও জন্মিল। আমি সময়ে সময়ে ইঁহাকে হষ্টেলে দেখিতে যাইতাম। এক দিন বৈকালে ইনি এবং ইঁহার এক সহযোগিনী কলেজের সন্নিকটে একটা বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গেলেন, কোনও কারণে স্কুলের ছুটী হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিলেন; আমার গৃহে তখন দুই পুত্র, এক ভাগিনেয় এবং কন্যা বর্ত্তমান। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া—তখন বেলা প্রায় ৪টা—আগন্তুক মহিলা দুইটীর জন্য কিঞ্চিৎ জল-যোগের ব্যবস্থা করা হইল। পূর্ণানন্দবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা কুলদা চট্টো-পাধ্যায় পাশের বাড়ীতেই থাকিতেন; তিনিও অভ্যর্থনায় যোগ দিলেন।

ইহার পরে এক দিন কি প্রয়োজনে স্প্রাই সাহেবের সহিত দেখা

করিতে গিয়াছি। কাজের কথা হইয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন—

"It has been reported to me that you go to the hostel at all hours. And one day the Head Mistress and another lady teacher went to your house and partook of sweets."

আমি বলিলাম, "It is not true that I go to the hostel at all hours. I have no special interest in it. You will understand the state of feeling here, from the fact that before I set foot in Mymensingh, the rumour was circulated that my marriage with that lady was settled."

Mr. Spry—"I did not know that."

আমি—As to the ladies partaking of sweets, Mrs. Chatterjee was present there.

Mr. Spry (বিস্ময়ের সহিত)—"Did Mrs. Chatterjee partake of the sweets ? That puts altogether a different complexion on the affair."

[অস্যার্থঃ—আমি শুনিয়াছি, তুমি যখন তখন হষ্টেলে যাও। এবং একদিন প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও অপর এক শিক্ষয়িত্রী তোমার গৃহে গিয়াছিলেন এবং জলযোগ করিয়াছিলেন।

"আমি যখন তখন হষ্টেলে যাই, এ কথা ঠিক নয়। সেখানে যাইবার আমার বিশেষ গরজ কিছুই নাই। এখানকার মনোভাব কি প্রকার, ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি ময়মনসিংহে

পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই গুজব রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, ঐ মহিলার সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে।

"জলযোগ সম্বন্ধে বলিতে চাই, যে ডাক্তার চাটার্জ্জীর স্ত্রী তাহাতে উপস্থিত ছিলেন।"

"মিসেস চাটার্জ্জী জলযোগ করিয়াছিলেন? তবে তো ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম দাঁড়াইতেছে।"]

এই ধূমায়মান বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ ফল প্রসব করিল ১৯১৩ সনের জন্য ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য নির্ব্বাচনে। পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন; আমি আচার্য্য মনোনীত হইয়াছিলাম ১৯১২ সনে। এবার আচার্য্য নির্ব্বাচনের সভাতে সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত। গত বৎসর ছয় জন আচার্য্য মনোনীত হইয়াছিলেন,—পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরজনীকান্ত গুহ। প্রথমেই এক জন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, ১৯১৩ সনের জন্য চারি জন আচার্য্য মনোনীত হউন। সেই প্রস্তাবই গৃহীত হইল, ছয় জন নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব টিঁকিল না। তৎপরে ঐ ছয় জনের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল। সভ্যগণ লিখিত ভোট প্রদান করিলেন, (voted by ballot)। সভাপতি লিখিত নামগুলি বলিয়া গেলেন, একজন তাহা চিহ্নিত করিলেন। প্রত্যেক নামের ভোট-সংখ্যা গণনার পরে সভাপতি ঘোষণা করিলেন, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরানন্দ গুপ্ত আচার্য্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, "সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইল," এই

বলিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম এ কি? যিনি আযৌবন ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার নিকটে কত উৎসাহী ধর্ম্মানুরাগী যুবক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, ময়মনসিংহের প্রতি অনুরক্তি যাঁহার এত গভীর ছিল, যে উচ্চতর বেতনের প্রলোভনও তাঁহাকে অন্যত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই প্রখ্যাত আচার্য্য আজ পদচ্যুত হইলেন, সে জন্য তাঁহার সমসাধক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছেন! আমি মনের যাতনায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলাম।

ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা এবং উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যেও অনেকে এই নির্ব্বাচনবিভ্রাটে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা পুনশ্চ সভা আহ্বান করিবার জন্য সম্পাদকের নিকটে লিখিত প্রার্থনা (requisition) প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে সভা আহূত হইল। সম্পাদকের অনুরোধে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ মহিমচন্দ্র ঘোষ, I. C. S., সভাপতির কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, সুতরাং সভার কার্য্যে কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। বারিষ্টার মিঃ চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হইল—পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ ও শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এই দুইজনও আচার্য্য মনোনীত হইলেন। এই সময়ে পণ্ডিত মহাশয় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দূরদেশে ছিলেন।

এই ক্লেশকর ঘটনার কয়েক মাস পরেই আমি ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করি, এবং কলিকাতা হইতে সম্পাদকের নিকট আচার্য্য-পদত্যাগের পত্র পাঠাইয়া দিই। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যোগ এইখানেই শেষ হইল।

২

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য

১৯১১ সনে আমি ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম, উপাসনার কার্য্য করি নাই, কারণ আমি আচার্য্য ছিলাম না।

"জীবনের স্বরসন্ধি" শীর্ষক প্রথম বক্তৃতাটী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ৮ই ভাদ্র (২৪এ আগষ্ট) ব্রহ্মমন্দিরে "ধর্ম্মসেতু" নামক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

বড় দিনের ছুটীতে কলিকাতায় একেশ্বরবাদী সম্মিলনে যোগ দিই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকারের অনুরোধে ২৮এ ডিসেম্বর সিটী কলেজের হলে ইংরেজী বক্তৃতা করি। বিষয়ের নাম ছিল না, সেণ্ট ফ্রান্সিসের (of Assisi) প্রসঙ্গ লইয়া বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। পুরুষনারীতে হলটী পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমার পরেই অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন সেণ্ট ফ্রান্সিসের জীবনী ধরিয়াই তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি শেষ হইলে যেই আমি মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলাম, অমনি নিজাম রাজ্যের হায়দরাবাদবাসী ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা) আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনাকে মিসেস বানার্জ্জীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিই।" মহিলাটী আমার করমর্দ্দন করিলেন, এবং বক্তৃতাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। নিকটেই শ্রীমতী নাইডু দাঁড়াইয়াছিলেন, অত বড় বক্তার সমক্ষে বক্তৃতার প্রশংসা শুনিয়া আমি অপ্রস্তুত হইলাম। বহুজনের মুখেই সুখ্যাতি শুনা গেল, কেন জানি না।

তারপর আমি মহা গোলে পড়িয়া গেলাম। মিসেস বানার্জ্জি কে, বুঝিতেই পারিলাম না। যাত্রীনিবাসে অনুসন্ধান করিবার কালে ডাক্তার বিপিনবিহারী রায় (Dr. V. Roy) আমাকে বলিয়া দিলেন এই মহিলা ব্যারিষ্টার আর. সি. বানার্জ্জীর পত্নী, সুবিখ্যাত রজনীনাথ রায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা অমিয়া বানার্জ্জী। কুমারী অমিয়া রায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, তাহা আমি জানিতাম। আমি দেখিলাম নানারূপ কাজের ঝঞ্চাটে তাঁহার বালীগঞ্জের বাটীতে যাইবার জন্য যে সময় করিয়া উঠিতে পারিব, সে সম্ভাবনা বড়ই কম। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে সামাজিক সম্মিলনে তাঁহাকে সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আবার যখন আসিবেন, যাইবেন।" আমার আর যাওয়া হয় নাই। বহুবৎসর পরে, ইঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ হালদারের অনুরোধে তাঁহাদিগের গৃহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলাম, শ্রীযুক্তা অমিয়া বানার্জ্জী ও তাঁহার কন্যারা সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

১৯১২ সনে যে যে কার্য্য করিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। মাঘোৎসবে ৬ই মাঘ সায়ংকালে মহর্ষির তিরোধান দিবসে নগরকীর্ত্তনের পরে ও ১১ই প্রাতঃকালে আচার্য্যের কার্য্য করিলাম। সায়ংকালে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ উপাসনা করিলেন। ২২এ জানুয়ারী টাউন হলে "ভারতবর্ষে সমাজের অভিব্যক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। ২৭এ ঢাকায় যাইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে "The conflict of Ideals" শীর্ষক বক্তৃতা করিয়া আসিলাম।

অন্যতম আচার্য্যরূপে এবৎসর প্রয়োজন মত মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিতে হইয়াছিল। মাঘোৎসবের অগ্রে ও পরে

যে কয়টী বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার বিষয় ও তারিখ প্রদত্ত হইল—

স্থান—	তারিখ—	বিষয়—
সূর্য্যকান্ত টাউন হল	৮ই জানুয়ারী	কেশবচন্দ্র ও বর্ত্তমান যুগ
ঐ	২০এ আগষ্ট	আনন্দমোহন বসু
ঐ	২৭এ সেপ্টেম্বর	রামমোহন রায় ও ধর্ম্মসংস্কার

১৯১৩ সনের মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত অমর চন্দ্র দত্ত এবং রাত্রিতে ডাক্তার পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। আমি ২২এ জানুয়ারী সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে "সত্য ও সংস্কার" নামক বক্তৃতা করি।

১২ই মাঘ (২৫এ জানুয়ারী) পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে "ধর্ম্মের কষ্টিপাথর" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

১লা বৈশাখ, ১৩২০ (১৯১৩) ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে "সমাজ-দেহ" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়াছিলাম। কলিকাতার দৈনিক কাগজে ইহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩০এ আগষ্ট বক্তৃতাটী পুনশ্চ ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৯১১ ও ১৯১২ সনে আমি ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলাম। প্রথমটীতে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, দ্বিতীয় বৎসর শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন সভাপতির কার্য্য করেন। প্রথমোক্ত বৎসর আমি সম্মিলনীর মুখপত্র 'সেবক' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করি। পূর্ণ দুই বৎসর সম্পাদক ছিলাম।

৩

ময়মনসিংহ ত্যাগ

গ্রীষ্মের ছুটীতে পুত্রকন্যা লইয়া কলিকাতায় গেলাম—এই সংকল্প লইয়া গেলাম, আনন্দমোহন কলেজে আর কাজ করিব না। দাদাকে বলিলাম, "আমি কলিকাতায় খোলার ঘরে বাস করিব, তবু ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইব না।" তিনি আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। এক দিন শুনিলাম, রিপণ কলেজে ইংরেজী পড়াইবার জন্য একটী অধ্যাপকের প্রয়োজন। গ্রীষ্মের দুপ্রহরে আহারান্তে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে লইয়া বৌবাজারে "বেঙ্গলী" পত্রিকার অফিসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তখন ঐ গরমের মধ্যে চোগাচাপকান পরিয়া সম্পাদকীয় কর্ম্ম করিতেছেন; বলিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে, তাঁহার আসল ওলাউঠা (true Asiatic Cholera) হইয়াছিল। তাঁহার হাতে দরখাস্তের টাইপ করা নকল একখানা দিলাম। বাঁড়ুয্যে মহাশয় একটু পড়েন, আর উল্লাসে বলিয়া উঠেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা এই রকম লোকই চাই। It is not everybody who can be a teacher. আপনি আসুন।" তিনি কিরূপে মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষকতা করিবার কালে স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া দিন চালাইতেন, সেই গল্প বলিলেন, বালাচুড়ী হাত হইতে খুলিবার ভঙ্গীটাও দেখাইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিবেন কত?" "আপনি আনন্দমোহন কলেজে কত পাইতেছেন?" "আমার বেতন ২০০-১০-৫০; আগামী জুন হইতে ২১০৲ পাইব; বিনা ভাড়ায় বাড়ী পাইয়াছি, প্রভিডেন্ট ফণ্ড আছে, মোটের উপরে

২৬০৲ টাকা হয়।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "We will give you two hundred. We are giving the same to Rabi." (আমরা আপনাকে দুই শত টাকা দিব ; রবিকেও তাহাই দিতেছি।" (রবি = শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, বর্ত্তমান অধ্যক্ষ।)

আমি—"I am senior to him" (আমি পরীক্ষায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ।)

সুরেন্দ্রবাবু—"But he is senior in service." (কিন্তু তিনি রিপণ কলেজের কর্ম্মে জ্যেষ্ঠ)

আমি আড়াই শত টাকার কমে আসিব না, এই কথা বলিয়া বিদায় লইলাম।

বেঙ্গলী অফিস হইতে হেরম্ববাবুর নিকটে গেলাম। তিনি খবর দিলেন যে, অল্প দিন হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এম্. এ. শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইবার জন্য তিন জন সহকারী অধ্যাপক (Assistant Lecturers) নিযুক্ত করিয়াছেন। সিটী কলেজের হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, মেট্রপলিটান কলেজের জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সুশীল কুমার দে—এই তিন জন। তাঁহার পরামর্শে সায়ংকালে স্যর আশুতোষের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে আমার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আপনি আসিবেন? যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ছেলেমানুষ। বেতন মাসে এক শত পঞ্চাশ টাকা।" আমি বলিলাম, আমি এই বেতনেই কাজ করিতে প্রস্তুত আছি ; ময়মনসিংহে কিছুতেই ফিরিয়া যাইব না।" তিনি ভরসা দিলেন, আমাকে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করিবেন।

তাহার এক দিন পরে সিণ্ডিকেটের সভা হইল। সভা হইতে

বাড়ী আসিয়া হেরম্ববাবু আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করিলেন, আমি যেন সমাজের "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" পত্রিকাখানিকে যথাসাধ্য সাহায্য করি।

তৎপর দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্যর আশুতোষের বাড়ীতে গেলাম—যাইবার কথা ছিল। তিনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন; আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "আপনাকে নিয়েছি।"

আমি এম্. এ. শ্রেণীতে গদ্য সাহিত্য পড়াইব, স্থির করিলাম। তাঁহার কথামত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিয়া Morley's Studies in Literature নিজের জন্য রাখিলাম; তখনই এক খণ্ড ক্রয় করা গেল। তারপর একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয় হইতে দুইখানা পুস্তক লইলাম—সিণ্ডিকেটের সভ্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া দিলেন, আমি সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছি, আমাকে পুস্তক ধার দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা সাধনাশ্রমে ছিলাম। দুই এক দিন পরেই পুত্রকন্যাসহ আমি গিরিডি গেলাম, সুকুমার আমাদের সঙ্গে গেল, অবিলম্বে তাহার মাতা ও ভাইবোনেরাও গেলেন। গুরুদাসবাবুও একবার যাইয়া কিছুদিন থাকিয়া আসিলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমাদিগকে এক মাসের জন্য তাঁহার বাড়ী বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন।

অবসরকলে আমার প্রধান কাজ হইল প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমণ, এবং অন্য সময়ে পাঠ। যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গ্রহণ

করিতেছি, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে "সঞ্জীবনীতে"ও তৎপরে "Indian Daily News" পত্রিকায় আমার নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হইল। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র পাইয়া আমি আনন্দমোহন কলেজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়কে পত্র লিখিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। পত্র-খানি ছাব্বিশ বৎসর পরে হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

Mymensingh
The 20th May, 1913

My dear Rajani Babu,

"I have learnt the news of your appointment as a University Lecturer with mixed feelings of joy and sorrow. The Sanjibany first brought us the news and then on Sunday night I received your letter. It is a good thing for you. A grave injustice has been done to you by the Council and the Government in not appointing you Principal of the college, though you were eminently fitted for the post. Now you are beyond the influence of Dr. Chatterjee and the relics of Eastern Bengal Government, but I am very sorry for the dear Ananda Mohan College. It is very unlikely that we shall get a Professor or Principal of

your standing. It is an irreparable loss to the college I do not see any one who can take your place, and I fear that the news of your appointment in Calcutta will dissuade many students from joining this college."

*   *   *   *   *

এই পত্র পাইবার পরে আমি যথারীতি পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলাম। আনন্দমোহন কলেজে অন্ততঃ দুই বৎসর কর্ম্ম করিব, আমি এই প্রকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলাম, ৩০এ জুন সেই সময় পূর্ণ হইবে ; সুতরাং ১লা জুলাইএর পরে আমার অন্যত্র গমনের বাধা রহিল না।

জুনের মাঝামাঝি আমরা কলিকাতা ফিরিয়া গেলাম। বাড়ী খুঁজিতে কয়েক দিন কাটিল। পরিশেষে দেবেন্দ্রের সহিত মিলিয়া ২নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে বাড়ী ভাড়া করা গেল। দোতলা বাড়ী, বাহিরের খণ্ডে তাহার ফুটবল ইত্যাদির কারখানা, ভিতরে দোতলা ও তিনতলার একটা ঘর আমার জন্য রহিল, রান্না ঘর ছিল একতলায়।

আনন্দমোহন কলেজ খুলিবে জুলাই মাসের ৪টা কি ৫ই। সপ্তাহকাল পূর্ব্বে আমি মান্তু ও পাচক ব্রাহ্মণকে লইয়া ময়মনসিংহে গেলাম। মান্তু এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহাকে সিটী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। খোকা ও বীণা মেশো-মহাশয়দের নিকট রহিল।

আমরা ময়মনসিংহে যাইবার দুই এক দিন পরেই কলেজ কৌন্সিলের এক সভা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি মিঃ স্প্রাই আসন গ্রহণ করিয়াই বলিলেন—

"Now that Rajani Babu is going away, let us carry out his resolution which is, that Government be requested to lend the services of a man who is a **First Class** M. A. of the Calcutta University, or has European qualifications." এবার "**প্রথম শ্রেণীর** এম্. এ." শুনিয়া প্রিন্সিপাল ডক্টর পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অপর সকলেই নীরব রহিলেন। আমি ভাবিয়া পাইলাম না, হাসিব কি কাঁদিব।

স্প্রাই মহোদয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নব পদের বেতন কত? আমি বলিলাম, বেশী নয় (Not much), দেড়শত টাকা। "কয় ঘণ্টা পড়াইতে হইবে?" "সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা।" "কি বই পড়াইবে?" "Morley's Studies in Literature." তিনি শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Will you see me before you go away?" উত্তর, "Certainly."

জিনিষপত্রগুলি পাঠাইতে কয়েক দিন গেল। পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে আনন্দোৎসবে একদিন নিমন্ত্রণ খাইলাম। কলেজ খুলিবার দিন কাজে হাজির হইয়া বেতন ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের প্রাপ্য টাকা লইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার ডাক গাড়ীতে ময়মনসিংহ হইতে প্রস্থান করিলাম।

আর একদিন প্রাতঃকালে স্প্রাই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "What can I do for you?" আমি জানাইলাম, "কিছুই চাই না।"

দ্বাদশ অধ্যায়

কলিকাতায় জীবনসায়াহ্ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্তের উপসংহার

স্বদেশী আন্দোলনে লিপ্ত থাকিবার অপরাধে আমার প্রতি যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা প্রকট হইল পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রজমোহন কলেজ হইতে বহিষ্কারে। অখণ্ড বঙ্গের রাজপুরুষেরা আমাকে আনন্দমোহন কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সেই প্রায়শ্চিত্তকে সজীব করিয়া রাখিলেন; পরিশেষে ভারত গবর্ণমেণ্টের কোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া আমি নিঃশেষে প্রায়শ্চিত্তের উদ্‌যাপন করিলাম।

যে দিন কলিকাতায় আসিলাম, সেই দিনই অপরাহ্নে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাইয়া অধ্যাপকের কাজে যোগ দিলাম। খোকা ও টগা কেশব একাডেমীতে ও বীণা বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইল। আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে সপ্তাহে তিন ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে প্রথমে তিন ও পরে দুই ঘণ্টা পড়াইতাম। এই নূতন এম্. এ. শ্রেণীতে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। বহু শ্রম করিয়া পাঠ প্রস্তুত করিতাম, বিস্তর পুস্তক পড়িতে হইত। এই বৎসর স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল; প্রাতঃকালে বাটীর বাহির হইতাম না, প্রায় সমস্ত দিন অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় যাপন করিতাম। নূতন ও পুরাতন পুস্তক ক্রয় করা আমার একটা নিয়মিত কাজ ছিল।

জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয় একজন জর্ম্মণ অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। আমি তাঁহার নিকটে জর্ম্মণ শিক্ষা করিতাম। হেরম্ববাবু, দাদা, জাপানী অধ্যাপক কিমুরা এবং অনেক যুবক জর্ম্মণ ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। অক্টোবর মাসে শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে ১৬২নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার পরে আমাকে জর্ম্মণ শিক্ষা ছাড়িয়া দিতে হয়।

আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপনায় অভ্যস্ত হইতে লাগিলাম, প্রশংসার কথাও কানে আসিল। হঠাৎ, বোধ হয় আগষ্ট মাসে, সংবাদ পাইলাম, পুলিশের লোক আমাদের পৈতৃক বাটীতে আমার সন্ধান করিতে গিয়াছে। স্যর আশুতোষকে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে।" কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে সিমলায় গমন করিলেন। কয়েক দিন পরেই রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে পত্র পাইলাম, ২৭এ সেপ্টেম্বর ভোরে স্যর আশুতোষ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন; সেইদিন প্রাতঃকালে আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ব্যাপারটা কি, বোধগম্য হইল না। ঐ দিন যথাসময়ে ভবানীপুরে যাত্রা করিয়া এস্‌প্লানেডে যাইয়া দেখি, আমার সহযোগী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও একইরূপ পত্র পাইয়া স্যর আশুতোষের বাড়ী যাইতেছেন। আমি রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়াছি, জিতেন্দ্রবাবু তখনও উহার সহিত যুক্ত ছিলেন; তাঁহার সহিত আমার নাম একত্র গ্রথিত হইয়াছে দেখিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। মুখোপাধ্যায়

মহাশয় প্রথমে আমার সহিত একাকী কথা বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা সুবোধ্য, কেন না, তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব ছিলেন, স্যর হারকোর্ট বাটলার (Sir Harcourt Butler) এবং সেক্রেটারী পূর্ব্ববঙ্গ-আসামের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের শার্প মহোদয় (H. Sharp)। স্যর আশুতোষের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহার মর্ম্ম এই—"স্যর হারকোর্ট বাট্‌লার আমাকে বলিলেন, 'তুমি বরিশালের লোক (the Barisal man) রজনী গুহকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ম্ম দিয়াছ। লোকটা বদ (he is a bad man)।' আমি উত্তর দিয়াছি, "আচ্ছা, তোমার সেক্রেটারীকে আমার রেজিষ্ট্রারের নিকটে পত্র লিখিতে বল, তিনি উত্তর দিবেন।" তিনি শার্পের সহিত কোনও আলোচনা করিতে সম্মত হন নাই; বাট্‌লারের প্রস্তাবে বলিয়াছিলেন, "আমি লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আসিয়াছি, শার্পের সহিত নয়।"

তারপর আমাকে আদেশ করিলেন, "আপনার নিকট গবর্ণমেণ্টের চিঠিপত্র যাহা আছে, তাহার নকল আজই মধ্যাহ্নকালে দারভাঙ্গা বিল্‌ডিংএ আমাকে দিবেন।"

আমি পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি দলিলের নকল যথাসময়ে ও যথাস্থানে তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি পড়িয়া বলিলেন, "আপনার কিছু করিতে পারিবে না।"

সে দিন সায়ংকালে সিটী কলেজে রামমোহন রায় স্মৃতিসভা ছিল; সভাপতি শ্রীযুত অম্বিকাচরণ মজুমদার; বক্তাদিগের মধ্যে আমি এক জন। সারাদিন দৌড়াদৌড়িতে গেল, বক্তৃতার কথা স্থির চিত্তে ভাবিতেই পারিলাম না। আমার পূর্ব্বে অধ্যাপক আর্কার্ট (Urquhart), মৌলবী ফজলুল হক (বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী,

১৯৩৯), এবং অপর কেহ কেহ বক্তৃতা করিলেন ; তৎপরে আমি গত বৎসরের বক্তৃতাটার পুনরাবৃত্তি করিলাম।

পূজার ছুটির পরে শুনিলাম, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গোলদীঘিতে কি একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আমি নিশ্চিন্তমনে কাজ করিয়া যাইতেছি। একদিন হেরম্ববাবু আমাকে বলিলেন, স্যর আশুতোষ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আমি বেতন বাড়াইয়া রজনীবাবুকে অধ্যাপকপদে স্থায়ীরূপে নিয়োগ করিব।" সহকারী অধ্যাপকগণ আপাততঃ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আমার নিয়োগপত্রে সময়ের উল্লেখ ছিল না। স্যর আশুতোষের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "That will go in your favour"— "সময়ের উল্লেখ যে নাই, তাহা আপনার পক্ষে অনুকূলই হইবে।"

ক্রমে ১৯১৪ সনের বসন্তকাল আসিল। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ১৯১২ সন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. শ্রেণীতে পড়াইতে-ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রায়শঃ দেখা সাক্ষাৎ হইত। তিনি গোপনে কি সংবাদ পাইয়াছিলেন, জানি না ; ফেব্রুয়ারী মাসে মৈত্র মহাশয় আমাকে এক দিন আশুবাবুর সহিত দেখা করিতে বলিলেন, যাহা যাহা বলিতে হইবে, তাহার দুই এক কথা বলিয়াও দিলেন। এক রবিবার বৈকালে আমি স্যর আশুতোষের গৃহে গেলাম। দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোকে বৈঠকখানা ঘর পরিপূর্ণ। কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার মুখার্জ্জী আসিলেন, এবং আসন গ্রহণ করিয়াই আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই তো রজনীবাবু, কি হবে ?" চোখের ভঙ্গী ও কথার সুরে আমি বুঝিলাম, বিপদ আসন্ন। তিনি কথাবার্ত্তার মধ্যে আমাকে জানাইলেন,

আমার অধ্যাপনা বিষয়ে ছাত্রগণের মত ভাল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে কি চলিয়া যাইতে হইবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বোধ হয় যাইতে হইবে।" পরিশেষে আমি বলিলাম, "আপনার সহিত একটা গোপনীয় কথা আছে।" তিনি বারাণ্ডার বাহির হইয়া আসিলেন। আমি হেরম্ববাবুর শিক্ষামত বলিলাম, "আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদিগের প্রতিনিধি; আপনি যদি আমাদের ভালমন্দ না দেখিবেন, তবে কে দেখিবে? তিনি স্মিতমুখে আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার ভাবনা কি? ইউনিভার্সিটির চাকুরী গেলে সিটী কলেজে বড় চাকুরী হইবে।" আমি গৃহে ফিরিলাম।

আশ্বাসবচনের ইতিবৃত্ত এই—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে স্থির করিয়াছিলেন, আগামী সেসন হইতে সিটী কলেজের তিনটী সুদক্ষ অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবেন—ইংরেজীতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, দর্শনে ডাক্তার হীরালাল হালদার, বিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু। প্রস্তাবটী সর্ব্বসাধারণের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। হরেন্দ্রবাবুর স্থলে আমি সিটী কলেজে কাজ পাইব, আশুবাবু আমাকে এই ভরসা দিলেন।

আমি এই বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলাম; হেরম্ববাবু ছিলেন সভাপতি। মার্চ্চ মাসে বৃহস্পতিবার সভার কার্য্য শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "রজনী আমার সঙ্গে এস।" আমরা মন্দির হইতে বাহির হইয়া হ্যারিসন রোডের দিকে চলিলাম। হেরম্ববাবু বলিলেম, "আগামী বৎসরের জন্য এম্. এ. ক্লাসে পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তোমার নাম নাই। তুমি তবে সিটী কলেজে তোমার নিজের

জায়গায় এস।" দেখিলাম, আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমি যে অবস্থায় সিটী কলেজ ছাড়িয়াছিলাম, তাহা তাঁহার মনে আছে। কথা বলিতে বলিতে আমরা হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বাকি কথাবার্ত্তা হইল। তাহার মর্ম্ম এই—

আমি—হরেন্দ্রবাবু কত বেতন পাইতেছেন?

মৈত্র মহাশয়—দুইশত পঞ্চাশ।

আমি—দুইশত পঞ্চাশের কমে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারিব না। আমি তাঁহার পাঁচবৎসর পূর্ব্বে এম্. এ. পাস করিয়াছি।

মৈত্র মহাশয়—তুমি আনন্দমোহন কলেজে কত পাইতে?

আমি—বেতন ছিল ২০০৲ হইতে ২৫০৲, আসিবার সময় ২১০৲ পাইয়াছি। বিনা ভাড়ায় বাসবাটী পাইয়াছিলাম। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে।

হেরম্ববাবু জানিতে চাহিলেন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা কি প্রকার। তখনও সিটী কলেজে উহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমি আনন্দমোহন কলেজের নিয়ম জানাইলাম।

কথা শেষ হইলে বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বন্ধ করিতে পারি নাই। মনে বড় দুঃখ হইল। ভাবিলাম, আমাদের দেশের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাকে আশ্বাস দিলেন, "আপনার কিছু করিতে পারিবে না'; সে কথাও অলীক প্রতিপন্ন হইল। তবে কাহার কথার উপরে নির্ভর করিব?"

কিন্তু আশুবাবুই বা কি করিবেন? আমার নিয়োগের অল্পকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার এ. সুরাবর্দ্দী (পরে স্যর

আবতুল্লা, মিঃ আবতুল রসুল এবং কাশীপ্রসাদ জয়স্‌ওয়াল, এই তিন খ্যাতিমান্ পুরুষকে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নিয়োগ নামঞ্জুর করিলেন। সিনেটের এক অধিবেশনে এই প্রতিকূল নির্দ্ধারণের (veto) বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, স্বয়ং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রেও প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তাহাতে টলে নাই।

তিন বৎসর পরে স্যর আশুতোষের মুখে আমার "অর্দ্ধচন্দ্রং দত্বা নিঃসারিতঃ" হইবার কারণ শুনিয়াছিলাম। যথাস্থানে তাহা দ্রষ্টব্য।

সে কালে সিটী কলেজের কৌন্সিলে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার প্রভাবে আমার নিয়োগের পথ সকল দিকেই সুগম হইল। প্রথমতঃ, তাঁহারা হরেন্দ্রবাবুর স্থলে নব অধ্যাপক নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করিলেন না; আমাকেও আবেদন করিতে বলিলেন না। তৎপরে প্রশ্ন উঠিল, নূতন অধ্যাপক এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন কি না; কারণ হরেন্দ্রবাবু এক বৎসরের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। আমি এই প্রসঙ্গে একদা হেরম্ববাবুকে বলিলাম, "যদি আপনারা আমাকে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করেন, এবং আমি সে সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে স্থায়ী কর্ম্ম প্রাপ্ত হই, তবে কি করিব?" তিনি কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। পরিশেষে বেতনের প্রশ্ন। বন্ধুজনেরা অনেকেই বিশ্বাস করিলেন না, যে সিটী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে তুইশত পঞ্চাশ টাকা দিবেন। কিন্তু হেরম্ববাবু কলেজটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন; আমার প্রতি অগাধ স্নেহ তো ছিলই। কিন্তু স্নেহের আকর্ষণ তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। তিনি গোপনে তাঁহার

এক প্রিয় শিক্ষককে সংবাদ লইতে বলিয়াছিলেন, এম্. এ. ক্লাসের ছাত্রমহলে আমার সম্বন্ধে ধারণা কি প্রকার। মৈত্র মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বে, কলেজ কৌন্সিল আমাকে প্রারম্ভিক বেতন (on an initial salary) দুইশত পঞ্চাশ টাকায় স্থায়ীভাবে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। এতদ্দ্বারা অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে প্রিন্সিপাল ও ভাইস্-প্রিন্সিপালের পরেই আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

দৈবের বিচিত্র গতি। কলেজের যে ভৃত্য ১৮৯৬ সনের ১লা এপ্রিল আমাকে পদচ্যুতির পত্র দিয়াছিল, আঠার বৎসর পরে সেই ব্যক্তিই নবনিয়োগ পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু সে নিজেই আমাকে জানাইয়া দিল, "আমি আপনাকে ক্লাসে একটা পত্র দিয়াছিলাম, এবং সেজন্য বড়বাবু (প্রিন্সিপাল) আমার চারি আনা জরিমানা করিয়াছিলেন।

আমি ১৯১৩ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯১৪ সনের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেতন পাইয়াছিলাম। ১লা জুলাই হইতে সিটী কলেজের নিয়োগ চলিল। ১৯০১ সনের ২১এ জুন হইতে ১৯৩৭ সনের ৩১মে পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন ছত্রিশ বৎসর আমি অবিচ্ছেদে শিক্ষাব্রত পালন করিয়াছি।

সিটী কলেজে কর্ম্ম

সিটী কলেজে দুই বৎসর কর্ম্ম করিবার পরে, ১৮৯৬ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পরেই উহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ঠিক আঠার বৎসর পরে পূজনীয় অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সাদর আহ্বানে ১৯১৪ সনের ১লা জুলাই হইতে পুনরায় উহার অধ্যাপকের

কর্ম্ম আরম্ভ করিলাম। মৈত্রমহাশয় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং আমার অধ্যাপনার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে আমার বেতন আট বৎসরের মধ্যে আড়াই শত হইতে তিনশত ত্রিশ, তিন শত পঞ্চাশ ও পরিশেষে চারি শত টাকা হইল। অধ্যক্ষ মহাশয় এই চারিশত টাকার গ্রেড্‌টী শুধু আমার জন্যই প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়ের পরামর্শানু-সারে উহার জন্য তুইটী পদ সৃষ্ট হয়। একটী আমাকে প্রদত্ত হইল। কিছুকাল পরে অপরটীকে ভাঙ্গিয়া তুইটী করিয়া সর্ব্বোচ্চ বেতন ৩৫০৲ করা হইল।

আমার অধ্যাপনা দক্ষতা সম্বন্ধে মৈত্র মহাশয়ের ধারণা এত অনুকূল ছিল যে, আমার অন্যত্র যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিতেন। দয়াল সিংহ কলেজ স্থাপিত হইবার প্রাক্কালে আমাকে উহার সহকারী অধ্যক্ষ মনোনীত করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯১১ কি ১৯১২ সনে, আনন্দ-মোহন কলেজে কর্ম্ম করিবার কালে দয়াল সিংহ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে অধ্যাপকের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন—বেতন ছিল তিনশত টাকা, মধ্যবর্ত্তী ছিলেন ভ্রাতা হেমচন্দ্র সরকার। পুনরায় ১৯১৫ সনে ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় একদিন আমাকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তাঁহাকে ঐ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে চাহেন, বেতন চারিশত টাকা দিবেন। আমি হেরম্ববাবুকে প্রস্তাবটী জানাইতেই তিনি বলিলেন, "আমি তবে কাজে ইস্তাফা দিব।" পরিশেষে ১৯২১ সনে কলেজের সম্পাদক তাঁহাকেই পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি সাত শত টাকা বেতনে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছি কি না।

মৈত্র মহাশয় আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

১৯২৪ সনে ব্রজমোহন কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ, ও আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় আমাকে চারিশত টাকা বেতনে পুনশ্চ অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য আমি সম্মত হই নাই।

পরিশেষে, রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজের ডক্‌টর দেবেন্দ্র মল্লিক কাশ্মীরে কর্ম্ম লইয়া গেলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে এক বৎসরের জন্য পাঁচশত টাকা বেতনে তাহার স্থলে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি উক্ত পদ গ্রহণ করি নাই।

আমি প্রথম সপ্তাহে আঠার ঘণ্টা পড়াইতাম। ১৯১৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (Lecturer) নিযুক্ত হইবার পরে হেরম্ববাবু দুই ঘণ্টা কমাইয়া দেন। ষাণ্মাসিক, বার্ষিক ও বাছনি (Test) পরীক্ষার কাগজ তো দেখিতেই হইত, তা ছাড়া প্রথম প্রথম সাপ্তাহিক বা মাসিক পরীক্ষার কাগজ দেখাও কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। Tutorial workও করিতে হইত। Tutors এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এই দিকের কার্য্যভার লঘু হয়।

আমি প্রধানতঃ গদ্য সাহিত্যই পড়াইতাম। আমার অধ্যাপনাতে অন্যান্য কলেজের ছাত্ররাও উপস্থিত থাকিত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি, এবং বহু বৎসর পরে এই প্রকার ছাত্র, অধুনা রাজ-কর্ম্মচারীর, মুখেও শুনিয়াছি।

সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ ছুটী লইলে আমি তিন বার তাঁহার স্থলে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হই। সেই সময়ে দুইবার আমাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২১ সনে

অধ্যক্ষ মৈত্র প্রায় ছয় মাস বিলাতে ছিলেন। এই সময়ে কালীপ্রসন্নবাবু অধ্যক্ষ ও আমি সহকারী অধ্যক্ষের কর্ম্ম করি। আমাদিগকে এ জন্য পারিশ্রমিক (allowance) দেওয়া হয় নাই।

১৯৩১ সনে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে, বোধ হয় আগষ্ট মাসে চট্টরাজ মহাশয় অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। অধ্যক্ষ মৈত্র কৌন্সিলের সভায় তাঁহার শূন্য পদে সহকারী অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেই তদীয় জামাতা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহার মতে সহকারী অধ্যক্ষ রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ফলে হেরম্ববাবু আমাকে Professor-in-charge আখ্যা দিয়া সহকারী অধ্যক্ষের কর্ম্ম করিবার ভার দিলেন। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই প্রকার চলিল। এ দিকে মৈত্র মহাশয় সহকারী অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ২রা ডিসেম্বর কৌন্সিলের সভাতে প্রথমে নির্দ্ধারিত হইল যে, একজন সহকারী অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হউক, কিন্তু তাঁহাকে স্বতন্ত্র বেতন দেওয়া হইবে না। তৎপরে শেষোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন মিঃ সুধাংশুমোহন বসু। তৎপরে হেরম্ববাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি কাহাকে সহকারী অধ্যক্ষ করিতে চাহেন। তিনি বলিলেন, "রজনী ছাড়া আর কে হইবে?" সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমিই নিযুক্ত হইলাম। তৎক্ষণাৎ বসু মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু ইহা অধ্যক্ষপদ প্রাপ্তির দাবী বলিয়া গণ্য হইবে না।" এ তর্কটা বেশী দূর অগ্রসর হইল না।

১৯৩২ সনে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে মৈত্র মহাশয় সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ ছুটী লইয়া গিরিডি চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার স্থলে অস্থায়ী (offg.) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলাম, কৌন্সিল

আমার স্থলে কোনও সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন না। ১৯৩৩ সনের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমি একাকীই দুইজনের কার্য্যভার বহন করিলাম। আমাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩৩ সনের ১লা এপ্রিল হেরম্ববাবু অধ্যক্ষের পদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৯৩৫ সনের ১লা জুন হইতে শ্রীযুক্ত মৈত্র এক বৎসরের ছুটী লইলেন, আমাকে তাঁহার পদে অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদ প্রদত্ত হইল। পর বৎসর (১৯৩৬) ১লা জুন হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে আমি স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলাম। এই পদে আমার বেতন পঁচিশ টাকা বাড়িয়া মোট তিনশত পঁচিশ টাকা হইল।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি ১৯৩৭ সনের ১লা জুন হইতে কর্ম্মত্যাগ করিলাম। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ হেরম্ববাবুকে মাসিক ৩৪০৲ পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। আমার জন্য তাঁহারা কিছুই করিলেন না।

আমি সিটী কলেজে মোট পঁচিশ বৎসর অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছি।

১৯১৫ সনে আমি শিক্ষকগণের প্রতিনিধিরূপে কলেজ কৌন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হই। তদবধি কয়েক বৎসর ঐরূপে এবং পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া আমি শেষ পর্য্যন্ত উহার সভ্য ছিলাম।

১৮৯৮ সনে কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সিটী কলেজের জীবনমরণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পর বৎসর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতবৈষম্য হেতু শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কর্ম্মে ইস্তফা দেন। অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত বহুল আয়াসে কলেজটীকে বাঁচাইয়া

রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯০৪ সনে মৈত্র মহাশয় অধ্যক্ষরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গুরুতর সংগ্রামের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কলেজ-টীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আমি যখন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই, তখন উহার উঠন্ত কাল। এই কালে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১৯২০।২১ সনে দুই হাজার দুইশত অতিক্রম করে। পুরাতন বাটীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী ভাড়াটিয়া পুরাতন বাটীতে সঙ্কুলান না হওয়াতে তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নূতন বিশাল বাটী নির্ম্মিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে উহার পার্শ্বেই প্রকাণ্ড ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই এক আকস্মিক বিপত্তি কলেজটীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল।

আমরা যখন স্কুল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রাবাসসমূহে সরস্বতী পূজার প্রথা প্রচলিত ছিল না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ শিক্ষায়তনসমূহে ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রাবাসে পূজা উৎসবাদির জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হয়। সিটী কলেজের ছাত্রাবাসের নাম "রামমোহন রায় হষ্টেল।" যে প্রতিষ্ঠান সাকারোপাসনার বিরোধী ও নিরাকারোপাসনার প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের নামে অভিহিত, তাহাতে সিটী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সরস্বতী পূজার উৎসব করিতে অনুমতি দিবেন, ইহা সম্ভবপর নয়। বৎসরের পর বৎসর ছাত্রগণের অনুমতি পাইবার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। ১৯২৮ সনে রামমোহন রায় হষ্টেলের ছাত্রগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল তাহারা বিনা অনুমতিতেই অথবা কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া উহাতে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করিবে।

বাসন্তী পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ উহার

অধ্যক্ষ অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়ের অগোচরে হষ্টেলের প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। অধ্যাপক রায় শুনিয়াই নিষেধ করিতে অগ্রসর হইলেন; ছাত্রেরা তাঁহাকে ঠেলিয়া ধাক্কা দিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিল। তৎপরে পূজা, বিসর্জ্জন আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি উৎসবাঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

এইবার কলেজটীর জীবনমরণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

কলেজটীর ঘরে ও বাহিরে দুই প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ কলেজের হিন্দু ছাত্রগণ সরস্বতী পূজার অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিতে লাগিল। ইহাতে অন্যান্য কলেজের ছাত্রেরাও তাহাদিগের সহিত যোগ দিল, এবং জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিল। হষ্টেলে পূজার ব্যাপারে যাহারা নেতৃত্ব করিয়াছিল, কৌন্সিলের অনুমোদন অনুসারে অধ্যক্ষ মৈত্র তাহাদিগের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করেন। ইহাতে ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়া এবং পিকেটিং করিয়া নিরপেক্ষ ছাত্রদিগকে কলেজে আসিতে বাধা দিতে লাগিল। এই কাজে এবং অন্যান্য উপদ্রবে অপরাপর কলেজের ছাত্রেরাও যোগ দিল। হেঁদোর দিঘীতে ও অন্যত্র ছাত্রগণের প্রতিবাদ সভা হইল; একটীতে জননায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। একদিন পাঠের সময়ে কতকগুলি ছাত্র কলেজের আঙ্গিনায় আসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি চট্টরাজ মহাশয়কে নিষেধ করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি নীরব রহিলেন। ছাত্রগণের ব্যবহার ক্রমশঃ বিনয়, শিষ্টতা ও ভদ্রোচিত আচরণের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল। আমি কলেজের মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষপাতী ছিলাম, এজন্য ছাত্রেরা আমার উপরে খুব চটিয়াছিল। একদিন অধ্যাপনার কাজে কলেজে যাইতেছি,

হষ্টেলের সম্মুখে আসিতেই পথের পূর্ব্ব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রায় এক শত ছাত্র Shame, Shame (ধিক ধিক) বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কলরব শুনিয়া ব্যায়াম শিক্ষক রাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা নীচে আসিয়া আমাকে কলেজে চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন, আমি কলেজে প্রবেশ করিলাম। আর একদিন ঐরূপ অধ্যাপনার কার্য্যে কলেজের নিকটে আসিতেই একটী কিশোর বয়স্ক ছাত্র আমার পশ্চাতে যাইয়া কি একটা শব্দ করিল। আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে একটা মিথ্যা নাম বলিল। কলেজে যাইয়াই ছুই একটী ছাত্রের নিকটে তাহার প্রকৃত নাম ও তাহার পিতার নাম পাইলাম, অধিকন্তু জানিলাম, সে নিকটবর্ত্তী এক কলেজে পাঠ করে। সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয়কে ব্যাপারটা জানাইলাম, তিনি কিছু করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আমি নিজেই কেরানীখানায় (Writers' Building) উহার পিতাকে ফোন করিয়া ঘটনাটা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া খুব বিস্মিত হইলেন, এবং যথাবিহিত করিবার আশ্বাস দিলেন। এই ছাত্রটীকে আর দেখি নাই।

অপর একদিন হেরম্ববাবুর সহিত তাঁহার গাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতে যাইতেছি। আমাদিগকে দেখিয়াই কতকগুলি ছাত্র পথের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "হেরম্ব" "হেরম্ব" "রজনী" "রজনী" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। আমরা একটু দূরে গেলে তাহারা নিবৃত্ত হইল।

কিছুকাল পরে হেরম্ববাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদা কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত যুবক তাঁহার গায়ে কাদা ছুড়িয়া মারিয়াছিল।

কলেজের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয় যে ধীরতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা ও সদ্বিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। আমি এক এক সময়ে ভাবিতাম যে তিনি যথোচিত কঠোরতা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিতেছেন না। কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝিয়াছিলাম।

বৈধ ও অবৈধ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কলেজের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুরা প্রাণ সংহারের জন্য একটী ব্রহ্মাস্ত্র উদ্ভাবন করিল।

সিটী কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন বাটী নির্ম্মাণের জন্য এক হিন্দু বিধবা মহিলার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। তিনি নিয়মিতরূপে সুদ পাইতেন, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে দশ বার বৎসরে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নাই। সরস্বতী পূজা সংক্রান্ত এই বিদ্রোহের মধ্যে দলপতিরা তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিয়া বসিল যে, যাহারা হিন্দু ছাত্রগণকে স্বধর্ম্মাচরণে বাধা দেয় তাহাদিগকে বিপুল অর্থ ঋণ দিয়া সাহায্য করা নিষ্ঠাবতী হিন্দু নারীর পক্ষে একান্ত অকর্ত্তব্য। তিনি তাহাদিগের প্ররোচনায় সুদে আসলে লক্ষাধিক টাকা আদায়ের জন্য কলেজ কৌন্সিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। বিশ্বকবি মহানুভব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজটীর এই ঘোর বিপত্তিকালে উহার প্রাণরক্ষার জন্য অগ্রসর না হইলে উহার আর নিস্তার ছিল না। তিনি বিশ্বভারতীর কোষাগার হইতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ দান করিয়া কলেজটীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। সিটী কলেজ অন্য প্রকারেও তাঁহার নিকটে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অন্যান্য কতিপয় দেশবিখ্যাত পুরুষ উহার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রচার করেন, তদ্দ্বারা কলেজটীর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

সিটী কলেজের বিরুদ্ধে দলপতিগণ সকল বৈধ ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার ফলে ছাত্রসংখ্যা অনেক কমিয়া গেল, কিন্তু কলেজটী মরিল না। গ্রীষ্মাবকাশের পরে প্রথম দিন অধ্যক্ষ মহাশয় যথারীতি কলেজের হলে উপাসনা করিয়া উপদেশ দিলেন। উপস্থিত ছাত্রগণের সংখ্যা দেখিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, "The college is saved"—কলেজটী রক্ষা পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় খুব অল্প ছিল।

অতঃপর কলেজটী ঘোর অর্থসঙ্কটে পতিত হইল। বিগত কয়েক বৎসর উহার ছাত্র সংখ্যা কলিকাতার কলেজগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। অর্থ সচ্ছলতার এই পূর্ণ জোয়ারের কালে কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন ক্রমবর্দ্ধমান করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই Provident Fund স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে কলেজের বাটীতে উহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ ও শিক্ষকদিগের পর পর কয়েকটী সভা হইল। পুনঃ পুনঃ আলোচনার ফলে আমরা উপলব্ধি করিলাম যে অধ্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন কমাইয়া না দিলে কলেজটী বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বেতনের তারতম্য অনুসারে হ্রাস করিবার হারের তারতম্য হইবে, এবং এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বেতনের নিম্নে কিছুই কাটা হইবে না। আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম যে, অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যক্ষ এবং আমার বেতন শতকরা চল্লিশ টাকা কাটা হউক। (অধ্যক্ষের বেতন ছিল ৭৫০৲, সহকারীর বোধ হয় ৫৫০৲,

আমার ৪০০৲) ইহার নীচে শতকরা ৩০৲, ২৫৲ এইরূপ হারে বেতন হ্রাস করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পর বৎসর ছাত্রসংখ্যা একটু বেশী হওয়াতে উপরদিকে শতকরা কুড়ি টাকা ও নিম্নদিকে তদনুপাতে বেতন কাটিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। দুই তিন বৎসর পরে উহার আবার দ্বিতীয় হ্রাস (cut) বিধিবদ্ধ হইল। তাহাতে আমার বেতন ৩৬০৲ হইতে ৩০০৲ হইল। ১৯৩৬ সনে কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পদের মর্য্যাদা বাড়াইবার অভিপ্রায়ে ২৫৲ ভাতা মঞ্জুর করিলেন। আমি এই দ্বৈত হ্রাস (Double Cut) শিরে লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

কলেজটীর অগ্নি-পরীক্ষার প্রারম্ভে Provident Fund এর জীবন বিলুপ্ত হয়।

ভগবৎ কৃপায় সিটী কলেজ বাঁচিয়া রহিল বটে, কিন্তু ইহার ছাত্রবল বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব্ব গৌরব আর লাভ করে নাই। উহা অদ্যাপি (১৯৪২) ঋণভারে প্রপীড়িত এবং মুক্তির উপায়ও অজ্ঞাত।

১৯৩৭ সনের প্রারম্ভে আমি আয়-ব্যয় সমিতির (Finance Committee) এক সভায় বলিলাম "আমি ১লা জুন হইতে অবসর গ্রহণ করিব।" তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত সুধাংশু মোহন বসু বলিলেন, আমরা পেন্সন দিব না। সিটী কলেজের সৌভাগ্য সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে, তখন কর্ম্মকালের পরিমাণ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রভৃতি ও কর্ম্মচারীদিগকে পেন্সন অথবা এককালীন টাকা (Gratuity) প্রদান করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কতিপয় অধ্যাপক ইতঃপূর্ব্বে পেন্সন বা থোক টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র গত বৎসর হইতে মাসিক ৩৪০৲ পেন্সন পাইতে-

ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ উহা জানিয়া বলিয়াছিলেন, "অধ্যক্ষের বেতন অপেক্ষা একজনকে অধিক পেন্সন দেওয়া হইতেছে, এটা কি প্রকার?" উক্ত সমিতি এই প্রকার নির্দ্ধারণ করিলে আমি এবৎসর যাঁহারা অবসর গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে এই প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা অন্যায্যতা প্রদর্শন করিয়া কলেজ কৌন্সিলে এক লিখিত মন্তব্য উপস্থিত করিলাম। তাহাতে কোনই ফলোদয় হয় নাই।

আমার অবসর গ্রহণের পরে, ১৯৩৭ সনের আগষ্ট মাসে ছাত্রগণ আমাকে ও অধ্যাপক ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে বিদায়াভিনন্দন পত্র প্রদান করে এবং অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রগণসহ আমাদিগের ফটো তুলিয়া উহার একখানি আমাকে উপহার দেয়।

দুই বৎসর পরে অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র রায় আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে কর্ত্তৃপক্ষ আমার "দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসনীয় অধ্যাপনায় পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে মাসিক উনচল্লিশ টাকা পেন্সন মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ পেন্সন প্রতি বৎসর শতকরা দশ টাকা হারে হ্রাস পাইবে।

আমি উত্তরে লিখিলাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষরূপে এই প্রকার পেন্সন গ্রহণ করিলে আমার নিজেকে আহম্মক বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে।

অধ্যক্ষ মহাশয় তদুত্তরে পেন্সন গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করিলেন।

আমি তদুত্তরে লিখিলাম, আমার মত পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

এক বৎসর অতীত হইলে, কলেজ কৌন্সিলের দুই সদস্য বিভিন্ন

সময়ে আমাকে সংবাদ দিলেন যে কর্তৃপক্ষ আমাকে এককালীন এক হাজার টাকা প্রদান করিবেন, এই প্রকার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অধ্যক্ষ রায় তাঁহার কার্য্যকালের অবসান পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আমাকে কোনও সংবাদ দেন নাই—টাকা দেওয়া তো দূরের কথা।

১৯৩৮ সনের গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজার ছুটীর পরে কার্য্যারম্ভের দিন অধ্যক্ষ রায়ের অনুরোধে আমি সিটী কলেজে ইংরেজীতে উপাসনা করিয়া উপদেশ দিয়াছি। তৎপরে এ যাবৎ সেখানে পদার্পণ করি নাই। ৯।৬।৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা

১৯১৭-১৯৩৭

১৯১৭ সনের গ্রীষ্মের ছুটী দার্জ্জিলিঙ্গে অতিবাহিত করিবার পরে যে দিন কলেজে উপস্থিত হইলাম, সেই দিন অপরাহ্ণে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে পুস্তকের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "Hope to welcome you as a colleague in a few days." "শীঘ্রই আপনাকে সহযোগী-রূপে সাদর সম্ভাষণ করিবার আশা করিতেছি।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কথার অর্থ কি ?" তিনি বলিলেন "সত্যই আপনি অধ্যাপক (lecturer) নিযুক্ত হইবেন। আপনি কাল সকালে স্যর আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

আমি রমাপ্রসাদকে (আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র), চিঠি লিখিয়া দিব যাহাতে আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারেন।" আমি সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে হেরম্ববাবুকে বলিলাম, "আশুবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "আমি তোমার নিকটে সপ্তাহে ষোল ঘণ্টা কাজ আদায় করিব।" আমি আঠার ঘণ্টাও পড়াইতাম।

ব্যাপারটার পূর্ব্ব কথা এই। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার না হইলেও উহার প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি বর্ষাধিক কাল পূর্ব্বে পোষ্ট-গ্রাডুয়েট ডিপার্টমেন্টের উন্নতি ও প্রসার সাধনের অভিপ্রায়ে ভারত গবর্ণমেন্টের সমীপে একটা পরিকল্পনা পাঠাইয়াছিলেন। উচ্চতম শিক্ষার সমগ্র বিভাগে অধ্যাপকের সংখ্যা বৃদ্ধি উহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি একটী প্রস্তাব এই করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব (whole time) অধ্যাপক ছাড়া কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কলেজ সকলের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্যের অতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে দুই তিন ঘণ্টা শিক্ষাদান করিবেন, এবং তজ্জন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই মাসিক এক শত টাকা বেতন পাইবেন। (দুই এক বিভাগে এই নিয়মের ব্যভিচার ছিল)। আমাদের গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট স্যর আশুতোষের পরিকল্পনাটী মঞ্জুর করিয়া পাঠাই-লেন। তখন শিক্ষাসচিব ছিলেন, স্যর শঙ্করণ নায়র। উক্ত পুনর্গঠন প্রস্তাবের সংশ্রবে আমি আহূত হইয়াছিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আশুতোষ-ভবনে গমন করিলাম। তিনি বলিলেন, "রজনীবাবু, অনেকেই বলিতেছিল, আমাদের প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিবেন না। মঞ্জুর তো হইল। আপনি

আসিবেন?" আমি বলিলাম, "আমি তো আসিয়াই ছিলাম। কেন যে গেলাম, তা' তো জানি না।" তখন তিনি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "কি করা যায়, আপনাকে রাখিলে ভারত গবর্ণমেণ্ট grant (তাঁহাদের মঞ্জুরী টাকা) বন্ধ করিবেন বলিলেন।" তার পরে আরও অনেক কথা হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বয়স কত? You are younger than myself, but not very much younger (আপনি আমার ছোট, কিন্তু বেশী ছোট নয়।" আমি বলিলাম ৪৯; তিনি তাঁহার বয়স বলিলেন ৫৩।

এই বিষয়ের সম্পর্কে তাঁহার নিকটে আরও কয়েকবার যাইতে হইল। পরিশেষে, বোধ হয় অগাষ্ট মাসে আমরা নবনিয়মানুসারে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলাম। আমার কাজ হইল পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর তিন শাখায় সপ্তাহে এক এক ঘণ্টা করিয়া Milton's Areopagitica পড়ান।

বিশ বৎসর কার্য্য করিবার পরে সিটী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শেষ হয়।

নবনিয়মানুসারে এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষকগণ অন্তরঙ্গ (internal) ও বহিরঙ্গ (external) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা এবং পরীক্ষার্থীদিগের উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করা এই দুইটীই তাঁহাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। আমি ১৯১৮ সন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ (১৯৪১) সন পর্য্যন্ত উভয় কর্ম্মেই নিযুক্ত আছি, মাঝে এক বৎসর প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করি নাই।

রোগ-ভোগ

কলিকাতায় আসিবার পরে, প্রথম বৎসরটা স্বাস্থ্য ভাল ছিল, সেইজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সময়ে আমাকে বিস্তর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল এবং কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জর্ম্মণদেশীয় অধ্যাপকের নিকটে জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ শ্রেণীতে পূজনীয় হেরম্ববাবু এবং আমার অগ্রজও পাঠ করিতেন।

সিটী কলেজে কার্য্য আরম্ভ করিবার পর হইতেই শরীর খারাপ হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ উৎকট উৎকট শিরোবেদনা প্রায় নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিল। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের ব্যবস্থানুসারে সপ্তাহে দুই তিন দিন ভোরে উদ্ভিজ্জজাত রেচক ঔষধ খাইলাম। কিছুদিন পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "তুমি কেন কতকগুলি ঔষধ খাইতেছ? রোজ সকালে ইডেন গার্ডেনে গড়ের মাঠে বেড়াইতে আরম্ভ কর, সব অসুখ সারিয়া যাইবে।" আমি বলিলাম, "প্রাতঃকালটা পড়ার জন্য রাখিতে হয়, তখন কি করিয়া বেড়াইতে যাই।" তিনি বলিলেন, "বেড়াইলে পড়াশুনা আরও ভাল হইবে।" তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি ১৯১১ সনের অক্টোবর মাস হইতে ময়দানে ও ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর এই ব্রত পালন করিয়াছি।

শিরঃপীড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই বৎসর আমার একটী নূতন রোগ দেখা দিল। কালক্রমে আমার দেহে এমন আরও কয়েকটী নব ব্যাধি আবির্ভূত হইল, যাহা আমার আর কোনও সহোদরকে স্পর্শ করে নাই। শারদীয় অবকাশে এক রজনীতে নিদ্রা যাইতেছি হঠাৎ

জাগিয়া দেখিলাম, বাম কর্ণের পশ্চাদ্দেশে বেদনা হইয়াছে। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য বিবরণ শুনিয়া একটা মালিশের তরল ঔষধ দিলেন, কয়েকদিনে সারিয়া গেল। নয় বৎসর পরে প্রায় ঐ সময়েই আবার উক্ত রোগেই আক্রান্ত হই, এবারও ডাক্তার আচার্য্য কয়েকবার দেখিয়া আমাকে রোগমুক্ত করেন। পুনরায় ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ ব্যাধিতে প্রবলরূপে আক্রান্ত হই। এবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর হইল। সংবাদ পাইয়া প্রাণকৃষ্ণবাবু তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং ফোন করিয়া ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে আনাইলেন। তাঁহার উপদেশে ডাক্তার মৈত্র serum injection দিলেন। এ যাত্রায় সারিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কেহ কেহ প্রচার করিয়াছিলেন, 'রজনীবাবু এবার চলিলেন।' ইহার পরও ১৯৩০ সনের ৩০এ নবেম্বর নূতন গৃহে আগমনের পরেই, ১৮ই জানুয়ারী এই রোগে কষ্ট পাইয়াছি। এবার ডাঃ সেনগুপ্ত চিকিৎসা করেন। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে ডাক্তার সত্যবান্ রায় স্বীয় কক্ষে আমাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় দেখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তৎপরে ৯।১০ বৎসর গুরুতর উপদ্রব হইতে মুক্ত আছি।

১৯২৪ সনের মার্চ্চ মাসে একটী অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাধি আবির্ভূত হইল। একদিন ইডেন উদ্যানে বসিয়া আছি, হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম, মলদ্বারের ডান পাশে খানিকটা স্থান ফুলিয়াছে। ডাক্তার উমেশচন্দ্র সামন্ত আহূত হইলেন। প্রধান প্রতিষেধ হইল hot compress. এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এক মাস, দুই মাস—নানারূপ ব্যবধানে রোগের আক্রমণ চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় বৎসর ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র পরীক্ষা করিয়া সপ্তাহে একবার ডুস লইবার ব্যবস্থা

দিলেন। কয়েকমাস পরে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলে আপনাকে ডাক্তার মৈত্রের চিকিৎসাধীনে রাখিলাম। তিনি ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আক্রমণের ব্যবধান বাড়িতে লাগিল। ১৯৩১ সনের পরে এই রোগ আর পূর্ব্বাকারে দেখা দেয় নাই।

ইতোমধ্যে বহুমূত্র প্রকট হইল। ১৯২৩ সনে, গ্রীষ্মের ছুটীর শেষদিকে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষা কার্য্য সমাপন করিবার পর শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইল দিনের পর দিন স্নানাহার বাদে দিবা রাত্রি সমস্ত ক্ষণ কেবল বিছানায় পড়িয়া থাকি। ময়দানে বেড়ান বন্ধ হইল, আহারে অরুচি জন্মিল। আমি বুঝিতে পারি নাই যে ইহা বহুমূত্রের পূর্ব্ব লক্ষণ। ক্রমশঃ প্রস্রাবের বার ও পরিমাণ বাড়িয়া চলিল পরিশেষে সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে মূত্র পরীক্ষার ফলে প্রকাশ পাইল, আমাকে প্রবল ব্যাধিতে ধরিয়াছে—21 grs in an ounce.

পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঔষধ পথ্য বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থামত চলিতে আরম্ভ করিলাম। ঔষধ cellasin.

ভাত খাওয়া বন্ধ হইল, দুইবেলা সুজি সিদ্ধ রুটী খাইতে লাগিলাম। চিনির বদলে স্যাকারিণ ; কতকগুলি তরকারী নিষিদ্ধ রহিল। বিধি ও নিষেধের একটা ফর্দ্দ করিয়া ডাক্তার আচার্য্যের দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া লইলাম। দুই তিন মাস পরেই মূত্রে চিনির পরিমাণ খুব কমিয়া গেল, দেহও একটু সবল হইল। গ্রীষ্মের ছুটীতে চিকিৎসকের পরামর্শে আমরা শিলং গেলাম।

আমি ঔষধ পথ্য সম্বন্ধে ডাক্তার আচার্য্যের পরামর্শ ষোল আনা পালন করিয়া চলিতাম। তৎসত্ত্বেও পর বৎসর গ্রীষ্মের অবকাশে

পুরীতে অবস্থানকালে রোগ খুব বাড়িয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্য মহাশয়কে অবস্থা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আমার দ্বারা আর হইল না ; আপনি specialistএর নিকটে যান। Insulinএর injection দিতে হইবে।" আমি বন্ধুজনের সহিত পরামর্শ করিয়া Dr. S. C. Sengupta (সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত) M. D. (Edin) মহাশয়ের নিকটে গমন করিলাম।

১৯২৮ সনের ১৬ই অক্টোবর, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার সেনগুপ্তের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক রোগের লক্ষণগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, benignant diabetes—অর্থাৎ দুষ্ট বহুমূত্র নয় ; সহজ বহুমূত্র। ইন্‌জেকশন লইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রত্যূষে ত্রিফলার জলপানের ব্যবস্থা দিলেন। অন্য ঔষধের ব্যবস্থাও ছিল। সেগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন রোগের মধ্যে আজ তের বৎসর ত্রিফলার জল অবিচ্ছেদে চলিতেছে। পথ্যের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণবাবুর বিধির মধ্যে কয়েকটী নিষিদ্ধ এবং নিষেধের মধ্যে কতকগুলি বিহিত হইল।

পূর্ব্বের কথা অনুসারে ডাক্তার সেনগুপ্ত দর্শনীস্বরূপ দশ টাকা গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়বার ইঁহার হাতে দশ টাকার একখানা নোট দিলাম. ইনি আমাকে পাঁচ টাকা ফিরাইয়া দিলেন। তদবধি ইঁহার গৃহে চিকিৎসার প্রয়োজনে যাইয়া আমি ইঁহাকে পাঁচ টাকাই দিতেছি। ইহার ন্যায় মধুর প্রকৃতি সুচিকিৎসক আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমার এই রোগের বিগত পনর বৎসরের ইতিহাস বিচিত্র। আট বৎসর কাল চিনির মাত্রা কখনও ২১ গ্রেণে উঠিত, কখনও এক গ্রেণের নীচে নামিত। পথ্যের মধ্যে তিন চারি বৎসর

দুইবেলা সুজির রুটি—তাহাও দশখানা হইতে তিনখানায় নামিয়া আসিল। তারপরে একবেলা এক ছটাক পুরাতন দাদখানি চাউলের ভাত—আজও তাহাই চলিতেছে। সপ্তাহে একদিন লুচি খাইবার ব্যবস্থা ছিল—দশ বৎসরে তার সংখ্যা বিশ হইতে আটখানা দাঁড়াইয়া ছিল।

১৯৩৪ সনের ২৮এ আগষ্ট পাঁচটার সময় কলেজ হইতে ফিরিবার পথে ট্রাম গাড়ীতে উঠিতে যাইয়া পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হই। তখন চিনির পরিমাণ এক আউন্সে প্রায় উনিশ গ্রেণ ছিল। তজ্জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতটী শুকাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল; এবং চিনি ২৭ গ্রেণে উঠিল। ডাক্তার সেনগুপ্তকে ফোনে সংবাদ দিলাম। তিনি তখন নিজে অসুস্থ এবং গৃহে আবদ্ধ; অধিকন্তু অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশানু-সারে মান্তুর সঙ্গে ট্যাক্সি করিয়া তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়িতে গমন করিলাম। তিনি পরীক্ষা করিয়া তখনই ডাক্তার কৃপাবিন্দু চক্রবর্ত্তীকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া ইন্‌জেক্‌শন্ দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রায় তিন মাস প্রতিদিন ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হইল। তারপর একদিন পর একদিন, সপ্তাহে দুই দিন—এইরূপে মার্চ্চমাসে উহার নিবৃত্তি হইল।

এই বিপত্তির উপরে সহসা আর এক বিপত্তি উৎপতিত হইল। ডিসেম্বর মাসে এক দিন স্বাভাবিক কণ্ঠ লইয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতে যাইতেই হঠাৎ স্বরভঙ্গ হইল। কষ্টেসৃষ্টে কাজ শেষ করিবার পরে গলা হইতে আর আওয়াজ বাহির হয় না, শেষে ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতে হইত। ১৭ই ডিসেম্বর, সপ্তাহকাল নিষ্ফল

ঔষধ ব্যবহারের পরে, মান্তুকে সঙ্গে লইয়া নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার সত্যবান রায়ের গৃহে গমন করিলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক কণ্ঠ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রোগ paralysis of the vocal nerve—বাক্‌স্নায়ু অবশ হইয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই কোনও গুরুতর মানসিক আঘাত পাইয়াছেন। (কথাটা সত্য।) ভাল হইয়া যাইবে।" প্রথমতঃ বৈদ্যুতিক চিকিৎসার জন্য আমাকে ডাক্তার কে. বি. ঘোষের নিকটে পাঠাইলেন। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে তাঁহার চিকিৎসাগার ছিল। তিনি একদিন পর পর আটবার (প্রতিবার দক্ষিণা আট টাকা; ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী) কণ্ঠে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিলেন; ঐখানেই ডাক্তার রায় বৈদ্যুতিক চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিদায় লইবার কালে ডাক্তার ঘোষ বলিলেন, "আপনার স্বর আরও ভাল হইবে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় হইবে না। ইতোমধ্যে এক দিন হাসপাতালে মান্তুকে দেখিয়া বলিয়া দিলেন, আমি যেন হাসপাতালে যাই, তিনি সেইখানে আমার চিকিৎসা করিবেন। তাঁহার কক্ষে তাঁহাকে আট টাকা দর্শনী দিয়াছিলাম, তিনি ইচ্ছা করিলে বহু আট টাকা আমার নিকট হইতে পাইতে পারিতেন।

৩রা জানুয়ারী হইতে আমি হাসপাতালে যাইতে লাগিলাম। ডাঃ রায় আমাকে অতি যত্ন সহকারে দেখিতেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব দেখিতেন, এমন কি কোন কোন দিন সর্ব্বাগ্রে দেখিতেন। আমাকে দরজার নিকটে দেখিলেই সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া যাইতেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার গলা ভাল হইবে।" আমি ভাঙ্গা সুরে বলিলাম, "আপনার ন্যায় বিখ্যাত চিকিৎসকের কথা যদি বিশ্বাস না করি, তবে কাহার কথা বিশ্বাস

করিব ?” আমি জানুয়ারী মাসে নয়বার, মার্চ্চ মাসে দুইবার এবং এপ্রিল মাসে একবার হাসপাতালে গিয়াছিলাম। আমি যে ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছিলাম এই তালিকা তাহারই পরিচায়ক। আমি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাস দুই ছুটী লইয়াছিলাম। সিটী কলেজে পড়াইতাম না, সহকারী অধ্যক্ষের কাজ করিতাম। মার্চ্চ মাস হইতে গলার স্বর স্বাভাবিক হইয়া আসিল এবং অচিরেই সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বের বল পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

এইবার আমার দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। বহুমূত্রের আতিশয্য বশতঃ পূর্ব্ব হইতেই শরীর দুর্ব্বল ছিল—দিন দুই পূর্ব্বে ডাক্তার সেনগুপ্তের নিকট হইতে ঔষধাদির ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছি। সে দিন কলেজের কাজ করিয়া অপরাহ্নে শ্রান্তদেহে উদরে ক্ষুধার জ্বালা লইয়া বাড়ী চলিলাম। কালীতলা হইতে ট্রামে হ্যারিসন রোডে উপনীত হইয়া দেখিলাম, মার্কেটের দক্ষিণে পার্ক সার্কাসের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। উঠিতে যাইয়া দেখি, পা'দানে লোক দাঁড়াইয়া আছে, পা' রাখিবার স্থান নাই। উঠিবার প্রয়াস পাইলাম না। ক্ষণকাল পরে চাহিয়া দেখি, ঐ গাড়ী নবীন ফার্ম্মেসী হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে।

অমনি ক্ষুধার তাড়নায় আমার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল, আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীটা ধরিতে চেষ্টা করিলাম, পাদানে এক পা রাখিতেই গাড়ী ছাড়িল, যাঁহারা পাদানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে একটু সরিতে অনুরোধ করিলাম, কেহ এক চুল নড়িল না। আমি গাড়ীর বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলাম, কিন্তু ভূমিসাৎ হইলেও লোহার শিক ছাড়িলাম না। বাম হাতে ছাতা ও বই, ডান হাতে শিক ধরিয়া আছি, এইরূপে গাড়ী হ্যাঁচড়াইয়া আমাকে খানিকদূর

লইয়া গেল। খুব একটা সোরগোল পড়িয়া গেল রাস্তায় বিস্তর জনতা হইল, গাড়ী থামিল। আমি যে গুরুতর রূপে নানা স্থানে আহত হইয়াছি, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। দাঁড়াইয়া দেখিলাম, যে নিচের কাপড়ে বেশ বড় রক্তের দাগ। ভাবিলাম, নবীন ফার্ম্মেসীতে যাইয়া ক্ষতে Tincture iodine লাগাই। পরে বাড়ী যাইব। এই সময়ে এক হিন্দুস্থানী আসিয়া আমাকে বলিল, "বাবু আপনি আসুন, (চৌধুরী কোম্পানীর সম্মুখে) ঐ খানে ঐ ক্যাম্পে আপনাকে বসিবার চেয়ার দিবে, ওখানে এক সাহেব আছেন।" আমি তাহার সঙ্গে গেলাম। লোকেরা বলিতে লাগিল, "বাবুর আজ নব জন্ম হইল।" আমি যাইয়া চেয়ারে বসিলাম, এক শ্বেতকায় ভদ্রলোক ক্ষতগুলি ধুইয়া ঔষধ (benzoin) লাগাইলেন, এবং first aid এর সার্টিফিকেট দিয়া বলিলেন, "Now you may go to the hospital." আমি বলিলাম, "Is it necessary ?" তিনি উত্তর দিলেন, "I don't think it is necessary." চলিয়া আসিবার সময় বলিলেন, "Thank God you have escaped with your life." আমি ট্যাক্সি করিয়া বাড়ী ফিরিলাম, এবং বাড়ীর সন্নিকটে Health Hall হইতে ডাক্তার রেণু গাঙ্গুলীকে তাঁহার গাড়ীতেই আহ্বান করিয়া আনিলাম। ইহার চিকিৎসা পরিবর্ত্তিত করিয়া ডাঃ সেনগুপ্ত ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা করেন।

এবারকার ট্রামওয়ে দুর্ঘটনাটী পূর্ব্ববর্ত্তী ছোট বড় আরও কয়েকটীর উপসংহার। ১৯২৭ সনে বর্ষার শেষ দিকে ইহার সূচনা হয়। সেদিন গড়ের মাঠ হইতে ফিরিবার পথে চাবির গোছা হারাইয়া ফেলিয়া মহাবিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম। ফলে ঘরে ঢুকিতে এবং স্নানাহার করিয়া কলেজে যাইতে বিলম্ব হইয়া গেল। সে দিন

নির্দ্ধারিত ছিল South African commission কলেজ দেখিবে। এজন্য কোটপ্যাণ্ট পড়িয়া যাইতে হইয়াছিল কিন্তু আমার যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা কলেজ দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি তৎপরে তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি, শ্যামবাজারের গাড়ী মেডিক্যাল কলেজের ফটকের সম্মুখে থামিয়াছে। কিন্তু আমি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া আমার ইঙ্গিতে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিতে লাগিল। আমি চলন্ত গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হাতে ২।৩ খানা বই ছিল, একখানা খুব ভারী, পাদানে দাঁড়াইয়াই বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলাম, গাড়ীটা দাঁড়াইল, এবং আমি সেই গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিলাম। বাম হাঁটুর পাশে ক্ষত হইয়াছিল, শুকাইতে কিছু দিন গেল। প্যাণ্টালুন খানিকটা রক্ষা করিয়াছিল। ১৯২৯ সনের জানুয়ারী মাসে (সাইমন কমিশনের কলিকাতায় আগমনের দিন) প্রাতঃকালে ইডেন গার্ডেন হইতে ফিরিবার কালে ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পঁহুছিয়া সময়াভাবে ট্রামগাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে গাড়ী থামিলে প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে যাইতেছি, হঠাৎ ফুটপাথের কিনারায় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম, মাথায় খুব জোরে গাড়ীর পঞ্জরের কাঠের সহিত ঠক্কর লাগিল, বিষম আঘাতে বাম চক্ষুর উপরে কপাল ফুলিয়া গেল এবং তীব্র বেদনা হইল, এক পা হইতে জুতা (deck shoe) ছিটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া রুমাল ভিজাইয়া কপালে লাগাইয়া বাড়ী আসিলাম; স্নানাহারের পরে ক্রমাগত পাঁচ ছয় ঘণ্টা বরফ প্রয়োগ করা হইল—তাহাতে যন্ত্রণা কমিয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ও গাল স্ফীত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নয়

মাস পরে কর্ণমূলের সেই পীড়ার মধ্যে আহত স্থানে আবার বেদনা হইয়াছিল।

১৯৩৩ সনে গ্রীষ্মের ছুটীতে একদিন রাত্রিকালে সিটী কলেজ হইতে ফিরিবার পথে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গাড়ী থামিলে ভূমিতে অবতরণ করিতেই একেবারে লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলাম। বাম পায়ের বুড়া আঙ্গুলে বিষম আঘাত লাগিল, কিসের সঙ্গে, বুঝিতে পারিলাম না। সেখানে ইটপাথর কিছু দেখিলাম না। আঘাতের চোটে আঙ্গুল পাকিয়া নখ পড়িয়া গেল। এজন্য আমাকে কয়েক মাস এক বিশেষ রকমের চটীজুতা পরিয়া ঘরের বাহির হইতে হইত।

ইহার উপরে দুই তিনবার নূতন ধরণের গাড়ীতে উঠিয়াই উহার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি কিন্তু বিশেষ আঘাত পাই নাই। এই কয়েকটী দুর্ঘটনার পরাকাষ্ঠা ও উপসংহার হইল ২৮এ আগষ্টের দুর্ভোগ। সেই দিন হইতে আমি ট্রাম ও বাস বর্জ্জন করিয়াছি।

অতঃপর কঠোরতর পরীক্ষা আসিতেছে। ১৮৯১ সনে আমি প্রথম চস্‌মা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি ($-1\cdot25$)। ১৯০২ সনে $-2\cdot5$ powerএর চস্‌মা লইতে হয়—শুধু দূর দৃষ্টির জন্য, পড়িবার জন্য চস্‌মার আবশ্যক হইত না। কালক্রমে দূর দৃষ্টির চসমাও বদলাইবার ও নূতন করিয়া পড়িবার জন্য চসমা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়। ১৯২৫ সনের এপ্রিল মাসে পড়িবার জন্য এক জোড়া এবং মে মাসে দূরের বস্তু দেখিবার এবং কলেজে পড়াইবার কাজের উপযোগী bifocal চসমা ক্রয় করিলাম। চক্ষুর বিশেষজ্ঞ চৈতন্য প্রকাশ ঘোষ যত্নপূর্ব্বক চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চসমার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আমি বরাবর বেড়াইবার সময় ট্রামে বই পড়িতাম। কুড়ি বৎসরে

এই রূপে আমার বহু পুস্তক পড়া হইয়াছিল। ১৯২৯ সনে সেই গুরুতর পীড়ার অল্প কাল পরে আমার বাম চক্ষুর অর্দ্ধাংশ রক্তবর্ণ হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। Bathgate কোম্পানীর একটা পেটেণ্ট ঔষধে ফল না পাইয়া মেয়ো হস্পিটালে যাইয়া ডাক্তার সুধীরচন্দ্র দত্তকে দেখাইলাম (ইনি রামমোহন সেমিনারীর ছাত্র ছিলেন।) তিনি চক্ষু পরীক্ষা করিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁহার চেম্বারে যাইতে বলিলেন, এবং সেইখানে প্রায় প্রতিদিন আমাকে দেখিয়া ঔষধ, সেক প্রভৃতির বিধান দিলেন। ধীরে ধীরে, একটু বিলম্বে চক্ষু নীরোগ হইল। প্রথম দিন তাঁহাকে দর্শনী দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।

১৯৩২ সনের শরৎকালে ডান চোখ ঐ রকম রক্তবর্ণ হইল। সুধীর বাবু তখন বিদেশে; কাজেই পূর্ব্ব বারের অনুকরণে গোলাপজল, গরম লবণের সেক প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলাম।

তৎপরে ময়দানে বেড়াইতে যাইয়া ক্রমশঃ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় দূর হইতে ট্রামগাড়ীর গন্তব্য স্থানের নাম পড়িতে পারি না। এই সময়ে অর্জ্জুন দাস নামক বোম্বাই অঞ্চলের একটী ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি কার্জন পার্কের পশ্চিমের ফুটপাথে তাঁহার আফিসের বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেন, আমি সেই সময়ে ময়দানের দিকে যাইতাম —ইহাই ছিল আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি সেখান হইতে চৌরঙ্গীর Whiteaway Laidlaw দোকানের ঘড়ি দেখিয়া সময় বলিতে পারিতেন, আমি দেখিতাম নিবিড় শূন্য—বুঝিলাম, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতেছে। ক্রমশঃ অর্জ্জুন দাসের সহিত হৃদ্যতা জন্মিল, তিনি

আমাকে তাঁহার নামের কার্ডে সুপারিশ করিয়া ডাক্তার জুয়ানের নিকটে প্রেরণ করিলেন—ইনি Old Persian, চৌরঙ্গী ও বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে ইঁহার দোকান ও বসিবার ঘর ছিল।

তিনি প্রথমে একটী তরল ঔষধ ও তৎপরে স্পেন দেশীয় একটা মলম চক্ষুতে প্রয়োগ করিবার বিধান দিলেন। আর চস্‌মার কাচ বারংবার খুলিয়া পড়িয়া চূর্ণ হইলে উপযুক্ত মূল্য লইয়া তাহার সংস্কার করিয়া দিতেন। শেষের বারে যে ফ্রেমটা দিয়াছিলেন তাহা আজও অটুট আছে।

আমি বসু কোম্পানী হইতে ঔষধ ক্রয় করিতাম। উহার জ্যেষ্ঠ স্বত্বাধিকারী একদিন আমাকে বলিলেন, ডাক্তার আপনাকে cataractএর (ছানির) ঔষধ দিতেছে। ডাক্তার জুয়ানকে সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "If nothing untoward happens there is no fear of cataract—যদি "মন্দ কিছু না ঘটে, তবে ছানির আশঙ্কা নাই।"

তৎপরে আমি ১৯৩৩ সনের পূজার ছুটীতে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবার ব্যপদেশে ঢাকায় গমন করিলাম। সেখানে সায়ংকালে ছাদে বেড়াইবার সময়ে দুইটী নূতন ব্যাপার আবিষ্কার করিলাম, প্রথম এক একটী গ্রহকে পূর্ণাঙ্গ থালা বা গোলকের মত না দেখিয়া চক্রের আকার দেখিতেছি দ্বিতীয়, চন্দ্রকলা একটীর স্থলে একাধিক, চারি পাঁচটী দেখিতেছি।

একদিন অবসরপ্রাপ্ত হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি এক চক্ষুতে ছানির অস্ত্রোপচার করাইয়া দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় তাঁহাকে আমার কথা বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, "চাঁদ কয়টা দেখেন?" উত্তর, "অনেকগুলি।" তিনি তখন বলিলেন, "তবে ছানি হইয়াছে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলাম, ডাক্তার সুধীরচন্দ্র দত্ত ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অচিরে তাঁহার কক্ষে গমন করিলাম। তিনি জর্ম্মণী হইতে আনীত যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "দুই চোখেই ক্যাটারাক্ট (cataract) হইয়াছে। বাম চোখে বেশী, ডান চোখে কম—"thank God, it is not glucoma"—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে গ্লুকোমা হয় নাই। এক বৎসর কাল তাঁহার পরীক্ষাধীন থাকিলাম। ১৯৩৫ সনের শেষ দিকে স্থির হইল, বড় দিনের ছুটীতে বামচক্ষুতে অস্ত্রোপচার করা হইবে। পূর্ব্ব বৎসর তাঁহার পরিদর্শনাগারে দাদার একটীমাত্র চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল, এবং তিনি দশ দিন পরে নিরাময় হইয়া স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি স্বগৃহে ছানি কাটাইবার আয়োজন করিলাম। ইহাতে ডিসেম্বর মাসে আমাকে মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা, জিনিসপত্র ক্রয় করা প্রভৃতি নিয়মিত অধ্যাপনাদি কাজের উপরে নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতে হইল। এজন্য ইচ্ছা থাকিলেও আমি ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেন গুপ্তের নিকটে যাইয়া রক্তের চাপ পরীক্ষা করাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমি নির্ব্বোধের ন্যায় একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিলাম। আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্তও হইল গুরুতর।

অস্ত্রোপচার উপলক্ষে দুই কন্যার সহিত বীণা ও প্রদোষ এবং সপরিবার খোকা আসিলেন। ২৪এ ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ডাক্তার দত্ত আমার শয়নকক্ষে বামচক্ষুর ছানি কাটিলেন—সহকারী জন

দুই ছিলেন। অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে নিশ্চল শয়ান, আবৃতনেত্র, এক-চক্ষুঃ প্রভৃতি অবস্থায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অস্ত্রপ্রয়োগের প্রথম কয়েকরাত্রি ঘরে নার্স থাকিল। দিন দশ পরে বাম চক্ষুর আবরণ উন্মোচন হইল—পরিষ্কার দৃষ্টির পুনরুদ্ধার হইয়াছে, উহাতে রাস্তার লোক জন গাড়ী ঘোড়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ডাক্তার দত্ত প্রতিদিন আমাকে দেখিতে আসিতেন। ৬ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে নিজে ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুইয়া দিয়া গেলেন।

সারাদিন বড়ই আরাম বোধ করিলাম—মাথা বেশ শীতল বোধ হইতেছে—প্রথম রাত্রি সুনিদ্রা হইল। বারটার সময় তীব্র মাথার যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অবশিষ্ট রাত্রি ছটফট করিয়া কাটিল।

পর দিন প্রাতঃকালে সুধীর আসিলেন, দেখিলেন, চক্ষুতে রক্ত-স্রাব হইয়াছে। সেই দিন হইতে দিবারাত্রি প্রায়শঃ বিষম যাতনার মধ্যে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ডাক্তার milk injection দিতে লাগিলেন—কিন্তু পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে দাদা আমাদিগকে বলিলেন, blood pressureটা একবার দেখা উচিত—ডাক্তারকে বলিও। আমরা তাঁহাকে কথাটা বলিলাম, তিনিও দেখা আবশ্যক বোধ করিলেন, কিন্তু আজকাল করিয়া তাহা আর হইয়া উঠিল না।

২১এ ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষকাল পর্য্যন্ত বেশ সুনিদ্রা হইল। তারপর যথারীতি ত্রিফলা খাইবার জন্য বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, তৎক্ষণাৎ যেন কেহ আমাকে পিছন হইতে চুলে ধরিয়া টানিয়া বালিশের উপরে ফেলিয়া দিল, কতকটা ইচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় শুইয়া পড়িলাম, ভাবিলাম, এটা কি হইল। কিয়ৎকাল পরে আবার উঠিয়া

বসিতে যাইতেই ঠিক ঐ অবস্থা হইল। মুকুল রাত্রিতে আমার ঘরে ঘুমাইত; তাহাকে জাগাইয়া বীণাকে ডাকিতে বলিলাম। খবর পাইয়া বীণা, মান্তু, বৌ প্রভৃতি আসিল। একটু বেলা হইলে বীণা সুধীরকে ফোন করিয়া সংবাদ দিল, এবং blood pressure দেখিবার যন্ত্রটা সঙ্গে আনিতে বলিল। প্রাতঃকালে বিছানায় নড়িতে চড়িতে এক একবার মনে হইতে লাগিল যে খাট অর্দ্ধচক্রাকারে ঘুরিতেছে। দুপ্রহর বেলার পূর্ব্বে ডাক্তার দত্ত blood pressure দেখিলেন; কত উঠিল, তাহা বলিলেন না, ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন, বিলক্ষণ বেশী। বলিলেন, "আমি surgeon, physician নই; এতদিন যাহার চিকিৎসাধীন ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দিন।" এই বলিয়া ডাক্তার সেনগুপ্তের নামে একখানা পত্র লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। বৈকালে বীণা পত্র লইয়া ডাক্তার সেনগুপ্তের নিকটে গেল। তিনি সন্ধ্যার পরে আমাকে দেখিতে আসিলেন। রক্তের চাপ কত হইল, তাহা তিনি আমাকে কিছুতেই বলিলেন না। অধিকন্তু আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ করিলেন, "অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে আপনার আমাকে বলা উচিত ছিল।" আমি এই ত্রুটি স্বীকার করিলাম। তারপর তিনি ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা নিজের হাতে লিখিয়া দিয়া গেলেন। বিছানায় উঠিয়া বসিতেও নিষেধ করিলেন—মাটীতে পা দেওয়া তো দূরের কথা। আমি পরে দেখিয়াছিলাম, pressure 235/110.

সেই রাত্রি হইতে আমার ভাগিনেয় খুদু (তাপসকুমার রায়) আমাকে দেখিবার ও রাত্রিতে আমার ঘরে থাকিবার ভার গ্রহণ করিল। সে মেডিকেল স্কুলের পরীক্ষা (L. M. F.) উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল হইতে এই গৃহেই

বাস করিত। সে তিন মাসের অধিককাল নিষ্ঠার সহিত আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল।

এইবার আর একটী দুরারোগ্য বা আরোগ্যাতীত ব্যাধি আমাকে আক্রমণ করিল। চক্ষুর চিকিৎসা কিছুকাল স্থগিত ছিল, রক্তের চাপ কমিলে ও দেহ একটু সুস্থ হইলে আবার আরম্ভ হইল। চক্ষুর যন্ত্রণা একটার পর একটা লাগিয়াই আছে। সর্ব্বশেষে হইল বাম চক্ষুতে conjunctivitis—যাকে বলে চোখউঠা। সুধীর প্রায় চারিমাসকাল চক্ষুটী রক্ষা করিবার জন্য কত খাটিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—যে চক্ষুতে পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলাম, তাহা চিরতরে অন্ধ হইল। মার্চ্চের শেষে ডাক্তার দত্ত আমাকে বি.এ. পরীক্ষার ইংরেজী অনার্সের কাগজ দেখিতে অনুমতি দিলেন—আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে চক্ষুটী একেবারে গিয়াছে। দুই তিনমাস পরে তিনি আমাকে তাহা জানিতে দিয়াছিলেন।

সুধীরের ঋণ আমি কোন কালেই শোধ করিতে পারিব না। আমাকে তিনি কি চক্ষুতেই দেখেন—এখনও, ১৯৪১ সনেও তাঁহার সশ্রদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের লাঘব হয় নাই। চিকিৎসার কালে তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "you are as a father to me"—"আপনি আমার কাছে পিতার মত।" আমি যখন রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ছিলাম, তখন তিনি নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতেন—এই তো তাঁহার সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। রোগীর গৃহে অস্ত্রোপচার করিলে তাঁহার পারিশ্রমিক দুই শত টাকা; তা'ছাড়া তাঁহাকে মাসের পর মাস আমার জন্য খাটিতে হইয়াছে—আমি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে

সম্মত করাইতে পারি নাই। বার বৎসর কাল আমি সমভাবে তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছি।

বামচক্ষু দৃষ্টিহীন হইল বটে, কিন্তু তাহার বেদনা, কখনও তীব্র, কখনও মৃদু, সুদীর্ঘকাল রহিল। ছয় বৎসর পরে উহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু এখন হইতে আমার প্রধান ব্যাধি দাঁড়াইল blood-pressure। গ্রীষ্মের ছুটীর পরে সিটী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু শরীর দীর্ঘ রোগভোগের দরুণ শীর্ণ হইতে লাগিল। ১৯২৯ সনের ৭ই জুলাই আমার ওজন ছিল ১ মণ ৩৭½ সের—তখন আমি বহুমূত্রে ভুগিতেছি। উহার মধ্যেই বৎসর দুই পরে (২১।১১।৩০) উহা ২ মণ ৩½ সেরে উঠিয়াছিল। এবার বৎসরাধিক কাল পরে, মে মাসে ডাক্তার সেনগুপ্তের গৃহে ওজন হইয়া দেখিলাম আমি ১৩৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ মণ ২৬ সেরে নামিয়াছি। তারপর কয়েকমাসে এক সের লাভ করিয়া ২১এ সেপ্টেম্বর আবার রক্তের চাপে (২১০।৯৫) শয্যা লইলাম। এবার দুই একদিন পরে শয়ন ঘরে টুলে বসিয়া স্নান করিবার সময় আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম—বৌ এবং ভোলা-নামক চাকর স্নান করাইবার জন্য উপস্থিত ছিল, পরে তাহাদের মুখে শুনিলাম। ২৯এ নবেম্বর ডাক্তারের বাড়ী যাইয়া ওজন হইলে দেখা গেল ১২৬ পাউণ্ড (প্রায় ১ মণ ২২ সের) তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে কমিতে ২৩।৫।৩৭ তারিখে দেহের ভার দাঁড়াইল ১১৬ পাউণ্ড (১ মণ ১০ সের) এই দুর্লক্ষণ দেখিয়া ডাক্তার সেনগুপ্ত আমাকে এক রকম জোর করিয়া কার্সিয়ঙ্গে পাঠাইলেন। সেখানে দুই মাসে ১১৬¾ পাউণ্ড অর্থাৎ মোট উন্নতি ¾ পাউণ্ড হইয়াছিল। এই কার্সিয়ঙ্গেই চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আমার ভার দেখিয়াছি ১৭০ পাউণ্ড। তারপর

আবার উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে উহা (১৯৪১) ১৩৩ পাউণ্ডে উপনীত হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের ২২এ নবেম্বর তৃতীয়বার রক্তের চাপে (২০৮।৯০) আক্রান্ত হই। তারপরে চারি বৎসর একপ্রকার ভালই চলিতেছে।

শুনিয়াছিলাম, বহুমূত্রের প্রতিকারকল্পে ইন্‌জেক্‌সন লইতে আরম্ভ করিলে তাহার আর বিরাম হয় না। আমার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে অন্যরূপ। আমি ১৯৩৫ সন হইতে ছয় বৎসরের অধিককাল ঐ দুরারোগ্য রোগের উপদ্রব হইতে মুক্ত আছি। কিন্তু কি একটা নূতন ব্যাধির জন্য ১৯৩৮ সনের নবেম্বর মাস হইতে আমার পক্ষে লবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চিনি, আলু প্রভৃতি বহুমূত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনার্থ বিহিত হইয়াছে। এক বেলা অন্নভোজন তাহার পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে। ঔষধ পথ্য সম্বন্ধে আমি ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের ব্যবস্থা কড়ায়ক্রান্তিতে পালন করিয়া থাকি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যচর্চ্চা

ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার জন্য Sir. A. Grant রচিত Xenophon ইংরেজী সাহিত্যে অন্যতম পাঠ্যপুস্তক ছিল। ভক্তিভাজন শশিভূষণ দত্ত মহাশয় ঢাকা কলেজে ঐ পুস্তকখানি কিছুদিন পড়াইয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে অধ্যাপনা কালে Grote's History of Greece এবং Jowett's Translation of Plato হইতে এক একটী স্থল পড়িয়া শুনাইতেন। এই সূত্রে গ্রীক সাহিত্যের প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় (১৮৮৯)। ১৯১৪ সনে গ্রীষ্মাব-

কাশের পরে সিটী কলেজে আমরা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকগণ কে কোন্ শ্রেণীতে কি কি বই পড়াইব, অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুমোদন অনুসারে তাহা স্থির হইল। আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে Xenophon পড়াইবার ভার পাইলাম। উহাতে 'সোক্রটীস' নামে একটী উৎকৃষ্ট অধ্যায় আছে। একদিন হঠাৎ অন্তরে একটা প্রেরণা পাইলাম, আমি সোক্রটীস নামক একখানা পুস্তক লিখিব; উহার মুখবন্ধস্বরূপ গ্রীক সভ্যতার একটা বিবরণ থাকিবে। ভূমিকা ও মূল গ্রন্থ একখণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলি পাঠ করিতে লাগিলাম। যত পাঠ করি ততই দৃষ্টি পরিধি প্রসারিত হইতে লাগিল। পরিশেষে উপলব্ধি করিলাম, ভূমিকাস্বরূপ গ্রীকসভ্যতার বিবরণ লিখিতেই পূরা একখণ্ড আবশ্যক হইবে।

আমি প্রথমে সোক্রটীস সম্বন্ধে প্লেটোর চারিটি "কথোপকথন" (Dialogues) মূল গ্রীক হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলাম। ১৯১৫ সনে গ্রীষ্মের ছুটি দার্জ্জিলিঙ্গে যাপন করিলাম। তদন্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পরেই প্রত্যহ মাথাধরায় ও অনিদ্রায় কষ্ট পাইতে লাগিলাম। কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলাম, উহা কিছুতেই গেল না, তখন উহা লইয়াই প্রথম নিবন্ধ 'এয়ুথুফ্রোণ' অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনিদ্রারোগ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইডেন গার্ডেনে ও গড়ের মাঠে বেড়াইবার নিয়মিত অভ্যাস হইতেই সারিয়া গেল। বৎসরান্তে, ১৯১৬ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে ভুবনেশ্বরে চতুর্থ নিবন্ধ 'ফাইডোন' সমাপ্ত হইল। দ্বিতীয় 'সোক্রটীসের আত্মসমর্থন' এবং তৃতীয় 'ক্রিটোন' কলিকাতাতে সমাপ্ত করিয়াছিলাম। প্রথম তিনটী পরে প্রবাসী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল,

এবং তিনটীর জন্যই সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাকে যথোচিত পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বর ও পূরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৬ সনের বর্ষাকালে আমি সোক্রটীসের জীবন-চরিত লিখিতে লাগিলাম।

মূল জীবন-চরিত যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তত্ত্ববিদ্যাসভার দুই অধিবেশনে পাঠ করিলাম। প্রথম দিন অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালদার সভাপতিরূপে প্রবন্ধটীর সবিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। একাংশ পরে সিটী কলেজের অধ্যাপকগণের এক অধিবেশনেও পঠিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের পরিকল্পনা ক্রমশঃ যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমি প্রকাশ করিবার উপায় চিন্তা করিয়া দিশাহারা হইলাম। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবার প্রকাশক হইতে অস্বীকার করিলেন। পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক চক্রবর্ত্তী ও চাটার্জ্জী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, "আমরা পাঠ্যপুস্তক ছাপাই ; যে বই বেশী বিক্রয় হয় না, তাহা আমরা প্রকাশ করি না।" অতঃপর অন্য পুস্তক প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করা ব্যর্থশ্রম বলিয়া বুঝিলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আমার সংকল্পিত ও আরব্ধ গ্রন্থের কথা জানাইলাম। তিনি পুস্তকের পরিকল্পনা দেখিতে চাহিলেন। আমি অচিরে একটা সূচীপত্র প্রস্তুত এবং উহাতে কি কি লিখিত হইয়াছে এবং কি কি লিখিতে বাকি আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া এক দিন দ্বারভাঙ্গা ভবনে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার না হইলেও কার্য্যতঃ উহার

কর্ত্তা ছিলেন। স্যর আশুতোষ আদ্যোপান্ত পরিকল্পনাটি পড়িয়া বলিলেন, "আপনি বই লিখিয়া ফেলুন, আমরা উহা ছাপাইব।" তিনি এই আশ্বাস দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আমার প্রয়োজনানুরূপ বহু মূল্যবান্ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ের জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সনে Church কর্ত্তৃক অনুবাদিত The Trial and Death of Socrates নামক পুস্তক এম্. এ. পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট হয়। আমি চাহিবামাত্র তিনি উহা আমাকে পড়াইবার অনুমতি দিলেন। অধিকন্তু মূলগ্রন্থ পড়াইবার পূর্ব্বে মুখবন্ধস্বরূপ যখন আমার ভূমিকার কয়েকটী অধ্যায় ছাত্রগণের নিকটে পাঠ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম তখন তিনি উৎসাহের সহিত উহার অনুমোদন করিলেন।

সোক্রটীস, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা ১৯২২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যবিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড আমার বিদেহিনী পত্নীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। স্যর আশুতোষের হাতে একখানি পুস্তক প্রদান করিতে সর্ব্বাগ্রে উৎসর্গের পৃষ্ঠাটিই দেখিয়াছিলেন। এবং তিনি ইহার মূল্য পাঁচ টাকা নির্দ্ধারণ করেন। একদা আমাকে বলেন, আপনি লাভের অর্দ্ধেক পাইবেন, কিন্তু লাভ কিছু হইবে না—এ বই বেশী বিক্রয় হইবে না। যদি fifth rateএ নভেল লিখিতে পারিতেন, তবে খুব বিক্রয় হইত।" তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসরে (১৯৪২) পাঁচ শত খণ্ড নিঃশেষ হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে এবং ডক্টর দিনেশচন্দ্র সেন Calcutta Review পত্রিকায় ইহার প্রশংসাসূচক সমালোচনা করেন। সঞ্জীবনীতে ইহার প্রচুর

সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। আর কোনও সমালোচনা উল্লেখ-যোগ্য নহে।

সোক্রেটীস দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৪ সনে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পরে প্রকাশিত হয়। এইখণ্ড তাঁহার উপরত আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

বোধ হয় তিনিই ইহার মূল্য আট টাকা ধার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ ১৩৩১ সনের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার প্রবাসীতে দ্বিতীয় খণ্ড সোক্রেটীসের বিস্তারিত সমালোচনা করেন। চৈত্রের সংখ্যায় আমার উত্তর এবং তাঁহার প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয়। অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনা মনে পড়িতেছে না।

ষাট, সত্তর ও তদূর্দ্ধ বয়সের পাঠকগণের মুখে 'সোক্রেটীস' নামক পুস্তকের প্রশংসা শুনিয়াছি। যুবকদিগের মুখে কদাচিৎ।

মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও আনুকূল্য ব্যতীত বিপুলায়তন সোক্রেটীস গ্রন্থ (দুইখণ্ডে demy 8vo প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠা এবং ১২ খানি ছবি) প্রকাশ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। এই কার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আমার সাহিত্যচর্চ্চার কাহিনী এইখানেই সমাপ্ত হইল। একটা মহৎ সংকল্প ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, ১৯০১ সনে আমি হোমারের ইলিয়াড পড়িতে আরম্ভ করিয়া বিলাত হইতে Leaf কর্ত্তৃক সম্পাদিত উৎকৃষ্ট সংস্করণের দুইখণ্ড গ্রীক মহাকাব্য আনাইয়াছিলাম। চারি সর্গ পাঠ করিবার পরে তের বৎসর উহা স্পর্শ করি নাই। ১৯১৪ সনে দেওঘরে অবস্থান কালে আমার ইলিয়াড

পাঠ সমাপ্ত হয়। দুই তিন বৎসর পরে মূল অডীসী আদ্যোপান্ত পাঠ করি। উভয় মহাকাব্যই একাধিকবার পাঠ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা চিত্তে উদিত হইল, একখানি পুস্তক লিখিব, তাহার নাম হইবে "The Iliad and the Ramayana : A study in comparative sociology. এই উদ্দেশ্যে নির্ণয়সাগর প্রেসের রামায়ণ ক্রয় করিলাম। ইতোমধ্যে সোক্রেটীস আমাকে নয় বৎসর কাল একাগ্রচিত্তে উহারই মননে ও লিখনে নিযুক্ত রাখিল। ১৯৩৪ সনে ইলিয়াড পুনরায় পাঠ করিলাম; ১৯৩৪ সন পর্য্যন্তও সংকল্পটী অন্তরে জাগরূক ছিল। কিন্তু

ষড় দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধঃ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

দীর্ঘসূত্রতারূপ জন্মগত ব্যাধিই আমার শুভ ও অভিনব সংকল্পটীকে রাবণের স্বর্গে যাইবার সিঁড়ি নির্ম্মাণের সংকল্পের ন্যায় ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমার বয়স পঁচাত্তর, দেহ জরাজীর্ণ, দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ—ভাবিয়াছিলাম, যাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই, তাহা আমি করিব—

মনে রয়ে গেল মনের কথা
শুধু চোখের জল আর প্রাণের ব্যথা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমার কয়েকটী বক্তৃতা ও ইংরেজী উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন—এগুলি সাহিত্যচর্চ্চার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য নয়।

বক্তৃতা—(১) সত্য ও সংস্কার (২) সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম (৩) জ্ঞানম্ সর্ব্বতো মার্গিতব্যম্ (৪) নবযুগের নীতি ও ধর্ম্ম (৫) যে যথা মাং

প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (৬) সভ্যতার পরশপাথর। (৭) স্বাধীনতা—অন্তরে ও বাহিরে (এখনও তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত আছে)। উপদেশ—(1) Whom the self chooses (2) From untruth Lead us unto Truth.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেশভ্রমণ ও বায়ুপরিবর্ত্তন

সেই যে ১৮৮৮ সনে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার পরে শুধু নানা স্থান দেখিবার উদ্দেশ্যে পর্য্যটন করা আমার অতি অল্পই হইয়াছে। এমন কি আমাকে এই লজ্জা লইয়া পরলোকে যাইতে হইবে যে, আমি তাজমহল দেখি নাই। বিহারে পাটনা, গয়া, আরা, ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে দুইবার কাশী ও একবার এলাহাবাদ গমনের প্রসঙ্গও যথাস্থানে বলিয়াছি। এইবার ১৯১৩ হইতে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত যে যে স্থানে গমন করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

১৯১৩ সনে গ্রীষ্মের ছুটীতে আমি গিরিডি গমন করি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই আমার প্রথম গিরিডি দর্শন। এ কথাও বলিয়া রাখি যে, কলিকাতার পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে আমি বরাবর গ্রীষ্মের ছুটীতেই গিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্বাপর প্রচণ্ড উত্তাপ ও আনুষঙ্গিক অস্বস্তিও ভোগ করিয়াছি। কিন্তু স্বাস্থ্য মোটের উপর ভালই থাকিত।

গিরিডি হইতে ফিরিবার পথে গাড়ীতে একটা বড়ই অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমাকে নিজেদের ও গুরুদাস বাবুর স্ত্রী পুত্র-কন্যার পাথেয়-ব্যয় বহন করিতে হইয়াছিল। এজন্য যথেষ্ট অর্থের অভাবে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট করিয়াছিলাম। আমাদের কামরায়

অত্যধিক ভিড় ছিল। মধুপুরে ট্রেন থামিলে আমি পাশের কামরায় যাইয়া দেখিলাম একটা বেঞ্চে চাদর পাতা আছে, কিন্তু যাত্রী উপস্থিত নাই। আমি চাদরটা একটু গুটাইয়া এক পাশে বসিলাম। অল্পকাল পরেই যাত্রী আসিল এবং আমাকে অভদ্রভাবে উঠিয়া যাইতে বলিল, লোকটী পশ্চিম দেশের এক মুসলমান। আমি উঠিব না, সেও ছাড়িবে না। ক্রমশঃ ঝগড়া বাধিয়া গেল, এবং দুই জনেই পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমার স্থির ছিল, আগে আঘাত না করিলে আমি আঘাত করিব না। চীৎকার শুনিয়া সুকুমার ও মান্তু ছুটিয়া আসিল; সংবাদ পাইয়া ষ্টেসন মাষ্টার আসিলেন, তিনি বলিলেন, অভিযোগ করিলে দুই জনকেই গাড়ী হইতে নামিতে ও মধুপুরে থাকিতে হইবে। অগত্যা আমি নিরস্ত হইলাম। সম্মুখের বেঞ্চের এক হিন্দুস্থানী আমাকে বসিবার স্থান দিল।

সেই দিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম তৃতীয় শ্রেণীতে আর যাতায়াত করিব না।

১৯১৪ সনে গ্রীষ্মের ছুটীতে আমরা দেড় মাসকাল বৈদ্যনাথে মোহিনী নিবাসে বাস করিয়াছিলাম। গুরুদাসবাবু সপরিবারে পূর্ব্বেই তথায় গমন করিয়াছিলেন, এবং বাড়ীটী তিনিই ভাড়া করিয়া দিয়াছিলেন।

স্থানটী মনোহর; অন্যান্য বাটীর ন্যায় আমাদের বাড়ীতেও সুগন্ধি ফুলের বাগান ছিল। প্রাতঃকালে রৌদ্রের জন্য অধিক দূর বেড়াইতে পারিতাম না, সায়াহ্নে বহু দূর ভ্রমণ করিতাম। পাঠ, ভ্রমণ, আহার ও নিদ্রা ইহাই ছিল নিত্যকর্ম্ম।

১৯১৪ সনে সম্বৎসর ধরিয়া আমার শরীর কোন না কোন রোগে

ক্লেশ ভোগ করিল। উৎকট শিরঃপীড়া, কর্ণমূলের অভিনব ব্যাধি, জ্বর, একটা না একটা লাগিয়াই থাকিত। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের ব্যবস্থা মত রেচক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে লাগিলাম। একদিন পূজনীয় হেরম্ববাবু বলিলেন, "কি তুমি মিছামিছি কতকগুলি ঔষধ খাইতেছ; প্রাতঃকালে বেড়াইতে আরম্ভ কর।" আমি প্রাতঃকালে পড়াশুনার ওজর করিলাম তিনি বলিলেন, তাহাতে পড়াশুনা আরও ভাল হইবে। পূজার ছুটী হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইডেন গার্ডেনে ও গড়ের মাঠে বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। গন্তব্য স্থানে ট্রামে যাইতাম, এবং ট্রামে বই পড়িতাম। কুড়ি বৎসর ময়দানে প্রাতর্ভ্রমণ অবিচ্ছেদে চলিয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশে ডাক্তার আচার্য্য দার্জিলিং যাইবার পরামর্শ দিলেন। আমার সহাধ্যায়ী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কালীমোহন সেন তখন সেখানে ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে ১৫নং Philosopher's cottage ভাড়া করা হইল। আমি পুত্রকন্যা-সহ এপ্রিল মাসে তথায় উপস্থিত হইলাম।

এবার দার্জিলিঙ্গে প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিলেন ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি আট রবিবার প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা করিলেন। উদ্বোধন আরাধনা, দেশ প্রার্থনা এবং চারিটী সঙ্গীত—সবশুদ্ধ পঞ্চাশ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা। আগাগোড়া চমৎকার। ছোট মন্দির—অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এক শনিবার শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন, "বৃহস্পতিবার আমার ২৯ বার দাস্ত হইয়াছে; গতকল্য ১৩ বার, আজ মোটেই হয় নাই। ইহাতে মনে হইতেছে, কাল আবার দাস্ত হইবে। কাল রবিবার মন্দিরে তুমি উপাসনা কর। আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। দুর্ভাবনায় রাত্রিতে ঘুম

ভাল হইল না। মাথা ধরিয়া গেল। বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "ভগবান, শাস্ত্রীমহাশয়কে সুস্থ কর।" ভোরে মান্তুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলাম, "আমি উপাসনা করিতে পারিব না।" সে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া দেখে শাস্ত্রী মহাশয়ের ছোট নাতি বিনয় বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিল। মান্তুকে দেখিয়াই সে বলিল, "আমি তোমাদের বাড়ী যাইতেছি। দাদা মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার শরীর ভাল আছে, উপাসনা তিনিই করিবেন।" আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এক দিন শাস্ত্রীমহাশয় স্যানিটেরিয়ামে বক্তৃতা করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কয়েক দিনের জন্য দার্জিলিং আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ১৯১৩ সনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসবে প্রদত্ত 'সত্য ও সংস্কার' শীর্ষক বক্তৃতাটি ঐ স্থানে দিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতার চুম্বক সঙ্গে ছিল না। স্মরণ শক্তির সাহায্যে বক্তৃতা করিলাম শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। উপস্থিতের সংখ্যা মন্দ ছিল না, এবং প্রশংসাও শুনা গিয়াছিল।

নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল, বি. এ. পরীক্ষার কাগজ দেখা, পাঠ, ভ্রমণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ। একটী ভাল নেপালী পাচক পাওয়া গিয়াছিল; সুতরাং আহার উত্তম হইত। নিদ্রাও ভাল হইত। কিন্তু আমি প্রায়শঃই মাথা ধরায় কষ্ট পাইতাম। দার্জিলিঙ্গে প্রতিবারই ঐরূপ কষ্ট পাইয়াছি—স্বাস্থ্য অন্যথা ভালই থাকিত।

আমরা একদিন মধ্যাহ্নাহারের পরে সিঞ্চল যাত্রা করিলাম। দলে ষোলটী পুরুষ ও নারী, ছাতা মোট আটটী, যুবকেরা জলবৃষ্টি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু ঘুম ষ্টেসনে পঁহুছিতেই যখন অবিরল বৃষ্টি আরম্ভ

হইল, তখন বীরেরা ছত্রবান সঙ্গীদিগের পার্শ্বে আশ্রয় লইলেন। ফলে সকলকেই ভিজিতে হইল। উপর দিকে উঠিতে উঠিতে আমার ভিতরের জামা ঘামে ভিজিল, উপরের কোট বৃষ্টিধারায় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইল। অধিকন্তু অনুভব করিলাম সতের বৎসরে দেহের শক্তিও কমিয়াছে। আমি ক্লান্ত হইয়া অর্দ্ধপথে এক ডাকবাঙ্গলায় বিশ্রামার্থ রহিয়া গেলাম, এবং অধিকাংশ যাত্রীও তাহাই করিলেন। তিন চারিটী যুবক সিঞ্চল দেখিয়া আসিলেন। চা পান করিয়া সকলে স্বধামে ফিরিয়া আসিলাম।

এবার এবং ইহার পরের বার দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে আমরা ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী হেমলতা সরকারের নিকট আন্তরিক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছিলাম।

সুকুমার আমাদের সঙ্গে সপ্তাহ দুই থাকিয়া গেল।

১৯১৬ সনে আমরা ভুবনেশ্বরে গেলাম। বীণার সঙ্গিনীরূপে সুধা আমাদের সঙ্গে গেল। আমরা ৺ মধুসূদন রাও মহাশয়ের বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম। বাড়ীটী এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনের ধারে অবস্থিত ও রেল ষ্টেসন হইতে চারি মাইল ও ভুবনেশ্বর তীর্থ হইতে দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উহার সংলগ্ন বাড়ীতে রক্ষক পুত্রকন্যাদি সহ বাস করে। নিকটে অন্য লোকালয় নাই—অর্দ্ধ মাইল দূরে জাগমারা গ্রাম, দুই তিন মাইল দূরে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। বাড়ীতে চারি পাঁচখানা খড়ের ঘর—একখানা মালিদের গোহাল। আমরা দক্ষিণদ্বারী বারাণ্ডাযুক্ত চৌচালায় বাস করিতাম। উহাতে যে শীতল বায়ু সেবন করিতাম মনে হইত তাহা বঙ্গোপসাগর হইতে আসিতেছে। বনের মধ্যে দুই এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত, কিন্তু আমরা কাহারও দর্শন পাই নাই।

স্থানটী যেমন নির্জ্জন তেমনই মনোহর। কূপের জল এমন হজমী শক্তির আধার ছিল যে অপর কোথায় এত প্রবল ক্ষুধা বোধ করি নাই। আহার্য্য সামগ্রী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য—হাট-বাজারের সন্ধান আমরা পাই নাই। লাল চাউল, মিষ্ট কুমড়া, কচু এবং এই প্রকার অন্য উপেক্ষিত তরকারী আমাদের প্রধান সম্বল ছিল। ঊনচল্লিশ দিনে ছেলেমেয়েরা মাছ বোধ হয় ছয় সাত বার পাইয়াছিল। দুই তিন সপ্তাহ বাসের পরে আলুর আমদানী বন্ধ হইল। পূর্ব্বোক্ত গ্রামের জমিদার আমাকে বলিলেন, "আমরা আগামী শীত কাল পর্য্যন্ত আর আলু খাইব না।" আমার চাকর পাঠাইয়া কটক হইতে কয়েক সের আলু আনাইলাম। সে দুই স্থানে ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে হাঁটিল ষোল মাইল এবং রেল ভাড়া লাগিল প্রায় আট আনা। কিন্তু জলের গুণে সামান্য খাদ্যও আমরা তৃপ্তির সহিত খাইতাম। আমরা সঙ্গে একটী নব নিযুক্ত রাঁধুনী আনিয়াছিলাম, সে পরিপাটী রন্ধন করিত।

মাঝে বীণা ও সুধা দুইজনেরই সামান্য জ্বর হইয়াছিল। যাতায়াতে চারি মাইল হাঁটিয়া ভুবনেশ্বর হইতে কৃশকায় ডাক্তার ডাকিতে প্রবৃত্তি হইল না, কাজেই তাহারা বিনা চিকিৎসায়ই আরোগ্য লাভ করিল, ব্যয়ও বাঁচিয়া গেল।

এখানে সাপের ভয় আছে, বাঘের ভয়ও আছে। আমরা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া জানালা খুলিতেই সেখানে বিষাক্ত সাপের একটা বাচ্চা দেখা গেল। সেটাকে মারিয়া পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল। বড় সাপও দেখা গিয়াছে। খণ্ডগিরির পথে গাছে গাছে বহু বানর দেখা যায়।

বনপ্রান্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে অতিথি সমাগমে আমাদের নির্জনতার অস্বস্তি লঘু হইত। মধু বাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুকান্ত, পরবর্ত্তী কালে গুরুদাসবাবুর বড় জামাতা শ্রীমান্

প্রফুল্লকুমার রায়, অধুনা সুপরিচিত চিকিৎসক শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ রায়, কেহ এক দিন কেহ দুই তিন দিন থাকিয়া গেলেন। প্রফুল্ল বড় গাছের ডালে একটা দোলনা খাটাইয়া দিয়াছিলেন, বালক বালিকাদের মত আমিও তাহাতে দুলিতাম। মধু বাবুর তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বসু সস্ত্রীক সাংসারিক কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ আমাদের সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবার রূপে বাস করিয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া আমরা বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় তখন পুরীতে ছিলেন। তিনি লিখিলেন ফিরিবার পথে আমাদিগের সহিত দুই এক দিন অবস্থান করিবেন। হঠাৎ পীড়িত হওয়াতে তিনি সোজা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অল্প কালের জন্য পাইয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

ভুবনেশ্বরের প্রধান আকর্ষণ, ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অনুপম নিদর্শন মন্দিরসমূহ এবং নিকটবর্ত্তী খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। খণ্ড-গিরিতে পাষাণের ছাদে অশোকের একটী শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। বৌদ্ধযুগে উৎকীর্ণ মানুষের মূর্ত্তিগুলিও বিস্ময়কর। আমরা মন্দির ও গিরি একাধিকবার দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। খণ্ডগিরিতে চৌকীদারের অনুরোধে আমাকে পরিদর্শন পুস্তকে স্বীয় মন্তব্য লিখিতে হইয়াছিল। উহার রক্ষক একজন হিন্দু পূজারী।

অগ্নিমান্দ্যের পক্ষে ভুবনেশ্বরের জল মহৌষধি।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে আমাকে বি. এ. শ্রেণীতে বায়রণের Childe Harold পড়াইতে হইবে। উহার অন্তর্ভূক্ত "মহাসাগরের প্রতি অভিভাষণ" নামক কবিতা বিশ্ববিখ্যাত। এজন্য অভিলাষ ছিল সাগর দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। ভুবনেশ্বরে উনচল্লিশ দিন

অবস্থানের পরে নিশাশেষে চন্দ্রালোকে আমরা পুরী যাত্রা করিলাম। আমরা পদব্রজে পূর্ব্বমুখে চারি মাইল অতিক্রম করিয়া ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পুরীর গাড়ী ধরিলাম, মালপত্র গরুর গাড়ীতে আসিল। দশটার সময় পুরী ষ্টেশনে পঁহুছিয়া এক পাণ্ডাকে সহায় করিয়া একটু খুঁজিয়া একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিলাম। এটী রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের বৃহৎ বাটীর হাতায় অবস্থিত। দুটী খোলামেলা ঘর, একটী আমাদের বাসকক্ষ এবং একটী পাকশালা ও পাচিকার শয়নঘর হইল। তিনখানা তক্তপোষ জুটিল, সুতরাং সকল দিকে সপ্তাহকাল বাসের সুব্যবস্থাই হইল। সে দিন মধ্যাহ্নে জগন্নাথের প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল, বড় পাণ্ডা পূর্ব্বেই আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদিগের ভুক্তাবশেষ দুই বালক বাহক ভোজন করিত—এই পুণ্যক্ষেত্রে জাতি বিচার নাই। আমরা স্বর্গদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। স্বর্গের দ্বাররূপ শ্মশানঘাট অদূরে অবস্থিত ছিল।

সমুদ্রস্নান এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উহাতে যুগপৎ বল এবং বুদ্ধি, সাহস ও কৌশল আবশ্যক। প্রথম দিন বলিতে গেলে ডাঙ্গায় বসিয়া ঢেউএর জলে স্নান করিলাম। ক্রমশঃ জলে নামিয়া ডুব দিতে শিখিলাম। সায়ংকালে উপকূলে বসিয়া উর্ম্মিরাশির উন্মত্ত নৃত্য দেখিয়া দেখিয়া মন এক রকম উদাস ভাবে পূর্ণ হইত। 'প্রাতঃসন্ধ্যা সমুদ্রতীরে ভ্রমণ, দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন, সাগরে স্নান, এবং কদাচিৎ বন্ধুজনের' সঙ্গলাভ—সপ্তাহকাল এইরূপে কোথা দিয়া চলিয়া গেল। জগন্নাথের মন্দির ও বিগ্রহ, গুণ্ডিচা, নরেন্দ্র সরোবর তীরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম, শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম—প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য সমস্তই দেখিলাম। পাণ্ডাদের অনুরোধ সত্ত্বেও কোনও মূর্ত্তির নিকটে

মাথা নত করি নাই। পুরীর পথে বহুদূর হইতে মন্দির দৃষ্ট হয়। উহার ভোগের প্রতিষ্ঠানটী আয়তন ও ব্যবস্থা-নৈপুণ্যে বিস্ময়কর। বাল্যকালে "জগন্নাথমাহাত্ম্য" পুঁথি পড়িয়াছিলাম, পরিণত বয়সে মন্দির ও মূর্ত্তি স্বচক্ষুতে দেখিলাম।

আমরা স্থির করিলাম, ফিরিয়া যাইবার কালে কটকে দুই তিন দিন থাকিয়া যাই। বন্ধু লালমোহন চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া তাঁহার গৃহে থাকিবার সাদর নিমন্ত্রণ পাইলাম। যাত্রার পূর্ব্বরাত্রিতে এক বিপদ উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রিতে বীণা আমাকে জাগাইয়া বলিল, সুধার দাস্ত হইতেছে, সে ভয়ে কাঁদিতেছে। আমি শুনিয়া একেবারে দিশাহারা হইলাম। অন্ধকার রাত্রি, টপটপ বৃষ্টি পড়িতেছে, যে দুই একটী পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারা কোথায় কতদূরে থাকে জানি না। উদ্বেগে আমার অবশিষ্ট রাত্রি ঘুম হইল না, নিজেও উদরে উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলাম। অশরণের শরণ দয়াল দীনবন্ধুর নাম করিতে করিতে প্রত্যূষের প্রতীক্ষায় রহিলাম। এক একবার মনে হইল, যদি কন্যাটী এখানেই থাকিয়া যায়, তবে আমি তাহার পিতামাতাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইব? প্রভাত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা হইতে এক বৃদ্ধ যাত্রী আসিলেন। তখন রথযাত্রা আসন্ন—সে সময়ে পুরীতে ওলাউঠা ব্যাপকরূপে আরম্ভ হয়। তিনি ভরসা দিয়া বলিলেন, এখনও ওলাউঠার কথা শুনা যায় নাই—বোধ হয় এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধও দিয়াছিলেন। আমি সুধাকে কিছুই খাইতে দিলাম না, নিজেও সমুদ্রে স্নানের লোভ সংবরণ করিলাম, কিছু আহার করিলাম কিনা মনে নাই। আমরা মধ্যাহ্নে পুরী ছাড়িয়া অপরাহ্লে কটকে উপনীত হইলাম। লাল-মোহনবাবুর এক ভৃত্য আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া

গেল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পত্নী প্রমীলা পত্র লিখিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ব্রাহ্ম বন্ধু কুঞ্জবিহারী গুহকে আনাইলেন। তাঁহার সফল চিকিৎসায় সুধা পরদিন অন্নপথ্য পাইল।

লালমোহনবাবু তখন কর্ম্মোপলক্ষে অন্যত্র অবস্থান করিতে-ছিলেন; কিন্তু অতিথিসৎকার বিষয়ে পত্নীকে যথোচিত নির্দ্দেশ পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রমীলা আমাকে মেশোমহাশয় বলিয়া ডাকিতেন, আমি যাইতেই তাঁহার পুত্রকন্যারা আমাকে 'দাদামহাশয়' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। আমরা পরম আরামে দুই তিন দিন এই গৃহে যাপন করিলাম।

মান্তু বিশেষ কারণে প্রথম রাত্রিতেই রাঁধুনীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। আমরা পরদিন ডাক্তার জয়ন্ত রাওএর গাড়ীতে কটক সহরটী পরিদর্শন করিলাম এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীকে দেখিতে গেলাম। তিনি তখন সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন। কলিকাতায় তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম।

১৯১৭ সনের গ্রীষ্মের ছুটীতে আমরা পুনশ্চ দার্জিলিং গমন করিলাম। এ যাত্রায় দাদা শ্রীযুক্ত গোবিন্দনাথ গুহ আমাদের জন্য Abi Holm নামক বাটী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার বাটীতে আহার করিয়া বাসাবাটীতে যাইয়া গুছাইয়া বসিলাম। বেশ বড় বাড়ী, আমাদের পক্ষে যথেষ্ট স্থান; উহাতে একটা বড় পিয়ানো ছিল। বাড়ীটা একটু জীর্ণ হইলেও আমরা বেশ আরামেই ছিলাম। 'এবারও ভাল নেপালী পাচক পাইয়াছিলাম। আমার সঙ্গে প্রায় নয় শত বি. এ. পরীক্ষার কাগজ গিয়াছিল—পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত অর্দ্ধাংশ (Half-Paper) সেগুলি দেখিয়া নিয়মিত ভ্রমণ, অধ্যয়ন প্রভৃতি ছাড়া সত্য ও সংস্কার বক্তৃতাটা লিখিয়া

ফেলিয়াছিলাম—এক ঘণ্টার বক্তৃতা লিখিতে ছত্রিশ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

এবারের একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ক্রমনিম্নভূমিতে তিনটী বাটি অবস্থিত ছিল। সর্ব্বোচ্চটীতে আমরা থাকিতাম। মধ্যেরটীতে এক খৃষ্টীয় পরিবার এবং সর্ব্বনিম্নটীতে পূর্ব্ববাঙ্গলার এক জমিদার সস্ত্রীক বাস করিতেন। আমাদের মাথার উপরে বঙ্গদেশের এক রাজার বৃহৎ প্রাসাদ। প্রতিবেশী পরিবার দুইটীর সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। খৃষ্টীয় ভদ্রলোকটীর শালী ঐ রাজার পরিবারে একদা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, এজন্য রাজবাড়ীতে তাঁহারা যাতায়াত করিতেন। একদিন পথে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। তিনি করমর্দ্দন করিয়া মধুর বচনে সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। ক্রমশঃ একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহার প্রাসাদে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে খৃষ্টীয় ভদ্রলোকটী আমাকে জানাইলেন, রাজাবাহাদুরের বিশেষ অনুরোধ, আমি কন্যাকে লইয়া রাজপুরী দেখিতে যাই। আমি জানিতাম, রাণী তখন দার্জিলিঙ্গে ছিলেন না—অনুরোধটা আমার ভাল লাগিল না। ভদ্রলোকটীও ছাড়েন না—তিনি একজন হেড মাষ্টার। আমি শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকারের মত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও অমত প্রকাশ করিলেন। তারপর একদিন হেডমাষ্টার মহাশয় ধরিয়া বসিলেন, আজ যাইতেই হইবে। তখন অপরাহ্ণ। আমি অগত্যা একাকী তাঁহার অনুগামী হইলাম। রাজসকাশে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তিনি বৈকালিক ভোজনের আয়োজন করিতেছেন। আমাকে একাকী দেখিয়া হাড়েহাড়ে চটিয়া গেলেন। দুই একটি শুষ্ক কথা বলিলেন। তাঁহার বৈবাহিক স্বনামধন্য জমিদার আশী প্রকারের আম পাঠাইয়াছেন,

তাহার টাইপ করা তালিকা দেখাইলেন, কিন্তু জলযোগে আহ্বান করিলেন না। আমি নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম। এই রাজাকে জীবনে আর দেখি নাই।

আর একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার উল্লেখ করিতেছি। এক ফিরিঙ্গী মাস্তকে দেখিলেই তাহার পথ রোধ করিত বা অন্যপ্রকারে ভয় দেখাইত। আমি এক শেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ লোকটীর আপত্তিকর ব্যবহারের কথা বলি। তিনি বলিলেন, ঐ লোকটীর উপর আমার নজর আছে। এক দিন আমার অনুপস্থিতকালে সে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া কি একটা গোলমালে তাহার লাঠি ফেলিয়া গিয়াছিল। পরে ঠাণ্ডা মেজাজে আসিয়া তাহা লইয়া যায়। তারপর সে কোনও উপদ্রব করে নাই।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া উডল্যাণ্ড হোটেলে কিছুকাল বাস করেন। এক দিন স্যার নীলরতন সরকারের বাড়ীতে এক বৈকালিক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন "আমি মার্কাস অরেলিয়াসকে কি একটা দর্শনের সহিত তুলনা করিব ভাবিয়াছিলাম"—কিন্তু নামটা কিছুতেই স্মরণ হইল না। এ বিষয়ে একটা ইতিহাস আছে। আমি ১৯১৩ সনে তাঁহার নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পরে একখণ্ড মার্কাস অরেলিয়াস উপহার দিয়া তাঁহার অভিমত প্রার্থনা করিয়াছিলাম পত্রযোগে নয়, তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাটিতে সাক্ষাৎ করিয়া। অভিমত পাই নাই—কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাকে দেখিলেই তিনি কথাটা উত্থাপন করিতেন—পনর কুড়ি বৎসর পরে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক দিন পূর্ব্বাহ্নে এক হোটেলে ভারতে বৃটিশ শাসন-সম্বন্ধে এক বক্তৃতা পাঠ করেন, বঙ্গের লাট লর্ড রোনাল্ডশে সভাপতি ছিলেন। বক্তার

নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া বিস্ময়-পুলকে পূর্ণ হইয়াছিলাম। আর এক দিন ঐ স্থানে ঐ সময়ে অধ্যাপক যতুনাথ সরকার এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

এবারও আমার শরীর মোটের উপর ভাল থাকিলেও শিরঃপীড়া কলিকাতাতেও আমার অনুসরণ করিয়াছিল।

পর বৎসর ১৯১৮ সনে আমাদের গন্তব্য স্থান হইল হাজারিবাগ। শুনিয়াছিলাম স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ হাসপাতালের সন্নিকটে একটী দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়া দিলেন। আমি পুত্রকন্যা এবং রাঁধুনী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে রজনী নামক এক লোকের হোটেলে শীতল জলে স্নান ও পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া মটর বাসে সায়ংকালে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলাম। দোতলাটীর একটা বড় ঘরে আমি ও বীণা থাকিতাম, অপর কক্ষে পুত্রদ্বয় থাকিত। নীচে বৈঠকখানারূপে একটী ঘর থাকিল। এবার এখানে পরিচিত ব্রাহ্মবন্ধু অধ্যাপক আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিবারণ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ললিত। এবং তাহাছাড়া হাজারিবাগে তিনটী প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিলেন —শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, অধ্যাপক খড়গসিংহ ঘোষ এবং মহেশ বাবু। তখনই তাঁহার গৃহের গ্রন্থালয় একটা দেখিবার বস্তু ছিল। অধিকন্তু আমার ভূতপূর্ব্ব সহবাসী ও সহযোগী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সপরিবারে তাঁহার মামাশ্বশুর মহেশবাবুর বাটীতে বাস করিতেছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী অদূরে বাস করিতেন। এই পরিবারের সহিত আমাদের আত্মীয়তা ছিল। খড়গসিংহের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ এই সময়ে তাহার বাড়ীতে কিছুকাল যাবৎ বাস

করিতেছিলেন। তিনি দূরসম্পর্কে আমার ভাগিনেয়ী। তাঁহার মধুর চরিত্র আমাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি দেবরদিগের সহিত বীণার জন্মদিনে আমাদের গৃহে আসিয়া জলযোগের ব্যবস্থার কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে খড়্গসিংহ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া কয়েক দিন আমাদের সহিত যাপন করেন।

শ্রীযুক্তা রায় মাঝে মাঝে আমাদিগকে সদালাপ ও আলোচনার জন্য আহ্বান করিতেন। এক দিন ধীরেন্দ্রবাবু ও এক দিন আমি কিছু বলিয়াছিলাম, এইটুকু মনে আছে।

স্থানীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে—উহা আমাদের বাটীর সন্নিকটে ছিল—এক রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীমতী রায় উপাসনা করিয়াছিলেন; আমিও এক দিন বেদি গ্রহণ করিয়াছিলাম। অবশিষ্ট কয়েক দিন মহেশবাবু ও ধীরেন্দ্রবাবু কার্য্য সম্পাদন করেন।

এক দিন আমরা শ্রীমতী রায় ও তাঁহার পুত্রকন্যার সহিত ক্যানারী পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম।

হাজারিবাগের জলবায়ুর আকর্ষণে এখানে আমার বাড়ী করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। একখণ্ড ভূমি নির্ব্বাচনও করিয়াছিলাম; কিন্তু মালিক তখন দূরস্থানে ছিলেন এজন্য দরদস্তুর করিবার সুবিধা হয় নাই। সংবৎসর পরে মহেশবাবু যখন মালিকের মতানুযায়ী মূল্য জানাইলেন, তখন আমার কামনা বিলুপ্ত হইয়াছে।

হাজারিবাগে দুই একবার শরীর অসুস্থ বোধ হইয়াছে। এটা নূতন সুরু হইল।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের দিন পূর্ব্বাহ্ণে আমরা ব্রজকুমারবাবুর বাড়ী আহার করিয়া মোটর গাড়ীতে হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে

গেলাম। মালপত্র পূর্ব্বেই বাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। চল্লিশ মিনিট লাগিয়াছিল।

আমরা এক দিন হাজারিবাগ জেলে যাইয়া অল্পবয়স্ক কয়েদীদের ব্যায়ামাদি দেখিয়াছিলাম। এই জেলটী খুব বড়।

১৯১৯ সনে দ্বিতীয় বার গিরিডি যাওয়া হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া আমরা শ্রীমান কালীমোহন ঘোষালের আতিথ্য লাভ করিলাম, যদিচ তিনি আমাদিগের টেলিগ্রাম পান নাই। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেন আমাদিগের জন্য বাবু ষষ্ঠীদাস মল্লিকের বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। এই পল্লীতে হেরম্ববাবু, কুঞ্জবাবু, পার্ব্বতীবাবু, দেবেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মের বাড়ী। এ যাত্রায় দাদা আমাদিগের সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

এবারকার ছুটী বিশেষ অভিজ্ঞতা উশ্রীর জলপ্রপাত ও কয়লার খনি দর্শন।

একদিন মধ্যাহ্নের আহার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া আমরা একদল ঘোড়ার গাড়ীতে উশ্রী প্রপাত দেখিতে রওনা হইলাম, একখানিতে আমরা দুই ভাই এবং আমার পুত্রকন্যাগণ, আর একখানি শ্রীমতী শিশিরকুমারী দত্ত ও তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র। দ্রষ্টব্য স্থানটী গিরিডির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে প্রায় দশ মাইল দূরে। যাইবার সময় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে একটু কষ্ট বোধ হইল, কিন্তু পথ ভাল, দৃশ্যও মনোহর। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে তিন চারি ঘণ্টা লাগিল। অব্যবহিত পূর্ব্বে বারিপাত হয় নাই, এজন্য প্রপাতটি একটু শীর্ণকায়, তবু যাহা দেখিলাম খুব ভাল লাগিল। তাহার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যও চিত্তাকর্ষক। বৈকালে সেখানেই আমরা জলযোগ করিলাম, এবং রবিকিরণ একটু মৃদু হইলে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলাম। এবার আমি গাড়ীর ছাদে

যাইয়া বসিলাম, এবং সমস্ত পথ শীতল বায়ু ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিলাম।

তারপর একদিন প্রাতঃকালে আমরা পাঁচজন দক্ষিণে অদূরবর্ত্তী এক কয়লার খনি দেখিতে গেলাম। কর্ম্মাধ্যক্ষের সৌজন্যে আমরা কলের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ খনিতে অবতরণ করিলাম, এবং ইতস্ততঃ বেড়াইয়া দ্রষ্টব্য সমস্তই দেখিলাম। আমরা কয় হাজার ফুট নীচে গিয়াছিলাম তাহা এখন মনে নাই। খনির কিয়দংশ কয়লা বহনের জন্য রেল গাড়ীর ব্যবস্থা আছে। যাহা দেখিলাম সমস্তই আমাদের পক্ষে নূতন।

এইবার দত্তপরিবারের কথা বলিব। শ্রীমতী শিশিরকুমারী দত্ত ও তাঁহার দিদি বিনয়কুমারী চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা চৌধুরী পাঠ্যাবস্থায় পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এই সূত্রে আমিও ইঁহাদের পরিচিত ছিলাম। তা' ছাড়া ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে শিশির আমার ছাত্রী ছিলেন। অধিকন্তু ১৯১৫ সনে তাঁহাদের ভ্রাতা শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র বাগচীর সহিত আমার কনিষ্ঠা শ্যালীর বিবাহ হয়; সুতরাং দত্তপরিবারের সহিত একটু সম্বন্ধও ছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। শিশিরের স্বামী বিলাতফেরত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্তের সহিত আমার সাধারণ আলাপ পরিচয় ছিল, কিন্তু পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এবারে গিরিডিতে দত্তমহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এবং দত্তজায়ার সহিত পুরাতন ঘনিষ্ঠতার পুনরুজ্জীবন হইল। আত্মীয়তার নৈকট্য প্রথম উপলব্ধি করিলাম বীণার জন্মদিনে। শিশির স্বয়ং নিজের হাতে জলযোগের সমস্ত আয়োজন সম্পাদন করিলেন—শুদ্ধ তাহাই নহে যখন যে পাত্রের প্রয়োজন—

এমন কি পিঁড়িখানি পর্য্যন্ত বাড়ী হইতে আনাইলেন। আমরা গিরিডি আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ৭এ কালু ঘোষের লেনে উঠিয়া আসিলাম। দত্তপরিবারের গড়পারের বাটী হইতে দূরত্ব অল্প, এজন্য কলিকাতায় পরস্পর দেখাসাক্ষাতেরও সুবিধা ছিল। এজন্য ক্রমশঃ তাঁহারা দুইজনই আমাকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। দত্তদম্পতী নিজ নিজ মনের কথা আমাকে অকপটে খুলিয়া বলিতেন—যাহা শুনিতাম আমার নিজের মনেই সংগুপ্ত থাকিত। ইঁহাদের পুত্রকন্যারাও আমাকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া মেশোমহাশয় বলিয়া ডাকিত। ইঁহাদের প্রথম ও মধ্যম কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকরণের অনুষ্ঠানে আমি আচার্য্যের কার্য্য এবং কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলাম।

পর বৎসর ১৯২০ সনে গ্রীষ্মাবকাশ কার্সিয়াঙ্গে কাটিল। শ্রীমান্ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য আমাদের জন্য পাঠায়াবাড়ী রোডে গঙ্গারাম কটেজের অর্দ্ধাংশ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা—এবার দাদা সহযাত্রী ছিলেন—কার্সিয়াঙ্গে উপনীত হইয়া মধ্যাহ্নে ভ্রাতা হেমচন্দ্র সরকারের গৃহে আহার করিয়া অপরাহ্নে পূর্ব্বোক্ত গৃহে গমন করিলাম। ঘরগুলি দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল। চারিটী ঘর—প্রবেশপথে বারাণ্ডা—সেটী আমার পাঠাগার করিলাম। তারপর একটী শয়নঘর—দাদা ও দুই পুত্রের অধিকারে রহিল। তারপরে দ্বিতীয় শয়নঘর আমার ও বীণার। তৎপরে দ্বিতীয় বারাণ্ডা—সেটী হইল খাবার স্থান। তাহার পার্শ্বে নীচে যাইবার কাঠের সিঁড়ি। নীচে পূর্ব্বদিকে রান্নাঘর ইত্যাদি। বাড়ীটী রাস্তার দিকে এক তলা, ভিতর দিকে দোতলা। খাটগুলিতে গদি নাই—মালিকের লোক বলিল, ভাড়াটিয়ারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। অপূর্ব্ব যুক্তি।

আমি তোষকের নীচে অয়েল ক্লথ ইত্যাদি পাতিয়া গায়ের বেদনা নিবারণের উপায় করিলাম।

দুই এক দিন পরে ঐ লোকটীই অগ্রিম ভাড়া লইতে আসিল। আমি রসিদ দেখিতে চাহিলে হাতে একখানা কায়েতী অক্ষরে লেখা কাগজ দিল। আমি উহা পড়িতে পারি না। আমি বলিলাম, রসিদ ইংরেজীতে লিখাইয়া লইয়া আইস। কিছুকাল পরে সে একখানি ইংরেজী রসিদ আমার হাতে দিল। আমি পড়িয়া দেখিলাম ঠিক আছে; তখন আমি রসিদখানা হাতে লইয়া যেই ভিতরে টাকা আনিতে যাইব, অমনি সে রসিদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। আমার ভয়ানক রাগ হইল—খুব বকাবকি করিতে লাগিলাম। দুই একটা কটূক্তিও বাদ গেল না।

এবার আমার প্রধান কাজ ছিল গ্রীকধর্ম্মের বিবরণ লেখা। ইহার সংস্রবে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের অনুরোধে Bloomfield Hall এ প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করি। আমরা সকলে একদিন পূর্ব্বাহ্নে সেন্ট মেরী নামক বৃহৎ আশ্রম দেখিতে যাই। ইহার বৃহৎ পুস্তকালয় একটা দেখিবার জিনিস। বীণার জল পিপাসা পাইয়াছিল। আমি জল চাহিতেই এক শ্বেতাঙ্গ এক গেলাস জল আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "Shall I bring a glass of wine?"

আমরা যাইবার সময় দীর্ঘ ও সমুচ্চ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় প্রশস্ত পথ দিয়া অবতরণ করিলাম। বৈকালে আমার উৎকট মাথা ধরিয়াছিল।

নীচের দিকে আমরা বাবু মতিলাল হালদারের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। তাঁহার পুত্র মনোরঞ্জনবাবুর বৌভাতে উপস্থিত ছিলাম, নিরপেক্ষ দর্শকরূপে।

একদিন পূর্ব্বাহ্নে বীণাকে লইয়া দার্জিলিং গেলাম। শ্রীযুক্তা শিশিরকুমারী দত্ত পুত্রকন্যাসহ ম্যাকিণ্টস রোডে এক বাড়ীতে শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা মজুমদারের সহিত বাস করিতেছিলেন, তাঁহারই অনুরোধে যাইয়া এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া আসিলাম এবং তাঁহাদিগকে আমাদিগের সহিত দুই এক দিন যাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। হঠাৎ সংবাদ পাইলাম, তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা পীড়িতা সাহায্যের জন্য লোক আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ মান্তুকে পাঠাইয়া দিলাম। কলিকাতায় ফিরিবার সময় আমরা এক সঙ্গেই গিয়াছিলাম।

কার্সিয়াঙ্গে সপ্তাহ দুই আমি কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগিয়াছিলাম।

১৯২১ সনে শীতের শেষ দিকে আমার এক মাসে তিন বার জ্বর হইল। গ্রীষ্মের ছুটীতে খোকা, বীণা ও রাঁধুনীর সহিত রাঁচি গেলাম। মান্তু ও তাহার স্ত্রী কলিকাতায় রহিল। আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু সতীশচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্তের বাঙ্গলা বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিলেন। আমরা রাঁচি পঁহুছিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; তাঁহার পত্নী সুমতিবালা আমার ছাত্রী—আমাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র পাত্রে দৈ পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। আমরা অপরাহ্নে জয়কালীবাবুর বাঙ্গলায় যাইয়া সংসার আরম্ভ করিলাম। উহা তাঁহার বাসবাটীর সংলগ্ন, চারিদিকে খোলা মেলা, আঙ্গিনায় বেল, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ; ঘর আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। দত্তমহাশয় অতি সজ্জন, সুপরিচিত ব্রাহ্ম। প্রয়োজনীয় আসবাব তিনিই জোগাইলেন।

আমরা একটী ভাল চাকর পাইলাম, রাঁধুনী তো ছিলই সুতরাং

আহারাদি বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম দুই এক সপ্তাহ বৃষ্টির অভাবে উৎকট গরমে কষ্ট হইতে লাগিল। অনেক বাড়ীর কুয়া শুকাইয়া গেল—পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক আমাদের কুয়া হইতে জল লইয়া যাইত—তাহাও শুষ্কপ্রায় হইল। সারারাত্রি বিছানা গরম থাকিত। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে দস্তুরমত ঠাণ্ডা পড়িল।

রাঁচি সহরটী বৃহৎ, পথগুলি—সমস্ত নয়—উচ্চাবচ। আমরা সার্কুলার রোডে ছিলাম। নিকটে রাজভৃত্য শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মিত্র বাস করিতেন, বহুকাল হইতে উহার সহিত পরিচয় ছিল, তাঁহার স্ত্রী আমাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্ম বাবু অধরচন্দ্র বসুর কন্যা। মিত্র পরিবারের সহিত আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। রায়পরিবারের আকর্ষণ তো ছিলই। নিকটেই শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কন্যার রেডিয়াম চিকিৎসার জন্য বাস করিতেছিলেন। রোগিণী ৺রামব্রহ্ম সান্যালের বিধবা পুত্রবধূ, হিরণ ও বীণার মাতা। প্রাচীনা মৈত্রজায়া আমার জন্য মাঝে মাঝে মুখরোচক খাদ্য রাঁধিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। আমি অনুনয় করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার কন্যা বীণা ও তাঁহার দৌহিত্রী বীণার মধ্যে বেশ ভাব হইল। আমরা একত্র বেড়াইতাম।

আমরা একদিন প্রাতঃকালে মোরাবাদী পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। উহাতে এক উচ্চ স্থানে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী ছোট মন্দির ও তাহার একটু নীচে তাঁহার বাসবাটী, পাহাড়ের পাদদেশে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী। মন্দিরের গাত্রে লিখিত আছে, এখানে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবে। আমি কিয়ৎকাল ব্রহ্মোপাসনা করিয়া দুই বীণাকে লইয়া জ্যোতিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি একটু পরেই

স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকটে আসিলেন। আমার নাম বলিতেই বলিলেন, "আপনি মার্কস অরেলিয়াস অনুবাদ করিয়াছেন? আপনি গ্রীক হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, আমি ইংরেজী হইতে করিয়াছি।" তার পরেই বলিলেন, "আমি আপনার ছবি আঁকিব।" বলিয়াই আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল পরেই রেখাচিত্রটী আমাকে দেখাইলেন, পরে বীণা সান্যালের চিত্র আঁকিলেন। তখন বেলা অধিক হইয়া গিয়াছে, আমাকে বলিলেন, কাল প্রাতঃকালে আপনার বাড়ী যাইয়া আপনার মেয়ের ছবি আঁকিব। যে কথা সেই কার্য্য। পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণ শেষ করিয়া দেখি তিনি আমার কন্যার চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। তিন খানি চিত্রই তিনি নিজে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার একখানা রিক্‌স ছিল, তাহাতে যাতায়াত করিতেন।

এক দিন অপরাহ্ণে আমরা গাড়ী করিয়া আট দশ মাইল দূরে কাঁকে বাতুলাশ্রম দেখিতে গেলাম। অমৃতবাবুর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে গেলেন। কাঁকের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্তাকর্ষক, এবং প্রতিষ্ঠানটী খুব বৃহদায়ত। ইহাতে ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয় দুই শ্রেণীর উন্মাদই স্থান পায়। আমরা আফিস ঘর হইতে কয়েকটী ভিতরের পাগল দেখিলাম; পথেও দুই একটী দেখিতে পাইলাম। যতদূর দেখিলাম, আশ্রমটি খুব প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আর একদিন আমরা বৈকালে ডোরাণ্ডা গেলাম। রাঁচি বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মনিবাস। ডোরাণ্ডা কেরাণীকুলের বাসস্থান। তখন বারিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে; মাঠ প্রান্তর গ্রীষ্মের অগ্নিদগ্ধ নগ্নরূপ পরিহার করিয়া শ্যামল শষ্প বসনে নয়নাভিরাম রূপ ধারণ করিয়াছে। কয়েকটী পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল।

রাঁচি ব্রাহ্মসমাজে রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা হইত। প্রায়শঃ জয়কালীবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। ছোট মন্দির, লোক বেশী হইত না।

রাঁচি হইতে তিনটী দীর্ঘ ও প্রশস্ত পথ তিন দিকে গিয়াছে—হাজারিবাগ, পুরুলিয়া এবং লোহারডাগা পথ নামে পরিচিত।

এ যাত্রায় প্রথমে জয়কালীবাবুর বাড়ী এক দিন বৈকালে জলযোগ করিয়া পরদিন বৈকালে উদরাময় হইল—মধ্যাহ্নে বোধহয় নূতন চাউলের ভাত খাইয়াছিলাম। শীঘ্রই সারিয়া উঠিলাম। কয়েক দিন পরে একাদশী তিথিতে শরীরে জ্বরভাব হইল। আমি তখন একাদশীতে লঘু পথ্য আহার করিতাম—জ্বরের উপদ্রব এক দিনেই দূর হইল। রাঁচি ছাড়িবার অল্প কাল পূর্ব্বে হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যার পরে খুব জ্বর হইল। সুস্থ হইয়া দুই এক দিন পরেই কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। বীণা সান্যাল আমাদের সঙ্গে গেল।

১৯২২ সনের গ্রীষ্মের ছুটি তৃতীয় বার গিরিডিতে পূর্ব্বে দেবেন্দ্র চৌধুরীর অধুনা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মহলানবীশের গৃহে যাপন করিলাম। সঙ্গে ছিল খোকা, বীণা, মান্তুর স্ত্রী ও শিশুপুত্র মুকুল। গালে একটী স্ফোটক লইয়া তথায় উপনীত হইলাম, পরে গায়ে ক্রমাগত ফোঁড়া বাহির হইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুর ঔষধ খাইয়া উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কিছুদিন পরে হঠাৎ জ্বর হইল। এবার অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন আমার প্রাচীন বন্ধু ও প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবস্থা মানিয়া আরোগ্যলাভ করিলাম।

এ যাত্রায় গিরিডিতে খুব আম খাইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে

রাঁধুনী লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে শুধু আমাদের জন্য রাঁধিত, নিজে খাইত না। সুতরাং রান্না তেমন ভাল হইত না। বাধ্য হইয়া সে নিজেও এখানে খাইত—দেখিলাম সে বেশ রাঁধে।

১৯২৩ সনে আমরা দ্বিতীয়বার কার্সিয়াঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটী যাপন করিলাম—দাদা, খোকা, বীণা, অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ, মুকুল ও আমি। রেলওয়ে কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র গুহ চারুভিলা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনি অতি সজ্জন। আমরা তথায় পঁহুছিয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকারের বাটীতে মধ্যাহ্নে আহার করিলাম—ডাউ হিলে উহার সন্নিকটেই আমাদের বাড়ী। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কনিষ্ঠ পুত্রসহ পূর্ব্ব হইতেই তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

আহারান্তে আবাসে উপনীত হইয়া দেখিলাম, বাড়ীটী দোতলা—কিন্তু দ্বিতীয় তলে শয়নঘর মোটে দুইটী। দাদার প্রস্তাবানুযায়ী একটী তাঁহার ও খোকার হইল, অপরটী অপেক্ষাকৃত বড় আমাদের চারিজনের জন্য রহিল। পথ হইতে ঢুকিবার ঘরটী আমি পাঠাগার করিলাম কিন্তু অচিরেই দারুণ দুর্গন্ধের জন্য আমাকে পশ্চাতের বারাণ্ডার এক কোণে পলায়ন করিতে হইল।

কলিকাতা ছাড়িবার সময়ে আমার শরীর একটু খারাপ বোধ হইয়াছিল, কার্সিয়াঙ্গ পঁহুছিবার দুই এক দিন পরেই আমার জ্বর হইল, খোকাও জ্বরে বিছানা লইল। দুই এক দিন পরে গুরুদাসবাবু পুত্রসহ দার্জিলিং গেলেন, বড় দিদি আমাদের শুশ্রূষার জন্য কয়েক দিন থাকিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বিশ্বাসের চিকিৎসায় আমি কিছুকাল ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিলাম।

ইহার পরেও জ্বরে আক্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে যদিচ একেবারে শয্যাশায়ী হই নাই। অধিকন্তু একদিন উদরাময়ে ভুগিলাম।

এবার আমার বিশেষ কাজ ছিল গ্রীকদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা।

এইখানে বীণা সংবাদ পাইল, তাহার স্কুল কলেজের সমপাঠী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা শান্তিলতা বসুরায় ময়মনসিংহে পিত্রালয়ে পরলোক গমন করিয়াছে। ইহাতে সে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইল। তাহার অনুরোধে উপরত আত্মার কল্যাণার্থ একদিন পরমপিতার নিকটে প্রার্থনা করিলাম।

শান্তি ছুটীর প্রারম্ভে আমাদের বাড়ীতে দুই একদিন থাকিয়া পিতামাতার নিকটে গিয়াছিল। সে গণিতে অনার্স পাইয়া বি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়। সে, য়্যানী এবং বীণা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে এম্. এ. পড়িতেছিল। ইহারাই ঐ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। আমি এক দিন ডাণ্ডীতে উঠিয়া ডাউ হিলের শিরোদেশে স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে পঁহুছিতেই চারিদিক কুয়াসাচ্ছন্ন হইল, সুতরাং বাড়ীগুলি খুব পরিষ্কার দেখিতে পারিলাম না। পদব্রজে ফিরিয়া আসিলাম।

১৯২৪ সনে চতুর্থবার গিরিডিতে গ্রীষ্মের ছুটী অতিবাহিত হইল। সাধু অঘোরনাথের নামে পরিচিত "গুপ্তকুটীর" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ভাড়া করিয়াছিলাম। সেখানে পঁহুছিয়া মধ্যাহ্নে গুরুদাসবাবুর বাড়ীতে আহার করিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন খোকা, বীণা, বৌ, মুকুল এবং ছয় মাসের শিশু প্রসূন।

সেই দিনই জানিতে পারিলাম, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাটনায় অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। পরে বুঝিতে পারিলাম আমরা যখন মধুপুর ষ্টেসনে গিরিডির গাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময়েই তাঁহার দেহ ঐ ষ্টেসনের মধ্য দিয়া

কলিকাতার দিকে চলিয়া গিয়াছিল। সংবাদটী শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। আমি ভাবিয়া পাইলাম না, আর কোন্ বাঙ্গালীর মৃত্যুতে দেশ এত ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

এবার আমরা রাঁধুনী লইয়া যাইতে পারি নাই, কিন্তু একটী ভাল চাকর পাইয়াছিলাম। রান্নার কাজ আগাগোড়া বৌ নির্ব্বাহ করিয়াছিল।

এই বৎসর মার্চ্চ মাসে আমি একটী নূতন রোগে আক্রান্ত হই। অধিকন্তু গ্রীষ্মকালে এক নূতন রকমের উদরাময় দেখা দেয়। গিরিডিতে তুইটীই আক্রমণ করিতেছিল, তবে বারংবার নয়।

এবারও আমরা গিরিডি হইতে কয়েক মাইল দূরে একটা কয়লার খনিতে অবতরণ করিয়াছিলাম, বেশ বিস্তৃত পরিমাণ একটা ছাদ ধ্বসিবার ভয়ে মোটা মোটা বহুসংখ্যক খুঁটির দ্বারা ঠেকা দিয়া রাখা হইয়াছে। পরে শুনিয়াছিলাম, ঐ খনির কতকটা স্থান ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।

১৯২৫ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিনা অনুরোধে আমাকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তৃতীয় প্রশ্নপত্রের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যে আমাকে পরীক্ষার সময় হইতে সমস্ত গ্রীষ্মের ছুটী কলিকাতায় থাকিতে হইল।

ঐ বৎসর বড় দিনের ছুটীর পূর্ব্বে জানিতে পারিলাম যে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্যও প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি। তখন সংকল্প করিলাম ঐ ছুটীর সহিত তিন চারি সপ্তাহের বিদায় লইয়া কলিকাতার বাহিরে যাইব। এই সময়ে পারিবারিক অশান্তিতে আমার মন এমন তিক্ত হইয়াছিল যে কিছু দিনের জন্য দূরে থাকিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। খোকা তখন কটকে ভিক্টোরিয়া

স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছে। সে আমাদের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করিল। আমি বীণা ও চারি বৎসরের বালক মুকুলকে লইয়া ২৩এ ডিসেম্বর রাত্রিতে পুরী-এক্সপ্রেসে যাত্রা করিলাম। ভয়ানক ভিড়। টিকেট ও লাগেজের কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে আমার কাঁধ হইতে আলোয়ানখানা চুরি গেল। আমাদের সম্মুখ দিয়া শীতের বিছানাপত্র সমস্ত ঠেলাগাড়ীতে প্ল্যাটফর্ম্মে চলিয়া গেল, কিন্তু দীর্ঘকায় ফিরিঙ্গী প্রভু আমাদিগকে কিছুতেই ঢুকিতে দিবে না। কয়েক মিনিট সময় থাকিতে আমরা প্রবেশ করিবার হুকুম পাইলাম। মাত্র একটী কামরা এতক্ষণ চাবিদ্বারা বন্ধ ছিল, দরজা খুলিতেই জলস্রোতের ন্যায় যাত্রীদল তাহাতে ঢুকিয়া পড়িল। খড়্গাপুর পর্য্যন্ত তবু আমরা তিন জন একটা ছোট বেঞ্চ পাইয়াছিলাম। সেখানে ভিড় এত বাড়িল যে আমি একটা বাঙ্কে কোন মতে একটু কাৎ হইবার স্থান পাইলাম। বীণা মুকুলকে কোলে লইয়া সারারাত তাহাদের সঙ্গে বসিয়া রহিল। শেষ রাত্রিতে গাড়ী কটক ষ্টেসনে পঁহুছিল। খোকা উপস্থিত ছিল। আমরা প্রত্যূষে আমাদের কালী গলির আবাসে উপনীত হইলাম। মধ্যাহ্নে মধুসূদন রাও মহাশয়ের বাড়ীতে ভোজন করিলাম।

আমাদের বাড়ীটী বাহির হইতে চিত্তাকর্ষক না হইলেও বেশ খোলামেলা ছিল ; ঘরও আমাদের পক্ষে অপ্রচুর ছিল না। ভিতরে বেশ বড় উঠান, তাহার উত্তর পার্শ্বে আমাদের দুইটী শয়ন ঘর, দক্ষিণে আমার পড়িবার ঘর, খাবার ঘর প্রভৃতিও ভাল ছিল। ক্ষীরোদ নামক পাচক আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল। শীতকালে কটকে ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর সন্নিকটেই যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। সুতরাং আহারের কোনও অসুবিধা ছিল না।

আমাকে এবার এম.এ. শ্রেণীতে বার্কের French Revolution এর জন্য Von Sybel, Taine, Aulard প্রভৃতির প্রণীত ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ কটকে আমার প্রধান কার্য্য ছিল। তা' ছাড়া মাঘোৎসবের বক্তৃতার সারসংগ্রহ ও ইংরেজী উপাসনার উপদেশটী লিখিয়া রাখিলাম। অধিকন্তু কেশবচন্দ্রের স্মৃতিসভায় (৮ই জানুয়ারী) টাউন হলে অন্যতম বক্তারূপে বক্তৃতা করিলাম। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী সভাপতি ছিলেন। ১১ই ঐ স্থানে "কি চাই" বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। তারপর কংগ্রেসকর্ম্মী লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু ধরিয়া বসিলেন, ছাত্রসংঘের অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিতে হইবে। অব্যাহতি না পাইয়া অভিভাষণটী ইংরেজীতে লিখিয়া ফেলিলাম। কটক ছাড়িবার পূর্ব্ব দিন টাউন হলে উহা পঠিত হইল।

স্বর্গীয় মধুসূদন রাওএর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথবাবুর কন্যা সুশীলার বিবাহে ভাই সতীশের আচার্য্যের কার্য্য করিবার কথা ছিল। তিনি আসিতে পারিলেন না, অগত্যা আমাকেই পৌরোহিত্য করিতে হইল। বর শ্রীমান্ মোহিনীমোহন মিত্র আমার ছাত্র ছিলেন।

কটকে এক মাসের কিছু কম বাস করিবার পরে আমরা একদিন ডাক্তার জয়ন্ত রাওএর গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া পুরী যাত্রা করিলাম। আমাদের সহযাত্রী হইলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সুকান্ত ও তাঁহার পত্নী এবং এক বন্ধু। এই সময়ে পুরীর মুন্সেফ কটকবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়ক কয়েক দিনের জন্য কটকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুকান্তের অনুরোধে স্থির হইল আমাদিগকে দুই তিন দিনের জন্য তাঁহার গৃহে থাকিবার সম্মতি দিবেন। আমরা নিজেরা আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া কয়েক

দিন সেখানে বেশ আরামে থাকিলাম এবং মন্দিরাদি আবার দেখিয়া লইলাম। যে প্রাতঃকালে লক্ষ্মীবাবু কন্যাসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমি কন্যা ও পৌত্রসহ সেই দিন অপরাহ্নে কলিকাতা রওনা হইলাম, খোকা কটকে নামিয়া গেল।

আমার এবারের কটক গমনে বিধাতার নিগূঢ় লীলা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। মনের ক্লেশে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিলাম, জানিতাম না যে ইহাতে কি অপ্রত্যাশিত ইষ্টবস্তু লাভ হইবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যেদিন শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়-চৌধুরীকে দেখিতে যাই, তদবধি আজ পর্য্যন্ত আমি জানিতাম না যে তাঁহার প্রদোষচন্দ্র নামক একটী পুত্র আছে। তাঁহার সন্তান-গণের মধ্যে শ্রীমতী প্রভাবতী রায়ের সহিত ১৯০৯ সন হইতে আমার পরিচয় ছিল এবং অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রকে সহযোগী পরীক্ষক-রূপে দুই একবার দেখিয়াছিলাম। এবার কটক যাইবার পরে প্রদোষকে প্রথম দেখিলাম। আমরা কটকে যাইবার পরে যথারীতি ব্রাহ্মদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি; প্রদোষের মামার বাড়ীতেও গিয়াছিলাম। এই সূত্রে প্রদোষও মাঝে মাঝে আমাদের গৃহে আসিত। সে পূর্ব্ব বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নে এম. এস-সি পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বীণাও এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গণিতে এম. এ. উপাধি লাভ করে। সুতরাং তাহারা পরস্পরকে মনোনয়ন করিলে "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" আমাকে এই নীতিবাক্যেরই অনুসরণ করিতে হইবে। প্রদোষ আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিত, এবং দরজার কোণে একটা আসনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কথাবার্ত্তা যাহা হইবার প্রায়ই আমার

সহিতই হইত। কেশবচন্দ্র স্মৃতিসভায় তাহার প্রবন্ধটী শুনিয়া একটু চমকিত হইয়াছিলাম। যখন কটক ত্যাগ করিলাম, তখন পর্য্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণের মত কিছুই দেখা যায় নাই।

মাঘোৎসবের প্রারম্ভে আমরা কলিকাতায় উপনীত হইবার কয়েকদিন পরে প্রদোষ, তাহার মাতা, দুই ভ্রাতা এবং দুই ভগিনী উৎসবোপলক্ষে তথায় আসিলেন। উৎসবের মধ্যেই একদিন অপরাহ্নে তাঁহারা আমাদের গৃহে আসিলেন—আমি বুঝিলাম সকলে মিলিয়া কন্যা দেখিতে আসিয়াছেন। বীণা ও পুত্রবধূ তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং দুই চারি দিন পরেই প্রদোষ ঢাকায় এবং মাতা ও ভগিনীদ্বয় কটকে চলিয়া গেলেন। তারপর বীণার নামে প্রদোষের একখানি পত্র আসিল, আমি তাহা না খুলিয়া কন্যার হাতে দিলাম। তিনি উহা পড়িয়া উত্তর দিবার জন্য আমার অনুমতি চাহিলেন, আমিও প্রাপ্তবয়স্কা ও সুশিক্ষিতা কন্যার সদ্বিবেচনার উপরে আস্থা রাখিয়া বিনা দ্বিধায় অনুমতি দিলাম। এইরূপে উভয়ের পত্রালাপ আরম্ভ হইল। পরবর্ত্তী কয়েক মাস প্রদোষ মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন এবং তখন আমাদের গৃহে উন্মুক্তদ্বার কক্ষে বসিয়া দুই জন আলাপ করিতেন। এইরূপে ধীরে ধীরে অল্পকাল আলাপ পরিচয়ের পরে প্রদোষ ও বীণার বিবাহসম্বন্ধ কন্যার পিতা ও বরের মাতার অনুমোদন অনুসারে স্থিরীকৃত হইল।

১৯২৬ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় ইঁহাদের পরিণয় সম্পন্ন হইল। বীণার পাঠ্যাবস্থায় কোনও কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আমার নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন। আমি বলিতাম, বি. এ. পাস করিবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দিব না। বি. এ. পরীক্ষায় সে গণিতে শতকরা প্রায় ৯০ নম্বর পাইল দেখিয়া তাহাকে ঐ

বিষয়ে এম. এ. পড়াইতে ইচ্ছা হইল। তৎপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শ্রেণীতে কোনও মহিলা ছাত্রী ভর্ত্তি হয় নাই। স্যর আশুতোষকে আমার অভিপ্রায় জানাইতেই তিনি উৎসাহের সহিত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলেন। বীণা, শান্তিলতা বসু রায় এবং শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা এই তিন বন্ধু পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এক বৎসর পরে শান্তিপ্রভাও গেলেন। বীণা একাকী রহিল এবং একাকীই উত্তীর্ণ হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই বিনা চেষ্টায় অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল, তাহাতে বিধাতার কৃপা জাজ্বল্যমান বিদ্যমান। এই সাক্ষ্য দিবার জন্যই কটকবাসের বিবরণ এতখানি লিখিলাম।

এই সময়ে আমি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ১৯২৭ সনের গ্রীষ্মের ছুটীতে আমাকে শিলং যাইতে পরামর্শ দিলেন। বীণার শাশুড়ী ও দুই ননদও ঐ সময় তথায় যাইবেন, এইপ্রকার স্থির হইল। আমি, মুকুল, বীণা, প্রদোষ এবং তাহার মাতা ও দুই সহোদরা এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একত্র কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তখন শিলং যাইতে হইলে গৌহাটীতে রাত্রিতে থাকিতে হইত। আমরা প্রদোষের মাতুল, আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়ার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যাকালে আমার পেটের অসুখ হইল, এজন্য গৌহাটীতে পরদিনও থাকিতে হইল। তৎপরদিন পূর্ব্বাহ্নে মোটর-বাসে রওনা হইয়া বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা শিলং উপনীত হইলাম। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পুত্র আসিয়া প্রদোষের মাতা ও ভগিনীদিগকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেল। শ্রীযুক্ত শিবনাথ দত্তকে আমি তার করিয়াছিলাম। তিনি ষ্টেসনে আমাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন এবং

বলিলেন, তাঁহার গৃহে আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত আছে। আমি তাঁহার গৃহসংলগ্ন শ্রীমান রজনীকান্ত দাসের বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলাম, আমরা মোটরে লাবানে সেই বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। আমি মধ্যাহ্নের আহার বর্জ্জন করিলাম। বাড়ীটী আমাদের খুব পছন্দ হইল। বাসগৃহ পাঁচটী; সম্মুখে, পশ্চাতে বড় উঠান ও ফুল বাগান, এক পার্শ্বে আয়ত উচ্চভূমি, ন্যাসপতি ও পীচ ফলের গাছ। তাছাড়া রান্নাঘর, খাবার ঘর, স্নানাগার, সমস্তই সুবিধাজনক।

শিলং সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। যেদিকে তাকাও শুধু শ্যাম তরুরাজি, তন্মধ্যে সরল বা Himalayan Pineই অধিক। পাহাড়গুলি অনুচ্চ, প্রধান রাস্তাগুলি চমৎকার, মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী। ১৯২০ সন পর্য্যন্ত দার্জিলিঙ্গে উহা দেখি নাই, কিন্তু শিলঙ্গে উহার ব্যবহার যথেষ্ট। এই শৈলপুরীর উচ্চতা কার্সিয়ঙ্গের সমান হইলেও শীত অপেক্ষাকৃত কম। আমি যে মোটা গরম কোট তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিলাম তাহা তোরঙ্গেই বন্ধ ছিল।

বেড়াইবার পক্ষে লাবান উপনগরীর এই একটা সুবিধা যে Kench's Trace নামক অনুচ্চ শৈলবেষ্টী পাকা প্রশস্ত পথ উহার অতি নিকটে। আমি প্রায়শঃ প্রাতঃকালে এই পথে ভ্রমণ ও পাহাড়টী প্রদক্ষিণ করিতাম। পথটী যেমন নির্জ্জন, দৃশ্যও তেমনই মনোহর। আমি ঐ সময়ে প্রায়শঃ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতাম, একদিন পথ হারাইয়া বিস্তর ঘুরিয়াছিলাম। লাবানের পূর্ব্বদিকের পাহাড়টী অপেক্ষাকৃত উচ্চ; পূর্ব্বাহ্নে উহার ছায়াস্নিগ্ধ নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিতে আমার খুব ভাল লাগিত। বৈকালে প্রায়ই ছোট বড় পুষ্করিণীর আকারের হ্রদগুলি দেখিতে যাইতাম। একদিন দূরবর্ত্তী বৈদ্যুতিক

শক্তির উৎস দেখিতে গিয়াছিলাম। শিলঙ্গে গৃহে ও পথে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহৃত হয়।

প্রাতঃসন্ধ্যা ভ্রমণ ছাড়া আমার কাজ ছিল প্রথম কয়েক দিন বি. এ. অনার্স পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করা এবং তাহা শেষ হইলে ইলিয়াড পাঠ। আসিয়া অল্পকাল পরের দুই তিন দিন একটু জ্বরে ভুগিলাম এবং পরে একটা পুরাতন রোগও একটু কষ্ট দিল, কিন্তু মোটের উপরে আমার শরীর বেশ ভাল ছিল। ২৮এ মে অপরাহ্নে পুলিশ বাজার ব্রাহ্মসমাজে "কি চাই" বিষয়ে একটা বক্তৃতা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলাম।

আমাদের আসিবার কয়েক সপ্তাহ পরে বৌ, প্রসূন ও উৎপলকে (১ বৎসর) লইয়া মান্তু আসিল। সে কিছু দিন থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল এবং প্রায় সেই সময়েই কটক হইতে খোকা আসিল।

দার্জিলিং ও কার্সিয়ং অপেক্ষা এই শৈলাবাসে আমার শরীর অধিকতর সুস্থ ছিল, এজন্য আমার ইচ্ছা ছিল জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া যাইব। কিন্তু ঐ মাসের প্রারম্ভেই এক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। আমার একটা অহঙ্কার আছে যে আমি চক্ষুর পলকে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ধরিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার মত আহাম্মক দুনিয়ায় নাই। নিদারুণ অশান্তির বেড়া আগুনের মধ্যে বাস করিয়াও আমি আশা করিতেছিলাম, যদিচ শেষ ভবিষ্যৎ নিবিড় তমসে নিহিত তথাপি সব ভালই হইবে। এই মোহের ঘোরে আট দশ দিন কাটিয়া গেল। স্থির হইল প্রদোষ তাহার মাতাকে লইয়া গৌহাটীর পথে নওগাঁ যাইবে ; সেই উদ্দেশ্যে

সে তাহার দাদার বাড়ীতে গেল। বীণা আমাদের নিকটে রহিল। যে দিন সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে শিলং ত্যাগ করিব, তাহার পূর্ব্ব দিন বৈকালে আমি কলিকাতা হইতে মান্তুর সম্বন্ধে এমন একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম, যাহাতে আমাদিগকে এক দিনের আয়োজনেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিতে হইল। বীণা আমাদিগের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে, প্রদোষকে তাহা বলা আবশ্যক। পরদিন প্রত্যূষে আমি দ্রুতপদে মোটর ষ্টেসনে রওনা হইলাম, সময় কম, স্থানে স্থানে দৌড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু ষ্টেসনে পঁহুছিয়া দেখিলাম প্রদোষদের বাস গৌহাটীর পথে চলিয়া যাইতেছে, হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়াও উহা থামাইতে পারিলাম না। প্রদোষকে তার করিলাম, সে যেন গৌহাটী ষ্টেসনে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করে।

আমরা পর দিন প্রভাতকালে যাত্রা করিয়া প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা পরে কলিকাতায় উপনীত হইলাম।

তাহার পরে অনেক কিছু ঘটিল। ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে মান্তু স্বতন্ত্র বাসায় চলিয়া গেল। শিলং হইতে ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার পরেই প্রদোষ পাটনা সায়েন্স কলেজে কর্ম্ম পাইয়া তথায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত ভূমিতে এক নব নির্ম্মিত বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইল ; আগষ্ট মাসে বীণাও তথায় গেল। সেখানে ১৯২৮ সনের বসন্তকালে প্রদোষ টায়ফয়েড জ্বরে প্রায় এক মাস ভুগিল, এবং গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হইলে তাহাকে লইয়া পুরী যাওয়া স্থির হইল। সেখানে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়কের সহযোগে ডাক্তার কুমারী যামিনী সেনের বাড়ীর একাংশ ভাড়া করিয়া ৯ই মে প্রদোষ, বীণা ও মুকুলকে লইয়া আমি পুরী যাত্রা করিলাম।

. বালুময় সমুদ্রতটের ঠিক উপরি ভাগে অবস্থিত দক্ষিণমুখী এই

বাড়ীর পূর্ব্বাংশ আমরা অধিকার করিলাম। পশ্চিমাংশে এক ইংরেজ মহিলা ছিলেন, পশ্চাতে পশ্চিমে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার সস্ত্রীক থাকিতেন। শ্রীমান্ সরোজেন্দ্রনাথ রায় কয়েক দিন আমাদের সহিত থাকিয়া গেলেন এবং খোকা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। শেষের দিকে প্রদোষের মাতা ও দুই ভগিনী ইলা ও বেলা দশ বার দিন আমাদিগের সহিত যাপন করিয়া একত্র পুরী ত্যাগ করিলেন। বীণা ও ইলা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা সমুদ্রতীরে ভ্রমণ, মধ্যাহ্নে সমুদ্রে স্নান, আরাম, নিদ্রা ও পাঠ—এক মাস কাল এক ভাবে অতিবাহিত হইল। আমি তখন সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিতাম। এখানে আমার বহুমূত্ররোগ বাড়িয়া গিয়াছিল।

কলিকাতায় ফিরিবার পরে প্রদোষ পাটনায় গেল, বাটীতে রহিল বীণা, তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রহিলেন তাহার বড় মাসী এবং আমি রহিলাম।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের পরামর্শ অনুসারে আমি ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তের চিকিৎসাধীন রহিলাম। তাঁহার নির্দ্দেশমত ১৯২৯ সনের গ্রীষ্মের অবকাশে আমি দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির করিলাম।

পত্রযোগে মিত্র বোর্ডিং (ভূতপূর্ব্ব Woodland) বিপুলায়তন জরাজীর্ণ স্বাস্থ্যনিবাসে আমার একার জন্য দোতলায় একটী ঘর অগ্রিম রিজার্ভ করিয়া ১০ই বা ১১ই মে দার্জ্জিলিঙের ডাক গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পরে পরম হরষে বিছানা করিয়া আরামে সটান শুইয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল আচ্ছা দেখি তো তোরঙ্গের চাবির গোছা কোথায় রাখিয়াছি। প্রথমে কোটের জামার পকেটগুলি বারবার খুঁজিয়া ঝাড়িয়া দেখিলাম, তারপর বালিসের

নীচে, বিছানার নীচে, বিছানা উল্টাইয়া উঠাইয়া, নাড়িয়া ঝাড়িয়া, বেঞ্চের তলায় হাতড়াইয়া দেখিতে কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু চাবি কোথাও মিলিল না। তখন আমার সুবিমল পরিতোষ উড়িয়া গেল, চিত্তে জাগিয়া রহিল শুধু উদ্বেগ, আত্মগ্লানি ও কিংকর্ত্তব্য ভাবনা। প্রাতঃকালে শিলিগুড়িতে গাড়ী হইতে নামিয়াই প্রদোষকে জরুরী (Urgent prepaid) উত্তরের মূল্যসহ টেলিগ্রাম করিলাম। দ্বিপ্রহরের পরেদার্জ্জিলিং ষ্টেসনে পদার্পণ করিয়াই মিত্র বোর্ডিং হইতে যিনি আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন—জানিলাম তিনি এক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার কোনও তার আসিয়াছে?" উত্তর, "না"। হোটেলে যাইয়া—অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন ভোজন বর্জ্জন করিয়া মিস্ত্রী ডাকাইয়া বি, এ. অনার্স পরীক্ষার কাগজগুলি যে তোরঙ্গে ছিল তাহা ভাঙ্গাইলাম, এবং অচিরাৎ পরীক্ষার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। কাপড়ের মজবুত তোরঙ্গটী নূতন কিনিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাহা আর ভাঙ্গিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিপদ হইল এই যে গরম জামা কোট গায়ে যাহা ছিল তাহা বদলাইবার উপায় রহিল না। একটা ফ্লানেলের ফতুয়া জীর্ণ হইয়া ছিল, পথের জন্য সেটী সঙ্গে রাখিয়াছিলাম, কাঁধের উপরে তাহার একটা বড় ছেঁড়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া গায়ে দিয়া প্রতিবেশীদিগের হাস্যোদ্রেক করিতাম। "দিন যায় দিন আসে, সময় বহিয়া যায়," চাবি আর আসে না—জরুরী উত্তরের টাকা দিয়া তারের উত্তরও আসিল না। দশ বার দিন পরে আমার সেই ছাত্রটী—নাম সুরেন্দ্র—হোটেলের মালিক বাবু বিহারীলাল মিত্রের এক গোছা চাবি আনিয়া "try, try, try again" করিতে করিতে একটা দ্বারা তোরঙ্গটা খুলিয়া ফেলিলেন। তৎপরে প্রদোষ পত্রে চাবি-

বিভ্রাটের সংবাদ শুনিয়া ঢাকা হইতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইল, "Send Keys Mittra Boarding" শিলিগুড়ি হইতে এই জরুরী তার পাইয়া প্রদোষ ধরিয়া লইল, আমি বরাবর দার্জ্জিলিং না যাইয়া শিলিগুড়িতে নামিয়া রহিয়াছি, এবং এই মিত্র বোর্ডিং শিলিগুড়িতে বর্ত্তমান, অতএব চাবি সেই সহরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন শিলিগুড়ির পোষ্টমাষ্টারকে পত্র লিখিলাম এবং তাহার অনুগ্রহে দার্জ্জিলিঙ্গের মিত্র বোর্ডিঙ্গেই চাবিটা পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। জরুরী উত্তরের টেলিগ্রাম শিলিগুড়িতে রজনীকান্ত গুহ এবং মিত্র বোর্ডিং কোনটাই না পাইয়া নিখোঁজ হইল।

আমি পরে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বিলাত যাত্রার কালে বোম্বাই যাইয়া আবিষ্কার করিলেন যে চাবির তোড়া কলিকাতায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। লোক পাঠাইয়া সেগুলি আনাইতে হইয়াছিল।

চাবি পাইবার পরে আমি স্বচ্ছন্দে দুইবেলা বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বহু দূর যাতায়াত করিতে পারিতাম না। এ যাত্রায় Birch Hillএ একদিনও যাই নাই।

পরীক্ষার কাজ শেষ করিয়া অল্পস্বল্প পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। ডান্টের গ্রন্থই প্রধান পঠিতব্য বিষয় ছিল।

দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'ধর্ম্মের শাঁস ও খোসা' শীর্ষক একটী বক্তৃতা করিলাম। পরে আর একটী বক্তৃতার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টির জন্য সম্পাদক হেমলতা সরকারের মতানুসারে উহা স্থগিত করা হইল। পরদিন শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আমাকে এ জন্য তিরস্কার করিলেন—তিনি বক্তৃতা শুনিতে যাইয়া বক্তাকে না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

এবার দার্জ্জিলিঙ্গে পরিচিত অনেক নরনারী আসিয়াছিলেন। আমাদের হোটেলেও কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধু পাইয়াছিলাম। ডাক্তার স্নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, বহুকালের পরিচিত এই দুই জন এবং রামমোহন রায় সেমিনারীতে আমার পরলোকগত ছাত্র সত্যেন্দ্রভূষণ দত্তের দুই কনিষ্ঠ সহোদর মনীন্দ্র ও ফণীন্দ্রভূষণ দত্তের সহিত নূতন আত্মীয়তা হইল। আমরা এই কয়জন এক বাড়ীতে থাকিতাম। পার্শ্ববর্ত্তী এক বাটীতে এক জমিদারের পুত্র থাকিতেন, তাঁহার সঙ্গে তরবারীধারী অনুচর থাকিত। তিনি আমার প্রতি অহৈতুকী প্রীতি-প্রদর্শন করিতেন, আমি তাহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেই নাই। আর একটী ত্রিতল বাটীতে ছিলেন বীণার ননদ শ্রীমতী প্রভাবতী রায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন (বড় চাকুরিয়া, মাসিক বেতন এক হাজার টাকা) এবং শ্রীযুক্ত বিনায়ক রাও—মান্দ্রাজের মারাঠা—বেশ ভদ্রলোক; এই দুই ভদ্রলোকের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

দর্জ্জিলিঙ্গে আসিবার পরে গরম কোট, ফ্লানেলের সার্ট এবং ফ্লানেলের ফতুয়া তৈয়ার করাইতে এবং পশমের গলাবন্ধ (muffler) কিনিতে হইল।

এই হোটেলের বাহ্যরূপ যেমন চিত্তাকর্ষক ছিল না, আভ্যন্তরীণ পরিচালনাতেও তেমনি উন্নতির অভাব। আমার প্রধান অস্নবিধা ছিল আমার খাদ্য সম্বন্ধে। আমি এই সময়ে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে নিরামিষ তরকারী ও আটখানা স্নুজীসিদ্ধ রুটী খাইতাম, তাহা ছাড়া সকালে চা, পাঁউরুটী ও মাখন, মধ্যহ্নে ঘোল, বিকালে মুড়ি ও নারকেল এবং ওভালটিন ও রাত্রিতে দুধ নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্নুজীসিদ্ধ রুটী ভাল হইত না, বলাই বাহুল্য। ব্যঞ্জনাদিও কোন রকমে খাওয়া যাইত।

হোটেলের ঘোল অখাদ্য বলিয়া আমি কভেণ্টারের দোকান হইতে ঘোল আনাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আমার নিজের একটী বালক-ভৃত্য ছিল, সুতরাং কাজটা অনায়াসেই চলিত। বৈকালে পাচক ঠাকুর সোটকা মুড়ি ভাজিয়া দিত, সুতরাং উহা দুষ্পাচ্য হইত। ইহার কোনও প্রতীকার সম্ভবপর হয় নাই। আহারের অসন্তোষ-জনক ব্যবস্থার জন্য আমার পূর্ব্বপরিচিত স্বাস্থ্যনিবাসে (L. J. Sanitarium) যাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম কিন্তু সেখানে যাঁহারা আছেন, এবং যাঁহারা উহা হইতে উন্নতির আশায় এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন, সেখানকার ব্যবস্থা আরও কদাকার। সুতরাং আমি "মিত্রাবাসং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছামি"—এই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

আমার আর এক অসুবিধা ছিল এই যে আমাদের বাটী হইতে পাকশালা ছিল অনেক দূরে সম্মুখস্থ একতলায়, ভোজনাগার হইতে আর একতলা নীচে। আমরা দোতলার সকলেই নিজ নিজ কক্ষে ভোজন করিতাম। হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণে খড়ম পায়ে দিয়া প্রত্যেক ঘরে আহার্য্য দিয়া যাইত। লোকটী বেশ চটপটে ছিল, কিন্তু দোতলার বারাণ্ডা হইতে ডাকিলে সে সহজে শুনিতে পাইত না। সকালে বিকালে চা রুটী প্রভৃতির বেলায়ও ভৃত্যদিগকে ডাকাডাকি করিতে বেশ সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে হইত। মোটের উপরে এই স্বাস্থ্যনিবাসের পরিচর্য্যা (service) সন্তোষজনক ছিল না।

দার্জ্জিলিঙ্গে এবারেও আমার পূর্ব্বতন মাথাধরা প্রায় প্রতিদিন লাগিয়া থাকিত। তদুপরি বার দুই জ্বরভাব এবং দুই একবার ঔদরিক উপদ্রবও দেখা দিয়াছে। সুখের বিষয় কোনও পীড়ায় শয্যা লইতে হয় নাই এবং নিদ্রা বেশ হইত।

এবার কেন জানি না বাড়ীর জন্য মন প্রায়শঃ আকুল হইত, এক একটী করিয়া দিন গুণিতাম, কবে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।

দার্জিলিঙ্গে প্রায় দুই মাস থাকিয়া হোটেলে বাসের প্রতি অন্তরে প্রভূত অসন্তোষ সঞ্চয় করিয়া অশ্বিনীবাবুর দুই বালকের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কক্ষে নীচের তিনটী শয্যায় বেশ আরামে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী শৈলবিহারে আমাকে এক হোটেলেই থাকিতে হইল।

১৯৩০ সনের দুই বড় ছুটীই বাটী নির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম; সে বৎসর হইতে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর আমি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও যাইতে পারি নাই। শেষোক্ত বৎসরটী আমার একটী স্মরণীয় দুর্বৎসর। কেন, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। ১৯৩৫ সনের গ্রীষ্মাবকাশে ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাকে কালিম্পং যাইতে পরামর্শ দিলেন।

আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু কালিম্পঙ্গে বাস করিতেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া বাসস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলাম। তিনি বলিলেন, অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালিম্পঙ্গে একটা স্বাস্থ্যনিবাসের অধ্যক্ষ ও পরিচালক, নাম "Hotel Hill View." তথায় আমার থাকিবার সুবিধা হইতে পারে। আমি ফণীবাবুকে পত্র লিখিয়া আহারাদি সম্বন্ধে আমার আনুপূর্ব্বিক ব্যবস্থা জানাইলাম, এবং বাসের জন্য একটী স্বতন্ত্র কক্ষ চাহিলাম। অধিকন্তু দৈনিক ও মাসিক ব্যয়ের

কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম। সকল বিষয়েই তাঁহার সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া তথায় অবস্থিতি করাই স্থিরীকৃত হইল।

শুনিলাম কালিম্পং যাইতে হইলে পুলিশের অনুমতি পত্র আবশ্যক। সেইহেতু একদিন প্রাতঃকালে ডেপুটী কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুকিয়া ষ্ট্রীট থানায় গমন করিলাম। দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে তাঁহার দর্শন পাইলাম। আমাকে দেখিয়াই ভদ্রভাবে বলিলেন—"It is not for you"—আপনার জন্য ইহার প্রয়োজন নাই। তখন বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্‌টর আমাকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন।

৭ই মে ফণীবাবুকে ত্রিশ টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া ঘর ভাড়া করিয়া রাখিলাম। ১০ই মে দাৰ্জ্জিলিং ডাক গাড়ীতে পূর্ব্বে রিজার্ভ করা দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের শয্যায় স্থান গ্রহণ করিয়া কালিম্পং যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে শিলিগুড়ি পৌঁছিয়া একখানা ট্যাক্‌সি ভাড়া করিয়া বেলা দশ কি এগারটায় কালিম্পঙ্গের হোটেলে উপনীত হইলাম। পথে পাহাড়ের উপরে উঠিতে উঠিতে তীব্র বমনের উদ্বেগ হইতেছিল—এক একবার বমি হয় আর কি। হোটেলে উপস্থিত হইতেই উপদ্রবের নিবৃত্তি হইল।

স্বত্বাধিকারী তখন হাটে গিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আগত ডাক্তার মজুমদার আমার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার পত্নী ও আমার ছাত্রী শ্রীমতী লীলা (রায়) ও জয়গোপালবাবুর কন্যা আনু (অন্নপূর্ণা) আমাকে আমার ঘরে লইয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলে সম্মুখে বৈঠকখানা। উহাতে ঢুকিলে বাম দিকের দরজা দিয়া আর একটী ঘরের মধ্য দিয়া গিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। ঘরটী বেশ বড়, পশ্চিমদিকে গোটা দুই এবং

উত্তর দিকে একটী জানালা। সেই দিকে সংলগ্ন শ্বেতকক্ষ। একজনের পক্ষে স্থান যথেষ্ট।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, ব্যাঙ্কে ভাল চাকুরী করিতেন, কিন্তু মাথায় একটু ছিট আছে। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া এবং কিছুকাল দেশভ্রমণ ও বিঘ্নবিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে এই হোটেল খুলিয়া উহার পরিচর্য্যা এবং উন্নতিসাধনে দেহমন নিয়োজিত করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে আগন্তুকগণের আহারাদির ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা তিনটী পুত্রকন্যাসহ একতলার একপার্শ্বে বাস করেন। বাড়ীটীর একতলার অন্যান্য ও দোতলার সমস্ত ঘর অতিথির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ফণীবাবু নিজের হাতে প্রশস্ত আঙ্গিনায় সুন্দর ফুলের বাগান করিয়াছেন। এজন্য তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শ্রম করিয়া থাকেন। ইনি কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী নহেন এবং ভৃত্যদিগের চোখ রাঙ্গানিতে দমিবার পাত্র নহেন। একবার মেথরেরা জোট বাঁধিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছিল। তখন ইনি নিজের হাতে তাহাদের কাজ চালাইয়াছিলেন, ফলে পরিণামে জয় তাঁহারই হইয়াছিল।

এই দম্পতীর যত্নে আমার আহারাদি বেশ হইত। সকালে চা রুটী ও মাখন এবং একটা ডিম এবং মধ্যাহ্নে তিন চারি পদ শাক, ডাল, তরকারী, দুধ হোটেল হইতে পাইতাম। ভাতের জন্য আমি পুরাতন দাদখানি চাউল লইয়া আসিয়াছিলাম। তাহা ফুরাইলে ভাল পুরাতন চাউল কালিম্পঙ্গে পাওয়া দুরূহ হইয়াছিল। বিকালের জন্য আমার সঙ্গে এক টিন মুড়ি আসিয়াছিল নারিকেল এখানে জুটিত না—প্রায় সমস্তই জলহীন ও শুষ্ক।

ওভালটিন আমার নিজের পয়সায় কিনিতে হইত—কেন না ফণীবাবুর মতে ওটা ঔষধ—ঔষধ তিনি দিতে বাধ্য নহেন। রাত্রিতে সুজীর রুটী—বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে জানি—উহা যত্রতত্র ভাল প্রস্তুত হয় না—ওটা বরাবর মড়মড়া কড়কড়াই খাইতে হইত। আমার এখনও মনে আছে, ব্যঞ্জনাদি বেশ স্বাদু হইত।

গ্রীষ্মঋতু শৈলবাসের পক্ষে উৎকৃষ্ট কাল সুতরাং এই হোটেলে দুইমাস ধরিয়া অতিথিবর্গের আগমন ও নির্গমন চলিতে লাগিল। লীলারা চলিয়া গেলে আমি সেই ঘরে যাইতে চাহিলাম। ইতোমধ্যে এক পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক উহা অধিকার করিলেন। কিছুদিন পরে আমি উহা পাইলাম, ঘরটী উৎকৃষ্ট।

এই ঘরটী খুব ভাল ছিল—দক্ষিণদিকে উন্মুক্ত, পূর্ব্বদিকে সিঁড়িতে যাইবার দরজা ও একটা জানালা, স্নানাগার ইত্যাদিও আলোকময়। অসুবিধা ছিল একটা এই যে ইহাতে বৈঠকখানার গল্পগুজব হাসিতামাসার আওয়াজ কখনও কখনও ঘুমের ব্যাঘাত করিত।

এখানেও আমার নিজের একটী ভৃত্য ছিল।

কালিম্পঙ্গে আসিবার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, এই পাহাড়ের দেশে মশা নাই, কেন না দার্জ্জিলিঙ্গ কাসিয়ং শিলঙ্গে মশার উপদ্রব সহিতে হয় নাই। পরন্তু এখানে ঘরে ও বাহিরে নিশ্চয়ই বিজলীবাতি আলোক বিতরণ করিতেছে। এই দুই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আমার দুইটী মশারির একটীও সঙ্গে লইয়া আসি নাই এবং মোম বাতির ডোমওয়ালা বাতিদানও রাখিয়া আসিলাম। কালিম্পঙ্গে আসিয়া দেখি এখানকার রাস্তায় সন্ধ্যার পরেই নিবিড় অন্ধকার, তথায় বিজলীবাতি স্বপ্নের অগোচর, একটী কেরোসিনের প্রদীপও

মিট মিট করিয়া আলো দেয় না। এমন কি এ স্বাস্থ্যপুরীতে মিউনিসিপালিটী বলিয়া কোন পদার্থই নাই—পুরবাসীরা ট্যাক্সভার-বহনের ভয়ে উহার ঘোরতর বিরোধী। ফলে এখানে মল দূর করিবার ও রাস্তাঘাট ঝাঁট দিবার কোনও সাধারণ (public) বন্দোবস্ত নাই। একটা প্রসিদ্ধ শৈলনিকেতন সম্বন্ধে এমন অব্যবস্থা কল্পনাই করিতে পারি নাই। তৎপরে প্রথম রাত্রিতেই উপলব্ধি করিলাম মশারি না আনিয়া কি বোকামিই করিয়াছি। সারারাত্রি মশার কামড় খাইয়া গা' চুলকাইয়া ও পিঠ চাপড়াইয়া সুনিদ্রা সম্ভোগ করা চলে না। বাধ্য হইয়া আমাকে তৃতীয় একটী মশারি কিনিতে হইল, বাজারে যাহা পাওয়া গেল তাহা অতি নীচু, ঘেরের তলায় কাপড় জোড়া দিয়া দোকানদার তাহা ব্যবহারে চলনসই উপযোগী করিয়া দিলেন। আক্কেলসেলামী কিঞ্চিৎ দক্ষিণায় অপব্যয় হইল।

ঘরের জন্য ছিল হোটেলের কেরোসিনের লণ্ঠন। আমি উহার আলোতে পড়িতে পারিতাম না, এজন্য খোলা বাতিদানে মোমবাতি জ্বালিয়া পড়িতাম। একদিন সন্ধ্যার পরে ফণীবাবুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া Younghusband রচিত The Epic of Mount Everest নামক চিত্তহারী রোমাঞ্চকর পুস্তকখানি বিছানায় শুইয়া তন্ময় হইয়া পড়িতেছি, হঠাৎ চৈতন্য হইল, গ্রন্থের উপরের দিকে আগুন ধরিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আগুন নিভাইয়া দেখি কয়েকটী পাতা শিরোদেশে কিছু কিছু পুড়িয়াছে, কিন্তু পঠিতব্য বিষয়ের কোনও ক্ষতি হয় নাই। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ফণীবাবুকে দগ্ধশীর্ষ পাতাগুলি দেখাইলাম, এবং তাঁহার পুস্তকের বদলে একখানি নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। কিছুদিন পরে

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জীর দোকান হইতে আমার পত্রানুসারে একখণ্ড পুস্তক পাইলাম কিন্তু ফণীবাবু দেখিলেন, উহা তাঁহার পুস্তকের সহিত অবিকল এক নহে। আমিও দেখিলাম, বিক্রেতাগণ ভুল করিয়া আমাকে স্কুল সংস্করণের একখণ্ড পাঠাইয়াছেন। কিছুদিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া অবিকল আর একখানি Epic of Mount Everest কিনিয়া জয়গোপাল বাবুর হাতে দিলাম এবং ক্ষতযুক্ত বইখানি নিজে রাখিলাম।

অধ্যয়নের বিষয়টা এইখানেই শেষ করি। হোটেলের আরও দুইখানি বই খুব ভাল লাগিয়াছিল—প্রথম Lord Ronaldshay's Sikkim, Bhotan and Tibet—চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ বিবরণ এবং একখানা উপন্যাস—নাম ভুলিয়া গিয়াছি—অতি মনোহর। পরে ঐ গ্রন্থকারের Madame Bovory কিনিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি কয়েকখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। তন্মধ্যে পড়িয়াছিলাম Conrad রচিত কয়েকখানি উপন্যাস এবং Keith's History of Classical Sanskrit Literature. ইলিয়াড (মূল গ্রীক দুই খণ্ড) এবং মেঘদূত (বর্ষায় পাহাড়ে পড়িবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও) স্পর্শই করি নাই।

এই স্বাস্থ্যনিবাসে যাঁহাদের সঙ্গে অল্পাধিক কাল বাস করিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের নাম স্মরণ আছে, জয়গোপাল বাবু, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এবং Minto Professor শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী। ইনি যে আমাদের গ্রামের ৭।৮ মাইল দূরে সহদেবপুরের অধিবাসী, দাদার সহাধ্যায়ী রজনীপ্রসাদ নিয়োগীর পুত্র, তাহা এত দিনে জানিতে পারিলাম।

পথে দুইজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল—(১) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি ইঁহাকে চিনিতাম, একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইঁহার সহিত আলাপ সুরু করি। ইনি অতি সজ্জন—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" এই প্রবাদের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমি ইঁহার বাড়ীতে গিয়াছি, ইনিও আমাদের নিবাসে আসিয়াছেন। ইঁহার সহিত বুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। পথিকে পথিকে যেমন মিলন হয়, সেইরূপ। কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহিত আলাপ হইল। ইনি পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য "হিমালয়ান হোটেলে" বাস করিতেছিলেন। ইঁহাকে অমায়িক লোক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই কলিকাতায় ইনি অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন।

আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাদের নিকটেই সপরিবারে এক বাড়ীতে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত গৃহে ও পথে বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কালিম্পঙ্গের দর্শনীয় বস্তু দুইটী—প্রথম, গ্রেহাম সাহেবের আশ্রম (Home) এবং প্রকৃত ও রূপক উভয় অর্থেই তাহার বহু নিম্নে Ropeway Station (মাল আমদানীর ষ্টেসন)। শিলিগুড়ি হইতে গিয়েলখোলা পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। উহা কালিম্পং হইতে দশ বার মাইল দূরে। সেখান হইতে আকাশ পথে তারের রশ্মির সাহায্যে এখানে মাল আমদানী হয়। একদিন বেশ দূর পথ হাঁটিয়া আসিলাম।

আমি দুই দিন ফণীবাবুর সহিত মোটর গাড়ীতে গ্রেহাম

সাহেবের আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা তাঁহার এক অতুলনীয় কীর্ত্তি। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও ভারতীয় রমণীর অবৈধ মিলনজাত সন্তানেরা লালিতপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আশ্রমটী এক সমুচ্চ ও বিস্তৃত শৈলের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং বহু শাখায় জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষালাভ করিবার পরে অনেকে অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে শুধু ভারতবর্ষের অজাত বালকবালিকারাই গৃহীত হয়। গ্রেহাম মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষকে এক একখানি ক্ষুদ্র লিপি লিখিয়া দিলেন, তদনুবলে আমরা গোশালা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুনিকেতন, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদি কত প্রতিষ্ঠানই দেখিলাম। তাঁহার বাসগৃহের বহির্বাটীতে বিস্তর কারুশিল্পের নিদর্শন দেখিলাম। তিনি আমাদিগকে দুই দিনই অর্দ্ধ পেয়ালা চা (half a cup of tea) পান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাতে সম্মত হই নাই।

নিম্নতর ভূমিতে সহরের এক পল্লীতে গ্রেহাম মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী শ্রীমতী গ্রেহামের স্মৃতিনিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে। অদূরে কয়েকটী শিল্পশালা প্রভৃতি পরিচালিত হইতেছে। সেগুলি কিছু কিছু দেখিয়াছি।

কালিম্পঙ্গে যাইবার অল্পকাল পরেই আমার বাম কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে পুরাতন বেদনা দেখা দেয়। সপ্তাহকাল ফ্লানেলের সেক দিলে উহার নিবৃত্তি হয়; কিন্তু সেক নিবৃত্ত হইবার কয়েকদিন পরে আবার আরম্ভ হয়। এই সেকের কার্য্যটা পুনঃপুনঃ চালাইতে হইয়াছে।

তারপর যাইবার পরেই কয়েক দিন কোমরের বেদনা এমন হইল

যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে কষ্ট হইত ; বিনা প্রকরণে কয়েক দিনে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

আর একটা দুর্লক্ষণ বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি ; এখানে খুব ভাল ঘুম হইত না।

২৯এ জুন কালিম্পং ছাড়িব, এইরূপ স্থির করিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে শিলিগুড়ির ষ্টেসন মাষ্টারকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের বার্থ রিজার্ভ রাখিবার জন্য পত্র লিখিলাম। ২৮এ রাত্রিতে আমার উদর বিকারগ্রস্ত হইল। ফণীবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতে চাহিলেন। আমি নিষেধ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম, আপৎ কাটিয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে সংবাদ পাইলাম, কালিম্পং শিলিগুড়ির রাস্তা একস্থানে ধ্বসিয়া গিয়াছে, এজন্য মোটর গাড়ীতে গিয়েলখোলা ষ্টেশনে এবং রেলগাড়ীতে শিলিগুড়ি যাইতে হইবে। মধ্যাহ্নভোজনের পরে একখানি ট্যাক্সিতে যাত্রা করিলাম, ফণীবাবু আমার বৈকালিক ভোজনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সঙ্গী হইলেন। তখন হোটেলে মোটে একজন অতিথি ছিলেন। আমার জন্য পাঁচ ও ফণীবাবুর ফিরিবার জন্য এক, মোটে ছয় টাকা ভাড়া। ইহাকে পঞ্চাশ দিনের জন্য ১৯৮৲ দিয়াছিলাম।

রেলওয়ে ষ্টেসন পর্য্যন্ত মোটর গাড়ীতে পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে বেশ আরামেই যাওয়া গেল, এবং বৈকালের আহারও যথারীতি সম্পন্ন হইল। ট্রেণের গার্ড আমার এক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, এই আবিষ্কারটীও সন্তোষ উৎপাদন করিল। কিন্তু গাড়ীটী মন্থর-গতি, রাত্রিতে আলোকশূন্য এবং তদুপরি একস্থানে কেন মনে নাই বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা হউক পরিশেষে শিলিগুড়ি পঁহুছিলাম এবং আমার অভীষ্ট আসনও পাইলাম। রাত্রিতে হোটেলের ঝোল

ও রুটি খাইলাম। আমার কামরায় এম্-এ শ্রেণীর এক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র পাইলাম। আরামে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্বধামে উপনীত হইলাম।

মধ্যাহ্নে দেখিলাম উদরের উপদ্রব আমাকে ছাড়ে নাই।

১৯৩৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার রক্তের চাপের আধিক্যে আক্রান্ত হইবার পর হইতে দেহের ওজন ক্রমাগত কমিতে লাগিল। ১৯৩৭ সনের মে মাসে উহা ১১৪ পাউণ্ডে অর্থাৎ প্রায় একমণ ষোল সেরে দাঁড়াইল। আমি এককালে তুইমণ উনিশ সের ছিলাম। ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাকে গ্রীষ্মকালে কার্সিয়াং যাইতে উপদেশ দিলেন, এবং আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। আমি কার্সিয়ঙ্গে ভাই সতীশ ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া পামার রোডে "হোপ কটেজ" নামক বাটী ভাড়া করিলাম এবং ২৪এ মে পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিয়া কার্সিয়ং যাত্রা করিলাম। সঙ্গে গেল খোকা ও তাহার বড় পুত্র কমল, বৌ, হাঁতু, নলিন ও মঞ্জরী এবং রাম নামক পাচক। পুলিশের অনুমতিপত্র পাইতে বিলম্ব হওয়াতে মান্তু মুকুলকে পরে রাখিয়া আসিল। পরদিন দশটার সময় হোপ কটেজে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম উহা চারুভিলার সন্নিকটে, পথের অপর অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে এবং উহার উপরেই বিভূতি বাবুর বাড়ী।

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে বিভূতিবাবুর স্ত্রীর সহিত বৌ'র সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল, এবার তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াই পরম পরিতুষ্ট হইলেন, এবং আমরা এই পরিবারের প্রয়োজনমত সাহায্য পাইয়া উপকৃত হইলাম।

আশাকুটীরে তুটী বেশ বড় শয়ন ঘর; সম্মুখে পশ্চিমদিকে ঐ

দুইটীর সমান দীর্ঘ সার্সিঘেরাও বারাণ্ডা—উহা তিনভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকে ঘেরাও বারাণ্ডা, চারিদিকে বেষ্টিত দুইটী স্নানাগার এবং দুইটী যাতায়াতের পথ। উঠানের পূর্ব্বদিকে পাকশালা, বাড়ীর সম্মুখে, পশ্চিমদিকে বৃহৎ আঙ্গিনা, তাহাতে গোটাকয়েক ফুলের গাছ। সতীশবাবুর পরামর্শে উত্তরদিকের বড় ঘরটী আমার এবং দক্ষিণের ঘরটী বৌ'র জন্য রহিয়াছে। সম্মুখের দক্ষিণের ঘরটী খোকা ও তাহার পুত্র অধিকার করিল, মধ্যের ঘরটী প্রবেশ পথ তাহাতে রাম শুইত, উত্তরের ঘরটী আমার পাঠাগার করিলাম।

এই সময়ে আমার মধ্যাহ্নে আহারের বিধান ছিল একদিন ভাত, পরদিন পাঁউরুটি, এই পর্য্যায় এবং ডাল, তরকারী ইত্যাদি। আসিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সেনগুপ্ত আমলকীর মোরব্বা খাইবার ব্যবস্থা দিলেন, চিনির সহিত বহুমূত্রের বিরোধ মানিলেন না। তিনি অধিকন্তু জাফ্‌না হইতে আমদানী কি নামের একটা ফল খাইতে বলিয়াছিলেন, দাম চতুর্গুণ হইলেও দেখিলাম উহা আমাদের বাতাবি লেবু।

প্রতিদিন চারিবার ভোজন, তিন চারিবার ঔষধ সেবন, প্রাতঃ-সন্ধ্যা ভ্রমণ এবং বৈকালে পাঠ—এই কার্য্যপ্রণালী অব্যাহত ছিল। এবার দূরপথ ভ্রমণের সাধ্য ছিল না। প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রায়শঃ এক-বেলা কার্টরোডের উপরের দিকে ও একবেলা নীচের দিকে বেড়াইতাম। কখনও কখনও পাঞ্জাবাড়ী রোডে বেড়াইতাম, কিন্তু গগারামকুটীরের নীচে অল্প দূরই যাইতাম। বর্দ্ধমানের বাড়ীর পথে ও মণ্টভিডেও পথে কখন কখনও গিয়াছি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য স্পষ্টই অনুভব করিতাম।

একদিন প্রাতঃকালে ডাউ হিলের অনেক উপরে ডাণ্ডি করিয়া

যক্ষ্মাহাসপাতাল দেখিতে গিয়াছিলাম। উহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বেশ সৌজন্যসহকারে ঘরগুলি দেখাইলেন, এবং সন্নিকটে তাঁহার নিজের বাড়ীতেও লইয়া গেলেন। আমরা হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিশ গুহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার পুত্র ঐ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

আমি ও সতীশ নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে বাস করিতাম। তাঁহার সহিত প্রায়শঃ দেখা ও কথাবার্ত্তা হইত—ইহা আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় ছিল। পাটনার প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ডাউ হিলের একটু উপরেই বাস করিতেন। তিনি চোখে ছানি পড়িয়া প্রায় অথর্ব্ব হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইত। বহুকালের পরিচিত শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সেন সিভিলিয়ানপুত্র করুণাকেতন সেনের গৃহে বাস করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমার নিকটে আসিতেন। পাটনা হাইকোর্টের দুই উকীলের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল।

পাঠের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—যে বইগুলি সঙ্গে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে পড়া হইল,—Life of Joseph Chamberlain 2 or 3 vols; Punch's History of England (3 vols); The Wutbering Heights by Elizabeth Bronte; Defoe—History of the Plague in London; Adventures of······by Dumas (son). The Three Musketeers by Dumas. এই বইখানি অনেক বৎসর পূর্ব্বে কিনিয়াছিলাম, কিন্তু বেশীদূর পড়া হয় নাই। এবার আরম্ভ করিয়া শতাধিক পৃষ্ঠা পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে উৎকৃষ্ট সংস্করণের বই লইয়া শেষ করিলাম এবং ডুমার উপন্যাস এত ভাল লাগিল যে

একাদিক্রমে যে ২৪।২৫ খণ্ড উপন্যাস পাইলাম সমস্ত শেষ করিলাম। তৎপরে এই কয় বৎসরে Balzac প্রায় ৪০।৫০ খণ্ড পাঠ করিয়াছি।

আমরা এবার খুব বিলম্বে পাহাড়ে আসিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ জুলাই মাসেও আবহাওয়ার অবস্থা মোটের উপর ভাল পাওয়া গেল। এ জন্য আমরা পূর্ণ দুই মাস থাকিতে পারিলাম। খোকা ও কমল ২৬ এ জুন চলিয়া গিয়াছিল।

১৬ই জুলাই মঞ্জরী তক্তপোষের উপর পড়িয়া গিয়া বাম চোখের নীচে ও থুতনীতে রক্তাক্ত ঘা করিয়া ফেলিল। আমি তখন পায়খানায় আবদ্ধ ছিলাম। বিভূতিবাবুদের সাহায্যে বৌ তাহাকে ডাক্তার সত্যকিঙ্কর বিশ্বাসের নিকটে লইয়া গেল। ইনি এখন যশস্বী ও ধনশালী চিকিৎসক। রেলওয়ে কোম্পানী ও কতকগুলি চা বাগানের ডাক্তার। মোটরগাড়ী, ঘোড়া এবং দুই তিন খানা বাড়ী করিয়াছেন। ইনি ক্ষতগুলির যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন, এবং নিজের কম্পাউণ্ডার দ্বারা প্রতিদিন বাড়ীতে ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিয়া দিবার উপদেশ দিলেন। তিনি একবার চারি টাকা দর্শনী লইলেন। কম্পাউণ্ডারকে রোজ এক টাকা দিতে হইত। মঞ্জরী ৮।৯ দিনে প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। এই আকস্মিক দুর্ব্বিপাকে ১৫।১৬ টাকা ব্যয় হইল।

আমরা ২৪এ জুলাই কার্সিয়ং ত্যাগ করিলাম। আমার ২য় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। শিলিগুড়িতে বিভূতিবাবুর ভ্রাতা রেলকর্ম্মচারী ফণীবাবুর চেষ্টায় আমি একাকী একটা ছোট কামরা (Cubicle) পাইয়াছিলাম।

কার্সিয়ঙ্গে আমার শরীর মোটের উপর মন্দ ছিল না।

পর বৎসরও (১৯৩৮) আমার কার্সিয়ং যাইবার ইচ্ছা ছিল

এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বিভূতিবাবু সপরিবারে আমাদের বাটীতে দেখা করিতে আসিলে তাঁহাকে বাড়ী দেখিতেও বলিয়াছিলাম। কিন্তু ডাক্তার সেনগুপ্তকে আমার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি পাহাড়ে যাইতে নিষেধ করিলেন। চিকিৎসকেরা রোগীকে বিধি নিষেধ বলিয়া দেন, তাহার কারণ বলেন না।

এই বৎসর প্রদোষ কর্ম্ম লইয়া বাঁকুড়ায় গেল, এবং বীণা আমাকে তথায় যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। যাঁহারা বাঁকুড়ায় ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, স্থানটী খুব স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ডাক্তার সেনগুপ্ত কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। বৎসরাধিক কাল পরে, ১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সম্মতি পাওয়া গেল।

সংবাদ পাইয়া প্রদোষ আমাকে লইয়া যাইতে আসিল, আয়োজন উদ্যোগে তিন চারি দিন কাটিল। ১০ই ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্ন আহারের পরে ভৃত্য দেবেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমরা বাঁকুড়ায় যাত্রা করিয়া রাত্রি নয়টার পরে ষ্টেসন হইতে ট্যাক্‌সিতে কন্যা-জামাতার বাটীতে উপনীত হইলাম। প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি ও বাতাসের জন্য বেশ শীত বোধ হইয়াছিল। বাঁকুড়া সাহিত্য সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাক্তার কালিদাস নাগ এক ট্রেণেই আসিলেন।

বাড়ীটী দোতলা, এক এক তলায় একটী বড় ও একটী ছোট ঘর। এক তলায় রান্না, ভাড়ার ইত্যাদি। স্বতন্ত্র এক ঘরে অমল চন্দ্র গুপ্ত থাকিতেন, তা ছাড়া ভৃত্যদের ঘর ও আছে। বড় বাড়ীটীর দক্ষিণে প্রশস্ত বারাণ্ডা, দক্ষিণ খোলা। এই পল্লীর নাম খৃষ্টীয়ান-ডাঙ্গা।

পরদিন প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিলাম এ কোথায় অজানা জায়গায়

আসিলাম। সুতরাং বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে প্রশস্ত বড় রাস্তায় যাইয়া বোকা বনিয়া প্রথমে একটী ভদ্রলোককে ও পরে বাড়ীর অচেনা চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্বধামে উপনীত হইলাম।

এই দিন ও পরদিন সায়ংকালে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে ও সন্ধ্যা সমিতিতে যোগ দিলাম।

প্রাতঃসন্ধ্যায় নিয়মিতরূপে ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলাম, বাঁকুড়া সহর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি উচ্চাবচ, ঢেউয়ের মত। বোধ হয় সমগ্র জেলাটীই তাই। উচ্চ ভূমিগুলি ঊষর, তাহাতে আবাদ হয় না ; কৃষিকার্য্য হয় নিম্নতর জমিগুলিতে।

এই সহরটীর স্বাস্থ্যের খ্যাতি আছে। এ জন্য অন্য জেলার ভদ্রলোকেরা অবসর গ্রহণের পরে এখানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

বাঁকুড়ায় আমার বহুকালের পরিচিত ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, কে হালদার (সুধীন্দ্রকুমার) ও তাঁহার পত্নী উষা। তাঁহাদের কন্যা লক্ষ্মীকে অনেক বৎসর পরে দেখিলাম, এ বৎসর ইংরাজীতে এম. এ. পাস করিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট জজ আর এক এস্. কে. (সুধীন্দ্রকুমার) হালদার ; তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সহিত নূতন আলাপ পরিচয় হইল। অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, ডিষ্ট্রিক্ট জজ ফণীভূষণ মিত্র, ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য (তিন জনই অবসরপ্রাপ্ত) ; ইহাদের সহিত অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। এক শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল। তিনি আমাকে নিজের বাগানের কতকগুলি ফল তরকারী উপহার দিয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বলের সহিত

এক দিন কলেজ বাড়ীতে কথাবার্ত্তা হইল। অধ্যাপকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন কলেজে আমার সহযোগী এবং শ্রীমান্ বিভাকর দাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদের সকলকে খুব অমায়িক বলিয়া অনুভব করি নাই।

বাঁকুড়ার বোর্ষ্টাল স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনী মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজের জামাতা। তিনি আমার প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। ঐ স্কুলে অল্পবয়স্ক কয়েদীরা নানা প্রকার শ্রমশিল্প শিক্ষা করে। তিনি এক দিন প্রাতঃকালে আমাকে সমস্ত বিদ্যালয় দেখাইলেন। অন্যরূপেও আমি তাঁহার নিকটে ঋণী।

মিউনিসিপালিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহার বাড়ীতেও গিয়াছি। তাঁহার পত্নী আমাকে অনেকগুলি ডালের বড়ী পাঠাইয়াছিলেন।

জজ সাহেবের পত্নী শ্রীযুক্তা ইলা হালদার এক দিন অপরাহ্ণে আমাকে ও বীণাকে গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বহুদূরস্থিত নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কিছু কাল আলাপ করিয়া আমরা ঐ গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিলাম। প্রায় এক বৎসর পরে ইহার শোচনীয় অপমৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলাম।

শ্রীমান্ যুধিষ্টির দাস I. Sc. পরীক্ষার কার্য্যে বাঁকুড়ায় আসিয়া সহযোগী পরীক্ষক প্রদোষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। আমরা তাহার ব্যয়ে কুষ্ঠাশ্রম দর্শন ও নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। এই সুযোগে আমি জজের সেরেস্তাদার, আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে যাইতে সমর্থ হই। ইনি,

ইঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী এবং দিদিশাশুড়ী সকলেই আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সকলেই অত্যন্ত সহৃদয়।

বাঁকুড়ায় আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত শেষ সাক্ষাৎ। তিনি শ্রীমতী উমা হালদারের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে আসিয়া তাঁহাদের গৃহে তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নগরে তিনি জনহিতকর অনুষ্ঠানের অধিনায়করূপে যে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমার তাহা শুনিবার সুযোগ হয় নাই, তাহার বাধা ছিল দৈহিক। কিন্তু পূর্ব্বে সময় নিরূপণ করিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। অপরাহ্নে আমি হালদারগৃহে উপস্থিত হইলে সংবাদ পাইয়া অল্পকাল পরেই তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুই এক কথার পরেই বলিলেন, "আপনাকে আজ অনেক কাল পরে দেখলুম।" তিনি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় লিখিতে পারিতেছেন, আমি এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে বলিলেন, "অভ্যাস হয়ে গেছে।" কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি কখনও শান্তিনিকেতনে যান নি?" আমার মনে হইল কবি আমার গালে আচ্ছা এক চড় মারিলেন। কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা না করিলাম, তা নয়—কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতার অপরাধ আমি আজও অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। মাঝখানে প্রদোষ ও বীণাকে ডাকিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিলাম। বীণাকে দেখিয়া বলিলেন, "এঁকে তো এখানেই দেখেছি।" মহর্ষি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কে কত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে বলিলেন, "আপনি আমার অনেক ছোট।" (৬॥ বৎসর)। কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে "আপনাকে আর

ধরিয়া রাখিব না" বলিয়া বিদায় লইলাম। কবি স্থবির হইয়াছেন। ঘণ্টা দুই পরে রবীন্দ্রনাথ বারাণ্ডায় আসন গ্রহণ করিলেন, এক এক করিয়া শতাধিক নারী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি পশ্চাতে বসিয়া বহুক্ষণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম।

বীণার জ্যেষ্ঠা কন্যা পারুলকে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বীণাকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার মেয়েটী দেও— আমি তাহাকে লেখাপড়া, গান, নাচ ও রান্না শিখাইব।"

দেড় বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ অমৃতধামে প্রয়াণ করেন।

বাঁকুড়ায় যাঁহাদিগের সহিত নূতন পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের সহিত অন্তরঙ্গ নৈকট্য অনুভব করিয়াছিলাম। ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন, দীর্ঘ কালেও সে শোকের তীব্রতা প্রশমিত হয় নাই। আমি ভুক্তভোগী বলিয়া তাঁহার মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে পারিতাম। তিনি স্বরচিত তিনখানি পুস্তক—হয়গ্রীব, সন্ধ্যোপাসনা ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থ তাঁহার গুরুর ও নিজের জীবনকাহিনী। আমি কলিকাতায় যাইয়া তাঁহাকে আমার কয়েকটী বক্তৃতা পাঠাইয়াছিলাম, এবং তিনি মন্তব্য সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন।

২৫এ মার্চ্চ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম।

কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণ

এখন কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন নগরে গমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

ঢাকা

১৯২২ সনের ফেব্রুরারী মাসে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা সুধার বিবাহোপলক্ষে খোকা ও বীণাকে লইয়া ঢাকায় গমন করিয়া তথায় তিন চারি দিন অবস্থান করি। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রাচীন ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল। বিবাহের পর দিন তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধে যোগ দিয়া শাস্ত্র পাঠ করি। ১৩ই ফেব্রুয়ারী মন্দিরে "ধর্ম্মের শাঁস ও খোসা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া ঢাকায় যাই। তাহার অল্পকাল পূর্ব্বে বীণার বিবাহ হইয়াছে। প্রদোষ নারায়ণগঞ্জে যাইয়া আমাকে লইয়া আইসে। দুই তিন ঘণ্টা তাহার দিদি শ্রীমতী প্রভাবতী রায়ের গৃহে বিশ্রাম করিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে গমন করি। সেখানে সুপরিচিত পশ্চিমদিকের গ্যালারীতে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। বীণা আমার সঙ্গেই থাকিল; সে আমার আহারাদির তত্ত্বাবধান করিত, প্রভাবতী ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। দুই এক দিন পরে সতীশচন্দ্র আসিয়া পূর্ব্বদিকের গ্যালারীতে রহিল। আমি দুইবার উপাসনা ও ৭ই ডিসেম্বর "ধর্ম্ম ও জাতীয় প্রকৃতি" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষ এক দিন আমাকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করেন। তথায় সম্বর্দ্ধনার পরে কিঞ্চিৎ বলিতে হইয়াছিল।

অপর এক দিন অপরাহ্নে প্রদোষ তাহাদের এক সমিতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। সেখানে পরিদর্শনের পরে ফল দ্বারা জলযোগ করিয়াছি।

১৯২৭ সনের বর্ষাকালে প্রদোষ ও বীণা পাটনায় প্রতিষ্ঠিত হইলে আগষ্ট মাসে আমি কয়েক দিনের অবকাশ পাইয়া এক সপ্তাহকাল তাহাদিগের নিকটে বাস করিয়া আসিলাম। মুকুল সঙ্গে গিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীটী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতার মধ্যে এবং গঙ্গার সন্নিকটে—একতলা ছোট গৃহ, জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলো ছিল। প্রতিদিন গঙ্গার খরস্রোতে স্নান করিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত।

পূজার ছুটীতে প্রসূনকে লইয়া পুনশ্চ ঐ গৃহে অল্পাধিক কাল বাস করিলাম। সে টাইফয়েড জ্বরে ভুগিয়া উঠিয়াছিল। এবারও প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিতাম। এক দিন হেডমাষ্টার শ্রীরঙ্গবিহারীর অনুরোধে রামমোহন রায় সেমিনারী পরিদর্শন করিলাম। পুরাতন শিক্ষকগণ বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। নবেম্বর মাসে খাজাঞ্চী রোডে নূতন বিশাল বাটীর দ্বার উন্মোচনের উৎসব সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিমন্ত্রিত হইয়া পাটনায় গমন করিয়াছিলেন। ভ্রাতা সতীশ কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে তিনি নূতন বাটীতে উপাসনা করিলেন, তাহাতে যোগ দিলাম। প্রধান উৎসবের দিন প্রাতঃকালে উহাতে উপস্থিত থাকিলাম এবং সায়ংকালে রায় মহাশয়ের রামমোহন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিলাম। ছাব্বিশ বৎসরে বিদ্যালয়টীর আশাতীত বিকাশ ও উন্নতি দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

তারপরে হঠাৎ প্রদোষের দিদি শ্রীযুক্তা বিভাবতী হালদারের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া প্রদোষ ও বীণা কলিকাতায় চলিয়া গেল। বড়দিদি সান্ত্বনার সহিত নয়াটোলায় ছিলেন, তিনি আমাদের আহারাদি দেখিবার ভার লইলেন। খোকা ট্রেনিং কলেজে পড়িত, সে আমাদের সঙ্গে থাকিল। ছুটী শেষ হইবার দুই একদিন পূর্ব্বে

আমরা ফিরিয়া যাইব, এই প্রকার স্থির ছিল। যাত্রার দিন প্রাতঃ-কালে প্রদোষ আসিল, সায়ংকালে আমরা পাটনা ত্যাগ করিলাম। ভ্রমক্রমে প্রসূনের কাপড়ের বাক্সটী ফেলিয়া গিয়াছিলাম, প্রদোষ তাহা দেখিতে পাইয়া এক্কা করিয়া ষ্টেসনে পঁহুছিয়া দেয়।

১৯২৭ সনের বড়দিনের ছুটীতে প্রদোষের সহোদরা ইলা এবং শ্রীমান্ সুখময় সেনের বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষের বিশেষ অনুরোধে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য কটকে যাইয়া তিন চারি দিন অবস্থান করিলাম। বিবাহের পরদিন একটী মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়া অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন—তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোকটী অত্যন্ত উদারপ্রকৃতি এবং সঙ্গীতপটু ও সঙ্গীতরচয়িতা। তিনি স্বরচিত হিন্দী, উড়িয়া ও বাঙ্গালা গীত গাহিয়া শুনাইলেন—একটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত কি না। এ প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর পাই নাই। এই সাম্প্রদায়িক কলহের কালে এ প্রকার উদারচিত্ত লোকের দর্শন দুর্লভ।

আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবার কালে বরকন্যা ও অন্য যাত্রীর জন্য আমার নামে পুরী হইতে একটি কামরা রিজার্ভ করা হইল। সেদিন রবিবার—ষ্টেসনে যাইবার পথে সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্য করিলাম। নৈশ ভোজন ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে নির্ব্বাহিত হইল।

১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে খোকার নূতন সংসার দেখিবার জন্য পাটনায় যাইয়া তাহাদিগের সহিত সপ্তাহকাল অবস্থান করি। এবারও প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করিতাম। একদিন বেহার ন্যাশনেল কলেজের অধ্যক্ষ পুরাতন বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার মোটর

গাড়ীতে লইয়া গিয়া নূতন কলেজবাটি, অধ্যক্ষের কক্ষ প্রভৃতি দেখাইলেন।

কলিকাতায় ফিরিবার সময়ে নূতন বৌকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। তাহাদিগের যত্নে প্রীত হইয়াছিলাম।

পর বৎসর জুলাই মাসে খোকার পীড়ার তার পাইয়া পাটনায় যাইয়া তিন চারি দিন ছিলাম।

১৯৩৩ সনে শারদীয় অবকাশে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর যে অধিবেশন হয় আমি তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হই। ঢাকার রেল ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ ও আরও অনেকে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষে বীণাদের টীকাটুলীর বাড়ীতে প্রায় এক মাস ছিলাম। ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন, এবং ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও আরও অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। অধিবেশন উপলক্ষে একদিন সায়ংকালে আচার্য্যের কার্য্য, সভাপতির অভিভাষণ পাঠ ও অন্যান্য কার্য্য এবং একটী বক্তৃতা করি। পরেও একদিন সায়ংকালীন উপাসনার কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল।

সম্মিলনীর অধিবেশনের কয়দিন পরে বীণা, প্রদোষ ও মুকুলকে লইয়া ময়মনসিংহে যাই। সেখানে পূজনীয় শ্রীনাথ চন্দ্র মহাশয়ের গৃহে তিন দিন পরম সমাদরে যাপন করি। তিনি বহুকাল হইতে একেবারে বধির ও চলচ্ছক্তিরহিত জরাক্লেশ বহন করিতেছেন, কিন্তু চক্ষুর জ্যোতিঃ, স্মৃতিশক্তি ও বাক্‌পটুতা অটুট আছে। আমি শনিবার প্রাতঃকালে পঁহুছিয়া সায়ংকালে ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা করি। পরদিন সন্ধ্যার সময় মনোমোহনবাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

সোমবার প্রাতঃকালে আত্মীয়বন্ধু, এবং অতি বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়ের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আনন্দমোহন কলেজের হষ্টেল দেখিয়া এবং অধ্যক্ষ কুমুদবাবু ও তাঁহার পত্নীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া সায়ংকালে ঢাকায় প্রত্যাগমন করি।

ইহার পরে একদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ ও অপর এক ডিরেক্‌টরের সৌজন্যে তাঁহাদের সহিত প্রতিষ্ঠানের লঞ্চে ঢাকেশ্বরী কটন মিল দেখিতে যাই। প্রদোষরা সকলে সহযাত্রী ছিল। এই বিশাল কারখানাটি দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

আর একদিন শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ প্রভৃতির সহিত নারায়ণগঞ্জ যাইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়া আসিলাম। যাতায়াত মোটর গাড়ীতে সম্পন্ন হইল।

অক্টোবরের শেষ দিকে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। ৪ঠা নবেম্বর শনিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দাস এবং আমি পূর্ব্বাহ্ণে স্নানাহার করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম। বেলা আন্দাজ দুইটার সময় আমরা বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহিত ষ্টেসন হইতে উকীল শ্রীযুক্ত ভামিনীরঞ্জন সেনের গৃহে উপনীত হইলাম। ইনি সিটী কলেজের প্রথম যুগের কৃতী ছাত্র। ইঁহার পুত্রও ঐ কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন, এখন পিতার সঙ্গে ওকালতী করিতেছেন। আমরা বৈঠকখানা ঘরে ফরাসের উপরে বিশ্রাম ও সঙ্গে যে লেবু ছিল তদ্দ্বারা পিপাসা ও শ্রম অপনোদন করিলাম। ভামিনীবাবু বিশ্রামান্তে নামিয়া আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া সদালাপ দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। আমি সিটি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ জানিয়া আমার প্রতি যেন

একটু বেশী সমাদর প্রদর্শন করিলেন। অপিচ সুরেন্দ্রনাথ দাসকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইলেন সে নাপিত। এজন্য বৈকালিক আহারে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা তাহার সহিত একত্র আহার করিব কিনা। আমি বলিলাম, "হাঁ, নিশ্চয়।" আমরা এক টেবিলে বসিলাম। জলযোগের ব্যবস্থা উত্তম হইয়াছিল। আমি বাঁধা নিয়মানুসারে বর্দ্ধমানের উত্তম মুড়ী এবং সঙ্গে যে ওভালটিন ছিল, তাহা দুধের সহিত খাইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা বংশগোপাল টাউনহলে উপস্থিত হইলাম, ভামিনীবাবুও একটু পরে গেলেন। সেখানে যে সভা হইল তাহাতে কে সভাপতি হইলেন, তাহা মনে নাই। সুরেন্দ্র সঙ্গীত ও বরদাবাবু প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে আমি, ধীরেন্দ্রবাবু ও স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু, এই তিন জনের বক্তৃতা হইল। ঘণ্টা দুই পরে সভা ভঙ্গ হইলে আমরা ভামিনীবাবুর গৃহে আসিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ষ্টেসনে গেলাম, এবং দশটার পরে হাওড়ায় উপনীত হইলাম। ধীরেন্দ্রবাবু রাত্রির আহার্য্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি রাত্রির কর্ত্তব্য গাড়ীতেই সম্পাদন করিলেন। বরদাবাবুরা তিন জন আমার অগ্রে বাস পাইলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমার পার্কসার্কাসের বাস পাইতে বহু বিলম্ব হইল, এজন্য বাড়ী পৌঁছিয়া আহারান্তে শয্যায় যাইতে রাত্রি বারটা হইয়া গেল। ফলে শেষ রাত্রিতে উৎকট মাথা ধরিল।

আমাদের যাতায়াতের ব্যয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দিয়াছিলেন।

আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ৯ই সেপ্টেম্বর "জাতিসংগঠনে রামমোহনের প্রভাব" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা

করিয়াছিলাম। ২রা অক্টোবর ঢাকায়, ১৪ই ময়মনসিংহে, ২৫শে ময়মনসিংহে এবং ৪ঠা নবেম্বর বর্দ্ধমানে উহারই পুনরাবৃত্তি করি।

ইহার পরে ১৯৩৫ সনের নবেম্বর মাসে এক সপ্তাহের জন্য মেদিনীপুরে প্রদোষ-বীণাদের গৃহে গমন করি। টুলটুল তখন তিন মাসের শিশু। মেদিনীপুরের দুধ উৎকৃষ্ট, আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই, রাস্তার ধূলিও ভুলিতে পারি নাই। বীণাদের দোতলা দক্ষিণ খোলা গৃহটীও খুব আরামদায়ক ছিল। সেখানে নিয়মিত ভ্রমণ ও ব্রাহ্মদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ছাড়া এক রবিবার সায়ংকালে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় মুকুলকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। তাহার বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হইতে দেরী ছিল না ; তখন মেদিনীপুরে উহা উপদ্রবের সৃষ্টি করিত।

কুমিল্লা, কটক, কালিম্পং এবং মেদিনীপুর—এই চারি সহরে আমার দিক্ ভুল হইত।